অহল্যাভূমি পুরুলিয়া

প্রথম পর্ব

সম্পাদনা

দেবপ্রসাদ জানা



দীপ প্রকাশন

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৩

প্রচ্ছদশিল্পী : ধ্রুব দাস
সহঃ সম্পাদনা : নিলয় মুখার্জ্জী

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

মুদ্রাকরঃ
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৩৭/১/২ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কোলকাতা-৪

বর্ণ সংস্থাপনঃ
আই. ই. আর. ই.
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অখণ্ড পুরুলিয়ার সেই সব মানুষের উদ্দেশে
যারা আচরণে বিনীত
আকাঙ্ক্ষায় নির্লোভ
যারা হৃদয়ের নিকটে আজও
চেয়েছে শুধু হৃদয়

যে ভূমি ধূসর হয়ে যায়নি
যে অরণ্য গগনপ্রয়াসী
যে নদী প্রবাহের লাগি
অস্থির চঞ্চল অতি

বিষয় সূচি

ইতিহাস

পুরাতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি

ভাষা ও সাহিত্য

সংস্কৃতি

ইতিহাস

প্রাচীন পুরুলিয়া ঃ বঙ্গদেশে আর্য-সভ্যতা ও সমন্বয়বাদ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা

ডঃ সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বর্তমান পুরুলিয়া অঞ্চলটি প্রাচীনকালে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কখনো রাধা, কখনো বজ্রভূমি, কখনো শিখরভূমি, কখনো মান্দারণ, আবার আধুনিককালে জঙ্গলমহল ও মানভূম নামেও সমাদৃত হত। আধুনিক যুগে আবার এই পুরুলিয়া অঞ্চলটিই বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজ অধিকারে আসে। বাংলার নবাব মীরকাশিম সিংহাসনলাভের পুরস্কার স্বরূপ মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম জেলা তিনটিকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেন। পরবর্তী নবাব মীরজাফর দ্বিতীয়বারের জন্য নবাব হলে এতে তিনিও স্বীকৃতি দানে বাধ্য হন। ১০ই জুলাই, ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের ঘোষণায় তিনি বলেন, "I do grant and confirm to the Company, foi defraying the expenses of their troops the Chuklas of Burdwan, Midnapore and Chittagong, which were before ceded for the same purpose."[1] এই বর্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলাদুটির মধ্যেই ছিল পুরুলিয়ার অবস্থিতি। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে কংসাবতী নদীর উত্তরাংশ ছিল বর্ধমান তথা দক্ষিণাংশ ছিল মেদিনীপুরের অন্তর্গত। ফলে এই সময় থেকেই পুরুলিয়ার আধুনিক ইতিহাসের যাত্রারম্ভ হয়। সাথে সাথে ব্রিটিশ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এখানকার অধিবাসীরাই প্রথম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়, যাকে ব্রিটিশ সরকার হীন প্রতিপন্ন করার জন্য কুখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে।

প্রাচীন পুরুলিয়া জেলার ইতিহাস এক গৌরবজ্জ্বল যুগের সাক্ষী হিসেবে দণ্ডায়মান। এর অনেক কিছুই আমরা বিস্মৃত হয়েছি এবং ঠিকমতো গবেষণাকার্যও হয়নি। পাহাড় ও বনজঙ্গলে ঘেরা প্রাচীন পুরুলিয়া রুক্ষ-সুক্ষ হলেও এখানেই বঙ্গদেশে প্রথম আর্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ হয়েছিল এবং কালক্রমে তা বঙ্গদেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বঙ্গদেশের প্রাচীনতম অঞ্চল এই পুরুলিয়া। সরাক, ভূমিজ, মাহাতো, বাগদি বাউরিদের কীর্তি গাথার দেশ। বঙ্গ সভ্যতা ও বাঙালি সংস্কৃতির অনেক উত্থান-পতন এবং অনেক ভাঙা-গড়ার ঘাত প্রতিঘাত এখানে ভীড় করে আছে। বঙ্গদেশের এই প্রাচীন অঞ্চলটি প্রাকৃতিক দিক থেকে বাঁকুড়ার সাথে ঘনিষ্ঠ। এদের মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই। এই সীমা পুরুলিয়া অতিক্রম করে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণীর সাথে যুক্ত। ভাষা, ভূ-প্রকৃতি ও সমাজ ব্যবস্থায় সাঁওতাল পরগনার সাথে যেমন বীরভূমের, তেমনি পুরুলিয়ার সাথে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। যে কোনো প্রাকৃতিক

ভূমি নকশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে রাজমহল থেকে এক অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী এবং গৈরিক মালভূমি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে একেবারে ময়ূরভঞ্জ-কেওঝোড়-বালেশ্বর স্পর্শ করেছে। এই পর্বতমালা ও গৈরিক মালভূমিই সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া এবং ময়ূরভঞ্জ বালেশ্বরের অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি এবং বাংলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম সীমা।[2] এই সব পুরাভূমির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাঁকুড়া জেলার বনআসুরিয়া গ্রামে প্রস্তরযুগের কুঠারফলক এবং পুরুলিয়া জেলায় প্রাপ্ত প্রস্তরময় কুঠার আজও প্রস্তরযুগকে স্মরণ করায়। ভারতে আর্য ও আর্যপূর্ব যুগের ভাষা এবং সংস্কৃতির সমন্বয়ের মধ্যেই ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি পূর্ণতা লাভ করেছে। ফলে বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব সমন্বয়বাদের এক দ্যোতক। পুরুলিয়ায় এই ইঙ্গিত স্পষ্টতর। এখানে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষীদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর এক নবজন্ম ঘটেছিল। আমরা এই সংস্কৃতিকে বঙ্গদেশের আদিরূপ বলতে পারি।[3]

মহাভারতের যুগে পুরুলিয়া জেলায় বিশেষত দামোদর ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুটি রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি ছিল সুহ্ম, অপরটি তাম্রলিপ্ত। দুই রাজ্যেই ছিল অনার্যদের বাসভূমি। পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে যে সব দেশ জয় করেছিলেন তাদের মধ্যে কাশী, সুহ্ম ও পুণ্ড্র ছিল অন্যতম।[4] পরবর্তীকালে রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে মধ্যম পাণ্ডব ভীম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে মোদাগিরি অর্থাৎ বর্তমান মুঙ্গের, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, প্রযুক্ত প্রভৃতি দেশ জয় করেছিলেন। সুহ্মের মধ্যে পুরুলিয়া অঞ্চলটি ছিল সেদিন পশুভূমি নামে পরিচিত।[5]

বঙ্গদেশে জৈনধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব সর্বপ্রথম পুরুলিয়া অঞ্চলেই অনুভূত হয়েছিল। ফলে এই অঞ্চলকে আর্য সভ্যতার আদিভূমি বলা যেতে পারে। অধ্যাপক নিহাররঞ্জন রায়ের মতে জৈনধর্মই বাংলার আদিতম আর্যধর্ম। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে পূর্বভারতে আর্যদের বাসস্থান বিদেহ বা বর্তমান মিথিলা থেকে শুরু হয়। আর্য সভ্যতা সেখান থেকে পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ) ও মগধে (দক্ষিণ বিহার) বিস্তৃত হয়।[6] খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ওই স্থানগুলি অনার্য অধ্যুষিত ছিল। কাজেই উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্র, মগধ ইত্যাদি স্থানগুলি আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। আর্যদের অনুরূপ অনুপ্রবেশ অঙ্গ রাজ্য বা বর্তমান মুঙ্গের ভাগলপুরেও হয়েছিল।[7] অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা বা বর্তমান ভাগলপুর। এখান থেকেই আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি পুরুলিয়ার উত্তরাংশে বিশেষত দামোদর নদের উত্তর তীরের ভূভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামায়ণ থেকে জানা যায় যে বঙ্গ অঞ্চলটি মিথিলার রাজা দশরথের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এরপর মহাভারতে আর্যদের পূর্বদিকে প্রভাব বিস্তার করার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই মহাকাব্যে বঙ্গদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে আমরা শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও কর্ণের যুদ্ধের অভিযানগুলির সংবাদ পেয়ে থাকি। কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গদেশের রাজারা কৌরবদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। মহাভারতে বঙ্গদেশের তীর্থস্থানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম ও করতোয়ার উল্লেখ এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে তিনদিন উপবাসের পর গঙ্গার পশ্চিম তীরে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যলাভ করা যায়।[8] কাজেই দেখা যায় যে মহাভারতের যুগে আর্যদের বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছিল। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব ভারতে আর্যীকরণ প্রক্রিয়া চালু ছিল।

হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনেক আগে থেকে জৈনেরাই প্রথমে আর্যীকরণের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

পুরুলিয়ায় জৈন সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রাচুর্য আজও বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিদর্শন ও এই জেলায় আছে, কিন্তু সেগুলি জৈনদের পরবর্তীকালে। আরও পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ঘটেছে এই জেলায়। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল যৎকিঞ্চিৎ।[9]

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের পুরুলিয়া অঞ্চলটি রাধা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[10] যদিও প্রাচীন বা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে লিখিত জৈনধর্মগ্রন্থ আয়রঙ্গ সুত্ততে আমরা প্রথম রাধা নামের উল্লেখ পাই। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে রাধা অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে পরিবৃত ছিল এবং এখানে অসভ্য লোকেদের বসবাস ছিল। এই গ্রন্থের লেখক দুঃখের সাথে উল্লেখ করেছেন যে রাধা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করা খুবই ভীতিপ্রদ ছিল। কাজেই উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে চতুর্থ এবং তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্যেরা বিশেষত জৈন শ্রমণেরা রাধা অঞ্চলটি সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এতদ্অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। জৈনধর্মাবলম্বীদের এইরূপ ধর্ম প্রচারের দ্বারাই বোঝা যায় যে তাঁরাই সর্বপ্রথম রাধা অঞ্চলের অধিবাসীগণকে আর্যীকরণ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। আয়রঙ্গসুত্ত থেকে আমরা একথাও জানতে পারি যে জৈনধর্মের চতুর্বিংশ তীর্থংকর মহাবীর এই অসভ্য জাতিকে নূতন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর এইরূপ পরিভ্রমণের কালে এখানকার অসভ্য লোকেরা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।[11] রাধা অঞ্চলটি সেই সময় দুই ভাগে বিভক্ত ছিল— বজ্রভূমি ও সুক্ষভূমি। বর্তমান পুরুলিয়া অঞ্চল বজ্রভূমির মধ্যে ছিল। এতদঅঞ্চলের কঠিন প্রস্তরময় রুক্ষ মৃত্তিকা সে কথাই প্রমাণ করে।

অন্যদিকে সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থ **মহাবংশ** থেকে জানা যায় যে রাধা অঞ্চলটি বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং সেখানে আদিমতম লোকেদের বসবাস ছিল। কিন্তু সেখানে বঙ্গ রাজার পৌত্রের দ্বারা আর্যীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যিনি এই জঙ্গল পরিবৃত অঞ্চলের মধ্যে কয়েকশত যোজন ব্যাপী কতকগুলি গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজেই তাদের মতে রাধা অঞ্চলে সভ্যতার অনুপ্রবেশ হয়েছিল বঙ্গ রাজাদের দ্বারা খ্রিস্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে।[12] এক কথায় বলা যায় যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মহাবংশ পুরুলিয়া অঞ্চলে সভ্যতা প্রসারের কৃতিত্ব জৈনধর্মকে দিতে নারাজ। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকারও অনুরূপ মত পোষণ করেন।[13]

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চব্বিশ জন তীর্থংকরের মধ্যে উনিশ জন সমেত শিখরে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। তেইশতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথের নির্বাণ লাভের পর পাহাড়টির নাম হয়েছিল পার্শ্বনাথ পাহাড়, চলতি কথায় যাকে পরেশনাথ পাহাড় বলা হয়ে থাকে। পাহাড়টিকে ঘিরে জৈনধর্মের এক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। পার্শ্বনাথের আদর্শের উপর ভিত্তি করে মহাবীর প্রবর্তিত জৈনধর্মের মূল কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় জৈনধর্মের প্রভাব ছিল বেশি। বিশেষত ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ ও পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া বাঁকুড়া অঞ্চলে। পুরুলিয়া থেকেই এই ধর্ম প্রসারিত হয়েছিল উড়িষ্যায় এবং বঙ্গদেশের অন্যত্র। জৈন পুরাণ অনুসারে মানভূম নামটি জৈন তীর্থংকরদের নামের সাথে জড়িত।

পরেশনাথ পাহাড়টি ঘিরে জৈনধর্মের যে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, খুব সম্ভবত এই রাজ্যের নাম ছিল শিখরভূম। শিখরভূম ছিল এক বিশাল রাজ্য, অজয় ও দামোদর নদের মধ্যে বিস্তৃত। ফলে জৈনধর্মের দ্বারা ওদিক থেকেও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের জনজীবন প্রভাবিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পুরুলিয়া অঞ্চলেই দেখা দিয়েছিল।[14] পুরুলিয়ার অসংখ্য জৈনমূর্তি,

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং কংসাবতী সুবর্ণরেখা নদীতীরে অবস্থিত অসংখ্য জৈনমূর্তি এই সত্যটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

পুরুলিয়া অঞ্চলে এবং নদীর তীরভূমিগুলিতে জৈনধর্ম প্রচারের কৃতিত্ব সরাকেরা দাবী করতে পারেন। আধুনিককালে পুরুলিয়া জেলার উত্তর পূর্ব রঘুনাথপুর ও পাড়া থানা এলাকায় সরাকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।[15] এছাড়া চাণ্ডিল ও চাস থানাতেও কিছু সরাকেরা বসবাস করেন। কালের প্রবাহে কিছু সরাক বাঘমুণ্ডির সুইসা অঞ্চলে বসবাস করা শুরু করেছেন। এক সময় পুরুলিয়া জেলার সর্বত্রই সরাকদের বসবাস ছিল। পুরুলিয়ার অধিকাংশ দেব-দেউল সরাকদেরই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমদিকে সরাকদের বসতি ছিল পঞ্চকোটকে কেন্দ্র করে। তাই অনেকে মনে করেন যে পঞ্চকোটের রাজারাই তাদের এনেছিলেন, অথবা পঞ্চকোট রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখে তাঁরাই উৎসাহিত হয়ে এখানে এসেছিলেন। সরাকেরা বাণিজ্য ও মহাজনী ব্যাবসায় লিপ্ত ছিলেন। ঋণ সুদের কারবার ও অন্যান্য ব্যাবসা-বাণিজ্যে তাঁরা প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছিলেন। সেই বিত্তের একাংশ তাঁরা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেছিলেন। এরই ফলে পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈন পুরাকীর্তির এত প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। অনেকে মনে করেন যে সরাকদের পুরুলিয়া অঞ্চলে বসবাস অতি প্রাচীনকাল থেকে। ভূমিজদেরও অভিমত যে সরাকেরা তাঁদেরও আগে পুরুলিয়া অঞ্চলে এসেছিলেন।[16] কাজেই আর্যীকরণের প্রক্রিয়া প্রথম জৈনেরাই পুরুলিয়া অঞ্চলে শুরু করেন, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনেক আগে। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে পুরুলিয়ার কাঁসাই নদীর তীরে জৈনদের অনেক সাংস্কৃতিক চিহ্ন দেখা যায়, যা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও দেখা যায় না।

সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্রাট অশোক সিংহলী কয়েকজন দূতকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য নিজে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তে এসে তাঁদেরকে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন। গয়া থেকে ছোটনাগপুরের পাহাড় অতিক্রম করে তাম্রলিপ্ত আসতে তাঁর সাতদিন সময় লেগেছিল।[17] তাঁর যাত্রাপথ ছিল পাটলিপুত্র থেকে রাজগৃহ, রাজমহল, ঝরিয়া, রঘুনাথপুর, ছাতনা, ঘাটাল হয়ে তাম্রলিপ্ত। এই তাম্রলিপ্তও অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[18] বর্তমান পুরুলিয়া জেলার পূর্বাংশ, হয়তো সমগ্রাংশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তাম্রলিপ্তের আয়তন ছিল প্রায় ১৪০০ লি বা ২৩৩ মাইল। পূর্বভারতে তাম্রলিপ্ত ছিল সবচেয়ে বড় বন্দর। পাটলিপুত্র থেকে আসতে হলে দামোদর পেরিয়ে যে পথ ধরে আসতে হত, তা ছিল বর্তমান পুরুলিয়া জেলার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিঃ বেগলার এই পথটি ধরে এসেছিলেন।

অশোকের মৃত্যুর পর মগধ সাম্রাজ্য মৌর্যদের হাতছাড়া হয়ে যায়। শুঙ্গবংশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অন্তর্কলহের সুযোগে চেদি বংশের সন্তান খারবেল কলিঙ্গের রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া তিনি রাজগৃহ এবং মগধও জয় করেছিলেন। দামোদরের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ বর্তমান পুরুলিয়া জেলা খারবেলের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল।[19] খারবেলের মৃত্যুর পর খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই পুরুলিয়া অঞ্চলে সাতবাহনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খারবেলের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ত্রি-কলিঙ্গের জন্ম হয়েছিল। এর প্রথম ভাগ ছিল পাললিক মরুভূমি অর্থাৎ দামোদরের দক্ষিণ তীর থেকে ময়ূরভঞ্জ, কেওঝোড় ও আঙ্গুল পর্যন্ত। সম্ভবত দামোদরের দক্ষিণ তীরস্থ সমগ্র অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান পুরুলিয়া জেলা কলিঙ্গ রাজ্যের প্রথমভাগের সাথে যুক্ত ছিল। অপরদুটি ভাগ মহানদীর দক্ষিণ তীর থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ এদেশে আসেন। বাংলাদেশ পরিভ্রমণের সময় তিনি গৌড় বঙ্গ কামরূপ রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা শুনতে পান। কাজেই মনে করা যেতে পারে যে ঐ বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে তিনি কোথাও অস্ট্রিকভাষী বা দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাননি। কাজেই মনে হয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই বাংলাদেশে অস্ট্রিকভাষী ও দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী আর্যভাষা গ্রহণ করেছিলেন।[20] হিউ-এন সাঙ বারাণসী, বৈশালী, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, চম্পা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। চম্পা বা বর্তমান ভাগলপুর থেকে তিনি এসেছিলেন ক-জঙ্গলে। ক-জঙ্গলকে অনেকে বর্তমান রাজমহল বলে চিহ্নিত করেছেন। ক-জঙ্গল থেকে দক্ষিণদিকে সিউড়ি, রাণিগঞ্জ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর হয়ে তিনি তাম্রলিপ্ততে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে।[21] সে সময় চম্পা (ভাগলপুর) রাজ্যটি ছিল ধানবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে তাম্রলিপ্ত রাজ্যটি দক্ষিণাংশের সমগ্র পুরুলিয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল।

মোটামুটি গৌড়ের রাজা শশাংকের সময় থেকে জৈনধর্মের বিস্তার ক্রমশ বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং পুরুলিয়া অঞ্চলে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের ফলে এই ধর্ম জনগণের ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত অসংখ্য শিবলিঙ্গ এই পশ্চিম রাধা অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছিল। যদিও এই জনপ্রিয়তার প্রকৃত কারণ এবং কোন্ সময় এই জেলায় প্রবেশ করেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত তথ্য আমাদের কাছে নেই। বোড়াম এবং রেলিবেড়া নামক স্থানে হর পার্বতীর মূর্তি ও অসংখ্য শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব একথা প্রমাণ করে। শিবলিঙ্গ ছাড়াও বিষ্ণু পূজার প্রমাণও এতদ্অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। বিষ্ণু অবতাররূপে নরসিংহের মূর্তি ধরে হিরণ্যকশিপুকে নিধন করছেন— এরূপ মূর্তিও এই জেলায় পাওয়া যায়। এছাড়া এ অঞ্চলে গণেশপূজারও প্রচলন ছিল। বোড়াম, রেলিবেড়া, বুধপুর ইত্যাদি অঞ্চলে কিছু গণেশমূর্তিও দেখা যায়। দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তি বোড়াম ও ছড়রাতে পাওয়া গেছে। কার্তিকের মূর্তি সংখ্যায় কম হলেও, এতদঅঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। কালী এবং শিবের নৃত্যরত মূর্তি কোশজুড়ি অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।[22] বোড়ামে যে মূর্তিগুলি ডাল্টন এবং বেগলার দেখেছিলেন— তাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত। অনুরূপভাবে পাঁচেট জলাধারে নিমজ্জিত অধিকাংশ মূর্তি ও মন্দিরই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতীক হিসেবে বিদ্যমান ছিল।[23]

সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়ের রাজা শশাংক সপ্তম শতাব্দীতে পুরুলিয়া অঞ্চলটি নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। এই অঞ্চলে তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৫৮০ থেকে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দণ্ডভুক্তি ও উৎকল এই সময় শশাংকের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এই দুই অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল উত্তর-তোষলি রাজ্য। উত্তর তোষলির শাসক শম্ভুযশকে পরাজিত করে শশাংক এই রাজ্যগুলি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেখানে সোমদত্ত নামে এক অধীনস্ত সামন্ত রাজাকে এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে রাজা শশাংক এ অঞ্চলে এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। ক্যানিংহামের মতে শশাংকের সাম্রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যা থেকে উত্তরে মগধ রাজ্য পর্যন্ত এবং পূর্বে ভাগলপুর থেকে পশ্চিমে মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ক্যানিংহাম সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রাচীন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা এই কর্ণসুবর্ণ পুরুলিয়া অঞ্চলে ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। ক্যানিংহামের মতে This has comprised all the Letty hill states lying between Midnapore and Singuja on the East and West,

and between the sources of the Damodar and Vaitarani on the North and South." ক্যানিংহামের মতে শশাংকের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বরাহবাজার বা তার নিকটস্থ কোনো এক স্থানে বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে হেউটের মতে কর্ণসুবর্ণ দুলমীতে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বেগলার এই কর্ণসুবর্ণকে দুলমীর যোলো কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে সাফরন নামক স্থানে ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। উপরোক্ত দুটি স্থানই সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কাজেই তাঁদের মত অনুসারে পুরুলিয়া অঞ্চলে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কোনো এক স্থানে শশাংকের কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল।[24]

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের উপরোক্ত মত স্বীকার করেন না। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে শশাংকের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি ও কানাসোনার মধ্যে অবস্থিত ছিল।[25] অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপরোক্ত মত পোষণ করেন। এমতাবস্থায় অধ্যাপিকা সুদীপ্তা মুখার্জী মন্তব্য করেন যে হয়তো পুরুলিয়া অঞ্চলের কোনো এক স্থানে শশাংক তাঁর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।[26]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মানবংশের রাজা শম্ভুযশকে পরাজিত করে শশাংক উত্তর তোষলি রাজ্যে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন যে উত্তর তোষলি ছিল প্রাচীন উৎকল রাজ্য। এই উত্তর তোষলি মেদিনীপুরের বৃহদাংশ, মানভূম, সিংভূম ও বালেশ্বর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। পরে দক্ষিণ তোষলি থেকে রাজা শশাংক মানরাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন, ফলে তাঁর সাম্রাজ্য পুরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলায় এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে মান নামাঙ্কিত একাধিক স্থান ও জনগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়— যেমন মানভূম, সিংভূম, বরাহভূম শিখরভূম, সামন্তভূম ইত্যাদি। পুরুলিয়া জেলারই পূর্বনাম মানভূম।[27]

কেউ কেউ মনে করেন যে মান একটি রাজবংশের নাম যাদের রাজত্ব মানভূম, বরাহভূম, সিংভূম ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। ফলে মান আধিপত্যের চিহ্ন এসব অঞ্চলে আজও বর্তমান।

চতুর্থ শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার এই বিশাল মান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। ওই শতাব্দীতে ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বাঁকুড়ার নিকট শুশুনিয়া শিলালিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত লিপিগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে যে সিংহবর্মনের পুত্র চন্দ্রবর্মন তাঁর রাজধানী বাঁকুড়া অঞ্চলের দামোদর নদের তীরে স্থাপন করেছিলেন। তিনি সমগ্র দামোদর উপত্যকার শাসক ছিলেন। কাজেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাঁর রাজ্য বর্তমান পুরুলিয়া জেলাতেও বিস্তৃত ছিল। ফলে পুরুলিয়া অঞ্চলকে আর্যীকরণ করার প্রক্রিয়া যা পূর্বেই শুরু হয়েছিল, এরপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা তা দ্রুততর হল। অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপিত চাণ্ডিল শিলালিপি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এছাড়া সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিত রামচরিত গ্রন্থে আমরা নিশ্চিতভাবে এই আর্যীকরণের প্রভাব দেখতে পাই। তাঁর রচনা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে একাদশ শতাব্দীতে রাজা রুদ্রশিখর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত শাসক তৈলকম্পীতে নিজ রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই তৈলকম্পী যা বর্তমান তেলকুপি নামে পরিচিত, দামোদর নদের তীরে পুরুলিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পুঞ্চার নিকটবর্তী বুধপুর গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুরূপ "সতী শিলা" আবিষ্কৃত হয়েছে।[28] এছাড়া বুধপুর গ্রামে প্রাপ্ত সীমানা নির্দেশক প্রস্তর স্তম্ভগুলিও বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। লিপিটিতে বলা হয়েছিল, রাঢ়ের বেষ্টনী ঘেরা পঞ্চাদ্রিশ্বরের সীমা কেউ যেন খর্ব না করে। তৈলকম্পীর অধিশ্বরের পঞ্চাদ্রিশ্বর হওয়া অসম্ভব নয়। এছাড়া বুধপুরে আরও দুটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে— একটি সতীস্তম্ভে, অন্যটি বীরস্তম্ভে। দুটি লিপিই দশম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবত একটি রাজবংশই তৈলকম্পী থেকে বুধপুর পর্যন্ত স্থানে রাজত্ব করেছিল।[29]

অনুরূপ লিপি কংসাবতী নদীর তীরে বোড়াম বা দেউলঘাটা অঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। বোড়ামে প্রস্তরগাত্রে খোদিত লিপিগুলি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ডাল্টন বা বেগলার তাঁদের বোড়ামে পরিভ্রমণকালে এগুলি দেখতে পাননি। পরবর্তীকালে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালস্ এগুলি আবিষ্কার করেন। এই লিপিগুলি পাঁচটি লাইনে লিখিত হয়েছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে লিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও তাতে ব্যাকরণগত অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে। লিপিগুলিতে রাজা রুদ্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই আমরা স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে পারি যে তিনি সেই প্রবল পরাক্রান্ত তৈলকম্পীর শাসক রাজা রুদ্রশিখর যাঁর কথা সন্ধ্যাকর নন্দীও তাঁর রামচরিতে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন তৈলকম্পী বা বর্তমান তেলকুপী যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পীঠস্থান ছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ অঞ্চলকে শিখরভূম বলা হত, যার সাথে রাজা রুদ্রশিখরের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[10] তেলকুপী পাঁচেট অঞ্চল শিখর রাজবংশের অঞ্চল বলেই চিহ্নিত। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শিখরভূমির রাজধানী তেলকুপী ব্রাহ্মণ্য পঞ্চদেবতার পুজার ও স্থাপত্যশিল্পের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় এই তেলকুপীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রায় ২৫/২৬টি মন্দির বিভিন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তেলকুপী পাঁচেট জলাধার তৈরির ফলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। কাজেই আমরা দেবলা মিত্রের লেখা থেকে জানতে পারি যে প্রাচীন তৈলকম্পী এক সমৃদ্ধ মন্দির নগরী ছিল। এই মন্দির নগরীর কেন্দ্র, লোকেরা যাকে ভৈরবস্থান বলে জানতো, সেখানে অন্তত ১৩টি মন্দির বিদ্যমান ছিল। এছাড়া ছোট বড় অনেক মন্দির ছিল। এই নগরীতে অনেকগুলি 'থান' ছিল যেমন দুর্গাথান, চড়কথান, শিবথান, কালীথান ইত্যাদি। এই অঞ্চল ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মন্দিরগুলিতে যে সমস্ত দেবদেবীর পূজার্চনা হত তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমা মহেশ্বর, বিষ্ণু, নরসিংহাবতার, মহিষমর্দিনী, দুর্গা, শিবলিঙ্গ, গণেশ ইত্যাদি। সংখ্যা থেকে মনে হয় যে এখানে শৈবধর্মের প্রাধান্যই ছিল বেশি। স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে এই মন্দিরগুলি উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির অনুরূপ ছিল। পুরুলিয়ায় রেখবর্গীয় যে সব মন্দির ধ্বংসের দশায় আজও দাঁড়িয়ে আছে, এই মন্দিরগুলি তাদেরই সমগোত্রীয়। পঞ্চদশ শতকে স্থাপিত বরাকরের মন্দির তিনটিও একই পরিবারভুক্ত বলা যেতে পারে। মূর্তিগুলির সঙ্গে নিকটবর্তী প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে পাওয়া মূর্তিগুলির মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়—যেমন পাড়া, বান্দা, বুধপুর, কোশজুড়ি ও দুলমী। তেলকুপীর এই মন্দির নির্মাণ সম্ভবত নবম শতাব্দীতে শুরু হয় এবং একটানা একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকে।[11] কিন্তু তেলকুপি ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠলেও কিছু জৈন ও বৌদ্ধধর্মের নিদর্শনও এখানে ছিল বলে বিনয় ঘোষ মহাশয় মন্তব্য করলেন।[12] বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ফলে একথা বলা যায় যে তেলকুপি রাজ্যটি দামোদরের দক্ষিণ তীর থেকে কংসাবতীর উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে ঝালদা থেকে পূর্ব দক্ষিণে বুধপুর পর্যন্ত ছিল এর সীমানা। অর্থাৎ বর্তমান পুরুলিয়া জেলার উত্তরাংশে এই রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল।

কতদিন পর্যন্ত রাজা রুদ্রশিখর এবং তাঁর বংশধরেরা এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। সম্ভবত লক্ষণ সেনের শাসনেও সেনদের সামন্ত রাজা হিসেবে শিখরবংশ রাজ্যশাসন করেছিল। পুরুলিয়া অঞ্চলে পাওয়া পাল-সেনযুগের অসংখ্য মূর্তি এই অনুমানের পক্ষে মত দেয়। সম্ভবত এই রাজ্যটির বিলুপ্তির পর নতুনভাবে গড়ে উঠেছিল পঞ্চকোট রাজ্য।

পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈনধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই

অঞ্চলটি ছিল জৈনধর্মের আদি পীঠস্থান। জৈনধর্মের আওতায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। পুরুলিয়ায় প্রাপ্ত অসংখ্য জৈনমূর্তি ও মন্দির এই পথেরই সন্ধান দেয়। দামোদর, কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা নদীগুলির তীরে গড়ে উঠেছিল জৈন মূর্তি ও মন্দিরগুলি। শশাংক, হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার অভিযানের ফলে এ অঞ্চলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, তার ফলে পরেশনাথ পাহাড় ঘিরে জৈন রাজ্যটি বিধ্বংস হয়েছিল। উপরোক্ত অভিযানকারীরা কেউ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। ফলে রাজনৈতিক নির্যাতনের সাথে মিলিত হয়েছিল জৈন বণিকদের বাণিজ্যের বিঘ্ন, যার ফলে তাঁরা এ অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং স্থানান্তরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী সেই প্রাচীন জনসম্প্রদায় সরাক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের একটা বড় অংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুইশা, সাফরন ও দুলমীতে। তাঁরা তাদের মূল বসতির থেকে ক্রমশ দক্ষিণদিকে সরে এসেছিলেন।[33] মোটামুটিভাবে বলা যায় যে পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রসারে বিঘ্ন শুরু হয় গুপ্ত রাজাদের সময় থেকেই। পরবর্তীকালে বাংলার পাল ও সেন রাজারাও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। ১০২৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের শাসক রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের ফলেও অনেক জৈন মন্দির ধ্বংস হয়।[34] অনেকে আবার মনে করেন যে মগধ থেকে আগত ভূমিজ সম্প্রদায় জৈনদের প্রতি বিরূপ থাকার ফলে এ অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে পুরুলিয়া অঞ্চলে আর্য সভ্যতা বিস্তারে প্রথমত জৈনধর্ম প্রভাব বিস্তার করলেও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তার স্থান গ্রহণ করেছিল। ফলে এই জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে কোনো না কোনো মন্দির কিংবা তাদের ধ্বংসাবশেষ আজও চোখে পড়ে। কাজেই পুরুলিয়া অঞ্চলটি মন্দির স্থাপত্য শিল্পের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সে তুলনায় বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি ছিল যৎসামান্য। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মও পুরুলিয়া অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল। আড়রা (আদ্রা) নিবাসী মহাপ্রভু শিবরাম গোস্বামী এবং তাঁর সমসাময়িক ত্রিলোচন গোস্বামী পুরুলিয়ায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে অনেককে ঐ ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[35] বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা থেকে মথুরা যাত্রাকালে মানভূম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত পাকবিড়রা বুধপুর রাস্তাটি ধরে কাশীধামে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে কাশীধাম (বেনারস) থেকে তিনি মথুরাতে উপস্থিত হন।[36]

পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনকালে আমরা পুরুলিয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য জানতে পারি না। রিয়াজু সালাতিন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজী বাংলার রাজা লক্ষণ সেনকে আক্রমণ করার পূর্বে পুরুলিয়া অঞ্চল দিয়েই যাত্রা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত রাধা বিভাগটি জয় করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[37] এছাড়া সিরাজ-ই ফিরোজশাহী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১৩৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বঙ্গদেশ আক্রমণ করে পরে উড়িষ্যা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। তিনি পঞ্চকোট রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ণনা করেন The area presented with low hills and dales, dotted with orchards." সুলতান শিখরভূমের শক্তিশালী রাজাকে পরাজিত করে সিংভূমের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে উড়িষ্যার জাজনগরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।[38] অনুরূপভাবে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ভারতের জমি জরিপ ব্যবস্থার আমরা এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাই। আকবরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী টোডরমল

সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করেন যে সম্বন্ধে আমরা আবুল ফজলের লেখা থেকে জানতে পারি। আকবরের সময় যে সমগ্র ভারত ১৫টি সুরা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল— তাদের মধ্যে বঙ্গদেশ ছিল অন্যতম। এই বঙ্গদেশকে আবার ১৯টি সরকারে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই ১৯টি সরকারের মধ্যে পুরুলিয়া অঞ্চল মান্দারন সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[39] আকবরের শাসনকালের কোনো এক সময় আফগান শাসক কুতলুঘ খাঁ উড়িষ্যা জয় করে নিলে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই অভিযানের সময় তিনি পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং পাড়া ও তেলকুপির পুরাতন মন্দিরগুলির সংস্কারসাধন করেন।[40] অনেকে মনে করেন যে তিনি চেলিয়ামা গ্রামে অবস্থানকালে সেখানে একটা হিন্দু মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে পুরুলিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বঙ্গদেশের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চলরূপে পরিচিত ছিল। এই সীমান্ত অঞ্চল দিয়েই বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল। প্রাচীনকালে এখানে জৈনধর্মের ব্যাপক বিস্তার হলেও তার পরই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের অগ্রগতি লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই স্থানে উপরোক্ত দুটি ধর্মের স্থাপত্যশিল্প ও মন্দিরের নিদর্শনও দেখতে পাওয়া গেছে। এই দুই সভ্যতাবিস্তারের তুলনামূলক আলোচনা পুরুলিয়ার যে সমস্ত স্থানে গড়ে উঠেছিল তার মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল।

জৈন স্থাপত্য শিল্প ও মন্দির

পাকবিড়রা: বাগদা-পুঞ্চার কাছে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে পাকবিড়রা গ্রামটি অবস্থিত। এত বড় সুপরিকল্পিত জৈন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পুরুলিয়া জেলায় কেন, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও দেখা যায় না। স্থানীয় জনগণ এগুলিকে হিন্দু ভৈরব জ্ঞানে পুজো করলেও এগুলি দিগম্বর জৈন মূর্তি।

সুইসা: বাঘমুণ্ডি থানায় সুইসা গ্রামটি অবস্থিত। বেগলার সাহেব এখানে অনেক পাথরের মূর্তি দেখেছিলেন। মূর্তিগুলির অধিকাংশই জৈন দেবদেবীর মূর্তি। তবে দু একটি বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের মন্দিরও আছে।

দুলমী, দেওলী: সুবর্ণরেখা নদীতীরে এই গ্রামগুলিতে জৈন তীর্থংকরদের অনেক মূর্তি দেখা যায়।

পলমা: পুরুলিয়া স্টেশন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পলমা। পলমায় কিছু দেউল ও জৈন মূর্তির ধবংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

ছড়রা: পুরুলিয়া শহরের সীমানা থেকে আট কিলোমিটার দূরে ছড়রা গ্রাম। বেগলার ও ডাল্টন এই গ্রামে দুটি প্রাচীন পাথরের দেউল দেখেছিলেন। ছড়রার ডোমপাড়ায় অধিকাংশই জৈনমূর্তি। ধর্ম মন্দিরে পাথরে গাঁথা কয়েকটি অক্ষত দিগম্বর জৈনমূর্তি দেখা যায়।[41]

হিন্দু স্থাপত্য শিল্প ও মন্দির

তেলকুপি: বিশালত্বের দিক থেকে জৈনধর্মের যেমন পাকবিড়রা, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সেইরূপ তেলকুপি। বর্তমানে মন্দিরগুলির সবগুলিই দামোদরের জলাধারে নিমজ্জিত হলেও কেবলমাত্র দুটি মন্দির এখনও অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে তৈলকুপির মতো এত বিশাল হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বোধহয় আর কোথায় ছিল না। এ সম্বন্ধে দেবলা মিত্রের গ্রন্থ Telkupi– a submerged Temple site on West Bengal দ্রষ্টব্য।

বোড়াম: পুরুলিয়া জেলার দ্বিতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বোড়ামকে বলা যেতে পারে। জয়পুর থেকে সাত কিলোমিটার দক্ষিণে কংসাবতী নদীর তীরে বোড়াম গ্রাম। পাথরের দেবদেবী যেমন গণেশ, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, মহিষমর্দিনী ইত্যাদি এখানে অনেক মূর্তি আছে।

বুধপুর: পুঞ্চা মানবাজারের মধ্যে কংসাবতী নদীর তীরে বুধপুর গ্রাম। বুদ্ধেশ্বর শিবের জন্যই গ্রামের নাম বুধপুর। আজও চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবভক্তেরা প্রত্যুষে স্নান করে জয়ধ্বনি দেন "বুধপুরের বুদ্ধেশ্বর, কানড়ার বানেশ্বর, বাগদার বুড়াবাবা" বলে। এখানে একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে বিরাজ করেছিল বিষ্ণু ও গণেশ। এছাড়া বৌদ্ধমূর্তির নিদর্শনও এখানে আছে।

চেলিয়ামা: এই গ্রামটি তেলকুপী থেকে বেশি দূরে নয়। চেলিয়ামার রাধাবিনোদ মন্দির বিখ্যাত। মন্দিরের গায়ে কৃষ্ণলীলার নানারূপ দৃশ্য, রাম রাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণু অবতার ইত্যাদি চিত্রিত আছে। জৈনধর্মের পর চেলিয়ামা ও রঘুনাথপুর অঞ্চলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূর্ণ বিকাশ হয়।

লাগদা: পুরুলিয়া শহরের পশ্চিমে রাঁচি রোডের ধারে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে লাগদা গ্রাম। গ্রামটি ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত। এখানে রঘুবর মন্দির, শ্যামচাঁদ মন্দির এবং মুরলীধারীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান।[42]

বিভিন্ন ধর্মের স্থাপত্য শিল্প ও মন্দিরের সহাবস্থান

পুরুলিয়া জনপদের একই স্থানে অবস্থিত হিন্দু ও জৈন স্থাপত্যশিল্প লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো স্থানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপও লক্ষণীয়। প্রাচীনকালে এরূপ সহাবস্থান আমাদের ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শই প্রমাণ করে। এখানে মাত্র কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করা হল।

সুইসা: সুইসা প্রধানত জৈনধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হলেও এখানে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও দেখা যায়। এছাড়া এখানে দু একটি বৌদ্ধ মূর্তিও আছে।

বোড়াম: বোড়াম মূলত হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হলেও এখানে জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও প্রভাব বিদ্যমান। বোড়ামের জনপরিবেশে জৈন বৌদ্ধদের পরে শিবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

বুধপুর: এই গ্রামটি হিন্দু দেবদেবীর পীঠস্থান হলেও স্তম্ভগাত্রে খোদিত বৌদ্ধমূর্তি এখনও বিদ্যমান।

বাগদা : পুঞ্চা থানার বাগদা গ্রাম পুরুলিয়া পুঞ্চা রাস্তায় শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এখানে একটিমাত্র জৈনমূর্তি আছে, গ্রামবাসীরা যাঁকে কার্তিক বলে পূজা করে থাকেন। হিন্দু মন্দির আছে দুটি, যদিও সেগুলি পরবর্তীকালের। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রস্তরগাত্রে খোদিত ফুল, লতা পাতা ইত্যাদি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বলে অনুমান করা যেতে পারে।

মুসলিম শাসনকালে এবং ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে উপরিউক্ত জৈন ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিকাশ লাভ না করলেও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুলিয়া অঞ্চলে এক নীরব যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। কালক্রমে এখানের হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভাষা, সংস্কৃতি, পালা-পার্বন ইত্যাদি অস্ট্রিকভাষীরা গ্রহণ করেছেন। পুরুলিয়ার ভূমিজ সম্প্রদায় ছোটনাগপুরের আদিম মুণ্ডাদের একটি শাখা, কিন্তু কালক্রমে মুণ্ডাদের সাথে এঁদের আত্মীয়তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এঁরা অস্ট্রিক ভাষা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছেন বাংলাভাষা। বরাহভূম, বাঘমুণ্ডি, পাতকুম, ধলভূম অঞ্চলে এঁদেরই সংখ্যাধিক্য। অনুরূপভাবে পুরুলিয়ার বাংলাভাষী আদি অধিবাসীদের মধ্যে মাহাতোরা অন্যতম, যাঁরা বর্তমানে কুর্মী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। প্রাত্যহিক জীবনে এঁরা নিজেদের বাঁধনা পরব, টুসু, ভাদু, ছাতাপরবের সাথে সাথে কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি দেবদেবীর পুজোও করে থাকেন। কৃষিজীবী এই আদিম

জাতির ইতিহাসও বদলে গেছে। পুরুলিয়া অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মাহাতোরা কোনোদিন রাজ্যস্থাপন করেননি। জন বিপ্লবের ভূমিকার ভূমিজদের যে অবদান, সে অবদান এঁদের নেই। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে এঁরা বারবার সাড়া দিয়েছেন। আগস্ট আন্দোলনে অনেকে শহীদ হয়েছেন। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনেও এঁদের অবদান অসীম। শিক্ষা দীক্ষা, রাজনীতিতে এঁরা আজ অনেক এগিয়ে গেছেন।

রাঢ় বাংলার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পুরুলিয়া অঞ্চল রুক্ষ শুষ্ক হতদরিদ্র হলেও বঙ্গ দেশের মধ্যে এখানেই প্রথম জেগে উঠেছিল আর্য সভ্যতা। এখানে জৈন ও হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, আর্য ও আস্ট্রিকভাষী সকলেই একাসনে পরম আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। এই সংস্কৃতিকেই বঙ্গ সংস্কৃতির আদিরূপ বললে নিশ্চয়ই ভুল হবে না।

1. Aitchison, C. U., A Collection of Treaties, Engagements and Sanads etc. Vol-I (Calcutta, Reprint, 1909) P.208
2 রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০) পৃঃ ৮৮
3. করণ, সুধীর কুমার, সীমান্ত বাঙলার লোকযান (কলিকাতা, ১৩৭১ সাল পৃঃ ৯, ২৬)
4. মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৩ অধ্যায়
5. মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, পশুভূমি অঞ্চলটি পূর্ব ভারতে অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলটি ছোটনাগপুরের মধ্যে বন্য পশুদের বিচরণ ভূমি ছিল। সম্ভবত পশুভূমিতে অসভ্য অনার্য জাতিদের বসবাস ছিল যাদেরকে আর্য-সাহিত্যে দস্যু বা রাক্ষস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অঞ্চলটি পুরুলিয়া জেলায় ছিল বলে অনেকে মনে করেন। ভীম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পশুভূমি জয় করেছিলেন।
6. Sarkar, D. C. Spread of Aryanisation in Bengal, (Journal of Asiatic Society, Vol-X VIII, 1962, No. 2)
7. Mukhopadhyay, S. C. Glimpses of the History of Manbhum (Calcutta, 1983), P. 12
8. মহাভারত, বনপর্ব, ৩৩
9. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড (কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬)
10. হুগলি নদীর পশ্চিমাংশ ও গঙ্গা নদীর দক্ষিণাংশ রাধা নামে পরিচিত ছিল।
11. Mukhopadhyay, Glimpses, P. 15
12. Ibid, P. 16
13. অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে মহাবীরের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার কাহিনি অপপ্রচারও হতে পারে। এই বিবরণটি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে তিনি মনে করেন। রাধা অঞ্চলের লোকেরা জৈনধর্মের দ্বারা সুসভ্য হয়েছিল এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্যই উপরোক্ত অপপ্রচার বলে তাঁর ধারণা। J. A. S. Vol-XVIII, No-2, P. 173
16. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৪৪৮-৪৫০
17. নীহাররঞ্জন, পৃঃ ৩৮৬
18. সিংহলের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ও সঙ্গীরা বোধিদ্রুমের শাখা নিয়ে যখন সিংহলে ফিরে গেছলেন, অশোক স্বয়ং তখন এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ তাঁদেরকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।
19. তরুণদেব, পৃঃ ৭৪-৭৫
20. করন, পৃঃ ৯
21. নীহাররঞ্জন, পৃঃ ১১৮-১১৯
22. Mukhopadhyay, Glimpses, P. 21
23. তরুণদেব, পৃঃ ১১০

24. Coupland, H. (Edl). Bengal District Gazetteer, Manbhum, Vol-XXVIII (Cal. 1911), P. 48
25. নীহাররঞ্জন, পৃঃ ৩৮৭
26. Mukherjee, Sudipta, Agrarian Discontent in Manbhum District. (An Unpublished M. Phil. Thesis of Benaras Hindu University)
27. মানভূম জেলার সৃষ্টি হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। তার অনেক আগে থেকেই মানভূমের অস্তিত্ব ছিল। মানভূম জেলা গঠনের পূর্বে মানভূম বলতে বর্তমান মানবাজারকে বোঝাত।
28. Mukhopadhyay, Glimpses, P. 29 & PP. 31-32
29. Gupta, P. (Edt), Catalogue of Antiquities (1965- Preserved in Patna Museum)
30. পাল সম্রাট রামপাল (আঃ ১০৬৯-১১২২ খৃঃ) যখন কৈবর্তরাজ ভীমের হাত থেকে বরেন্দ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন তখন তাঁর অনেক সামন্ত তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এই সমস্ত সামন্তের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৈলকম্পীর শাসক রুদ্রশিখর।
31. পাঁচেট জলাধার তৈরির প্রাক্কালে এই তেলকুপীর মন্দিরগুলির বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই সময়ের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের এ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীমতী দেবলা মিত্র তাঁর প্রকাশিত Telkupi- a submerged temple site in West Bengal গ্রন্থে তেলকুপীর মন্দিরগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।— নীহাররঞ্জন, পৃঃ ৯৮২-৯৮৩
32. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৪৪৬
33. তরুণদেব, পৃঃ ৯৯
34. Mukhopadhyay, Glimpses, PP. 19-20
35. ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চকোট রাজবংশ শাক্তধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করেন। পঞ্চকোট ইতিহাস, পৃঃ ৪৯—রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদনা—দিলীপকুমার গোস্বামী।
36. শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮
37. Salim, Ghulam Husain, Riyazu- S. Salatin (Eng. Trans Delhi, Reprint, 1975), P. 47 f.n.
38. Banerjee, A. K. (Edt.) West Bengal District Gazetteers, Bankura (Calcutta, 1968), PP. 78-79
39. আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ বর্ধমান, পশ্চিম হুগলি, শিখরভূম (পঞ্চকোট), ধলভূম এবং সিংভূম সরকার মান্দারনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
Abul Fazl, Ain-I-Akbari, Vol-II (Eng. Trans. New Delhi, Reprint, 1988), PP. 127-128
40. Sudipta, The Agrasian Discontent, P. 26
41 পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৪৪৩-৪৪৫
42 গোস্বামী, দিলীপকুমার, পুরুলিয়ার মন্দির (পুরুলিয়া ২০০১)



চুয়াড় বিদ্রোহ

নকুল মাহাতো

ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বর্বর আক্রমণ, শোষণ, অত্যাচার ও বহুমুখী নিপীড়ণের বিরুদ্ধে নিজেদের যুগ-যুগ ধরিয়া অর্জিত বিভিন্ন অধিকার, সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা রক্ষা করার প্রতিরোধ সংগ্রামে যে সমস্ত বীর ও অসম সাহসী কৃষক লড়াই করিয়া অসম যুদ্ধে প্রাণ দিয়া গিয়াছেন, যাহাদেরকে বিদেশি শাসকশ্রেণী এবং তাহাদের এদেশীয় দোসর বাহিনী বন্য, বর্বর, দস্যু (Banditti), ডাকাত (Dacoit), খুনি (Mardarer) কালা আদমি, চুয়াড় (Chuar) ইত্যাদি নামে 'বিভূষিত' করিয়া ইতিহাসের পাতায় তুলিয়া ধরিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যাহা আমরা পড়ি তাহাতে এই সকল অসংখ্য গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস স্থান তো পায়নি বরং চিরকালই অবাঞ্ছিত অবহেলিত থাকিয়াছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা দেশের তথা তৎকালীন বাংলা দেশে অজস্র কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রামের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস কৃষক সমাজ বা দেশের মানুষের কাছে তুলিয়া ধরার জন্য সুপ্রকাশ রায়ের মতো কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রধানত ব্রিটিশ আমলাদের বহু বৎসর পরে লিখিত গেজেটিয়ার (J. C. Price, W. W. Hunter, Coupland, O. Mallay, Dalton) কিছু গ্রন্থ, দলিলপত্র, রচনা, তৎকালীন পত্র-পত্রিকা সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট ইত্যাদির ওপর ভর করিয়া ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিলেও সত্যকারের তৎকালীন এইসব এলাকার আর্থসামাজিক, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অবস্থার এবং সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের মুখে প্রায় (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭) দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস রচনার কাজ বেশিরভাগই অবহেলিত, উপেক্ষিত হইয়া আছে। শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে শোষিত শ্রেণির থেকে উদ্ভূত বা শোষিত শ্রেণির প্রতি প্রাণঢালা ভালোবাসা লইয়া এবং এই শ্রেণি হইতে অসম-সাহসী বিদ্রোহী কৃষক যোদ্ধাদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধানিবেদনকারী গবেষক, ঐতিহাসিক তাদের দীর্ঘ পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ অধ্যবসায় সর্বোপরি সর্বহারার একনায়কত্বের মতাদর্শে দৃঢ়বিশ্বাসী সমাজ বিজ্ঞানীরাই তৎকালীন ভারত ইতিহাসের নবদিগন্ত উদ্ভাসিত করিতে পারেন।

ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস্-এর কথায় "জনসাধারণই তাহাদের ইতিহাসের স্রষ্টা"। মার্কস্-এঙ্গেলস্ মানবজাতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—ইতিহাসের স্বরূপ "যতদিন মানবজাতি সকল প্রকার শোষণ উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ না করিবে, যতদিন মানুষ কেবল জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিবেন ততদিন তাহার তাহার কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিতে পারে

না, ততদিন তাহার কোনো প্রকৃত ইতিহাসও থাকিতে পারে না। সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভের পরই কেবল সে তাহার নিজের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবে। তাহার পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাস কেবল শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক-শোষিত শ্রেণিসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ইতিহাস। এই শ্রেণিসংগ্রামই চালক শক্তিরূপে মানবজাতির ইতিহাসকে উহার চরম পরিণতির দিকে—অর্থাৎ প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভের দিকে লইয়া যায়।"

উক্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকেও স্পষ্ট আলোকপাত করে। পরাধীন ভারতের বিগত দুইশত বৎসরের ইতিহাস শ্রেণিতে শ্রেণিতে দ্বন্দ্বের, শোষক-শোষিতের সংঘর্ষের ইতিহাস, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী, দেশীয় রাজা-মহারাজা, জমিদার-জোতদার, ইজারাদার, মহাজন ও ব্রিটিশদের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা পুঁজিপতিদের সহিত কৃষকশ্রেণির ও জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষের পরাধীন দশার আরম্ভ। তখন হইতে কৃষক-শ্রমিক এবং জনসাধারণের আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। এমনকি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আপোষমূলক রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হইলেও অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক এই ইতিহাসকে স্বীকৃতি না দিলেও তাহাই ভারতবর্ষের জনসাধারণের বিশেষত কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির একমাত্র ইতিহাস এবং তাহাই ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের মূল ভিত্তি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুপ্রবেশের কালে ভারতীয় সমাজের অবস্থা সম্পর্কে মহামতি কার্লমার্কসের ভাষায়—এশিয়া তথা ভারতীয় সমাজের গ্রামীণ অচল, অনড় স্বাবলম্বী গ্রামসমাজে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের (১৮৫৭) সমাজের ছবি (তাঁহার 'ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া'তে যে ছবি আঁকিয়াছেন) তাহার প্রায় শতবর্ষ পূর্বে একই স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে ধন-ঐশ্বর্যের লোভে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া, নগর জনপদ ধ্বংস করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। আবার কেহ কেহ দুর্বল শাসকের হাত হইতে এলাকার শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া এদেশেই বিভিন্ন এলাকায় রহিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপনে এদেশের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। এবং যেহেতু ভারতের সমসাময়িক সামাজিক স্তরকে তাহাদের মৌলিক স্বার্থের বিরোধী বলিয়া মনে করে নাই, তাই তাহারা সম-সাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোটি ভাঙিয়া চুরমার করার প্রয়োজন মনে করে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত বিভিন্ন জাতির বণিক-সম্প্রদায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে ভারতে আগমন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী ভারতের ব্যাবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই লড়াই-এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভের সহিত পূর্বের কোনো বৈদেশিক আক্রমণের তুলনা চলে না। ভারতের প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতি, স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ ব্যবস্থায় তাহারা হস্তক্ষেপ করে নাই। কিন্তু ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণি বিশেষত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজকে তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী ভাবিয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া স্বাবলম্বী গ্রামসমাজকে আঘাত করার এবং ভাঙিয়া চুরমার করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। মোঘল শাসনকালে গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা চলিয়াছিল তাহা প্রতিষ্ঠিত ছিল সামরিক শক্তির উপর। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক হইতে যেমন তাহা বহুধা বিভক্ত ছিল তেমনি সমগ্র ভূখণ্ড ছিল বহু গোষ্ঠী, বহু ভাষা,

উপভাষা, বহু ধর্ম এবং বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতি ও চেতনায় বিভক্ত। পাহাড়-পর্বতসঙ্কুল এলাকায় অসংখ্য ছোট-বড় উপজাতি গোষ্ঠীর স্ব-শাসিত এলাকা ছিল। এই এলাকাগুলিতে নিজ গোষ্ঠীদের কেহ কেহ গোষ্ঠীপ্রধান (Chief ben) নির্বাচিত বা মনোনীত করিত। জমির উপর সাধারণ অধিকার, কৃষি ও হস্ত শিল্পের সংমিশ্রণ এবং অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগ নিয়ম হিসেবে ব্যবহৃত হইত। ইহাই ছিল ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের ভিত্তি। সর্বাপেক্ষা সরলরূপের গ্রামসমাজে সকলে একত্রে মিলিয়া জমি চাষ করিত এবং সমাজের সকল সভ্যের মধ্যে ফসল ভাগ করিয়া লইত। তাহার সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারের সূতা-কাটা ও কাপড়বোনার ব্যবস্থা ছিল। সমাজের বা গোষ্ঠীরপ্রধানই প্রয়োজনে বিচারের কাজ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ এবং কর সংগ্রহ করিত। সমাজের জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে পার্শ্ববর্তী স্থানের অব্যবহৃত জমির উপর জঙ্গল কাটিয়া ওইভাবে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিত। এইভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের উৎপাদন সংগঠনে সরলতার মধ্যেই এশিয়ার অপরিবর্তনশীল সমাজের ধ্বংস এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা চলিতেই থাকে। রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ঝঞ্ঝা সমাজের মূল অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের কাঠামোটিকে স্পর্শই করিত না।

মোগল আমলে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সামন্ত প্রথার যে ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল জঙ্গল পরিপূর্ণ পাহাড় এলাকায় সেখানে অগ্রগতি স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন ব্যবস্থাতেই বিকশিত হইতেছিল। মোগল সম্রাটগণের শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে বাঁচার আশায় এলাকায় জনগণ সামন্তরাজাদের পিছনে দাঁড়াইত এবং বিভিন্ন এলাকায় দেশীয় সামন্তরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ও মোগল শক্তির উপর আঘাতের উপর আঘাত হানিয়াছিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সামন্তদের আঘাতের ফলেই মোঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মোঘল শাসনের শেষভাগে ভারতীয় সমাজের প্রায় সর্বত্রই এই ভাঙন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়কালের নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজা ও তাহাদের কর্মচারীবৃন্দ লইয়া যে মধ্যবর্তী শ্রেণিটির জন্ম হইয়াছিল তাঁহারা প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে বসবাস করিতে থাকিলে এগুলি ব্যাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু স্বাবলম্বী গ্রাম-সমাজই ছিল উৎপাদনের কেন্দ্র, তাহাদের বাড়তি সামগ্রি পণ্যে পরিণত হইত এবং নগর বা প্রশাসন কেন্দ্রে এসব সরবরাহ করিতে গিয়া ব্যবসায়ী শ্রেণির জন্ম হইতেছিল। সমাজের উপরতলায় নগর-সমাজের মানুষের বিশেষত শাসকশ্রেণির ভোগ-বিলাসের চাহিদা মেটানোই ছিল ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য। অপরদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ কোটি কোটি কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের জীবনযাত্রায় অপরিবর্তন থাকিয়া যায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের মূল অর্থনীতির ভিত্তি ছিল বিনিময় প্রথা। সেখানে মুদ্রার অনুপ্রবেশ ঘটেনি বলিলেই চলে। ফলস্বরূপ সমাজের মধ্যে যেমন ভাঙন দেখা দেয়, তেমনি প্রাচীন সমাজের সংকটও দেখা দিয়াছিল। সমতল এলাকায় সামন্ত এবং তাহাদের সাঙ্গপাঙ্গরা আমলাতান্ত্রিক গোমস্তায় পরিণত হয়। একদিকে নগরায়ণের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজন অপরদিকে গ্রামীণ কৃষির অবস্থা অবহেলিত হওয়ায় কুটিরশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য কৃষির বিকাশের দিকটি অবহেলিত ছিল।

পলাশির যুদ্ধ, মহীশূর যুদ্ধ, মারাঠা যুদ্ধ, কর্ণাটক যুদ্ধ জয়ের পর প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের হটাইয়া দিয়া ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বুকে 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' পরিণত করিল। দিল্লির মসনদে মোগল সম্রাটদের ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগে বাণিজ্য ও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি তাহাদের সৈন্যবাহিনীকে বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করিতেন। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগে

কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব, ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং রাজ্য সম্প্রসারণে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম ও নিষ্ঠুরতম অভিযান, আক্রমণ চালাইয়াছে। সমতল এলাকার তুলনায় পাহাড়িয়া অঞ্চলের স্বাধীনচেতা সামন্তগণ তাহাদের অধীনস্থ কর্মচারিদের বৃহৎ অংশ এবং নিরীহ গ্রামাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়গুলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যবাহিনীর উন্নততর অস্ত্রের সঙ্গে অসম-যুদ্ধে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামগুলি গবেষকগণ কতটা তুলে ধরিতে পারিবেন, সেটা তাহাদের উপর নির্ভর করে। ব্রিটিশ বেনিয়ারা রাজদণ্ড হাতে লইয়া ভারতীয় অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সর্বোপরি তাহাদের দেশপ্রেমকে নিঃশেষ করার অপচেষ্টা করিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ কোম্পানির এই আক্রমণের বিরুদ্ধে পাহাড়, বন-জঙ্গল এলাকার সাধারণ মানুষ মরণপণ লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিয়াছে। ১৮৫৭ সালের পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। এমনকি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে ১৯৪৮-৫০ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনীর এই বর্বর আক্রমণ চলিয়াছে (১৯৪৮-এ সরাইকেল্লা, জুনাগড়, ১৯৪৯-৫০ সালে তেলেঙ্গানার কৃষকদের দমন করিতে প্রেরিত হইয়াছিল) । ১৭৬৭ সালে মেদিনীপুরে রেসিডেন্ট গ্রাহাম সাহেবের আদেশে লেফ্‌টন্যান্ট ফার্গুসেন বিরাট দেশি-বিদেশি সৈন্যবাহিনী লইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তদের আক্রমণ করিয়া জঙ্গল-মহলগুলিতে কোম্পানির অধীনে আনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হতচকিত সামন্তরা সাময়িকভাবে কেহ কেহ কোম্পানির কাছে নতিস্বীকার করিলেও বেশিরভাগ সামন্তরাই বারে বারে রুখে দাঁড়াইয়াছিল। ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শুধু সামন্তরাই না, সামন্তদের অধীনস্থ ঘাটোয়াল (পাইক, দিগার, সর্দার, তাবেদার, সাজরল, তরফ সর্দার) এবং সর্বোপরি এলাকার আদিবাসী কৃষকরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করিয়াছিল। যদিও এইগুলির নেতৃত্বে ছিলেন ছোট-মাঝারি ও উৎখাত হওয়া সামন্তদের আত্মীয় এবং প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ লড়াই চলিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে দামপাড়ার সামন্ত জগন্নাথ পাত্র থেকে পর পর তিনপুরুষ প্রাণ দিয়াছে (৩য় পুরুষ রঘুনাথ সিং-এর ১৮৩৩তে ফাঁসি হইয়াছিল) বরাভূমে সামন্তরাজা বিবেকনারায়ণ ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মুখে তাহার স্ত্রী-পুত্র সহ জঙ্গলে আশ্রয় নিয়াছিল, তাহার পুত্র লছমন সিংও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করিয়া ১৭৯৪ সালে বন্দি হন এবং মেদিনীপুর জেলে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র গঙ্গানারায়ণ ১২ বৎসর ধরিয়া বনে-জঙ্গলে থাকিয়া প্রস্তুতি নিয়া ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া ব্রিটিশ-বিরোধী যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়াছিলেন, যাঁহার মাথার দাম (জীবিত বা মৃত) তখনকার মূল্যে কোম্পানির পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা ঘোষিত হইয়াছিল। খরসোয়ার রাজা তাহার কাটা মাথাটি কোম্পানির কাছে জমা দিয়া টাকা তুলিয়াছিলেন এবং গভর্নর জেনারেল প্রত্যক্ষ পলিটিক্যাল এজেন্ট দিয়া সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি গঠন করিয়া সমগ্র এজেন্সি এলাকায় ননরেগুলেটিং বিশেষ আইনবলে বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত শাসনব্যবস্থা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৭৯৮ হইতে ৪/৫ বৎসর ধরিয়া জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, J. C. Price-এর ভাষায় যাহাকে The Great Chuar Rebellion আখ্যা দিয়েছিলেন, যেখানে কয়েক লক্ষ কৃষক ঘরবাড়ি, চাষবাস ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে, অর্ধাহারে-অনাহারে থাকিয়া মহান কৃষক বিদ্রোহ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, যাহা মেদিনীপুরের Collector লিখিতভাবে তাহার ২৫শে মে ১৭৯৮-এর চিঠিতে জানাইয়া ছিলেন—"প্রাচীনকাল হইতে যাহারা জমির ভোগদখল করিতেছিল তাহারা যখন

দেখিল যে বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে তাহাদের জমিভোগের অধিকার ·জানিয়া-শুনিয়াই কেবলমাত্র সরকারি পুলিশ-বাহিনীর ব্যয়-নির্বাহের অজুহাতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে অথবা সেই জমির উপর এরূপ একটা নূতন রাজস্ব ধার্য করা হইতেছে যাহা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই আর আবেদন-নিবেদনেও কোন ফল হইবে না, প্রথম সুযোগেই অস্ত্রধারণ করিয়া যাহা তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে বিস্ময় বা ক্রোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পাহাড়-জঙ্গল এলাকায় যে ছোট ও মাঝারি অসংখ্য সামন্তরাজা ছিল সেখানে গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, দুর্গম গিরিপথগুলিকে যাত্রীদের সুরক্ষা করা এবং সর্বোপরি অন্য সামন্তদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রাচীন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে একদল কৃষক বা সামন্ত কর্মচারী জমি ভোগ করিত, এবং এই জমি চাষ করিয়াই তাহারা তাহাদের জীবিকা-নির্বাহ করিত। সামন্তদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহাদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করিয়া পুরস্কৃত বা বিবৃত করা হইত। কিন্তু কখনও তাহাদের জমির ভোগদখল হইতে উচ্ছেদ করা হইত না। কোম্পানি সরকার যখন এই সার্ভিস-হোল্ডারদের সমস্ত জমিগুলি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা করিল তখনই এই বিদ্রোহ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন সামন্ত-রাজার এলাকায় এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইত। কোথাও পাইক, কোথাও দিগার, সর্দার, তরফদার, মদিয়াল, তাবেদার ইত্যাদি নামে এরা আখ্যাত হইত। যেহেতু সামন্তদের এলাকাগুলিতে সবাই মিলিয়া-মিশিয়া চাষ করিত এবং সবাই ভাগ করিয়া খাইত। সমগ্র এলাকা জুড়িয়া এদের জনসংখ্যা কয়েক লক্ষ ছিল। উড়িষ্যার ১৮২০ সাল পর্যন্ত এ বিদ্রোহ চলিয়াছিল খুরদা ও অন্যত্র জঙ্গল এলাকায়। পরবর্তীকালে বোর্ড অফ রেভিনিউ (Board of Revenue) ঘাটোয়ালদের সমস্ত জমি ফেরত দিলে এবং পুলিশ চৌকিগুলি তুলিয়া লইয়া এদের হাতেই শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে, অসংখ্য হাজার হাজার কৃষকের উপর পরোয়ানা জারি ছিল, এবং কোনো সামন্ত এলাকাকেই ভাগ করা যাইবে না, এবং রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে না—এই বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য ১৮০৫ সালে জঙ্গল-মহল জেলা গঠন করার পরই বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ১৮৩১-১৮৩৩ সালে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িলে ইতিহাসে ভূমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা ও কোল বিদ্রোহ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। তার ফলশ্রুতিতে এই বিস্তীর্ণ এলাকার শাসনভার Governor General নিজের হাতে লইয়া এক 'Political' Agent দিয়া শাসনের দায়িত্ব লইয়াছিলেন।

J. C. Price তাহার ১৮৭৪ সালের লিখিত "The Chuar Rebellion of 1799" পুস্তকে পরিশিষ্টের দ্বিতীয় বাক্যটিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে জঙ্গল-মহল এলাকার সমস্ত কোম্পানির আইন অমান্যকারী উপজাতিরা অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে সব জঙ্গল এলাকায় কোম্পানির অনুপ্রবেশের পূর্বে প্রাচীনকাল হইতে ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা ছিল সেই সমগ্র এলাকাতেই এই কৃষক বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম থেকে মেদিনীপুরের মাধ্যমে যেমন করিয়া ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য পাঠানো হইয়াছিল তেমনি রামগড়, সিউড়ি এবং কটক থেকে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বিদ্রোহে যেমন ঘাটোয়াল, পাইক, লায়া, গরাইত এবং হাজার হাজার কৃষক প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন এদের ছিল। নেতৃত্বে ছিল জমি থেকে উৎখাত হওয়া কৃষক বা সামন্তরা। ১৭৬৯-৭০-এ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুপ্রবেশের সময় কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর

আক্রমণে চাষবাস ছাড়িয়া হাজার হাজার কৃষক ঘরবাড়ি জমি-জায়গা ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল যাহার ফলশ্রুতিতে রায়পুর মানভূম এবং অন্যান্য এলাকায় কোথাও এক-তৃতীয়াংশ, কোথাও এক-চতুর্থাংশ মানুষ অনাহারে মারা গিয়াছিলেন। "The Annals of Rural Bengal-এ W. W. Hunter" উল্লেখ করিয়াছেন এবং সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতীয় কৃষক বিদ্রোহ' বইয়ে বঙ্গদেশে এককোটি ও বিহারে পঞ্চাশ লক্ষাধিক নরনারীর অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে ঠিক তেমনি ১৭৯৮-১৮০৫ সালে অসংখ্য মানুষ চাষবাস ছাড়িয়া দিয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া অনাহারে মারা গিয়াছিল এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল।"

এই বিদ্রোহে শুধু কৃষকরাই ছিল তাহা নয়, মালঙ্গী (লবণ উৎপাদনকারী) যাহারা কোম্পানির লবণ উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ায় উৎখাত হইয়াছিল বা তন্তুবায় তাহারাও এই বিদ্রোহকে সমর্থন করিয়াছিল।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পাহাড়-পর্বত এবং জঙ্গল এলাকায় সামন্তদের প্রায় সর্বত্রই Service tenure প্রাচীনকাল হইতেইছিল। ইহারা যেমন বিভিন্ন ঘাটগুলি পাহারা দিত, গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মূল দায়িত্ব পালন করিত তেমনই বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতেও ওই এলাকাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব পালন করিত। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রকমের Service tenure-গুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া বহিরাগতদের জমিগুলি অনেক বেশি হারে বন্দোবস্ত করিতেছিল এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকায় থানা স্থাপন করিয়া পুলিশ, দারোগা বসাইতেছিল। তৎকালীন বীরভূম, মেদিনীপুর, রামগড়, ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি জেলাসহ পাহাড় এলাকায় প্রায় সর্বত্র এই প্রথা ছিল এবং সর্বত্রই এই বিদ্রোহের আগুনজ্বলিয়া উঠে। শুধু ঘাটোয়াল (দিগার, সর্দার, তাবেদার, পাইক, লায়া) এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল বা নেতৃত্ব দিয়াছিল তাহা নয় সামন্তরাজারা অধিকাংশই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হইয়াছিল। এই আন্দোলন সাময়িকভাবে যখন দমিত হইয়াছিল তাহার পরও ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই-দশক পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এই লড়াই চলিয়াছিল। বর্তমান বীরভূম জেলার পাহাড়-জঙ্গল এলাকা, সাঁওতাল পরগনা, হাজারিবাগ, ধানবাদ, বোকারো, রাঁচি, সিংভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের একাংশ, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড় ইত্যাদি জেলাগুলিতে এই বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং উড়িষ্যার খুড়দা প্রভৃতি স্থানগুলিতে ১৮১৬ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় দেশীয় সৈন্যবাহিনী কামান, বন্দুক ও বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ব্যারাকপুর, কটক, মেদিনীপুর, সিউড়ী, রামগড়, গোরখপুর ইত্যাদি ব্যারাকগুলি হইতে দুর্ধর্ষ ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সাহায্য করিয়াছিল কৃষকবিরোধী বিভিন্ন পরগাছাশ্রেণী। এই বিদ্রোহগুলিতে একদিকে যেমন অসমযুদ্ধে নিজেদের ভূমি, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সর্বোপরি তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়া গিয়াছে তেমনই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাচীনকাল হইতে যে জমি কমিউন প্রথায় চাষ করিয়া পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাইত তাহা হইতে উৎখাত হইয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল এবং বিভিন্ন বিদ্রোহে সামিল হইত। তাহাদের ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ ও তাহাদের বশংবদরা আজও দস্যু হিসাবে চিহ্নিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের পরিচিতি এরূপভাবে থাকিবে, না গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত পরিচয় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ জানিতে পারিবে তাহা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে।

এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের নিকট নতিস্বীকার করে এবং—

(১) সমস্ত Service tenure-গুলি তাহাদের পূর্বতন ঘাটোয়ালদের হাতে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়।

(২) এই জমিগুলি তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করিতে পারিবে এবং তাহার জন্য নূতন Regulations তৈরি হয়।

(৩) এই জমিগুলি চিহ্নিত করিবার জন্য সার্ভে করিয়া ঘাটোয়ালদের নামে নথিভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৪) এলাকার সামন্তদের এলাকাগুলি বিভক্ত হইবে না অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূর্যাস্ত আইনে নীলাম বিক্রয় হইবে না এই মর্মে Regulations করিতে গভর্নর জেনারেল বাধ্য হয়।

(৫) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা সংগঠিত থানা, পুলিশবাহিনী প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হয় এবং এই এলাকার সামন্তদেরই হাতে পুলিশী দায়িত্ব অর্পিত হয় (ঐতিহাসিকগণের মতে ইহা Peculiar administration)।

(৬) অনেকগুলি Non-regulating এলাকা ঘোষিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৩৩ সালে Non-regulating area (South West Frontier Agency) গঠিত হয় যাহা গভর্নর জেনারেল প্রত্যক্ষভাবে তাহার Political Agent-এর মাধ্যমে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে বাংলা-বিহারের সমতল এলাকার প্রজাস্বত্ব আইন নতুনভাবে রচিত হয় (Non-regulating area যথা, ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন)।

(৭) বীরভূম ও মেদিনীপুর হইতে ২৩টি পরগনা ও কয়েকটি মহল লইয়া একটি জেলা ১৮০৫ সালে গঠিত হয় যাহার প্রশাসন কেন্দ্র ছিল বাঁকুড়া।

পরবর্তীকালেও ১৯০০ পর্যন্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এই এলাকায় সংগঠিত হইয়াছে কিন্তু কৃষকেরা তাহাদের মুক্তি অর্জন করিতে পারে নাই যদিও সাময়িক কিছু সুবিধা অর্জনে সক্ষম হয়।

কেবলমাত্র মৌলিক ভূমি-সংস্কারের মধ্য দিয়াই কৃষকদের সত্যিকারের মুক্তি আসিতে পারে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কৃষক বিদ্রোহগুলি দেশব্যাপী সংগঠিত হইয়াছে সেখানে যদিও মূল প্রশ্ন ছিল ভূমি প্রশ্ন, যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠা ভূমিব্যবস্থা, গ্রামীণ স্বয়ংনির্ভরতা, অধিকার ইত্যাদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ সংগ্রাম। স্বাধীনোত্তর যুগেও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ আরও বেশি তীব্রতর হইতেছে এবং সেই আক্রমণের মধ্য দিয়া পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষকশ্রেণিগুলি উদারনীতির নামে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বহুজাতিক কর্পোরেশন, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহজভাবে অনুপ্রবেশের পথ সুগম করিতেছে। এই উদ্ভূত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তৎকালীন কৃষকদের মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে ব্যাপকতম কৃষক সমাজকে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণের হাত হইতে মুক্ত করিতে কৃষক শ্রেণিসহ সমস্ত শোষিত মানুষকে ব্যাপকতম সংগ্রামে সামিল করিবার মহান দায়িত্ব পালন দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষের উপর নির্ভর করিতেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুলিয়া (১৯০০-১৯৪৭)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বসু

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর আক্ষরিকভাবে পুরুলিয়া জেলার উদ্ভব ঘটলেও ১৮৩৩ সালে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সৃষ্ট (রেগুলেশন তেরোর ভিত্তিতে) মানভূম জেলার অংশ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পুরুলিয়া গ্রহণ করে এসেছে।

মানভূম জেলা গঠিত হওয়ার পর প্রথম পাঁচ বছর মানবাজার ছিল জেলার সদর দপ্তর। তারপরে এটি সরিয়ে আনা হয় সদর পুরুলিয়ায়। বলা হল জঙ্গল এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় প্রশাসনিক সুবিধা হবে।

ইংরাজরা তাদের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পুরুলিয়াকে বেছে নিলেও আগামী দিনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অর্থাৎ "ইংরাজ তাড়াও" আন্দোলনে পুরুলিয়া অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল।

বিশ শতকের শুরু থেকে পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে মানভূমে যে ইংরাজ বিরোধীতার সংগ্রাম সূচিত হয়েছিল এবং যা কখনো অহিংস অথবা সহিংস ছিল—তা' বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সংগ্রামে জাতিও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষই বিপুলভাবে অংশ নিয়েছিল।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনের প্রধানপুরুষ ছিলেন নিবারণ দাশগুপ্ত। তাঁর জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার ঝাউঝাড়া গ্রামে, এপ্রিল, ১৮৭৬ সালে (বাংলা ১২ বৈশাখ, ১২৮৩) কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর চাকুরি জীবন শুরু করেন মেদিনীপুর জেলায় স্কুলের সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় দশ বছর ছিলেন। ঝাড়গ্রাম, কাঁথি ও তমলুক এই তিন জায়গাতেই চাকুরি জীবন কাটিয়েছিলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবে মেদিনীপুরের সংগ্রামী রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

১৯১১ সালে বদলি হয়ে এলেন মানভূমে। প্রথমে মানবাজার পরে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ছিলেন ঝালদায়। বি.টি. পাশ করলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সময়ে তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়। ১৯১৪ সালে পুরুলিয়ার সরকারি জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন এবং পরের বছর (১৯১৫) প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হলেন, সরকার তাঁকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদা দেন।

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে মানভূম তথা পুরুলিয়াতেও পৌঁছেছিল। এই আন্দোলনে ১৯২১ সালে তেইশ বছরের সরকারি

চাকুরি এক কথায় ছেড়ে দিয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় নিবারণচন্দ্র যোগ দিলেন। আংশিক সরকারি পেনশনও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ—যাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার খণ্ড-ঘোষে। তিনি ছাত্রজীবন কাটিয়েছিলেন পুরুলিয়ায় তাঁর মেশোমশাইয়ের বাড়িতে। ওকালতি পাশ করে তিনি পুরুলিয়াকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কর্মস্থল হিসেবে এবং এখানেই তিনি নিবারণচন্দ্রের খানিক সংস্পর্শে আসেন। এই পরিচয়ের ফলে অতুলচন্দ্র অচিরে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্রের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই কংগ্রেসের শিকড় মানভূমে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছিল।

১৯২১ সালে নিবারণচন্দ্র প্রথমে পুরুলিয়া স্টেশনের কাছে পরে নীলকুঠি ডাঙায় এবং তারও পরে নডিহাতে স্বদেশি কাজকর্মের জন্য একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র তৈরি করেন। এর নাম হয় শিল্পাশ্রম। এখানে নিবারণ চন্দ্র ও অতুলচন্দ্রের পরিবার একসঙ্গে বসবাস শুরু করেন এবং এর ফলে তাঁদের দুটি পরিবারের সৌহার্দ্যও নিবিড় হয়। এর কিছুদিনের মধ্যে (১৯২৭) আশ্রমটি পুনরায় স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমানে দেশবন্ধু রোডে অবস্থিত চিত্তরঞ্জন দাশের পুরুলিয়ার বাসভবনে (বর্তমানে নিস্তারিণী মহাবিদ্যালয়) উঠে আসে। কিন্তু সেখানেও এর অবস্থিতি স্থায়ী হয় নি। পরের বছর (১৯২৮) শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে উঠে এসেছিল নিবারণচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী হরিপদ দাঁর প্রদত্ত তেলকলপাড়ার একখণ্ড জমিতে। গৃহ নির্মাণের অর্থও হরিপদ দাঁ দিয়েছিলেন।

শিল্পাশ্রম কার্যত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের এক মিলনস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীজীর শিল্প ও আদর্শের প্রচার ছিল প্রধান কর্মকাণ্ড। নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্রের পরিবার ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বহু কর্মী নিত্যদিন আসা যাওয়া করতেন। এঁদের দেখাশোনা সব কিছু হাসিমুখে করতেন অতুলচন্দ্রের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। নিবারণচন্দ্রের স্ত্রী তখন জীবিত ছিলেন না। ফলে লাবণ্যপ্রভাকে একাই দুটি পরিবার সহ অন্যান্য কর্মীদের নানা ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে হত। কর্মীদের কাছে ক্রমশ তিনি "মা" বলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন।

অল্পবয়সী ছেলেদের মধ্যে জাতীয় চিন্তাধারা নিয়ে যাওয়ার জন্য নিবারণচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন "তিলক জাতীয় বিদ্যালয়।" অন্যদিকে শিল্পাশ্রমে স্বদেশিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এক দেশলাই কারখানা তৈরিরও পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মাসে (১২-১৫) পুরুলিয়া শহরে অনুষ্ঠিত হল বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের দ্বাদশ সম্মেলন। সম্মেলন উপলক্ষে মহাত্মাজী সহ কংগ্রেসের প্রথম সারির সমস্ত নেতারা পুরুলিয়া শহরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান জেলা স্কুলের পেছনে। এই সম্মেলন মানভূমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় এক নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিল। সম্মেলন থেকে যে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে নির্বাচিত হয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং অতুলচন্দ্র ঘোষ। জনসাধারণের মধ্যে নিয়মিত প্রচারের সুবিধার জন্য একটি মুখপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সেই কারণে কেনা হল একটি প্রেস—তার নামকরণ হল 'দেশবন্ধু প্রেস" এবং প্রকাশিত মুখপত্রের নাম তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেওয়া হল "মুক্তি"।

"মুক্তি" পত্রিকার সম্পাদক হলেন নিবারণচন্দ্র এবং প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। প্রথম সংখ্যাটি বেরিয়েছিল ১৯২৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর। এর দাম ছিল এক আনা। প্রথম থেকেই পত্রিকাটি তার নির্ভীক মতামতের জন্য ইংরাজ সরকারের বিষ নজরে পড়েছিল।

১৯২৬ সালের ১৯ মার্চ "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার জন্য সরকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার মামলার করার কথাও একসময়ে ভেবেছিল।

১৯২৩ সালে সাইমন কমিশন বর্জনের যে ডাক সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি দিয়েছিল তার সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিল মানভূমের সাধারণ মানুষ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। বর্জনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মানভূম কংগ্রেসের প্রথম জেলাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে (৬ এবং ৭) এই কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে পুরুলিয়ায় এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। অভ্যর্থনার সমিতির সভাপতি ছিলেন বিপ্লবী অন্নদা কুমার চক্রবর্তী। এখানে বিলাতি বস্ত্র বর্জনের ও স্বদেশির শপথ উচ্চারিত হয়েছিল।

কেবলমাত্র পুরুষ নয় মহিলারাও স্বাধীনতার আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯২৮ সালে গঠিত হয়েছিল মহিলা সভা এবং তার সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে মানভূম থেকে নির্বাচিত যেসব প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। তাঁর নাম শেফালিকা বসু।

১৯২৮ সালে ঝালদার জমিদার ইংরাজ অনুগামী রাজা উদ্ধবচন্দ্রের প্ররোচনায় খুন হলেন মানভূম যুব কংগ্রেসের নেতা সত্যকিংকর দত্ত, হরি ঠাকুর ওরফে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সত্যকিংকর ঝালদা, বাগমুণ্ডি ও জয়পুরের কৃষক ও শ্রমিকদের কংগ্রেসের পতাকার নীচে জমায়েত করার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। সত্যকিংকর নিহত হয়েছিলেন ১০ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঝালদা পুরভবনের কাছে।

উপরোক্ত ঘটনার মাত্র সাতদিন পূর্বে ৩রা ডিসেম্বর পুলিশ নিবারণচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল "মুক্তি" পত্রিকায় "বিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার জন্য। সরকার বিরোধী উস্কানিমূলক লেখার অভিযোগ এনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক এবং ১৫৩-ক ধারার ভিত্তিতে নিবারণচন্দ্রের এক বছরের কারাবাসের সাজা হয়।

এই সময়ে আরো একটি পত্রিকা রাজরোষে পড়েছিল। চাইবাসা থেকে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত "তরুণ শক্তি" পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ও মুদ্রাকর ছিলেন যথাক্রমে অন্নদাকুমার চক্রবর্তী এবং কুমুদবিকাশ রায়। সরকারবিরোধী লেখার অভিযোগে অন্নদাকুমারের এক বছর এবং কুমুদ বিকাশের তিনমাসের জেল হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সরকারের এক অদ্ভুত প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে "মুক্তি" পত্রিকায় নিবারণচন্দ্রের লেখা প্রকাশের জন্য তাঁরও তিনমাসের কারাদণ্ড হয়েছিল মুদ্রাকর হিসেবে। এখন তিন মাসের মেয়াদ কাটাবার পর জেল থেকে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে আবার গ্রেপ্তার হলেন, এবার তাঁর অপরাধ "তরুণ শক্তি" পত্রিকা যে প্রেস থেকে বেরোত সেই "চিত্তরঞ্জন প্রেস" এর তিনি মালিক। এবারেও তাঁর আবার সাজা হল তিনমাসের।

১৯২৯ সালের এপ্রিলে (২৭ ও ২৮) নিবারণচন্দ্রের কারাগারে থাকাকালীন ঝালদা'য় মানভূম কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে। ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মানভূম যুব কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে সাইমন কমিশন (১৯২৭) বর্জনের সময় পর্যন্ত মানভূমের ক্ষেত্রে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব। বস্তুত ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানভূম তার সংগ্রামী মেজাজ পুরোপুরি দেখাবার সুযোগ পেল। আন্দোলন শুধু আর শহরকেন্দ্রিক রইল না। গ্রামে-গঞ্জে, হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী এলাকায় ছড়িয়ে

পড়ল। একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। ঝালদা'য় সত্যকিংকর দত্তর হত্যা বাৎসরিক জমিদার বিরোধী "সত্যমেলা"'য় (১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩০) পরিণত হল।

বাগমুণ্ডিতে সরকার বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, মোহনদাস বাবাজী, শিউশরণ লাল জয়সোয়াল এবং বীররাঘব আচারিয়া। বরাবাজার, বান্দোয়ানে আদিবাসীদের মধ্যে ইংরাজ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির অপরাধে রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ১০৮ ধারায় ১২ মার্চ থেকে এক বছরের কারাবাসের শাস্তি হল।

১৯৩০ সালের ১৪ই আগস্ট তৎকালীন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট টেলর ও পুলিশ সুপার চার্চার ভোরবেলা রামচন্দ্রপুর আশ্রমে পৌঁছে বিনা প্ররোচনায় কংগ্রেস নেতা অন্নদাকুমার চক্রবর্তীর উপর এমন বেপোরোয়া লাঠি চালালেন যে তিনি ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মাসখানেক পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ইংরাজের বিচারে তাঁর দু'বছরের কারাদণ্ড হয়। অন্নদাকুমারের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গোবর্ধন নাথ, মাখর ভূমিজ, ফল্গার মাহাত, মনসা মাঝি এবং গুরুচরণ ভূমিজা। তাঁদেরও একই প্রকার কারাদণ্ড হয়েছিল।

লবণ-আইন ভঙ্গের উৎসাহে মানভূমে কোনো সমুদ্র না থাকায় তেরোজনের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদে'র এক প্রতিনিধি কাঁথি গেলেন আইন ভেঙে লবণ তৈরির জন্য। এই দলে অরুণচন্দ্র ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীও ছিলেন। পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেও তাঁরা সেখানে সমুদ্রের ধারে লবণ তৈরি করেন এবং পুরুলিয়া ফিরে তাঁরা সেই লবণ দেশপ্রেমের নমুনা স্বরূপ পুরুলিয়াবাসীকে বিক্রি করে কংগ্রেসের আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এর কয়েকদিনের মধ্যে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য অরুণচন্দ্র ঘোষ, চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, হীরেন মুখোপাধ্যায় এবং অশোক চৌধুরীর তিনমাসের কারাদণ্ড হয়।

সমগ্র মানভূমে কংগ্রেসের আন্দোলনের কর্মসূচি (বিলাতি বস্ত্র ও মাদক দ্রব্য বর্জন রেখা ও খদ্দরের প্রচার প্রভৃতি) সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছিল। সরকার জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানভূমেও দমন নীতি আরো জোরদার হল। সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে "মুক্তি" পত্রিকা ও "দেশবন্ধু প্রেস" বন্ধ হয়ে গেল। শিল্পাশ্রম থেকে কোনো কর্মীর আর জেল যেতে বাকি থাকল না। সরকার শিল্পাশ্রমে পুরোপুরি তালা ঝুলিয়ে দিল। ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি অতুলচন্দ্র, স্বামী শংকরানন্দ, শশধর গাঙ্গুলী সহ নিবারণচন্দ্র আইন অমান্য করে কারাবরণ করলেন। মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারি লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে মহিলা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। আইন অমান্যের অপরাধে লাবণ্যপ্রভা ঘোষের আড়াই বছরের কারাদণ্ড হল। ইতোপূর্বে অরুণ চন্দ্র ঘোষেরও অনুরূপ অপরাধে একই সাজা হয়েছিল। বাসন্তী দেবী এবং উর্মিলা ঘোষের কারাদণ্ড হয়েছিল ছ'মাস করে।

১৯৩৩ সাল থেকে সারা ভারতের সঙ্গে সঙ্গে মানভূমেও লবণ সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলনে ভাঁটা দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজী ১৯৩৩ সালের ২৩ আগস্ট ঘোষণা করলেন আগামী এক বছর চিত্তশুদ্ধির জন্য আন্দোলন স্থগিত থাকবে। অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের ৩রা আগস্ট পর্যন্ত।

১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি নিবারণ দাশগুপ্ত জেল থেকে মুক্তিলাভ করে অসুস্থ শরীরে পুরুলিয়া শহরে ফিরে আসেন।

ডিসেম্বর মাসে তাঁর ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য তিনি রাঁচি চলে যান।

স্বরাজ্য দলের সভায় যোগ দিতে গান্ধীজী রাঁচিতে এসে ১৯৩৪ সালের ৩রা এপ্রিল অসুস্থ নিবারণচন্দ্রকে দেখতে যান। শেষের দিকে অসুস্থতা বাড়তে থাকলে তিনি পুরুলিয়ায় ফিরে আসেন। ১৯৩৫ সালের ১৭ই জুলাই শিল্পাশ্রমে তাঁর জীবনদীপ চিরকালের মতো নির্বাপিত হয়। বিক্রমপুরের নিবারণচন্দ্র পুরুলিয়াকেই আপন দেশ বলে জ্ঞান করেছিলেন। কৃতজ্ঞ পুরুলিয়াবাসীও তাঁকে "ঋষি" হিসেবে মরনোত্তর সম্মানে ভূষিত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সুভাষচন্দ্র এক চিঠিতে নিবারণচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছিলেন— "নিবারণবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এমন একটি খাঁটি মানুষ সহজে মেলেনা। তাঁকে হারিয়ে দেশ যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। পুরুলিয়াবাসী সে ক্ষতি বেশ উপলব্ধি করলেও আমরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হইনি, আমাদের দেশে খাঁটি মানুষের এত অভাব যে তাঁর মতো একজন আদর্শ পুরুষের তিরোধান ঘটলে দেশের সর্বত্র সে অভাব অনুভূত হতে বাধ্য।"

তিরিশের দশকে মানভূমের আন্দোলনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মানুষের ঘৃণা উৎপাদন এবং কবির ভাষায় "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য"। এ ছাড়া এই আন্দোলন জেলার চতুর্বর্ণ সমাজের দেয়াল ভেঙে দিতেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কারণ আন্দোলনের নেতারা তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা তথাঘটিত উচ্চবর্ণও নিম্নবর্ণের ভেদরেখা মুছে দিয়েছিলেন'— যা বিয়াল্লিশের আন্দোলনে সংগ্রামী মেজাজকে মজবুত ও সংহতি দিয়েছিল।

(২)

১৯৪২ সালের ৯ আগস্টের "ভারতছাড়" আন্দোলনের ঢেউ দেশের অন্যান্য স্থানের মতো মানভূমেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ৮ই আগস্ট রাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি "ভারতছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল আর তার দু'দিন করে পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম ঘেরাও করে পুলিশ লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, অরুণচন্দ্র ঘোষ, রামকিংকর মাহাতো প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করল। বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও বীররাঘব আচারিয়াকে নজরবন্দি করে রাখলেন সরকার।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আন্দোলনকে থামানো গেল না। সরকারের চোখ এড়িয়ে যে সমস্ত মধ্যস্তরের কর্মী তখনও বাইরে ছিলেন তাঁরা আদ্রায় এক গুপ্ত স্থানে মিলিত হলেন। উক্ত বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিবারণচন্দ্রের পুত্র চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, কন্যা বাসন্তী দেবী ও তাঁর স্বামী সুবোধ রায় এবং অতুল চন্দ্রের পুত্র অমলচন্দ্র। ওই বৈঠকে স্থির হয় কর্মীরা থানা দখল করবেন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া এবং রাস্তা ঘাট ও পুল ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

আদ্রায় আনুষ্ঠানিক কোনো বৈঠক সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন পরবর্তী সময়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—ভজহরি মাহাতো এবং পদক চন্দ্র মাহাতো। তাঁদের মতে পুলিশের নজর এড়িয়ে এধরনের কোনো বৈঠক করা তখন সম্ভবপর ছিল না। তাঁরাও সে সময়ে বরাবাজার থেকে আদ্রায় গেছিলেন গোপনে। আগামী দিনের আন্দোলন নিয়েও আলোচনা হয়েছিল—তবে সে আলোচনা হয়েছিল পুলিশকে এড়িয়ে কর্মীদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্তরে। অর্থাৎ এক সঙ্গে এক জায়গায় না বসে আদ্রার বিভিন্ন জায়গায় দু'জন তিনজন মিলিত হয়ে। তবে নিবারণচন্দ্রের পুত্র তারিখের উল্লেখ না করেও সুনিশ্চিতভাবে বলেছেন আদ্রায় একটি বৈঠক হয়েছিল এবং তিনি (চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত) তাতে নিজে উপস্থিত ছিলেন।

যাইহোক, আদ্রাতেই ঠিক হয়েছিল আন্দোলনে নেতারা কে কোথায় নেতৃত্ব দেবেন। বান্দোয়ান

থানা দখলের দায়িত্ব নিলেন ভজহরি মাহাতো এবং কুশধ্বজ মাহাতো। জয়পুর থানার দায়িত্ব পড়ল বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এবং বরাবাজার থানার ধনঞ্জয় ও ভীম মাহাতোর উপর। মানবাজার থানা দখলের জন্য এগিয়ে এলেন সত্যকিংকর মাহাতো আর অন্যদিকে হুড়ার দায়িত্ব নিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী। চাস থানা দখলের দায়িত্ব দেওয়া হল জগবন্ধু ভট্টাচার্যের উপর।

আদ্রার বৈঠকের সিদ্ধান্তকে আমরা ব্যাপকভাবে মঞ্জুর করে নেওয়া হল পিড়পিড়িতে রামলাল সারাওগির বাগানবাড়িতে এক সভা ডেকে। সেখানে রামলালও উপস্থিত ছিলেন।

আদ্রার বৈঠকে এবং পরবর্তী সময়ে রামলাল সারাওগির বাগানবাড়িতে অনুষ্ঠিত সভা থেকে স্থির হয় আন্দোলনকে সুষ্ঠুরূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন আরো একটি গোপন বৈঠকের। বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট হল সুদূর বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রাম যেখানে পুলিশ সহসা খোঁজ খবর করে উঠতে পারবে না।

২৩ সেপ্টেম্বর জিতানে ভজহরি মাহাতোর বাড়িতে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হল জেলার অগ্রণী কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে। সেখানে স্থির হয় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সারা মানভূমব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাশকতামূলক কাজে সমস্ত কর্মীরা শক্তির ভূমিকা নেবেন। বস্তুত ভবিষ্যতের স্বাধীনতার ইতিহাসে জিতানই পুরুলিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের তীর্থক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হবে।

জিতান বৈঠকে পুলিশ থানাগুলি আক্রমণের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত যেখানে লিখেছেন ৩০ সেপ্টেম্বর সেখানে ভজহরি মাহাতো বলেছেন, "২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২, ১৩ই আশ্বিন।"

মানভূমের উত্তরে নাশকতামূলক কাজে প্রস্তুতির অভাবে প্রত্যাশামতো সাড়া মেলে নি। যদিও আদ্রা, ইন্দ্রবিল, কাশীপুর এবং পাড়া থানার রাস্তা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং কোথাও কোথাও টেলিগ্রামের তার কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টাও দেখা দিয়েছিল। সাঁতুড়ি, হুড়া, পুঞ্চা ও বলরামপুরের কোনো কোনো অংশে টেলিগ্রাফের তার কাটা ও মদভাঁটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সবই ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র।

তবে সাফল্য এসেছিল বরাবাজার, বান্দোয়ান বাগমুণ্ডি এবং মানবাজার থানার ক্ষেত্রে।

বরাবাজার থানা দখলের নেতৃত্বে ছিলেন ভীম মাহাতো, মদন মাহাতো এবং ধনঞ্জয় মাহাতো। ২৯ সেপ্টেম্বর আগের দিন (২৮ সেপ্টেম্বর) হীরু সিং সর্দার হাটে ঢোল পিটিয়ে গ্রামবাসীকে জানালেন তারা যেন এখন থেকে ইংরাজ সরকারকে আর কোনো খাজনা না দেন। অবশ্য এর আগে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর ওখানে সাফল্যের সঙ্গে একদফা হরতাল হয়ে যাওয়ায় জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিল।

২৮ সেপ্টেম্বরের রাত থেকেই থানা অভিযানকারীরা জাহানাবাদে অতুলাশ্রমে (অতুলচন্দ্র ঘোষের নামে তৈরি হয়েছিল) জমায়েত হয়েছিলেন, পরের দিন যাওয়ার পথে যত এগিয়েছেন ততই সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। থানায় ছিল গুটি কয়েক পুলিশ আর আট-দশটি রাইফেল। ক্রম-অগ্রসরমান জনতার বিপুল আকার দেখে প্রতিরোধের পরিবর্তে ভয়ে দারোগা আর পুলিশ হাতে রাইফেল ধরতে প্রায় ভুলে গেল। তবে জনতা তাদের নিষ্কৃতি দিল না। একটা দড়ি দিয়ে তাদের বেঁধে রেখে তাদেরই চোখের সামনে থানা লুঠ করেন—অর্থাৎ কাগজ-পত্তরে আগুন লাগিয়ে দিল এবং আসবাব-পত্র সব ভেঙে তছনছ করে দিল। বরাবাজার থানা প্রায় সাতদিন ইংরাজ প্রশাসনের হাত থেকে মুক্ত ছিল। এই অভিযানে শবরদের ভূমিকাও ছিল গৌরবজনক। ছামু শবর, রামু শবর ও লক্ষ্মণ শবরের নেতৃত্বে শবরদের একটা ভালো অংশ এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন।

এক সপ্তাহ পরে মিলিটারি এনে থানাকে পুনর্দখল করা হয়েছিল। এতে আহত হয়েছিলেন ছ'জন স্বেচ্ছাসেবক।

বান্দোয়ান থানা দখলের অভিযান হয়েছিল ৩০ সেপ্টেম্বরের ছ'দিন আগে ২৪ সেপ্টেম্বর। এখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুখ্যত ভজহরি মাহাতো, গৌর মাহাতো এবং বাবুরাম মাহাতো। এই অভিযানে ধাদকা ও কুইলাপাল অঞ্চলের অধিকাংশ লোক যোগ দিয়েছিলেন। অভিযানের মাঝখানে টটকো নদীর সেতু ভাঙতে গেলে নিরাপত্তায় রত মিলিটারিদের গুলিতে কিছু লোক আহত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাচরণ ভূমিজ, জুড়ুন মুদি, রতন মাঝি, মুড়িরাম মাহাত প্রভৃতি। এতদ্‌সত্ত্বেও অভিযানকারীরা নিরুৎসাহিত না হয়ে দৃঢ় ভাবে বান্দোয়ান থানার দিকে এগোন এবং অচিরেই থানাকে বরাবাজারের মতো ইংরাজ অধিকার থেকে মুক্ত করেন। বান্দোয়ান থানাকেও পুনর্দখল করতে ইংরাজ পুলিশের বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

বরাবাজার ও বান্দোয়ান থানা দখলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এক বিরাট জনতা যাঁদের সঙ্গে অধিকাংশ ছিলেন জনজাতিগোষ্ঠী, বারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পটমদা" থানা দখলের জন্য পটমদা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। পটমদা থেকে সাতকিলোমিটার দূরে তাঁরা যখন আহারাদি ব্যস্ত ছিলেন, তখন বান্দোয়ান থানাকে মুক্ত করার জন্য এক ট্রাক ভর্তি মিলিটারি অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হয়। অতবড় জনতাকে ওখানে দেখেই বিনা প্ররোচনায় মিলিটারি জনতাকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক আহত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিপ্র মাহাতো, লক্ষণ মাহাতো, জুড়ুন মুদি প্রভৃতি। লক্ষণ মাহাতোর আঘাত ছিল খুবই গুরুতর, তাঁর একটি পা শেষ পর্যন্ত অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছিল।

বাগমুণ্ডি থানার ডাকঘর সাফল্যের সঙ্গে ভস্মীভূত হলেও আন্দোলনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল মানবাজার থানা অবরোধের ক্ষেত্রে। এখানে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৩ আশ্বিন সারারাত ধরে আশেপাশের গ্রাম থেকে কর্মীরা চেলুয়াগ্রামের পশ্চিম দিকের মাঠে জমায়েত হয়েছিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর সকালবেলা মানবাজার থানার সামনে যখন মিছিল করে কংগ্রেস কর্মীরা পৌঁছেছিলেন তখন সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছল। সেই সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিশ কোনোরকম সতর্কধ্বনি না দিয়েই জনতাকে লক্ষ করে গুলি চালাতে তাকে। সামনের সারিতে ছিলেন চুনারাম মাহাতো গোবিন্দ মাহাতো এবং গিরিশ মাহাতো। চুনারাম মাহাতো গুলি বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। অন্যদিকে গুরুতর রূপে আহত হলেন গোবিন্দ, গিরিশ এবং দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ানো হেমচন্দ্র মাহাতো। সবশুদ্ধ অন্তত দেড়শো লোক গুলিতে জখম হয়েছিলেন। পুরুলিয়া হাসপাতালে কয়েকদিন পরে গোবিন্দ মারা যান। কিন্তু সৌভাগ্যবশত গিরিশ মাহাতোর দুইবার গুলিতে জখম হলেও তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন জেল হাসপাতালে হেমচন্দ্র আহত অবস্থায় বন্ধুদের সাহায্যে গোপনে বাঁকুড়ার রাজকোট গ্রামে ডাঃ মহন্ত চৌধুরীর গৃহে ওঠেন। সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে তিন মাসের মধ্যে সুস্থ হন। পুলিশ হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজীর নির্দেশে যখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের কথা বলা হল তখন তিনি আত্মগোপনরত অবস্থা থেকে বেরিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছিলেন

সরকারি অত্যাচারকে ভ্রুক্ষেপ না করে মানবাজারে গুলি চালানোর প্রতিবাদে ৬ই অক্টোবর সাফল্যের সঙ্গে পুরুলিয়ার হরতাল পালিত হয়েছিল। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মানভূম তথা পুরুলিয়ায় গণআন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে। এর প্রধান কারণ একদিকে পুলিশের অত্যাচার এবং অন্যদিকে যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের অধিকাংশেই তখন ইংরাজের নজরবন্দি

তবে এর অর্থ এই নয় যে ইংরাজ সরকারের স্বস্তি ফিরে এসেছিল। ১৯৪২ সালের ২৩ ডিসেম্বর মানভূমের ডেপুটি কমিশনার বিহারের মুখ্য সচিবকে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি জানান অবস্থা আপাতত শান্ত হলেও তা কেবল বাহ্যিক। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রকট। সুযোগ পেলেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

সবশেষে মানভূমের সংগ্রামী আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন আর কতজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সংখ্যাতত্ত্বের সেই হিসেব দিয়ে পুলিশের অত্যাচারের সঠিক পরিমাপ করা যাবে না। কারণ বহু জায়গায় অত্যাচার এর চেয়েও ব্যাপক হয়েছিল—যার বিবরণ কখনোই পাওয়া যাবে না। যেমন গ্রেপ্তারও হয়নি গুলিও চলেনি কিন্তু নির্মমভাবে বান্দোয়ানের সাধারণ মানুষ পুলিশের লাঠির আঘাতের শিকার হয়েছিল। শুধু মানুষ নয় গৃহপালিত পশুকেও জোর করে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। বরাবাজার থানার নিরীহ শবররাও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। শুধু কর্মীরা নন তাঁদের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনেরাও পুলিশের রোষের সম্মুখীন হয়েছিলেন। চিত্তভূষণ দাশগুপ্তের মতে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে সাতশত লোককে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু সংখ্যাটি মনে হয় অনুমান। আরো বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ আমরা জানি এসব ক্ষেত্রে পুলিশ অনেক সময়েই পুরো তথ্য বা রেকর্ডস রাখে না। তবে তিনি সঠিক ভাবেই বলেছেন, “দুই জনের মৃত্যু হয় ও একজন চিরতরে পঙ্গু হইয়া যায়। বহুস্থানেই পাইকারি জরিমানা আদায় করা হয়।” (রক্তে রাঙা মানভূম, পৃ. ২২৯)।

প্রধানত যে বইগুলি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১। গেজেটিয়ার অব দি মানভূম ডিস্ট্রিক্ট—এইচ. ক্যাপল্যাণ্ড
২। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : পুরুলিয়া— এন. এন. সেন (সম্পাদক)
৩। পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য
৪। সদর মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন— সুমিত্রা মিত্র
৫। স্বাধীনতা আন্দোলনে রক্তে রাঙা মানভূম— ভজহরি মাহাতো ও পদক চন্দ্র মাহাতো



প্রাচীন পুরুলিয়া

অনিলকুমার চৌধুরী

পুরুলিয়া সম্পর্কে যা-ই বলতে যাওয়া হোক না কেন নিহত মানভূমের কথা চলে আসবেই অনিবার্যভাবে। যেহেতু পুরুলিয়া, মানভূমের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধার্মিক প্রভৃতি সকল পর্যায়ের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে, একান্ত অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট, বিজড়িত। তাই, মানভূমের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে পুরুলিয়ার কাহিনি অবতারণা করলে তা ইতিহাসের অপলাপ হবে। কারণ, পুরুলিয়া মানভূমের আত্মা, প্রাণ, কেন্দ্রভূমি। বিশেষত প্রাচীন পুরুলিয়াকে জানতে হলে 'একদা মানভূমে'র খবরাখবর নিতান্তই আবশ্যিক। তাই, বর্তমান প্রবন্ধ মানভূমের কথা দিয়েই আরম্ভ করতে হবে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের (১২.৮.১৭৬৫) পর অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পরে কোম্পানি বিহারের ছোটনাগপুরের অন্তর্গত জঙ্গল মহলে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। সেই সূত্রে বহু জমিদার অধ্যুষিত এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সুষ্ঠু বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা সময়ে সময়ে আপনাদের প্রয়োজন মতো নানা আইনের প্রচলন করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আইন তেমনি একটি আইন, যার বলে, প্রাচীন জঙ্গল মহলকে খণ্ড খণ্ড করে তার পরগনাগুলিকে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সঙ্গে যুক্ত করে জঙ্গল মহলের বিলোপ সাধন করা হল। সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুরকে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হল— যার সদর দপ্তর হল মানবাজারে। নবীন মানভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত হল সুপুর, রায়পুর, অম্বিকানগর, শিমলাপাল, ভেলাইডিহা, ফুলকুস্‌মা, শ্যামসুন্দরপুর এবং ধলভূম। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলার সদর দপ্তর স্থান পরিবর্তন করে চলে এলো পুরুলিয়া গ্রামে। কারণ, গ্রামটির অবস্থানগত সুবিধা প্রশাসনিক কাঠামোকে সকল দিক দিয়ে সহায়তা করবে বলেই মনে হয়েছিল তৎকালীন শাসককুলের, তাছাড়া বাণিজ্যিক উৎকর্ষের সম্ভাবনা ও পরিবেশ একান্ত অনুকূল বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। তাই, পাঁচ বছর পরেই মানভূমের সদর দপ্তর মানবাজার থেকে একদা জঙ্গল মহলের কেন্দ্রভূমি এই পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হল। বস্তুত পুরুলিয়া গ্রাম তখনও ঘন জঙ্গলের অন্তঃপাতী ছিল। গ্রামটি ছিল বিশাল আয়তনের। উত্তরে— রাঘবপুর, অলঙ্গীডাঙা, ধবঘাটা, পূর্বে — মহলঘুটা, শরবাগান, পালঞ্জা। দক্ষিণে— নডিহা, দুলমি, কেতিকা ও পশ্চিমে ভাটবাঁধ, বেলগুমা। মতান্তরে, উত্তর ও পূর্ব দিকে যমুনাজোড়, দক্ষিণে নডিহা, দুলমি, কেতিকা ও পশ্চিমে—ভাটবাঁধ, বেলগুমা। সিপাহি বিদ্রোহের কিছু পূর্বে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ধলভূমকে মানভূম থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। সে সময় জেলার ক্ষেত্রফল দাঁড়াল ৭৮৯৬ বর্গমাইল। যার মধ্যে

৩১টি ছোট-বড় জমিদারি ছিল। মানভূমের চেহারা তখন দেখতে হল এক বিষম সামন্তরিক ক্ষেত্রের মতো। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে শেরগড় ও পাঁড়রার কিয়দংশ বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর পুনরায় এক আদেশবলে সুপুর, রায়পুর, অম্বিকানগর, শিমলাপাল, তিলাইডিহা, ফুলকুস্‌মা, শ্যামসুন্দরপুরকে বাঁকুড়া জেলার সাথে যুক্ত করা হল। অতঃপর বৃহত্তর মানভূমের রূপ তথা ক্ষেত্র বারংবার খণ্ডিত হয়ে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৭৭ বৎসর একরূপ নিরুপদ্রবেই ছিল। যদিও এর মধ্যে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মানভূমের উত্তরাংশ অর্থাৎ গোবিন্দপুর (ধানবাদ অঞ্চল) সাবডিভিশনকে মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু তখন তা ফলবতী হয়নি।

জেলায় প্রথম লোকগণনা হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে বলা হয়েছিল যে, জেলার তৎকালীন আয়তন ৪১৪৭ বর্গমাইল। উক্ত সীমানার মধ্যে ১০,৫৮,২২৮ জন মানুষের বসতি ছিল। ছিল তিনটি শহর (পুরুলিয়া, ঝালদা, রঘুনাথপুর), ৬১৪৪ টি গ্রাম এবং ১,৭৪,৪৯৪ বাস্তুবাড়ি। সেই সময়কার মানভূমের প্রতি বর্গমাইল লোকসংখ্যার গড় ঘনত্ব ছিল ২২৫ জন। মূল জনসংখ্যার অর্ধেক এখানকার আদিবাসীগণ। এঁরা কুড়মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, ও বাউরি সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান কালের ভাষায় 'ভূমিপুত্র' এই জেলার চতুঃসীমা নির্দেশ করা হয়েছে—উত্তরে—হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগনা, পূর্বে বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুব, দক্ষিণে সিংহভূম এবং পশ্চিমে রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলা। উত্তর-দক্ষিণে ১৪০ কিলোমিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ৯২ কিলোমিটার। মানভূম ছোটনাগপুর থেকে নিম্ন বঙ্গের বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রমাবতরণশীল মালভূমির প্রথম ধাপরূপে কথিত। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গল, ঝরনা-প্রপাত এ জেলার প্রাকৃতিক অলঙ্কার। এ জেলায় অনেক পাহাড় আছে। তার মধ্যে জেলার দক্ষিণাঞ্চলের দলমা পাহাড়ের উচ্চতা ৩৪০৭ ফিট, দক্ষিণ-পশ্চিমে সেওয়াই ও চারাজুরাল যথাক্রমে ২৬৩৭ ফিট ও ২৪১২ ফিট। অযোধ্যা পাহাড়ের গজবুরুর উচ্চতা ২২২০ ফিট, উত্তর-পূর্বে পঞ্চকোট পাহাড়ের উচ্চতা ২১১০ ফিট। এছাড়াও আরও অনেক পাহাড় আছে এই জেলায় যাদের প্রায় সকলেরই উচ্চতা হাজার ফিটের উপর। বানসা, জয়চণ্ডী, ডুমুণ্ডা প্রভৃতি। বেশির ভাগ পাহাড়ই ঘন অরণ্যময় ও নানা প্রজাতির শ্বাপদ অধ্যুষিত। বড় হিংস্র জন্তুর প্রাচুর্যের কথা বিশেষ শোনা যায় না। তবে, হাতি ও ভালুক বড় পাহাড়ের জঙ্গলে নিয়মিতই দেখা যায়।

এখানকার বনে-জঙ্গলে নানান জাতের পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। চোরা-শিকারির মৃত্যুবাণ এড়িয়ে আজও গভীর অরণ্যমধ্যে তাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, পূর্বের তুলনায় বতর্মানে এদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমে গেছে। বহু প্রকারের জ্বালানি ও আসবাব তৈরির উৎকৃষ্ট জাতের কাঠের গাছ এখানকার বড় বড় জঙ্গল (সংরক্ষিত) -গুলিতে এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণেই মেলে। তার মধ্যে শাল, সেগুন, নিম, গামার, কুসুম, ডোকা, শিরিষ, সৎসাল, মুর্গা, আসন, অর্জুন, শিমুল, করম। ফলদায়ী গাছের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, বেল, কদম, পেয়ারা, কুল, মহুয়া, কেঁদ প্রভৃতির বৃক্ষ জেলার প্রায় সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে আজও পাওয়া যায়। বৃহৎ ফুলের গাছগুলির মধ্যে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, পলাশ, বাবলা। ধাধ্‌কি, পুটুশ প্রভৃতি ছোটগাছও এ অঞ্চলে অফুরান। এদের প্রাপ্তিস্থান মাঠা, বাঘমুণ্ডি, চাকিরবন, রাকাব, কুইলাপাল ইত্যাদি বন-সমারোহের মধ্যে। উক্ত অরণ্যগুলি একদা মানভূমের বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হত। আজ এসব সম্পদ বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ছোটনাগপুরের এই অধিত্যকাটি বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমনিম্ন হওয়ায় জেলার নদীগুলি

সবই পূর্ববাহিনী। বরাকর, দামোদর, সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, কুমারী, নেংসাই, টটকো, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি আরও অনেক ছোট-বড় নদী এ জেলার শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তবে, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় অধিকাংশ নদীতেই জল থাকে না। দামোদর, কাঁসাই, কুমারী, সুবর্ণরেখাকে বাঁধ দিয়ে কিঞ্চিৎ জল সঞ্চয় করা গেছে—কৃষিকার্যের উন্নতির কথা ভেবে। এখানকার আবহাওয়া স্বভাবত শুষ্ক। বৎসরে গড় বৃষ্টিপাত ৪৯-৫৫ ইঞ্চি মাত্র। তাপমাত্রা— উচ্চতম ৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং নিম্নতম তাপমাত্রা ৬-৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে থাকে সচরাচর। আর্দ্রতা থাকে ৭৫ থেকে ৮৫ শতাংশের মধ্যে। বাতাসের গতিবেগ সারাবছর ঘণ্টায় আড়াই কিলোমিটার থেকে সাত কিলোমিটার পর্যন্ত থাকে।

সদর শহর ও অন্য দুটি শহরের পথঘাট পিচঢালা হলেও গ্রামপথগুলি অধিকাংশই কাঁচা। তবে, সদর শহর থেকে পশ্চিমমুখী রাঁচিরোড, উত্তরমুখী বরাকর রোড, পূর্বমুখী বাঁকুড়া রোড ও দক্ষিণমুখী চাঁইবাসা রোড, এই পথগুলি ভালো পাকা রাস্তার পর্যায়ের ছিল। এই পথগুলি একদা তরুবীথিসম্বলিত ছিল। পথের উভয় পার্শ্বে ছায়াতরুশোভিত বীথিকা পান্থজনের পথশ্রম দূর করতে সাহায্য করত । বর্তমান সেসব পথগুলির নগ্ন-ভগ্ন দশা। পুরুলিয়ার বড় রাস্তাগুলির মধ্যে দুটি রাস্তার ওপর সেতু নির্মিত হয়েছে। চাঁইবাসা রোডের ওপর কংসাবতীর সেতু তৈরি হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এবং পুরুলিয়া-ধানবাদ রোডের ওপর দামোদরের ওপর তেলমুচা সেতু নির্মিত হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এই সেতুটির জন্য তদানীন্তন জেলা বোর্ড বরাবর টোল ট্যাক্স আদায় করতেন।[১]

খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্যে মানভূম জেলা ছোটনাগপুর এবং বাংলার অন্যান্য জেলাগুলি অপেক্ষা সমৃদ্ধতর। এখানে অজস্র প্রকারের খনিজ দ্রব্য সারা অঞ্চলময় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেগুলির দ্বারা বহুপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প অনায়াসেই গড়ে তোলা যায় কিন্তু এ যাবৎ সে চেষ্টা করে দেখা হয়নি। প্রায় ২০/২৫ রকমের খনিজ বা আকরিক পদার্থের মধ্যে চিনামাটি, কয়লা, তামা, ফেল্‌সপার, ফ্লুওরাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় আছে এই জেলার মৃত্তিকাগর্ভে। এ ছাড়া স্বল্প পরিমাণ হলেও তেজস্ক্রিয় আকরিক পদার্থসহ অভ্র, লোহা, গার্নেট, গ্রাফাইট, এ্যাসবেসটস, কায়ামাইট প্রভৃতি আরো বহুপ্রকার খনিজ আছে, যা দিয়ে অবশ্যই কোনো লাভজনক বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা যায় না। একদা এখানকার বেশিরভাগ নদীতেই নাকি 'সোনা'ও পাওয়া যেত বিগত ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। যদিও সেই সোনা সংগ্রহের গড় খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না কোনোদিনই—তবু, ১৯০৪/৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এক ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বেলেডি থেকে ২৭১ টন খনিজ কাঁচামাল থেকে টন প্রতি ৬০৮ গ্রাম হারে সোনা তুলেছিলেন। যার মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সিসা ও রুপার-ও সন্ধান পাওয়া গেছে।[২] ইচাডি গ্রামের সন্নিকটে সুবর্ণরেখার কূলে এক প্রাচীন সোনা তোলার কারখানা আমরা দেখেছি। কারখানাটি কোনো এক ইংরেজ কোম্পানির পরিত্যক্ত এলাকার মধ্যে ছিল।

এরূপ একটি সম্পদশালী জেলার 'জিন' থেকেই বর্তমান পুরুলিয়ার উৎপত্তি। আমরা দেখেছি, ৭৭ বৎসরের প্রাচীন মানভূমকে নিতান্ত এক ছেলে-ভুলানো অজুহাত দেখিয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিন টুকরো করে মানভূমকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হল, পরিবর্তে জন্ম নিল নূতন পুরুলিয়া জেলা। সদর রইল পুরুলিয়াতেই। এই রাজনৈতিক হত্যার কোনো প্রতিবাদ, প্রতিকার হল না। তৎকালীন ছোট-বড় রাজনৈতিক দলগুলিও তাঁদের কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন। ভারত ভাগের মতো এখানেও সেই অবৈজ্ঞানিক ভাগাভাগিটা সোনামুখ করে মেনে নিলেন সকলে। বিহার থেকে

বার হয়ে এসে পুরুলিয়া পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে যুক্ত হল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলের মাঠে এক সুবিশাল উৎসবের আয়োজন হতেও দেখেছি আমরা।

কলকাতা থেকে নামিদামি ব্যক্তিগণ সে উৎসবে যোগদান করে আমাদের ধন্য করেছিলেন। নূতন জেলার আয়তন হল ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার। ২টি সাবডিভিশন, ২০টি ব্লক, ৩টি পুরসভা, ২০টি থানা, ২৪৫২টি বসতিপূর্ণ গ্রাম। মানচিত্রে জেলার অবস্থান নির্ধারিত হল-- ২২°৪২'৩৫৩" থেকে ২৩°৪২'০" উত্তর এবং ৮৫°৪৯'২৫" থেকে ৮৬°৫৪'৩৭" পূর্ব। সেই পুরুলিয়ার বর্তমান রূপ তো সকলেই দেখছেন, বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম! কিন্তু, পুরুলিয়া শহরের তো একটা অতীত ছিল, যা অনেকেই দেখেননি। পুরুলিয়ার সেই অতীতের কিছু কাহিনিই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। সেদিনের সেই পুরুলিয়াকে জানতে হলে— আগেই জানতে হবে মানভূমকে, তা সে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও। তাই, এত দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন হল।

আমার ছেলেবেলা থেকেই এ প্রবন্ধ শুরু করব। যখন থেকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে অথবা দেখতে শিখেছি— সেই সময়টা ১৯২৫/১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ। তখন থেকে যা দেখেছি, শুনেছি অথবা বুঝেছি তা-ই অতঃপর বিবৃত করব। বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্গে মতান্তর হতে পারে অতি স্বাভাবিকভাবেই— তাই, তাঁদেরও লেখনী গ্রহণ করার সবিনয় আহ্বান জানিয়ে উদ্দিষ্ট প্রবন্ধের সূচনা করি।

উল্লিখিত সময়কালে এই মানভূমের সদর শহর পুরুলিয়ার কী রূপ ছিল তারই যথাসাধ্য বর্ণনা উপস্থাপিত করব। প্রাচীন পুরুলিয়ার কর্মকাহিনী ঘিরে কয়েকটি ছড়া-গান আমার সংগ্রহে রয়েছে। তারই দু-একটি এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেব। স্বভাবতই মনে আসছে ১৯৫০/৫১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কাশীপুর থানার অন্তর্বর্তী গ্রামাঞ্চলে শোনা পুরুলিয়া শহর সম্পর্কে একটি ভাদুগান— 'পুরুল্যার বাজারে ভাদু / বড় বড় পাকা ঘর / মুঢ়ায় মুঢ়ায় জ্বলছ্যে বাতি / রাত্যে ভিত্যে নাইখ ডর।' বস্তুত, পুরুলিয়া সদর শহর ঘোষিত হওয়ার ৩৮ বছর পর পুরসভার প্রবর্তন হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। সরকারি পরিচালনাধীনে প্রতিষ্ঠিত এই পুরসভার প্রধান ছিলেন তৎকালীন জেলাশাসক (ডেপুটি কমিশনার) সচিব (সেক্রেটারি) শ্রী নন্দলাল ঘোষ, উপপ্রধান শ্রী সদানন্দ মুখোপাধ্যায়, সদস্যগণ ছিলেন শ্রী রামদয়াল মজুমদার, শ্রী প্রিয়নাথ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে যাওয়ার পর পুরুলিয়ার জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ঘরবাড়ির সংখ্যার উন্নতি হতে থাকে, যানবাহন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পুরসভাকেও সর্বপ্রযত্নে সচেতন হয়ে উঠতে হয়। শহরের পথে পথে তাই জ্বলে উঠল আলো। প্রতিটি পথের মোড়ে লোহার খুঁটির ওপর কাঁচে ঢাকা কেরোসিনের বাতি বসানো হয়, কোনো কোনো বাড়ির দেওয়ালে লোহার শৌখিন ব্র্যাকেটের ওপর বসানো হয় কেরোসিনের বাতি। এই আলো যথাসময়ে জ্বালবার ও নেভাবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্বেই সিঁড়ি, লম্ফ ও টিনে কেরোসিন তেল নিয়ে আলোগুলিতে তেল দিয়ে, কাঁচ মুছে জ্বেলে দিয়ে যেত এবং পুনরায় সকালে সেগুলি নিভিয়ে দিয়ে যেত। সারা শহরের জন্য এরূপ বেশ কিছু লোক নিযুক্ত ছিল। এরা আনুমানিক ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত ছিল। তারপর পুরুলিয়ার পথে বিদ্যুতের আলোর প্রবর্তন হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণোৎসব উপলক্ষে পুরসভা দপ্তরের সীমানার মধ্যে 'জুবিলি টাউন হল' নামে একটি বৃহৎ সভাগৃহ নির্মিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে, দশ হাজার টাকা ব্যয়ে, যেটি পরবর্তী কালে একটি রাজনৈতিক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

পুরুলিয়ার পথঘাটগুলি সেকালে প্রশংসনীয়ভাবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকত। প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে পুরসভার উদ্যোগে প্রতিটি পথ ঝাড়ু দেওয়া হত। সকালবেলায় রাস্তা সাফাইয়ের পরেই জলের গাড়ি আসত পথে জল দিতে। পুরসভার তখন তিনখানা মোটর ট্যাঙ্কার ছিল পিছনে ঝারি বসানো।[৩] চালকের কেবিনে রিলিজ ভালভ থাকত যাতে চালক প্রয়োজনমতো চালু ও বন্ধ করতে পারত। পথের দু-দিকের নর্দমা পরিষ্কার করার ভিন্ন লোক নিযুক্ত ছিল। নিয়মিত শহরের সকল পয়ঃপ্রণালী এইভাবে পরিষ্কৃত হত। শহর তখন ছিল এক অতি স্বাস্থ্যপ্রদ, মশা-মাছিহীন। এখানকার পানীয় জল হজমের সহায়ক ছিল। ফলে, সারা বছর ধরে বাইরে থেকে বহু বিত্তবান মানুষ আসতেন এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। সে দিন আজ আর নেই। পুরুলিয়া এখন অনিবার্যভাবেই সর্বদূষণে দূষিত। 'স্বাস্থ্যকর স্থান' নাম পুরুলিয়ার অনেকদিন ঘুচে গেছে। শহরটিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি রাজপথ একটি সুন্দর বৃত্ত রচনা করেছে। মোটর ভ্রমণের উপযোগী ছয় মাইল দীর্ঘ এই চক্রপথটি নির্মিত হয়েছে শহরের উত্তরে রেনী রোড ও উইল্‌কক্‌স চক্করের সহযোগে। শহরের পূর্বে বাঁকুড়া রোডের লেভেলক্রসিং থেকে শুরু হয়ে শহরের সমগ্র উত্তর সীমানা পার হয়ে পশ্চিমে রাঁচি রোড বরাবর এসে ভাট বাঁধের মধ্য দিয়ে বেলগুমা পার হয়ে চাঁইবাসা রোডে মিশেছে। এই সুদীর্ঘ পথটি একদা তরুবীথিশোভিত ছিল, এখন সম্পূর্ণ রিক্ত। শহরের মধ্যে ইংরাজি নামে আরো কয়েকটি রাস্তা আছে। সাহেব বাঁধের উত্তর পাড়ের পথটির নাম 'জে ল্যাং রোড'। অনেকে ভুল করে এই পথটিকে 'নর্থ লেক রোড' বলে থাকেন কিন্তু নর্থ লেক রোড আরও উত্তরে রাঘবপুর ও পুরুলিয়ার সীমানা নির্ধারণ করছে। হাটের মোড় থেকে যে পথটি পুলিশ লাইনের পাশ দিয়ে নীলকুঠিডাঙা হয়ে রেলস্টেশনে মিশেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে পথটি আসলে সোজা চলে গিয়ে তেলকলপাড়া পার হয়ে দুর্গামন্দির কালীমন্দির-হরিবোলমেলার সংযোগস্থলে বাঁকুড়া রোডে মিশেছে। যখন রেললাইন বসল তখনই এই দীর্ঘ পথটি খণ্ডিত হয়েছিল। পথটির নাম ছিল 'ইন্ডিগো ফ্যাক্টরি রোড'। এখন সে নাম বদলে এস সি সেন রোড নাম হয়েছে। আরো একটি পথ আছে— কসাইডাঙার নিকটবর্তী কবরখানার মোড় থেকে যে পথটি কুমোরপাড়া লেভেল ক্রসিং পার হয়ে শর-বাগানের মধ্য দিয়ে গিয়ে 'ওলড্ মানবাজার রোডে' পড়েছে— তার নাম 'নিউ ফেমিন রোড'। এ নামটি এখনও চালু আছে।[৪]

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'লয়েড মার্কেট' নাম দিয়ে পুরসভার উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় পুরুলিয়ায় 'হাট' প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার মিস্টার আর্থার লয়েড ক্লে, আই সি এস-এর নামেই উক্ত হাটটির নামকরণ হয়। হাটের গোলঘরটিও ওই সময়েই তৈরি হয়। এখন সেখানে হাটের দপ্তরখানা, একজন দপ্তর সহায়ক সেখানে বসেন। তাঁর কাজ হল হাটের শৃঙ্খলা রক্ষা ও যথাযথ রাজস্ব আদায়। তখনকার কালে এঁর পদবি ছিল 'হাট-চৌধুরী'। এই পদে নির্বাচিত ব্যক্তি সাধারণত নির্বাচিত কমিশনারগণেরই একজন হতেন।

পুরসভার তত্ত্বাবধায়ক বিভাগে (কন্‌জারভেন্সি) সেকালে একটি 'ছাড়ঘর' ছিল। ইংরাজিতে যাক 'পাউন্ড' বলা হয়। স্থানীয় ভাষায় 'ছাড়' শব্দের অর্থ খোঁয়াড়। যদিও সেটি অনেকদিনই হল বন্ধ হয়ে গেছে। সেটির প্রয়োজনীয়তা ছিল পথে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো ও গৃহস্থের ক্ষতিসাধক জীবজন্তুগুলিকে একটি দায়িত্বপূর্ণ অবরোধে আটকে রাখার। নয়তো তারা পথ অপরিচ্ছন্ন করবে, যানবাহনের বাধার সৃষ্টি করবে, এমনকি গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধনও করতে পারে। তাই, ইতিউতি বিচরণশীল গরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জীবগুলিকে

আইনানুগভাবে আটক রাখার জন্য এই 'ছাড়ঘরের' ব্যবস্থা। যথার্থ মালিক সঠিক প্রমাণ দাখিল করে জরিমানা দিয়ে স্বীয় পশুটিকে ফেরত নিতে পারতেন। এই জীবগুলিকে ছাড়ঘরে যথার্থভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পাকা গোহাল ও পশুখাদ্য পরিবেশনের জন্য ঠিকাদার মারফত ব্যবস্থা করার নিয়ম ছিল। সেই ছাড়ঘরের সংলগ্ন পুরসভার কনজারভেন্সির গাড়িগুলির ডিপো ছিল। তাই, ওই অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'গাড়িখানা'। সে নাম আজও চালু আছে। এই গাড়িখানা পুরুলিয়া-বরাকর রোডের ওপর অবস্থিত। এই কনজারভেন্সির দায়িত্বে থাকতেন একজন কমিশনার। সে নিয়ম আজও আছে।

পুরুলিয়া পুরসভার একটি দাতব্য ঔষধালয় ছিল সেকালে। বিশুদ্ধ মেডিকলের পাশে যেখানে এখন পুরসভার পাকা দোকানঘর হয়েছে সেখানেই এককালে এক পুরাতন গৃহে ছিল 'চিত্তরঞ্জন দাতব্য ঔষধালয়'। একজন কবিরাজমশাই সদা এর দায়িত্বে থাকতেন। ঔষধালয় সংলগ্ন তাঁর আবাসস্থল ছিল। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত মানুষজন সেখান থেকে চিকিৎসা ও ওষুধ পেতেন। এরও অনেক পূর্বে এই বাড়িটি লেডি ডার্ফারিন হাসপাতালের চিকিৎসকের আবাস ছিল। অর্থাৎ সাব-এ্যাসিসটেন্ট সার্জনের কোয়ার্টার। হাসপাতাল প্রসঙ্গে এ সবের আলোচনা রয়েছে।

প্রতি পাড়ায় ছিল পুরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল নিম্ন-প্রাথমিক। কয়েকটি মাত্র উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, আমলাপাড়া, মুনসেফডাঙা, নীলকুঠিডাঙা ও নডিহায়। বালিকাদের জন্য একান্তভাবে ছিল 'পুরুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়', যার সর্বশেষ উত্তরণ 'শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে'।

মানভূম জেলায় তৎকালে যে তিনটি শহর ছিল তাদের মধ্যে পুরুলিয়া ছাড়া বাকি দুটি হল— রঘুনাথপুর ও ঝালদা। পুরুলিয়ার বারো বৎসর পরে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল রঘুনাথপুর এবং ওই বৎসরেই ১লা জুলাই ঝালদায় পুরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে, রঘুনাথপুর পুরসভা প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্বে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানে চৌকি ও মুনসেফি আদালত স্থাপিত হয়।[৫] ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়া সদরে জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

বড় স্কুল বলতে তখন মাত্র দুটি ও একটি মাইনর স্কুল ছিল। তার মধ্যে 'জেলা স্কুল' নামে একটি সরকারি বিদ্যালয় ও 'মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন' নামে একান্তভাবে জনসাধারণ-পরিচালিত এবং একটি মাইনর স্কুল ছিল। মাইনর স্কুলটিও মূলত জনসাধারণ পরিচালিত ছিল। এই মাইনর বিদ্যালয়টির জন্মদাতা মুনসেফডাঙা নিবাসী শ্রদ্ধেয় হৃষিকেশ রায়। তাঁরই একক প্রচেষ্টায় তাঁর নিজস্ব কোচিং ক্লাশটিকে বহু অধ্যবসায়ে নিষ্ঠায় এই মাইনর স্কুলে পরিণত করেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টিই আজকের 'মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড হাই স্কুল।' বর্তমান যুগের হাওয়ায় সেই জ্ঞানতপস্বী, ছাত্রবন্ধু, শিক্ষাবিদ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী হৃষিকেশ রায় মহাশয় নিশ্চিতভাবে হারিয়ে গেছেন। তাঁকে ভুলে গেছে তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ ছাত্ররাও।

আজকের মতো পুরুলিয়া শহরে তখন এতো দোকান-পসার ছিল না। আমাদের ছেলেবেলায় পুরুলিয়া শহরে মাত্র দুটি বইয়ের দোকান ছিল। রাধাকিশোর সরকারের (বাঁকুদা) ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার ছিল রোহিণী ফার্মেসির সামনাসামনি, আর চক্‌বাজার কালীমেলার সন্নিকটে দোলগোবিন্দ দত্তের বইয়ের দোকান। 'ছাত্রবন্ধু ভাণ্ডার' প্রকৃতই ছাত্রবন্ধু ছিল তাই দোকান একদিন বন্ধ হয়ে গেল। দোলগোবিন্দ মহাশয় প্রকৃত ব্যবসায়ী তাই দোকানটি আজও চলছে।

হীরালাল মল্লিক, গুহি সদাগর ও নীলুর মনোহারির দোকান ছিল বড়রাস্তার ওপর। যার মধ্যে সদাগরের দোকান বহুদিন হল উঠে গেছে। বর্তমান দত্ত মেডিকেলের সামনে হীরালাল মল্লিকের দোকান, পোস্ট অফিসের মোড়ে নীলুর দোকান আজও রয়েছে।

কাপড়ের বড় দোকানও ছিল বেশ সীমিত। দত্ত মেডিকেলের জায়গায় একদা সুরেশচন্দ্র দত্তের কাপড়ের খুচরা ও পাইকারি দোকান ছিল, আজ যা নেই। বাটার দোকানের পাশে তিনকড়ি চন্দের খুচরা কাপড়ের দোকান— আজও আছে। তাছাড়া কাপড়গলি অর্থাৎ বনমালী সেন লেনই ছিল একমাত্র খুচরা ও পাইকারি কাপড় ও তৈরি জামা-কাপড় কেনাবেচার একমাত্র কেন্দ্র, আজও তাই-ই আছে।

মিঠাইগলি ওরফে সন্দেশগলি তথা আনন্দবাজার লেনে কেবল মিষ্টির দোকানের সারি ছিল। ছিল ভোলা ময়রার প্রসিদ্ধ তেলেভাজার দোকান। সেকালে ৬৪ পয়সায় ১ টাকা হত, তাই তখনকার ১ পয়সার মূল্য আজকের ১০০ পয়সায় টাকা হিসাবে ১.৫৬ নয়া পয়সা। সেই পুরাতন ১ পয়সায় তখন আটটি বড় বড় বেগুনি, অথবা চারটি ঝালবড়া কিম্বা দুটি করে বেশ বড় মাপের চপ বিক্রি হত। ১ পয়সার মুড়িতে একটি জোয়ান মানুষের ভালো জলখাবার হয়ে যেত। পুরুলিয়ার হাটের কাছে চাঁইবাসা রোডের ওপর এমনিই কয়েকটি তেলেভাজার দোকান ছিল। সেসব দোকানের কোনোটিই আজ আর নেই। তবে সন্দেশগলিতে মিষ্টির দোকান অবশ্য একটি-দুটি এখনও রয়েছে। বাকি সব এখন নানা পণ্যের বিপণি।

জুতোর দোকান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু-একটি থাকলেও মাঝবাজারে বাটার উল্টোদিকে দেরাস্‌তুল্লার° মস্ত বড় জুতোর দোকান ছিল। সে দোকান আমাদের বালককালেই উঠে গেছে এবং বাড়িটিও হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। এরই উল্টোদিকে সেখ্ আহেদ বক্সের দোকান ছিল— সেগুলি কিন্তু এখনও আছে। আমার অনুমান সেই দোকানের মালিকগণ হয়তো সেই দেরাসতুল্লা সাহেবের কেউ হবেন। হয়তো বা অধস্তন পুরুষ।

ওষুধের দোকান বলতে তখন গুপী ডাক্তারের (ভট্টাচার্য) ওষুধের দোকান 'ধন্বন্তরী ফার্মাসি', ডাঃ ত্রৈলোক্য ঘটকের 'ঘটক ফার্মাসি' ও শৈলজাকান্ত মিত্রের 'কমলা ফার্মাসি'। ধন্বন্তরী ফার্মাসির অবস্থান ছিল পোস্ট অফিসের মোড়ের মাথায়। এখন সেটা একটা বেশ বড়সড় এক ঘড়ির দোকান, কমলা ফামার্সি ওই মোড়েই চাঁইবাসা রোডের ওপর পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুলের পূর্ব অংশে আর ঘটক ফার্মাসি ছিল বাটার দোকানের অব্যবহিত পশ্চিমে। এর কোনটিই আজ আর নেই।

শহরে ছাপাখানা ছিল বেশ কয়েকটি। অন্নপূর্ণা, সাবিত্রী, তারা, হীরা, দেশবন্ধু ও জেলা বোর্ড প্রেস প্রভৃতি। রঘুবর ত্রিবেদীদের অন্নপূর্ণা প্রেস, অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায়ের সাবিত্রী ও তারা প্রেস, জেলা কংগ্রেসের দেশবন্ধু প্রেস, কালিপদ সরকারের হীরা প্রেস, জেলাবোর্ডের জেলা বোর্ড প্রেস। অন্নপূর্ণা ও সাবিত্রী প্রেস ছিল সদর থানার উল্টোদিকে, তারাপ্রেস হাসপাতাল মোড়ে, হীরাপ্রেস ছিল মধ্যবাজারে তিনকড়ি দে লেনে, নামোপাড়ায় ছিলে দেশবন্ধু প্রেস। যেটি পরবর্তীকালে 'মুক্তি প্রেস' নামে পরিচিত হয়, জেলা বোর্ড প্রেস ছিল জেলা বোর্ডেরই অঙ্গনে। বর্তমানে জেলা বোর্ড প্রেস ও মুক্তি প্রেস ছাড়া অন্যগুলি উঠে গেছে।

যানবাহন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সেকালে হাতে টানা রিক্‌শা ও দুই ঘোড়ার পাল্‌কি-গাড়ি ছিল। বিত্তবানদের কারো কারো এক ঘোড়ায় টানা বিলাসবহুল টম্‌টম্‌, ল্যান্ডো ও পালকি গাড়ি ছিল। হাতে টানা রিক্‌শাগুলি শহরের মধ্যেই চলাচল করত আর ঘোড়ার গাড়িগুলি শহরে ও শহর ছাড়িয়ে কাছাকাছি গ্রামেও যাতায়াত করত। তন্তুজের সামনের জায়গাটায় তাদের আড্ডা ছিল। পাঁচ-ছয়খানা গাড়ি সবসময়েই ওই আড্ডায় দেখা যেত। কিছু পরেই তিনখানা মোটর-ট্যাক্সি এসেছিল। দুই ভাই অনিল মৈত্র ও কিরণ মৈত্র এবং আর একজন—পূর্ণচন্দ্র ভকৎ এই

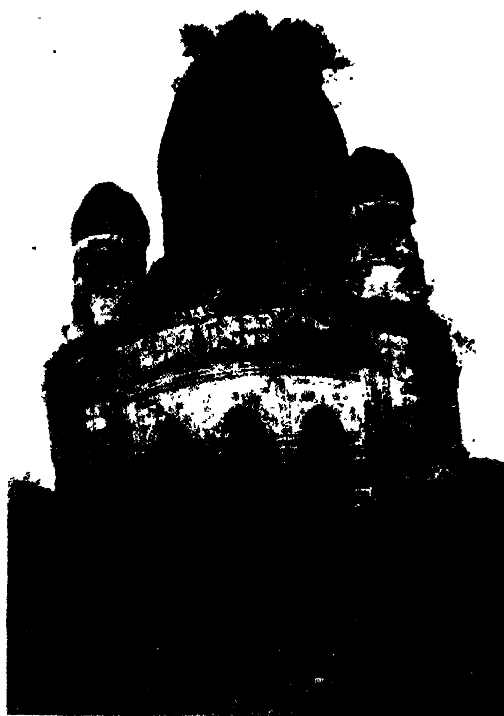
তিনজনে তিনটি ট্যাকসি চালাতেন—সরকারি লাইসেন্স বলে। কিন্তু বঙ্গভুক্তির পরপরই সেগুলি ধীরে ধীরে একে একে পশ্চাদপসরণ করে। উক্ত ব্যবসাতে প্রাইভেট গাড়ির প্রবল স্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কয়েকটা ছোট ছোট বাস ছিল। শহর থেকে রাঁচি, ধানবাদ, পাড়া-দুবড়া-রঘুনাথপুর, হুড়া-পুঞ্চা-বাগদা-বাঁকুড়া, বলরামপুর-বরাবাজার-মানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে (রুটে)[৬] যাতায়াত করত। রামকৃষ্ণ বাস সার্ভিস, শক্তি বাস সার্ভিস, হেলাল ইত্যাদি বাস কোম্পানি ছিল পুরুলিয়ায়। রাঁচির রতনলাল সুরজমলের একটা মস্ত বড় ঘি রংয়ের বাস রাঁচি-পুরুলিয়া যাতায়াত করত। সেইসব গাড়িগুলি আজ আর নেই। বিহার-উড়িষ্যা যখন বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন শহরের মোটরগাড়িগুলির নম্বর হল- B.O.MN–তারপরে সংখ্যা অর্থাৎ কিনা 'বিহার উড়িষ্যা-মানভূম'। তারপর আবার বিহার থেকে উড়িষ্যা পৃথক হয়ে গেল তখন গাড়ির (মোটর) নাম্বার প্লেটে লেখা হল B.R.P–এবং নম্বর। এখন পশ্চিম বাংলায় সে সব বদল হয়ে গেছে। প্রাইভেট কার বলতে তখন তিন-চারটি মাত্রই ছিল। বিত্তবান কয়েকটি ব্যক্তি ও কাশীপুরের মহারাজার মোটরকার ছিল। এইসব গাড়িগুলির জন্য ছিল মাত্র তিনটি পেট্রল পাম্প। একটি ছিল 'বার্মা অয়েল কোম্পানি'র, তার অবস্থান ছিল বর্তমানের তন্তুজের জায়গায়। 'শেল্'-এর স্থান ছিল বর্তমানের জৈন অটোমোবাইলস্। সে কালে এটি রাঁচির রতনলাল সুরজমলের এক্তিয়ারে। তৃতীয়টি ছিল 'সকনি', তার অবস্থান ছিল 'তারা' প্রেসের পুব পাশের জমিতে। শেষোক্ত দুটি পাম্প আজও আছে তবে ভিন্ন নামে ও মালিকানায়। টুনু সেন ও বাদু সিং পরিচালিত একটি মোটর সার্ভিসিং গ্যারেজ ছিল। দুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্থানে এই সার্ভিসিং গ্যারেজটি বেশ দীর্ঘদিন কাজ করেছিল। প্রাইভেট গাড়ি ছাড়াও সরকারি দু-একটি গাড়ি, পুরসভার গাড়ি, জেলা বোর্ডের গাড়িও সেখানে সারাই হত। নাম ছিল সিন্‌হা মোটর সার্ভিসিং জাতীয় কিছু।

জেলা শহরে জেলখানা স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিদের দ্বারা জেলখানার বাগানে সব্‌জি চাষ করা হত ব্যাপক আকারে। এখানকার ফসল বাজারে বিক্রি হত না, জেলখানার প্রয়োজনেই তা ব্যয়িত হত। আজকাল আর জেলখানার বাগানে চাষ হতে দেখি না। জেলখানায় এই বাগান বড় হাটের অব্যবহিত পশ্চিমে, মাঝে একটি বাইপাস রাস্তা রয়েছে যেটি কোর্ট কম্পাউন্ড ও চাঁইবাসা রোডকে যুক্ত করেছে। সেই রাস্তার গায়েই জেলবাগানের প্রাচীর। সেই প্রাচীরের ধারে ধারে জেলবাগানের সীমানার মধ্যে সারি সারি ৬/৮ টা বড় বড় সিসু গাছ (সিংশপা) ছিল। প্রাচীন প্রবাদ বলত, ওই গাছগুলিতে ব্রহ্মদৈত্যের বাস আছে। তাই, সন্ধ্যার পর ওই পথে কেউ আনাগোনা করত না। পঞ্চবহিন, নাকি পঞ্চব্রাহ্মণকন্যা, কুলিন ও অবিবাহিতা, পিতার জাতিকুল রক্ষার্থে ওই পঞ্চকন্যা একত্রে যুক্তি করে ওই স্থানে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তাই, লোকে বলত পঞ্চ বাহিনীর রাস্তা। সে, যাই হোক মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বহু রাজনৈতিক বন্দি পুরুলিয়ার এই জেলখানায় বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। একবার তো রাঁচি থেকে আমদানি করা গুরখা সৈন্য দিয়ে রাজনৈতিক বন্দিদের কাছ হতে কথা আদায় করতে বেশ কড়া শাসন করা হয়েছিল—, চাবুকের দ্বারা প্রহার করে। শুনেছিলাম, এই কাণ্ড নাকি দফায় দফায় সারাদিন ধরে চলেছিল। সেই ভাগ্যহতদের দলে এই প্রতিবেদকের এক অগ্রজ মাসতুতো ভাইও ছিলেন। এঁর নাম ছিল অমরনাথ চৌধুরী (গদাইদা)। ইনি Bengal Provincial Conspirary Case-এ ধরা পড়েছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুকুমার মিত্রসহ। ইনিও পুরুলিয়ার ছেলে। কসাইডাঙায় ওঁদের বাড়ি ছিল।

পুরুলিয়া সদর দপ্তর ঘোষিত হওয়ার পর-পরই কালেক্টরি ভবন নির্মিত হয়ে যায়। আনুমানিক

এর ৩৩ বছর পর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ফৌজদারি আদালতের সূচনা হয়। দেওয়ানি আদালতের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা হতে আরও অনেক বছর কেটে যায়। বিংশ শতকের পূর্বে তা সম্ভব করা যায়নি। তবে, এই দেওয়ানি আদালতের বিচারবিভাগীয় অধিক্ষেত্র একদা ছিল সমগ্র মানভূম ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী সিংভূম জেলা ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্বলপুর জেলা পর্যন্ত। আজ সেই বিশাল সীমানার ক্ষেত্রাধিকার হারিয়ে কেবলমাত্র পুরুলিয়ার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। পুরুলিয়ার এই দেওয়ানি আদালতটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান কালের দৃষ্টিনন্দন সুবৃহৎ রক্তিম বর্ণের ভবনটি নির্মিত হয় আরো অনেক পরে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। বার অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে। বার অ্যাসোসিয়েশনের পুরাতন বাড়ির সামনেই কালেক্টরি সংলগ্ন 'খাজনাখানা' (Treasury)। তার সামনেই ছিল একটি বিশাল তেঁতুলগাছ, কাণ্ডটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ছিল। গাছটি এত বড় আর ঘন ছিল যে, ট্রেজারির সামনের সমগ্র অংশটি সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকত। ট্রেজারির বারান্দায় অহরহ সশস্ত্র প্রহরা বসানো ছিল। সেখানে ছিল এক বিশাল কাঁসার ঘণ্টা, যেটি প্রতি ঘণ্টায় বাজিয়ে প্রহরীরা সময় ঘোষণা করতেন। সেকালে এই ঘণ্টার প্রহর ঘোষণা শহরটির প্রায় সকল স্থান থেকেই শোনা যেত। ওই পথটি দিয়ে কেউ পার হতে গেলেই (যদিও, তখন সচরাচর কেউ ও পথে যেত না, কিন্তু আমরা যেতাম। আমাদের মামাবাড়ি যাবার ওটাই সহজ পথ ছিল বলে) প্রহরী তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেঁকে উঠত—'হাল্ট-হুকুমদার্'! অর্থাৎ Hault! Who comes there! পথিক দাঁড়িয়ে পড়ে সাড়া দিলেই প্রহরী গর্জন করে উঠত—'ফান্দার্ফো'! যার অর্থ friend or foe। পথিকের সতর্ক উত্তর শুনে প্রহরী স্থানটি পার হবার অনুমতি দিত। তবে, অবশ্যই সন্ধ্যার পর ওই পথে কাউকেই কোনো কারণে যেতে দেওয়া হত না। তখন সরকারি দপ্তরগুলিকে ঘিরে কোনো সীমানা-প্রাচীরও ছিল না। ফলে, সরকারি দপ্তর সংলগ্ন মাঠে আমরা ছেলেরা দল বেঁধে ফুটবল, হকি খেলতাম। পাশেই এখন যেখানে দমকল, সমবায়িকা, সেখানে একদা ফাঁকা মাঠ ছিল চারিদিকে বড় বড গাছে ঘেরা। সেই মাঠ ছিল সরকারি আধিকারিকগণের খেলার মাঠ। নাম ছিল 'অফিসার্স গ্রাউন্ড'। এখন তারও আর অস্তিত্ব নেই।

বাস স্ট্যান্ডের সমগ্র এলাকাটি একদা বেশ বড়সড় একটি ফাঁকা মাঠ ছিল। একটি চওড়া রাস্তা মাঠের মাঝখান দিয়ে গিয়ে কাছারি এলাকার সঙ্গে রাঁচি রোডের সঙ্গে মিশেছে। পথটি তৈরিই হয়েছিল সরকারি বড়কর্তাদের দফ্তরে যাতায়াতের জন্য। কেননা সকল জেলাধিকারিকের আবাস ছিল রাঁচি রোডের উভয় পার্শ্বে। ওই রাস্তাটির দক্ষিণে ইংলিশ চার্চের সংলগ্ন মাঠে তখন আরও অনেক ছেলেরা খেলত। লোক বলত 'চার্চ গ্রাউন্ড'। পথের উত্তর পাশে ছিল সরকারি তাম্বু ডিপো (Tent Godown) ও তার মাঠ। তাম্বু ডিপোর ঘরটি এই সেদিন ভেঙে ফেলা হল। ওখানে নাকি এখন সরকারি পরিবহনের ঘাঁটি তৈরি হবে। বর্তমানে যেখানে সরকারি পরিবহনের দপ্তর ও গ্যারাজ রয়েছে সেই বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং বনবিভাগের অধিকৃত সমগ্র ক্ষেত্রটিসহ জমিতে, আমাদের শৈশবে, ইউরোপীয় স্থাপত্যে গড়া একটি সুবৃহৎ একতলা, ফল ও ফুলের বাগানঘেরা, সীমাপ্রাচীরসহ বাংলোবাড়ি ছিল বিদেশি মিশনারিদের; খুব সম্ভবত জার্মান ইভাঞ্জেলিস্টিক্ লুথারেন চার্চের বাড়ি ছিল সেটা। সেখানে থাকতেন একটি ইঙ্গ ভারতীয় পাদ্রী পরিবার। আমরা যখন শৈশবে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেভেন্থ এ/বি-শ্রেণিতে পড়তাম, টিফিনের সময় লুকিয়ে প্রাচীর পার হয়ে সময়ের ফল আহরণ (চুরি?) করতে যেতাম। প্রায় সবরকম ফলেরই গাছ ছিল সেখানে। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল (বিভিন্ন জাতের), আতা প্রভৃতি তার মধ্যে অধিক পরিমাণেই ছিল। সেইসব ফল সংগ্রহকালে সেই বাংলোর ভিতরের লোকজনদের দেখেছি— তাদের তাড়াও



পঞ্চকোট পঞ্চরত্ন মন্দির



কাশীপুরের রাজবাড়ী



তেলকূপীর প্রাচীন মন্দির



ছোট বলরামপুরের মন্দির



জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি-পাক্‌বিড়রা



ক্রোশজুড়ির মন্দির



নাটোয়া নাচ



বুলবুলি নাচ





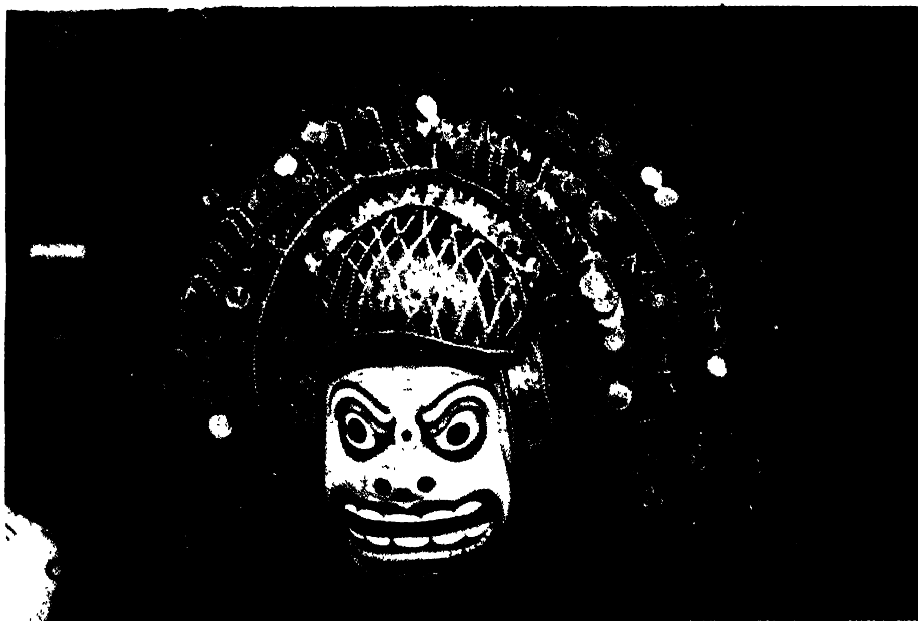
অম্বিকা মূর্তি-গজপুর



নাচনি নাচ



ছৌ নাচ



ছৌ-নাচের মুখোশ



প্রখ্যাত নাচনি সিন্ধুবালা দেবীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

খেয়েছি। ধরা পড়ে গেলে অবশ্যই তাঁরা কোনোরূপ উৎপীড়ন করেননি কখনও। ছদ্ম শাসনের পর ছেড়েই দিতেন। বাড়িটির মধ্যে নানা বয়সের মহিলার সংখ্যাই সমধিক ছিল। একজন গৌরবর্ণ প্রৌঢ় পুরুষকে মাঝে মাঝে দেখেছি। তাঁর সান্নিধ্যে কখনও আসিনি। পাশেই আমেরিকান চার্চের ছোট প্রাচীর ঘেরা ফল-ফুলের বাগান-বাটিকা, পাকা একতলা। সেখানে একজন বৃদ্ধা মেমসাহেব থাকতেন স্থায়ীভাবে। এখন যেটি Assembly of God Church School পূর্বকালে সেটি সাহেব মিশনারি পূর্ণ ছিল। সেখানেও আমরা টিফিনের সময় লুকিয়ে ঢুকতাম। একটা বিশাল তেঁতুলগাছ ছিল—তারই লোভে। পাদ্রী সাহেবদের কাছে ধরা পড়ে গেলে তাঁরা একটা ঘরে (যিশুর ছবি টাঙানো) নিয়ে গিয়ে আমাদের বসিয়ে ধর্মোপদেশ দিতেন। বিকৃত বাংলায় বলতেন, "টোম্‌রা বড়ো হইয়ে ক্রুষ্ণের পূজা করিবে না। ক্রুষ্ণা আতিশায় দুষ্টা লোক আছে, লম্পট্ভি আছে। লেডিজদের কাপড় খুলিয়া লইতো। ক্রুষ্ণা সভ্য মানুষ ছিলো না।" যিশুর ছবি দেখিয়ে বলতেন—"এই দেখো আমাদের মহান যিশাস খ্রাইস্ট—, সব মানুষকে যিনি ভালোবাসেন, টোমাডের মটো শিশুদের সাথে খেলা করেন—, ইনিই আসল্ গড আছেন। ইঁহার নিকট ভালো হইবার জন্য প্রেয়ার কারিবে, টোমাডের ভালো হইবে" ইত্যাদি। আমরা প্রায়ই সেইসব ধর্মকথা শুনে ক্লাসে ফিরে আসতাম। রাঁচি রোডে আছে লুথারন চার্চ। এটি অতি প্রাচীনকালের। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের কোনো এক সময় এই চার্চটি তৈরি হয়েছিল বলেই মনে হয়। উক্ত চার্চের প্রাচীন নথিতে দেখা যায় যে বিগত ২৫.০২.১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই চার্চে মহাকবি শ্রী মধুসূদন দত্ত মহাশয় ছড়রার কোনো এক কাঙালীচরণ সিংহের পুত্র কৃষ্ণদাসের ধর্মপিতা রূপে রেকর্ডভুক্ত হয়েছিলেন। কোর্ট কম্পাউন্ডের পাশেই রয়েছে ইংলিশ চার্চ— তৈরি হয়েছিল ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। সহারর সবচেয়ে পুরাতন ধর্মস্থান বলে চিহ্নিত ডাঙারডাঙার বড় মসজিদ। এটি তৈরি হয়েছিল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। সে তুলনায়·শহরের দেবালয়গুলি নিসন্দেহে অর্বাচীন। প্রাচীনত্বের মর্যাদাসম্পন্ন হলে কোথাও না কোথাও নথিপত্রে তার উল্লেখ থাকত। তা যখন নেই তখন অনুমান করে নিতে বাধা নেই যে শহরের বুকের ওপর দেবালয়গুলি নিতান্তই আধুনিককালের।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে চাঁইবাসা রোডের ওপব পরেশনাথ ঘোষ স্ট্রিটের তেমাথায় ছিল মানভূমের প্রথম জেনারেল হাসপাতাল। উক্ত চাঁইবাসা রোডের পশ্চিমে ছিল হাসপাতালভবন ও উক্ত পথের পূর্বে অর্থাৎ অপর পারে ছিল সারি সারি ডাক্তারদের কোয়ার্টার। হাসপাতালটির নাম ছিল—'লেডি ডাফ্‌রিন হাসপাতাল'। সেকালে হাসপাতালের প্রধানকে বলা হত—'সিভিল সার্জেন', তাঁর অধীনে অ্যাসিসটেন্ট সার্জেন এবং তাঁর নীচে সাব অ্যাসিসটেন্ট সার্জন। এই সাব্ অ্যাসিসটেন্ট সার্জন সাধারণত আউটডোরের দায়িত্বে থাকতেন। অ্যাসিস্‌টেন্ট সার্জেন ইনডোরের দায়িত্বে থাকতেন। হাসপাতালের প্রশাসন ও বড় বড় কেস্‌গুলিতে সিভিল সার্জনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থাকত। মোট ৫০টি বেড নিয়ে ছিল এই লেডি ডাফরিন হাসপাতাল। পুরুলিয়ার কবিমানস স্বতস্ফূর্ত হয়ে গান বাঁধল— 'পুরুল্যার বাজারে ন-কি/দবাই খানা খুলেছ্যে/ মাথায় টেনা বিটিছেল্যা / ব্যামার দেখত্যে লাগ্যছে।' ইত্যাদি। সারা মানভূম জেলা থেকেই রোগী আসতে লাগল, ক্রমশ স্থানসঙ্কুলান অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। ৬০ বছরের মাথায় কাশীপুরের মহারাজা জ্যোতিপ্রসাদ ও স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী শচীন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয়ের বদান্যতায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অপেক্ষাকৃত এক বৃহত্তর জমির ওপর পুরুলিয়ার বুকে গড়ে উঠল ২০০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ সদর হাসপাতাল। নাম হল যথাক্রমে 'জ্যোতিপ্রসাদ ইনডোর হসপিটাল' এবং 'নন্দলাল চ্যারিটেবল্ (আউটডোর) ডিসপেনসারি।' ডাক্তারদের জন্যও অনেক কোয়ার্টার তৈরি হল। লেডি ডাফ্‌রিন হাসপাতালের বাড়িটিতে সম্প্রতি

পি ডবলিউ ডি-র দপ্তর হয়েছে। এছাড়া নিউ ফেমিন রোডে মর্গসহ একটি ১০০ শয্যার প্লেগ হাসপাতাল ছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ায় ব্যাপক ভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, সে কারণেই শহরের বাইরে (তখনকার কালে) এই হাসপাতাল। হাসপাতাল বাড়িটি পাকা হলেও ছাদ ছিল খোলা বসানো। বেশ অনেকগুলি কক্ষ ছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলা অত্যন্ত করুণভাবে ভুগেছিল বেরিবেরি রোগে। মানভূমের আত্মার আর্তনাদে দিকদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হল— 'জীবন খেলো বেরিবেরিতে/এই বিষম কলিতে।' ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ছোট বলরামপুরের সন্নিকটে কাঁসাই নদীর তীরে 'নব কুষ্ঠ নিবাস' নামে ২০০ শয্যার এক বেসরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে রোগের যথাযথ চিকিৎসা এবং সমাজে, পরিবারে পরিত্যক্ত রোগমুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া হত। আজ তার অবস্থা অতীব করুণ। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে গোবরা গড়িয়ায় (এ কালের রাসময়দান) গড়ে উঠেছিল 'লেডি রাদারফোর্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড মেটারনিটি সেন্টার', ১০.১০.১৯৪৫ তারিখে বিহারের গভর্নর হিজ এক্সিলেন্সি স্যর টমাস জর্জ রাদারফোর্ড এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ছয় শয্যাবিশিষ্ট এই মাতৃসদনটি বেশ কিছুদিন ভালোভাবেই চলেছিল—কিন্তু কেন যে বন্ধ হয়েছিল তা সাধারণ্যে জানা যায়নি। আজ সেই বাড়ি বেদখলে। মাতৃসদনের সংলগ্ন দুই স্যুইটের একটি কোয়ার্টারও ছিল— তারও অবস্থা ওই একই। সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর মালিক বলে শুনেছি। কিন্তু তাঁরাও এটি দখলকারীদের কবল থেকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন না। তারও যুক্তিসিদ্ধ কারণ আমরা সাধারণ মানুষ অবগত নই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুরুলিয়া শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে 'লেপ্রসি মিশন' নামে একটি কুষ্ঠ হাসপাতাল বহুকাল পূর্বেই গড়ে উঠেছিল জার্মান মিশনারি (German Evangelistic Lutheran Church)-দের উদ্যোগে। উদ্যোগী পুরুষটি ছিলেন রেভারেন্ড হাইন্‌রিখ্ উফ্‌মান নামে এক বিদগ্ধ জিওলজিস্ট। এ অঞ্চলে তিনি তাঁর মাতৃহারা শিশুকন্যাকে নিয়ে স্বীয় পেশা অথবা নেশায় গাছ-গাছড়ার সন্ধানে ফিরতেন। এ অঞ্চলে থাকাকালীন ঝালদায় তাঁর শিশুকন্যাটি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথম দিকে ধরা পড়েনি। রোগ নির্ণয় হলে তার চিকিৎসা আরম্ভ হয় এবং তিনি জার্মানি ফিরে যান কন্যাসহ। বহু চিকিৎসার পরও সেই কন্যাটিকে বাঁচানো যায়নি। হাইন্‌রিখ্ উফ্‌মান সাহেব একদিন জার্মানি থেকে ফিরে এসে জি ই এল চার্চ ও মিশন টু লেপার্স ইন ইন্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ইস্ট-এর সহযোগিতায় গড়ে তোলেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ার লেপ্রসি মিশনের হাসপাতাল। সেই অবধি ওই হাসপাতালটি একান্ত সার্থকতার মধ্য দিয়ে চলেছে। বর্তমানে এর শয্যাসংখ্যা শোনা গেছে পাঁচ শতাধিক। হাসপাতালটি বরাবরই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তখন (১৯২৫ খ্রিঃ)-এ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত আদিবাসী খ্রিস্টান ডাঃ সান্ত্রা, এল এম পি এবং এঁর পরবর্তীকালে এসেছিলেন ডাঃ আশুতোষ রায়, এল এম পি। এ হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারিও হত নিয়মিত। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ প্রভাতকুমার মল্লিক উক্ত হাসপাতালের অবৈতনিক সার্জন ছিলেন বলে শোনা যায়। তিনি জেলাবোর্ডের কুষ্ঠরোগের (D.L.O) ডাক্তার রূপে পুরুলিয়ায় এসেছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়ায় পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় দেশবন্ধু রোডে।

বেসরকারি চিকিৎসক হিসাবে নাম করা যায় বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মণীন্দ্রলাল ভট্টাচার্যর। চক্‌বাজারে তাঁর নিজস্ব ক্লিনিক ছিল, 'রাজনারায়ণ মেডিকেল হল'। এখন যেটা ডি কে হার্ডওয়্যারের দোকান। মণীন্দ্রবাবুরা পাঁচ ভাই-এর মধ্যে চারজনই চিকিৎসক ছিলেন। এঁদের পিতৃদেবও ওই লাইনেরই লোক ছিলেন। এই চারভাই সেকালের পুরুলিয়ার জনজীবনে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভরসাস্থল ছিলেন। আর ছিলেন ডাঃ প্রমথ দে, এল এম এস। মন্মথ

সরকার, বসন্ত সরকার, উভয়েই এম. বি.। দন্ত চিকিৎসকরূপে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন একমাত্র এক বৃদ্ধ চিনা ডাক্তার। ডাঃ লিউ চ্যাং থাই। এঁরা তিনপুরুষ ধরে পুরুলিয়ার মানুষের সেবা করেছেন। বর্তমানে তাঁরা সপরিবারে পুরুলিয়া ত্যাগ করেছেন। এঁদের ক্লিনিক ছিল পুরুলিয়ার মধ্যবাজারে, দুর্গামেলার সন্নিকটে।

পুরুলিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট সম্পদ হল 'সাহেব বাঁধ'। এই জলাধারটি পুরুলিয়া শহরের পশ্চিমাংশের এক বৃহত্তর এলাকার মানুষের পানীয় জলের সারা বছরের চাহিদা পূরণ করে। বর্ষা তথা পরবর্তী দু-একমাস যাবৎ এই সুবৃহৎ জলাধারের ৫০ একরের মতো স্থান জলপূর্ণ থাকে, অন্য সময়ে তা কমে কমে এসে ৩০/৩৫ একরের মতো স্থানে জলসঞ্চয় থাকে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে এক বিস্তৃত ঢালু জমির পূর্বভাগে বাঁধ বেঁধে এই বিস্তীর্ণ জলাশয়টি নির্মিত হয়েছিল তৎকালীন বিদেশি প্রশাসনের চেষ্টায়। সাহেব বাঁধের বর্তমান কালের 'ইস্ট লেক রোড' সেই বাঁধ। মূলত জেলখানার কয়েদিদের দ্বারা এই বাঁধ দেওয়া হয়েছিল এবং তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী ওই বাঁধ দেওয়ার কাজে পূর্ণ একদিনের শ্রমদান না করলে ডেপুটি কমিশনর সাহেব কোনো ঠিকাদারি দরখাস্ত মঞ্জুর করতেন না। বাঁধের তিনটি দিকই তখন তরুবীথিশোভিত ছিল। জলাশয়ের কেন্দ্রে দুটি জঙ্গলময় দ্বীপের সৃষ্টি করা হয়েছিল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। দ্বীপদুটির মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বড়। ছোটটি তটরেখার কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হওয়ায় সেটি সুভাষ পার্কের অঙ্গীভূত হয়েছে। বড়টি জলাশয়ের কেন্দ্রমুখী হওয়ায়, প্রাচীন কাল থেকেই সেখানে শীতের শুরু থেকেই বহু রকমের বিদেশি পরিযায়ী পক্ষীকুলের সমারোহ দেখা যেত প্রতিবছর। ফলে, এই সাহেব বাঁধ শহরের একটি অলংকারের মতো এক সুরম্য স্থানে পরিণত হল। জলাশয়ের চারিদিকে সুন্দরভাবে চারিটি ভ্রমণপথও সেইসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল। উত্তরের পথটির নাম 'জে ল্যাং রোড',' দক্ষিণের পথটির 'রবীন্দ্র সরণি' রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল, হয়েছে কিনা জানি না। পূর্ব ও পশ্চিমের পথদুটি যথাক্রমে 'ইস্ট লেক রোড' ও 'ওয়েস্ট লেক রোড' নামে কথিত। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উক্ত জে ল্যাং সাহেব মানভূমের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। সাহেবরা এই বাঁধ তৈরি করে দিয়েছিলেন তাই এ বাঁধের নাম সাহেব বাঁধ।

মানভূম পুরুলিয়ার প্রাচীন যুগে শহরের বুকে বেশ কয়েকটি ব্যাংক ছিল। তার মধ্যে ছোটনাগপুর ব্যাংক, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, বিষ্ণুপুর ব্যাংক, সোনার বাংলা ব্যাংক, সিটি কমার্শিয়াল ব্যাংক, হাজরাদি ব্যাংক প্রভৃতি। ছোটনাগপুর ব্যাংকের অবস্থান ছিল— বর্তমান ইউ বি আইয়ের পিছনের দিকে, রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। ওই অঞ্চলের নক্শা (ম্যাপ) তখন অন্যরকম ছিল। ওই ইউ বি আইয়ের স্থানে সিটি কমার্শিয়াল ব্যাংকের একতলা ভাড়া ঘর, অশোক স্টুডিওর প্রাক্তন একতলা বাড়িতে ছিল সোনার বাংলা ব্যাংক, বিষ্ণুপুর ব্যাংক ছিল বরাকর রোড ও এস এন সরকার স্ট্রিটের মোড়ে। কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও মহালক্ষ্মী ব্যাংক ছিল পোস্ট অফিসের সন্নিকটে বরাকর রোডের ওপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছোট-বড় প্রতিটি ব্যাংক নিজেরা ডুবে শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কত মানুষকে যে পথে বসিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সে এক অতি বেদনাময় কাহিনি। সেদিনের সেই মর্মান্তিক, সুগভীর ক্ষত আজও বহু মানুষের অন্তরকে মথিত করে।

মানভূম-পুরুলিয়ার আপামর সাধারণ বরাবরই রাজনীতিসচেতন। লড়াইয়ের মনোভাবও ইতিহাসস্বীকৃত। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ মানভূম-পুরুলিয়ার মানুষের ধর্ম। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এ অঞ্চলের দেওয়ানি লাভের (খ্রিস্টীয় ১৭৬৫—১২ আগস্ট) পুরো দুই বৎসরও কাটেনি, ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সঙ্গে মানভূম, বরাহভূম, ধলভূম প্রভৃতি

অঞ্চলের জমিদারগণের মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামক প্রতিবাদ, প্রতিরোধের সূত্রপাত। পরবর্তী ৬৩ বৎসর যাবৎ বিদ্রোহের সে আগুন নেভেনি। বরাভূম রাজকুমার গঙ্গানারায়ণের মৃত্যুর (১৮৩২—নভেম্বর) সঙ্গে সঙ্গে এ বিদ্রোহের অবসান হয়। যন্ত্রণাকাতর মানভূমের গণদেবতার হাহাকার ধ্বনিত হয় করুণ গানের সুরে — "জীও জীও গঙ্গানারায়ণ সিংহাসুর / কলিতে কে উঠাল্য রণেরি অঙ্কুর।' এর এক বছর পরেই মানভূম জেলার জন্ম হয়েছিল। এই মানভূমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন স্বীয় অধিকার কায়েম করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হল, সেই সুযোগে কিছু উচ্চবর্ণের মানুষ কোম্পানির সহায়তায় আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি করে মহাজনী ব্যবসা শুরু করেছিল। যার ফলে ক্রমশই স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পতন সাধিত হল। চাষী ও কৃষিজীবীগণ ক্রমশ কৃষিজমির মালিক থেকে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হল। মহাজন, জমিদার হয়ে উঠল। ভূমিপুত্রগণ 'বেগারি', 'আটপৌরে' প্রভৃতি শ্রেণির চিরদাসে পরিণত হল। তাতেও শেষ হল না। মহাজনেরা ভূমিহীন দাসগণের স্ত্রী পুত্র কন্যা বধুর সেবাগ্রহণ করার অধিকার অর্জন করে ফেলেছেন ততদিনে। ভূমিপুত্রদের নিরুপায় ধৈর্যের অচলায়তন আবার একদিন চুরমার হয়ে গেল। লক্ষ্মীপুরের পরগনাইতের[৮] নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিবাদ গুরুতর আকার ধারণ করল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল মানভূম-পুরুলিয়াও। কিন্তু এবারও তার ফল বিশেষ সুবিধাজনক হল না। প্রতিবাদকে এবারও পেশিশক্তির দ্বারা দমিত করা হল, কিন্তু স্ফুলিঙ্গ, ভস্মের আবরণের অন্তরালে দিক পরিবর্তন করে আত্মপ্রকাশের পথ অন্বেষণ করতে থাকল সবার অলক্ষে। সে কালে পুরুলিয়া শহরে একটা ছোটখাটো গ্যারিসন ছিল। সেই শিবিরে থাকত রামগড় ব্যাটালিয়নের প্রেরিত ৬০ জন পদাতিক ও ২৪ জন অশ্বারোহী। এই সৈন্যরা ছিল এই জেলা ও সন্নিহিত জেলাগুলি থেকে আগত ভূমিপুত্র। একদিন সেই স্ফুলিঙ্গের উত্তাপ শিবিরে প্রবেশ করে দুর্গবাসীদের উত্তপ্ত করে তুলল। তারা সরকারি দলীয় নায়ককে বিদূরিত করে পঞ্চকোটের কোনো এক রাজপুরুষের নেতৃত্বে উক্ত গ্যারিসন থেকে বেরিয়ে পড়ে সরকারি দপ্তরখানা আক্রমণ করে বসল। তখন 'সিপাহি বিদ্রোহের' লেলিহান অগ্নিশিখা সারা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই মহাবিদ্রোহের অংশীদার হয়ে মানভূম-পুরুলিয়া এক ইতিহাস সৃষ্টি করল। তথাপি ঈপ্সিত স্বাধীনতা পাওয়া গেল না। তবে, ফলস্বরূপ কোম্পানির রাজত্ব চলে গেল বটে, কিন্তু ইংলন্ডের রানী নিজেকে সাম্রাজ্ঞী ঘোষণা করে ভারতবর্ষের শাসন নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি তাঁর ঘোষণাপত্রে দেশবাসীকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। দেখা দিল 'নীল বিদ্রোহ'। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রের এক বছরের মধ্যেই, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। হাজার হাজার কৃষক-অধিবাসীর রক্তে ভেসে গেল মানভূম-পুরুলিয়ার মাটি। কালক্রমে, এ বিদ্রোহও শান্ত হল। চাষি ও কৃষিজীবীরা ধীরে ধীরে নীলকর সাহেবগণের হাত থেকে বহুলাংশে মুক্ত হতে লাগল। পুরুলিয়া শহরের নীলকুঠিগুলি ক্রমে ক্রমে বন্ধ হতে থাকল। পাতকূমের 'ইন্ডিগো অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি' উঠে গেল। সীতুর সুবিশাল কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল ইংরেজ ব্যবসায়ী। বস্তুত এ অঞ্চলের নীলচাষ উঠে গেল একদিন। রাজনৈতিক আন্দোলনও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো মানভূম-পুরুলিয়ায়। এর দীর্ঘ ২৫ বছর পর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' জন্মের পর থেকে পুনরায় রাজনৈতিক সক্রিয়তা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে লাগল এ অঞ্চলে। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের 'বঙ্গ ভঙ্গের' আন্দোলনের সাথে সাথে মানভূম পুরুলিয়ায় আবার রাজনৈতিক সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া

গেল, বিদেশি বর্জন ও বহ্নুৎসবের মধ্য দিয়ে। এর পর থেকেই মানভূম-পুরুলিয়া ধীরে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে এসে পড়ে। বৃহত্তর বাংলার 'অনুশীলন', 'যুগান্তর' প্রভৃতি স্বদেশি বিপ্লববাদী দলগুলি যেমন এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল তেমনি অপরদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও অভ্যুত্থান ঘটল। দেশের স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে এই দলগুলি একত্রে মিলেমিশে কর্মসূচি গ্রহণ করল। পুরুলিয়ায় এঁদের মূলকেন্দ্র হল 'শিল্পাশ্রম'। সেকালের প্রায় সমস্ত বড় বড় নেতা পুরুলিয়া এসে ওই শিল্পাশ্রমেই আশ্রয় নিতেন। তাঁদের মধ্যে মোহনদাস গান্ধী (দেশবন্ধু রোডে অস্থায়ী শিল্পাশ্রমে), যতীন্দ্রমোহন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল, আচার্য কৃপালনী, মুকুন্দ দাস, চারুবিকাশ দত্ত, পান্নালাল দাসগুপ্ত প্রভৃতি অহিংসবাদীরা যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন চরমপন্থী স্বদেশিগণও। তাঁরা এখানে এসেছেন, থেকেছেন এমনকি বহু আত্মগোপনকারীদেরও শিল্পাশ্রমের বাইরে নানা স্থানে, যেমন, সিন্দার পট্টির একটি বাড়িতে, আমডিহার এক গুপ্ত আশ্রয়ে, নিলকুটিডাঙার ত্রিবেদীবাগানের পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়িতে অতি সঙ্গোপনে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। স্থানীয় খদ্দর ভাণ্ডারের অভ্যন্তরেও দু-একজনকে থাকতে দেখেছি—যাঁদের আমরা কোনোদিন পুরুলিয়ায় দেখিনি। তাঁদের ধরন-ধারণ, ভাষা ইত্যাদি সবই এদিককার লোকের থেকে বহুলাংশে পৃথক বলেই আমাদের মনে হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে কঠিন শাস্তির ভয়ে কোনোদিন তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আজও জানি না তাঁরা কারা। অনেক পরে তাঁদের কারো কারো নাম জানতে পেরেছিলাম। তখন সেই ব্যক্তিগণের চরম শাস্তি হয়ে গেছে রাজশক্তির হাতে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনমাত্র হলেন— চারুবিকাশ দত্ত, বিনয় বসু, দীনেশ মজুমদার ও নলিনী বাগচি। চারুবিকাশ দত্তের দ্বীপান্তর হয়েছিল আন্দামানে, বাকি তিনজনেরই এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে-পরেই, দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়, বিনয় বসু ধরা পড়ার পূর্বমুহূর্তেই নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন এবং নলিনী বাগচি গৌহাটি স্টেশনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে— বহু যুগ পূর্বে পুরুলিয়ার মাহাত পাড়ায় এক বর্ষীয়সী মাহাত রমণীর কণ্ঠে একটা গান শুনেছিলাম। বড় করুণ সে গান,—

মাই বাপের ক'ল ছাড়্যে নু নু/মাসির ঘরকে আলি— রে।
কতুয়ালে দিলেক তাড়া/কাঁচা জী'ট খুয়ারি— রে।।

উপরোক্ত ঘটনাগুলির মতোই বেদনাময় এই গান ও তার সুর। এই গান কি সেই তাঁদের স্মরণ করেই রচিত হয়েছিল? প্রশ্ন রেখেছিলাম কৌতূহলের বশে। উত্তর পেয়েছিলাম প্রৌঢ়া মাহাতানির চোখের অবিরল জলধারায়। এখন, আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি— এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্বকথিত খদ্দর ভাণ্ডারটি (খদ্দর কাপড়ের দোকান) তৎকালীন পুরুলিয়ার বিপ্লবী যুবকগণের একটি প্রধান মিলনকেন্দ্র ছিল। দোকানটি ছিল বর্তমান অশোক স্টুডিওর ঠিক উল্টোদিকে একটি দোকানগৃহে। সেখানে প্রতিদিন প্রায় সারাক্ষণ এক যৌবনোত্তীর্ণ কৃশকায় ভদ্রলোক খাটো ধুতির ওপর কালো গলাবন্ধ মলিন কোট পরিহিত, পায়ে বাংলা-জুতো, দোকানের বাইরে একটি টুলে বসে থাকতেন। দোকানের ভেতর আড্ডাধারী দাদা-মামারা প্রায়শই তার সঙ্গে নানা মস্করা করতেন। সে সবের ভাষা বুঝলেও ভাব বোঝার মতো বয়স তখনও আমাদের হয়নি। অনেককাল পরে জেনেছিলাম— তিনি পুলিশের ইন্‌ফরমার্‌রূপে রাজনৈতিক খবরাখবর সংগ্রহ করতে আসতেন। তাঁকে সবাই ডাকত গোপালদা বলে এবং একইসঙ্গে চা-পান-বিড়ি চলত। বিপ্লবী দাদাদের আরো দুটি আড্ডা ছিল— এখন যেটি ডাঃ ক্ষীরোদকুমার দে মহাশয়ের হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেন্‌সারি সেখানে সে সময় একটি সাইকেল মেরামতি ও বিক্রির দোকান

ছিল বেশ বড়সড় গোছের। মালিক ছিলেন নীলকুঠিডাঙার বীরেন্দ্র মুখার্জি এবং দ্বিতীয়টি বড় পোস্ট অফিসের (পুরাতন বাড়ি) সামনের বারান্দার নীচে রাজপথের ধারে— লোকমুখে যার নাম ছিল 'পোস্টাল ক্লাব'। এই দুটি আড্ডাই মূলত বিপ্লবী দাদা-মামাদের ইনফরমেশন ব্যুরো ছিল। শহরের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিও এই পোস্টাল ক্লাবে অথবা বীরেন বাবুর সাইকেলের দোকানে নিয়মিত আড্ডা দিয়ে যেতেন। পোস্টাল ক্লাবের সংলগ্ন হরিদার অস্থায়ী চায়ের দোকানও পুরুলিয়ার বিপ্লবী দাদাদের তথ্য সংগ্রহের গুপ্তক্ষেত্র ছিল। তখনও পর্যন্তও অপরাপর কোনো বামপন্থী দলের অস্তিত্বের কথা মানভূম-পুরুলিয়ায় অজ্ঞাত ছিল। উক্ত প্রকার ঘটনাবলির বহু পরে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ একে একে নানান্ দলের অভ্যুদয় ঘটেছে। তা-ও অতীব ক্ষীণ, দুর্বল আকারে—একান্ত গুরুত্বহীনভাবে।

শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মানভূম-পুরুলিয়া কোনোদিন পিছিয়ে ছিল না। দুটি ছেলেদের হাইস্কুল ও একটি মেয়েদের স্কুল এখানে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই চলছিল। তারমধ্যে একটি সরকারি ও অন্যদুটি জনসাধারণ পরিচালিত। সরকারি বিদ্যালয়টি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়া 'জেলাস্কুল' নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে 'মানভূম-ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন' ও সমকালীন সময় থেকেই 'পুরুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির প্রায় ৫০ বৎসর পরে একটি ছেলেদের মাইনর স্কুল ও পরে জে কে কলেজের জন্ম। বড় মেয়েদের ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ানোর উদ্দেশ্যে ভাগাবাঁধ পাড়ার জ্যাকেরিয়া ম্যানসনে একটি কোচিং ইন্সটিটিউশন খোলা হয়েছিল। সেখানে পড়াতেন শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র রায় ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র হরিপদ রায় মহাশয়গণ।

সংস্কৃতির দিক দিয়েও প্রাচীন পুরুলিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। শত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমলাপাড়ায় 'রায় লাইব্রেরি' নামে একটি গ্রন্থাগার চালু ছিল। প্রায় সমসাময়িক কালে, 'বান্ধব সান্ধ্য সম্মেলনী', 'পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইন্সটিটিউট,' ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'হরিপদ সাহিত্য মন্দির', আরও পরে 'পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত বিদ্যালয়', 'সারস্বত সঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি জেলার মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সুদীর্ঘকাল যাবৎ জড়িত থেকেছেন। পুরুলিয়া শহরের এই সাংস্কৃতিক পর্বটিরও এক বিশাল ইতিহাস আছে। গান-বাজনা, অভিনয় প্রভৃতির সনিষ্ঠ চর্চার প্রবল আগ্রহ একসময়ে শহরবাসীকে আপ্লুত করে রাখত উক্ত সব প্রতিষ্ঠানগুলি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির অনুশীলন ও প্রদর্শনের জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ তামাক ব্যবসায়ী প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয় স্বনামে 'প্রতাপ নাট্যমন্দির' নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 'নাট্যালয়' নির্মাণ করে দেন। তৎকালীন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার কোনো মফস্বল শহরে পুরুলিয়ার মতো এরূপ রঙ্গালয় তখন ছিল না কোথাও। এখনও আছে কিনা জানতে ইচ্ছা করে। পুরুলিয়া শহরে তখন বিদ্যুৎ না থাকায় নাট্যমন্দিরে নিজের পাওয়ার হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকালব্যাপী একাদিক্রমে বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মঞ্চে শিশির ভাদুড়ীর ন্যায় বিখ্যাত অভিনেতা সদলে এসে 'সীতা', 'সাজাহান' প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটক অভিনয় করে গেছেন। এসেছিলেন তৎকালীন চিত্রজগতের বিদগ্ধ নায়ক-নায়িকা দুর্গাদাস-উমাশশী। জাদুকর পি সি সরকার (বড়), এই মঞ্চে তাঁর জগৎপ্রসিদ্ধ জাদুর খেলা দেখিয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যবিদ উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্করসহ এই মঞ্চে তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টি 'লেবার অ্যাণ্ড মেশিনারি' প্রদর্শন করে গেছেন। উদয়শঙ্করের 'তাণ্ডবনৃত্যে'র অনুষ্ঠান শহরবাসীকে চরিতার্থ করে দিয়েছিল। মানবতাবাদের মহান প্রবক্তা

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তদীয় পত্নী এলেন রায়কে নিয়ে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এই মঞ্চে তাঁর নিজস্ব ভাবধারার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যান। দুর্ভাগ্যবশত সেই প্রতাপ নাট্যমন্দিরের জনপ্রিয় মঞ্চটি এখন আর নেই— সেখানে এখন নিউ সিনেমা। সিনেমা হলও একটি ছিল তখন। নাম ছিল 'শ্রীরাম চিত্রমন্দির', আজকের কমলা টকি হাউস। নির্বাক ছবির কাল থেকে এই সিনেমা হল চলছে। সে সময়কার মালিক ছিলেন বাঁকুড়ার সুপ্রসিদ্ধ বিড়ি ও দোক্তা ব্যবসায়ী নগেন্দ্রনাথ দত্ত। কমলা টকি হাউসের অনেক পরে প্রতাপ নাট্যমন্দির সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে 'ছায়াবাণী' পরে 'এ ওয়ান সিনেমা', শেষে এই 'নিউ সিনেমা'।

পুরুলিয়া শহরের অতি প্রাচীন কোনো উৎসব অথবা মেলার ধারাবাহিকতা নেই । তবে, জেলার বিভিন্ন স্থানে অবশ্যই আছে। সেগুলির সবকটিই কোনো না কোনো দেবতা অথবা দেবীর পূজাকে উপলক্ষ করেই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে পুরুলিয়ায় রথযাত্রার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পুরসভার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের কার্যবিবরণী (প্রসিডিংস্) থেকে জানা যায় যে, স্থানীয় একজন বাইজি ধর্মীয় অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে পুরুলিয়া শহরে তাঁর আরাধ্য দেবতার রথযাত্রানুষ্ঠানের মনস্থ করায়, রথ নির্মাণের জন্য পুরসভার একটি ফাঁকা জমি, চক্‌বাজার কালীমেলার উল্টোদিকে, যেটি এখন 'নেতাজি পার্ক', ভাড়া নেবার জন্য আবেদন করছেন এবং পুরসভা সে আবেদন অনুমোদন করছেন। অতঃপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বাইজি মনমোহিনী দাসীর (মণি বাইজি) আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউর রথযাত্রা শুরু হয়ে গেল। পুরুলিয়ার ভূমিপুত্রগণ আনন্দ-উল্লাসে গেয়ে উঠলেন—'পুরুল্যাকে দেখ্যে আল্যম/ মস্ত রথের রবরবা/ হাজার ল'কে টানছ্যে রশি/ মণি বাইয়ের দেবসেবা।' সেই রথ আজও চলে জাঁক জমকের সঙ্গে। পিতলের পাতে দশাবতারের মূর্তি খোদিত করে আনুমানিক ১৫ ফিট উচ্চতার এক সুবৃহৎ পঞ্চরথ মন্দিরের নকশার অনুকরণে নির্মিত হয় এই রথ। শহর বিদ্যুতায়িত হবার পর রথের চূড়াগুলিকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে দুই-আড়াই ফিটের মতো কমিয়ে দিতে হয়।

শহরের উপকণ্ঠে আরও একটি প্রতিষ্ঠান বার্ষিক অনুষ্ঠান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি মুখ্যত রাজস্থানিদের । এটিও কিঞ্চিৎ প্রাচীন। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'গোশালা'। গো সেবাকে মূল উদ্দেশ্য করেই এই প্রতিষ্ঠান। গোপাষ্টমীর শুভদিনে এখানে ২/৩ দিন ধরে মেলা বসে। 'গোশালার পরব ভারি/ করেছে নাথু মাড়ারি।'* পর্বের সময় গোপূজা, হোম, প্রদর্শনী প্রভৃতিতে মেলার মর্য্যাদা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

বর্তমানকালে যেমন পুরুলিয়ার প্রতি পাড়ায় পাড়ায় একাধিক ক্লাব রয়েছে এবং সেই ক্লাবে শিশু-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই সমান যাতায়াত— আগেকার পুরাতন পুরুলিয়ায় কিন্তু সেরকম ক্লাব কোথাও ছিল না। যা ছিল তা একান্তভাবেই বয়স্কদের জন্যই। তা-ও আবার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল না—সেগুলি ছিল একান্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত ও বিত্তবান মানুষের জন্য। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। একমাত্র 'মানভূম স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন' ছাড়া। অন্যান্য ক্লাবগুলির নাম, যথা— ইউনিয়ন ক্লাব, ইউরোপীয়ন ক্লাব, পোলো ক্লাব প্রভৃতিতে সাধারণ মানুষের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। ইউনিয়ন ক্লাব ছিল একান্তভাবেই বিত্তবান উকিল সম্প্রদায়ের ও দেশীয় উচ্চ রাজকর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত এক সংঘ। ১৯০৮/৯ খ্রিস্টাব্দে শহরের কতিপয় বিত্তবান এরূপ একটি ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ও তৎকালীন মুনসিফ গোপালবাবুর বাড়িতে এর গোড়পত্তন হয়। ক্রমশ সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সতন্ত্র গৃহের প্রয়োজনবোধে ৯,৫০০ টাকায় মিদনাপুর জমিদারি কোম্পানির ' হোয়াইট হাউস' নামক বাড়িটি

ক্রয় করা হয়। ক্লাবটি এখনও সেই বাড়িতেই আছে। অনেক মনীষীর পদার্পণ ঘটেছে এই ক্লাবে। এসেছেন দেশনেতা শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জাদুকর শ্রী পি সি সরকার (বড়) প্রভৃতি আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই ইউনিয়ন ক্লাব থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন', এবং পুরুলিয়া 'টাউন ক্লাব'। সেগুলি আজও তাদের কর্মসূচি পালন করে আসছে যথাসাধ্য। ইউরোপীয়ান ক্লাব ছিল সাহেব রাজকর্মচারিদের জন্য। সেটি ছিল বর্তমানকালের চিত্তরঞ্জন বিদ্যাপীঠ ও এম এম হাই স্কুলের জমিতে। সেখানে একদা এক সুবিশাল আমগাছের নীচে খোলায় ছাওয়া বড় বড় কামরার চারচালা পাকা বাড়ি ছিল। ভিতরে বিলিয়ার্ডরুম, ইনডোরগেম চেম্বার ও বাইরে জোড়া টেনিস হার্ড কোর্ট। মাঝে-মধ্যে দু-একজন মেমসাহেবও আসতেন ক্লাবের শোভা বৃদ্ধি করতে। প্রায়শই (বোধহয় প্রতি রবিবার) সেখানে খানাপিনার ঘটা লক্ষ করা যেত। রাত্রে বড় বড় হ্যাসাক্ ও কারবাইড গ্যাসের বাতি জ্বলত। ক্লাবঘরটির কোনো সীমানা প্রাচীর না থাকলেও সমগ্র প্লটটি তাঁদের দখলেই ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে (১৯৩৯-৪৫) ওই ক্লাবঘর অব্যবহার্য হয়ে পড়েই ছিল। আর ছিল এক 'পোলো ক্লাব'। বেলগুমার মাঠে পোলো খেলা হত। সেখানেও ছিল একটি টালির চালের ছোট ক্লাব ঘর। বছর দশেক আগেও সেই ঘরের অস্তিত্ব ছিল। পোলো খেলতে আসতেন বিশেষত সাহেব সরকারি উচ্চপদাধিকারীগণ। দেশীয়দের মধ্যে ছিলেন ডুমরার রাজা, নোয়াগড়ের রাজা প্রভৃতি। আমরা সেকালে তাঁদের পোলো খেলা দেখেছি বেলগুমার মাঠে। ডুমরার রাজার পোলো খেলায় খুব নাম ছিল তিনি ভালো শিকারিও ছিলেন। রানীগঞ্জ ও রামগড় থেকেও সাহেবসুবোরা এখানে পোলো খেলতে আসতেন। সেই পোলো ক্লাব আমাদের কৈশোরকালেই উঠে গেছে। তার স্মৃতিও এখন আর নেই।

জেলার পুলিশি ব্যবস্থা সেই ব্রিটিশ আমলে—আনুমানিক ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এখনকার মতো ছিল না। আইন-কানুনের কোনো অদলবদল না হলেও একালের থেকে বহু বিষয়েই তফাত ছিল। যেমন, তখনকার দিনে পুলিশের পোশাক এখনকার মতো ছিল না। তখন ছিল হাফ্-প্যান্ট, হাফশার্ট, সকলের জন্য। কনস্টেবল্দের পায়ে পট্টি ও এ্যামুনিশন এস্কেল বুট ও মাথায় লাল পাগড়ি, বুকে পিতলে তৈরি নম্বর। অফিসারদের পায়ে মোজা, বুট ও মাথায় পিথ হ্যাট। কনস্টেবলদের জন্য কোনো বাহন ছিল না। অফিসারদের জন্য ছিল ঘোড়া। প্রতিটি পুলিশ ফাঁড়িতে ও কোয়ার্টারের সংলগ্ন অশ্বশালা ছিল। উচ্চপদস্থ সাহেব পুলিশ অফিসার ও প্রশাসনিক আধিকারিকগণ ঘোড়াতেই চলাফেরা করতেন। এখনকার চেয়ে তখন পুলিশের সংখ্যা অনেক কম থাকলেও রাতপাহারা ও চৌকিদারের ব্যবস্থা ছিল নিশ্ছিদ্র। জেলখানার সন্নিহিত মাঠে নিয়মিত কুচকাওয়াজ হত। পুরাতন পুলিশ লাইনের লাগোয়া রেসিডেন্ট সার্জেন্ট-এর কোয়ার্টার ছিল, সেখানেই থাকতেন রেসিডেন্ট সার্জেন্ট, লাইনের সর্বতোময় কর্তারূপে। প্যারেড গ্রাউন্ডের একপাশে ছিল হকি খেলার মাঠ। সেখানে নিয়মিত হকি খেলা হত। আজকাল এসব বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে, পুলিশের শারিরীক যোগ্যতায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পুরাতন পুলিশ লাইনে তখন প্রতিদিন নিয়মিত 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামক ব্রিটিশ পতাকা তোলা ও নামানো হত। বেশ বড়রকমের একটি অস্ত্রাগার ছিল এখানে। যাকে 'ম্যাগাজিন' বলা হত। সেখানে থাকত নিরন্তর প্রহরা। যাম ঘোষণার জন্য সেখানেও একটা বড় কাঁসার ঘণ্টা ছিল— সেটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজত। এই পুলিশ লাইন ছিল মূলত পুলিশ ছাউনি (ব্যারাক্)। এছাড়া শহরে তিন স্থানে তিনটি ফাঁড়ি (আউটপোস্ট) ছিল, তা এখনও আছে।

পুরুলিয়ায় প্রথম রেলগাড়ি চলল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। বেঙ্গল-নাগপুর বড় লাইনের রেলপথে সিনি থেকে আসানসোল পর্যন্ত রেলপথ হল। পথিমধ্যে পড়ল আদরা, পুরুলিয়া। লাইনে বড় গাড়ি চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্রডগেজ লাইন পাতা হল। জলকল বসল। কিছুকাল পরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পাতা হল ছোট লাইন। পুরুলিয়া থেকে রাঁচি, লোহারদাগা পর্যন্ত। ফলে, পুরুলিয়া রেলস্টেশন একটি জংশনে পরিণত হল। স্থাপিত হল লোকোশেড্, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, বসল, ইঞ্জিন ঘোরাবার রেঞ্জ, মাল তোলা-নামানোর জন্য ক্রেন ও উঁচু প্ল্যাটফরম্ তৈরি হল। তিনটি প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম্‌ও তৈরি হল। প্ল্যাটফর্ম্ ও সমস্ত স্টেশন চত্বরে বিশাল বিশাল ডে-লাইট বসানো হল, যেগুলি নিয়মিত সন্ধ্যার মুখেই জ্বেলে দেওয়া হত। অফিসের ভিতরে জ্বলত কেরোসিনের বড় বড় বাতি। সিগন্যালগুলিতেও ওই কেরোসিনের বাতিই জ্বলত। গার্ডসাহেবের লাল-নীল আলোতেও কেরোসিন ব্যবহৃত হত। সে সময়ে এ অঞ্চলে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি ছাড়া প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মচারি ফিরিঙ্গি ছিলেন। তাঁদের দাপটও সহ্য-সীমার বহির্ভূত ছিল। তাঁরা স্থানীয় কোন শ্রেণির মানুষকেই মানুষ বলে গণ্য করতেন না। এঁদের দাপট চরমে উঠেছিল বিশেষ করে রেলওয়ে ডিভিশন আদ্রায়। তেনারা যেখানে বসতেন, দাঁড়াতেন, এমনকি যে রেলগাড়ির কামরায় ভ্রমণ করতেন সেখানে কোনো কালো চামড়ার কেউ যেতে বা বসতে পারতেন না। ওঁরা নিজেদের ব্রিটিশ নাগরিক বলে মনে করতেন। আদরায় তাঁদের জন্য সকল ব্যবস্থাই সতন্ত্র ছিল এবং বলা বাহুল্য, অন্যান্যদের তুলনায় অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর অবশ্যই আর তাঁদের ৯৯ শতাংশকে এদিকে দেখা যায়নি। আদরার রেল হাসপাতাল তৈরি হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রাচীনকাল থেকেই পুরুলিয়া শহরের অবদান আছে। 'রাজশক্তি' 'Manbhum', 'পুরুলিয়া দর্পণ' [১০] প্রভৃতি নামে পত্রিকাগুলি একশত বৎসর পূর্বেই চালু হয়েছিল। জেলার প্রথম বিদগ্ধ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় বগলাচরণ ঘোষ মহাশয় মণি বাইজি লেনে নিজের প্রেস 'রাজশক্তি প্রেস' থেকে 'রাজশক্তি' নামে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করতেন এবং অন্নপূর্ণা প্রেস থেকে ইংরাজি ভাষায় Manbhum নামে এক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। সাবিত্রী প্রেস থেকে শ্রী অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায় 'পুরুলিয়া দর্পণ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর অনেক পরে দেশবন্ধু প্রেস থেকে 'মুক্তি' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রী নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়, এটি এখনও চালু আছে। ভারতী প্রেস থেকে শ্রী অন্নদাকুমার চক্রবর্তীর 'সংগঠন' পত্রিকা শহরে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। উক্ত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে একমাত্র 'মুক্তি' ব্যতীত অন্য সবগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিংশ শতাব্দীর ৩/৪ দশকে পুরুলিয়া শহরে ব্যাপকভাবে হস্তলিখিত পত্রিকার চলন ছিল। ছাত্র শ্রী সর্বমুখ রায়ের 'বিদ্যুৎ', শ্রী সলিল মিত্রের 'কিশোর' পত্রিকা, শ্রী অমল চট্টোপাধ্যায়ের 'আলোকশিখা', শ্রী সুনীতি পাঠকের একটি পত্রিকা ছিল বলেই মনে হচ্ছে—নাম ভুলে গেছি। এমনি আরও বেশ কয়েকটি পত্রিকা ছিল। ছদ্মনামে লেখা প্রকাশিত হত তখনও। সুনীতি পাঠক 'নীলপাখি' ছদ্মনামে অন্যান্য পত্রিকায় লেখা দিতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী অরুণচন্দ্র ঘোষের সম্পাদিত একটি হস্তলিখিত পত্রিকা ছিল। নাম ছিল—'মগজ', নিতান্তই পারিবারিক, ব্যঙ্গাত্মক।

আরও বহু বিষয় বলার রয়ে গেল। প্রাচীন পুরুলিয়ার যতটুকু দেখেছি বা শুনেছি সব নিঁখুত করে বলতে হলে তা পুস্তকাকারে পরিণত হবে। এখানে বিশেষ স্থানাভাবহেতু তাই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত

করেই লেখা হল। মাদৃশ প্রাচীন ব্যক্তিবর্গকে এ কাজে অগ্রসর হতে সাদর আহ্বান জানাই। তাঁরা আসুন, তাঁদের জানা প্রাচীন পুরুলিয়ার কথা ও কাহিনী তুলে ধরুন— আমাদেরই উত্তরসূরীগণ এতে উপকৃত হবেন।

১। মানভূম গেজেটিয়ার — পৃষ্ঠা ৬৫, ৬৭, ৬৯
২। পুরুলিয়া গেজেটিয়ার — পৃষ্ঠা - ৪৪
৩। পিছনের চাকাগুলি সলিড টায়ারের ছিল।
৪। ওলড মিউনিসিপ্যাল ম্যাপ—১৯২৭
৫। বস্তুত শহর হিসাবে রঘুনাথপুর ও ঝালদা সুপ্রাচীন
৬। প্রাচীনকালে এইসব রুটে চলত 'পুসপুস' গাড়ি
৭। মিউনিসিপ্যাল ম্যাপ।
৮। বীর সিং মাঝি।
৯। শ্রী নানুরাম খেড়িয়া—বর্তমানে এঁর ৪র্থ/৫ম পুরুষ এখানেই বাস করছেন।
১০। ত্র্যহস্পর্শ, অনাহত— সম্পাদক যথাক্রমে স্ত্রী ভূতনাথ চটোপাধ্যায় ও শ্রী অশোককুমার চৌধুরী।



জঙ্গলমহল থেকে পুরুলিয়া—এক রক্তাক্ত অধ্যায়

জলধর কর্মকার

বহু ভাঙাগড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই মানুষের পথ চলা। হিমালয় থেকেও প্রাচীন, লাল পোড়ামাটি আর পাহাড়শ্রেণি যার অঙ্গভূষণ; যার বিচিত্র খনিজ ও অরণ্য সম্পদকে যুগ যুগ ধরে হরির লুঠ করেও শেষ করা যায়নি—এই জঙ্গল এলাকার মানুষও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে, কভু জয় কভু পরাজয়ের মাধ্যমে রচনা করে চলেছেন ইতিহাস—যে কাহিনি আজও নিরালা বনমর্মরের মতো ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে বহু দূরে রয়ে গেছে। ঐতিহাসিক হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন—

"We talk of Gandhi and Jawaharlal
Of Matilal, Tilak and the rest
But never of these men ;
Who bared their breast
To bullets brave, necks the swinging rope..."

একথা সত্যি, আমরা শুধু গান্ধী, জওহরলাল, মতিলাল, তিলকের কথাই বলি, কিন্তু বুলেটের সামনে যারা বুক পেতে দিয়েছিল, ফাঁসির দড়িতে যারা প্রাণ দিয়েছিল—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর কাহিনি থেকে তাদের কথা বাদই থেকে গেছে।

অরণ্যপর্বতাবৃতং দেশং ঝারিখণ্ড খ্যাতং
রাঢ় গঙ্গা রাঢ়শ্চ অটবী রাজ্যং প্রণামিতম্।।
নির্বাণে পার্শ্বনাথশ্চ বর্ধমান সতীর্থঙ্করৌ।
বুদ্ধস্য শ্রীচৈতন্যস্য পদরেণুভি পবিত্রম্।।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে জঙ্গল এলাকার এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে এখানকার চিরায়ত ঐতিহ্যের এক বড় সাক্ষী। বৈদিক যুগে এই এলাকাকে বলা হত 'কালকারণ'। রামায়ণে একে বলা হয়েছে—'আটবিক দেশ'। ২০০০ বছর আগে এলাকাটি পরিচিত ছিল, 'বজ্জভূমি' বা 'বজ্রভূমি' নামে। জৈনদের পবিত্র গ্রন্থ—'আচারঙ্গসুত্ত'তে এই এলাকার বর্ণনা মেলে। ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এই এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। (Bengal District Gazetters Purulia-10)। 'কৃষ্ণ' নামের মাধ্যমে আপামর জনগণকে সাম্য এবং মৈত্রীর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করতে করতে মহান বৈষ্ণব সাধক শ্রীচৈতন্যদেব ১৫০৯ সালে জঙ্গল এলাকার এই রাস্তা দিয়েই পুরী থেকে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

(The Bhumij Revolt–1832-33, Page–I)। পাহাড়ি উপত্যকা এবং অজস্র নদীনালা-ঝরনাধারাবেষ্টিত এই দুর্গম অঞ্চলে গ্রামের সংখ্যা ছিল কম এবং সেগুলি ছিল দূরে দূরে।

হিন্দু এবং মুসলিম সাম্রাজ্যবাদীরা বার বার হানা দিয়েও এখানকার ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করতে পারেননি। শেরশাহ, সম্রাট আকবর এবং তাঁর উত্তরসূরিরা বহুবার চেষ্টা করেও এই এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে এই এলাকার অধিবাসীরা প্রথম কোনো বিদেশি শাসকদের সংস্পর্শে আসেন। ১৭৬০ সালে কোম্পানি বাংলার তৎকালীন নবাব মীরকাশিমের কাছ থেকে প্রথম এই অঞ্চল লাভ করে। পরে এই অঞ্চলেরই নাম হয় 'জঙ্গলমহল'। বাইরের বণিকেরা এই এলাকায় সিল্ক, লাক্ষা এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্যের বাণিজ্য করতে আসেন। এই পাহাড়ি এলাকার সর্দাররা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কোনরকম রাজস্ব দিতে সরাসরি অস্বীকার করে।

জঙ্গল এলাকায় কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার

নবাব হওয়ার লোভে মীরজাফরের পথ ধরে মীরকাশিমও ইংরেজদের দিয়েছিলেন নগদ ২৬ লক্ষ টাকা এবং তার সাথে বর্ধমান, চট্টগ্রাম এবং মেদিনীপুর জেলার জমিদারি। এটা ১৭৬০ সালের ঘটনা। তখন থেকেই এই এলাকা নবাবি শাসনের পরিবর্তে চলে যায় ইংরেজদের অধীনে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি আবার বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করায় এদেশে তাদের আইনগত ভিত আরো পাকাপোক্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ১৭৬৭ সাল থেকে এই পার্বত্য এলাকায় ব্রিটিশদের সরাসরি অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ১৭৯৩ সালে এল আর এক বিপর্যয়। লর্ড কর্নওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করায় এদেশের সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থার চরিত্রটাই গেল বদলে। তখন থেকেই কখনো বা মিঃ গ্রাহামের নেতৃত্বে, কখনো বা ক্যাপঃ ফার্গুসন, নান্, ইম্পে কিংবা লেফঃ উইলসন-এর নেতৃত্বে এই এলাকার উপর নেমে এসেছে ব্রিটিশের আক্রমণ।

বন কেটে, পাহাড় ধ্বসিয়ে—শ্বাপদসংকুল পরিবেশে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের পর্যুদস্ত করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি যারা তৈরি করেছিল, পাহাড়ের এক-একটি প্রস্তরখণ্ডের সাথে এতদিন ছিল যাদের প্রাণের সম্পর্ক, পাহাড়ি সুগন্ধী ফুলেরা ছিল যাদের কাছে বোনের মতো, ভাল্লুক, হরিণ, বাঘ, হাতি ছিল যাদের ভাই, পাহাড়ি চূড়া, প্রান্তরের শিশিরবিন্দু আর গরু, মহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুর উষ্ণতা আর মানুষ সবাই মিলে যারা ছিল একই পরিবারভুক্ত—ব্রিটিশরা আদিবাসীদের এই আজন্ম অধিকারের জমি চড়া হারে জমিদারদের কাছে বিক্রয় করে ভূমিজাত সন্তানদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে—প্রথম সুযোগেই অস্ত্রধারণ করাটাই ছিল স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক উগ্রতা এসং সাহসিকতার কারণে জমিদাররা এলাকার আদিবাসীদের (বন্য, একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য যাদেরকে বলা হত চুয়াড়) পাইক, বরকন্দাজের কাজে নিয়োগ করত। এই পাইকরা জমিদারদের দেওয়া নিষ্কর জমি ভোগ করত, যাকে বলা হত পাইকান জমি। ইংরেজরা প্রথমেই পাইকানদের কর্মচ্যুত করে নিজস্ব পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে তাদের জমি কেড়ে নেয়। প্রায় ২৫ হাজার পাইক ঘর, বাড়ি, জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সর্বহারা মানুষ প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। বিদ্রোহের অংশীদার কখনো সাধারণ মানুষ, কখনো রাজা-জমিদার। প্রথম পর্যায়ে তিনদিক থেকে

তিনজন জমিদার এগিয়ে এসেছিলেন নেতৃত্বে। যথা— মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, বাঁকুড়ার রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিং এবং ঘাটশিলার রাজা জগন্নাথ ধল। শুধু তাই নয় এই একই সময়ে বলা যায় ১৭৬৭ সাল থেকেই বরাভূমের রাজা বিবেকনারায়ণ তৃতীয়, সতেরখানি তরফের সর্দার লাল সিং, কুইলাপালের জমিদার সর্দার সুবলা সিং, মানভূমের রাজা হরিনারায়ণ, পঞ্চসর্দারির সর্দার কিষেণপাতর, ধাদকার সর্দার শ্যামগঞ্জন সিংহ প্রমুখরা গর্জে উঠেছিলেন ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট জন গ্রাহাম, জর্জ ভ্যানসিটার্ট, ফার্গুসন, ক্যাপঃ ম্যারবেস প্রমুখ ইংরেজ বাঘারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন তির আর বল্লমবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য দাপটে।

জঙ্গলমহল জেলা গঠন

১৭৬৭ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত চুয়াড় বিদ্রোহের এই প্রথম পর্যায়েই প্রমাদ গুনেছিল ব্রিটিশ সরকার। মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট ফার্গুসন সাহেব উপরোক্ত পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে আদিবাসী জমিদারদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না, যদি না ওই অঞ্চলে স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ১৭৬৭ সাল থেকে এই যে বিদ্রোহ তাকে প্রথম 'দি গ্রেট চুয়াড় রেবেলিয়ান' বা 'মহান চুয়াড় বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছিলেন জে সি প্রাইস। ভূমিজাত সন্তানদের জমি হারানোর ক্ষোভের সাথে যুক্ত হয়েছিল আর কিছু কারণ। '৭৬-এর মন্বন্তরের বিভীষিকাময় দিনগুলির সময়েও (১) কোম্পানির কর্মচারীদের রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়ি, (২) কোম্পানি সরকারের উঁচু রাজস্বের হার, (৩) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন, (৪) ইংরেজদের জমি নীলাম প্রথা, (৫) জমি বিক্রয় আইন, (৬) দারোগা প্রথা, (৭) জঙ্গল কানুন, (৮) লবণ কর প্রভৃতি বিষয় বিদ্রোহের কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার নিজেদের রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধার জন্যই জঙ্গল এলাকায় একটা শক্ত ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করল।

মোগল সম্রাট শাহজাহান এই জঙ্গল এলাকায় শাহসুজাকে পাঠিয়েছিলেন সুবাদার করে। রাজমহল তখন ছিল বাংলার রাজধানী। পরে এই রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে এই রাজধানীকে নিয়ে আসেন মুর্শিদাবাদে। সময়টা ছিল ১৭১৪ সাল। তখন এর নাম ছিল মুকসুদাবাদ। মুর্শিদকুলি খাঁর নাম অনুসারে পরে তা হয় মুর্শিদাবাদ। ১৭১৪ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত বাংলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। ১৭৭২ সালে বাংলার প্রথম গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য গঠন করেছিলেন পাঁচেৎ জেলা। ১৭৬৭-১৭৯৯ পর্যন্ত মুহুর্মুহু চুয়াড় বিদ্রোহে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল এলাকায় প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য ১৮০৫ সালে ১৮ নং ধারা অনুযায়ী বীরভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলা থেকে বিভিন্ন স্থান নিয়ে গঠন করল 'জঙ্গলমহল' জেলা। বীরভূম জেলা থেকে আনা হল পাঞ্চেৎ, বাগমুণ্ডি, বেগুনকোদর, কাতরাস, হেঁসলা, ঝালদা, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর প্রভৃতি। তারও আগে এগুলি ছিল রামগড় জেলার মধ্যে। বর্ধমান জেলা থেকে আনা হল সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুর জেলা থেকে ছাতনা, বরাভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল এবং বেলিয়াডিহি। মেদিনীপুরের কালেক্টার এডওয়ার্ড বেরার তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসকে জানিয়েছিলেন—"পশ্চিমের জঙ্গল এলাকা লম্বায় ৮০ মাইল ও চওড়া ৬০ মাইল। পূর্বে মেদিনীপুর, পশ্চিমে সিংভূম, উত্তরে পাঁচেট ও দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবাদি

জমির এলাকা স্বল্প। আনুপতিক চাষযোগ্য এলাকাও কম, মাটি পাথুরে, ভূ-ভাগ পর্বতময় ঘন অরণ্যে ঢাকা।" মোট ২৩টি পরগনা ও মহল যুক্ত হল জঙ্গলমহলের সাথে। নবগঠিত এই জেলার সদর শহর হল বাঁকুড়া। জঙ্গল এলাকায় ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েমের জন্য প্রথম ধাপ নির্মিত হল এইভাবে জঙ্গলমহল জেলা গঠনের মধ্য দিয়ে।

এরপরের ইতিহাস শাসন ও শোষণের ইতিহাস। শোষকের ভূমিকায় কখনো সরাসরি ব্রিটিশ প্রভু, কখনো তাদের দোসর রাজা-জমিদার। তবে এই এলাকার রাজা-জমিদাররা বেশিরভাগই ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী।

জন্ম নিল মানভূম

১৮৩২-৩৩ সালে ঘটেছিল আর এক অভ্যুত্থান—ব্রিটিশরা যার নাম দিয়েছিল "গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা"। বরাভূম রাজপরিবারের বিক্ষুব্ধ গঙ্গানারায়ণ সিংহ পাশাপাশি ধলভূম, পাতকুম, কুইলাপাল, মানভূম, পঞ্চকোট, রায়পুর প্রভৃতি এলাকার রাজা ও জমিদারদের সাহায্য নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানালেন ব্রিটিশ শাসনকে।

গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা

জঙ্গলমহলের সর্ববৃহৎ অংশ ছিল বরাভূম। ১৫শ-১৬শ শতকে রচিত ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে 'বরাভূমি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পশ্চিম দিক ছিল পাতকুম দিয়ে ঘেরা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিংভূম, দক্ষিণে ধলভূম, পূর্বে কুইলাপালের ছোট জায়গির এবং মানভূম এবং উত্তরে পাঁচেৎ। ১৮৩৩ পর্যন্ত এর প্রায় সমস্ত সীমান্তই ছিল ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত। ঘাটের সংখ্যা ছিল দশটি। এর মধ্যে প্রধান চারটি ছিল ধাদকা, সতরখনি, পঞ্চসর্দারি এবং তিনসওয়া ব' বেড়মা।

বরাভূম এলাকায় ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রথম যার সংস্পর্শে এসেছিল তিনি হলেন বরাভূম রাজপরিবারের চল্লিশতম রাজা বিবেকনারায়ণ (তৃতীয়)। বরাভূমের তিনিই ছিলেন শেষ স্বাধীন রাজা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি বহুদিন সংগ্রাম করেছিলেন। ১৭৬৭ সালে প্রথম যে চুয়াড় বিদ্রোহ তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনিই।

রাজা বিবেকনারায়ণের ছিল দুই বিবাহ। প্রথমটির ছেলে লছমন সিং এবং দ্বিতীয় পক্ষের রাজা রঘুনাথনারায়ণ। আদিবাসী ভূমিজদের নিয়ম অনুযায়ী প্রধান বা পাটরানীর পুত্র, তিনি প্রথমে জাত হোন বা নাই হোন তিনিই হবেন পরবর্তী রাজা। রঘুনাথনারায়ণ বয়সে বড় হলেও কনিষ্ঠা রানীর পুত্র বলে আইনত তাঁর সিংহাসন পাওয়ার কথা ছিল না। পাটরানীর ছেলে বলে লছমন সিংই ছিলেন ন্যায্য উত্তরাধিকারী। কিন্তু জনসাধারণের সমর্থন এবং ভূমিজ আইন পক্ষে থাকা সত্ত্বেও লছমন সিং সিংহাসনে বসতে পারলেন না, কারণ ব্রিটিশ সামরিক শক্তি ছিল রঘুনাথনারায়ণের অনুকূলে। লছমন সিংকে জমিদারি থেকে বঞ্চিত করে বরাবাজার থেকে বহুদূরে দুর্গম দলমা পর্বতশ্রেণীর নিভৃতে বাঁধডি নামক জায়গায় জায়গির দিয়ে সরিয়ে রাখা হয়।

১৭৯৮ সালে রঘুনাথনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ এবং মাধব সিংহ-এর মধ্যেও একই কোন্দল শুরু হয়। পরে এই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত লড়াই লছমন সিং-এর ছেলে গঙ্গানারায়ণ এবং রঘুনাথনারায়ণের ছেলে মাধব সিং-এর মধ্যে প্রকট রূপ ধারণ করে। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চসর্দারি তরফের দায়িত্ব পেয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণ সিং। কিন্তু রাজার দেওয়ান, সুচতুর

এবং ধড়িবাজ মাধব সিং-এর পিছনে ছিল ইংরেজ রাজশক্তি। ইংরেজ বলে বলীয়ান হয়ে নিষ্ঠুর মাধব সিং তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু এবং খুড়তুতো ভাই গঙ্গানারায়ণ সিংকে পঞ্চসর্দারি তরফের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করেন।

মাধব সিং-এর কাছে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে গঙ্গানারায়ণ মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন মাধব সিং তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ক্ষোভ শেষে পরিণত হল ঘৃণায়। মাধব সিং একদিন গোলাঘর দেখে কেতুঙ্গা থেকে বামনীর রাস্তা দিয়ে ফিরছিলেন। জোর করে খাজনা আদায় করার ফলে মাধব সিং-এর বিরুদ্ধে সবাই ছিলেন অতিষ্ঠ। সতেরখানির লালসিং এবং পঞ্চসর্দারির অন্যান্য সর্দারসহ গঙ্গানারায়ণ বামনীর ডুংরিতে টাঙির এক কোপে মাধো সিংকে হত্যা করেন। অন্যান্য সর্দাররাও তির বিঁধে প্রতিশোধ নেন। এ সম্পর্কে বহু তথ্য একটি পাথরে খোদাই করা ছিল নাকটি থানের কাছে। রাখাল বালকেরা পাথরটির অনেক অংশই যদিও এখন ভেঙে দিয়েছে। ১লা মাঘের দিন এখন সেখানে পূজা হয়। পূজারী হলেন পলাশডির লাভডু সিং।

যাইহোক মাধব সিংকে হত্যা করার পরই জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন। ১৮৩২-এর ১লা মে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঙ্গানারায়ণ সিং বরাবাজারের মুনসিফ কাছারি লুঠ করেন, কোর্ট জ্বালিয়ে দেন এবং বাজারে লুঠতরাজ চালানো হয়। এরপরই ১৪মে তারিখে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী বরাবাজারে ইংরেজদের ক্যাম্পের দিকে এগোতে থাকে। মাধব সিং-এর মন্ত্রণাদাতা এবং দেশের শত্রু ব্রিটিশ বিতাড়নই ছিল উদ্দেশ্য। হাতে তাদের উন্মুক্ত তরবারি, তির-ধনুক এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র। চতুর্দিকে নাগড়া এবং ধামসার গুরুগম্ভীর আওয়াজ। প্রচণ্ড চিৎকার, হর্ষধ্বনি দিতে দিতে ধামসা বাজাতে বাজাতে, কেউ বা উল্লাসে বৃহৎ উন্মুক্ত তরবারি, কেউ টাঙি, ফারসা হাতে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসতে থাকেন ব্রিটিশ ক্যাম্পের দিকে। ম্যাকডোনাল্ড তাঁর বাহিনী নিয়ে সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের ছন্নছাড়া করলেও তাদের পিছু হটানো যায়নি। বাঁধডি, কুইয়ানি, বামনী, সামানপুর, বেড়মা, বড়চাতরমা, আদাড্ডি, আগইডাঙ্গরা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হয় খণ্ডযুদ্ধ। রায়ডি-বেড়াদাতে ঘাঁটি স্থাপন করে ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্রোহ মোকাবিলার চেষ্টা করে। ১৮৩২-এর সারা ডিসেম্বর মাস ধরে রায়ডি, দিগারডি, বেড়্যাডি, বেড়াদা প্রভৃতি জায়গায় চলতে থাকে ব্রিটিশ তাণ্ডব। বিদ্রোহীরা সম্মুখযুদ্ধে না গিয়ে গেরিলা আক্রমণে ব্রিটিশ ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাহাড়ের গোপন স্থান থেকে শন শন করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা বিষমাখা তির ইংরেজ বাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। ব্রিটিশ ফৌজের জন্য আসা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যও পাহাড়ি রাস্তায় লুঠ হয়ে যাচ্ছিল। রাসেল এবং লেফটেনান্ট কর্নেল কুপার-এর নেতৃত্বে ৫০ রেজিমেন্টের দল বাঁধডি আক্রমণ করতে এসেও ব্যর্থ হয়। প্রলোভন দিয়ে অন্যান্য ঘাটোয়ালদের মন জয় করার সমস্ত ব্রিটিশ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

প্রথমবারের অভিযানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবার পর পরবর্তীকালে দ্বিতীয় দফার প্রস্তুতি নিয়ে ব্রাডন, যুগ্ম কমিশনার W. Dent, T Wilkinson প্রমুখের সুপরিকল্পিত আক্রমণে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে বাধ্য হন। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত যথাসম্ভব জোরদার ব্রিটিশ আক্রমণ চলে। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ইংরেজ বাহিনী দলমা পাহাড়কে ঘিরে রাখে। গঙ্গানারায়ণ এইসময় চোরাপথে রাতের অন্ধকারে লাড়কা কোলদের সাহায্য লাভের আশায় সিংভূমের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খরসোয়ান-এর ঠাকুর চৈতন সিং-এর (যিনি ছিলেন ব্রিটিশ মদতপুষ্ট) সেনাদের দ্বারা হিন্দু সহর থানায় তিনি নিহত হন। মরতে মরতেও তিনি একাকী ঠাকুর চৈতন সিং-এর তিনজন

লোককে হত্যা করেন এবং ৩০ জনকে ঘায়েল করেন। গঙ্গানারায়ণ সম্পর্কে ইংরেজরা এতই ভীত ছিল যে তার জামাতা এবং বহু আত্মীয় এবং কমপক্ষে একশত জন লোক দ্বারা তারা গঙ্গানারায়ণের ছিন্ন মস্তকটি শনাক্ত করান।

গঙ্গানারায়ণ ছিলেন সাহসী বীর যোদ্ধা। বীরত্বের কারণে পাতকুমের সমস্ত লোকরা তাঁকে বলতেন 'সিংহাসুর'। দুর্গম জঙ্গলের মাঝখানে তিনি মাঝে-মধ্যেই ধ্যানস্থ হতেন। বীরমাটি মাখতেন চামু ডুংরিতে। বুরুডির কাছে তাঁর একটি অফিস ছিল। পাশেই আছে একটি পুকুর। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে—ইংরেজদের সাথে লড়াইয়ের রক্তস্রোতে নাকি ওই পুকুরটির সৃষ্টি। পুকুরটির নাম 'গঙ্গাজুইড়া'। বাঁধডি গ্রামের দক্ষিণে সাহড়া গাছের কাছে তিনি গুহাপূজা করতেন। তাঁর ঘোড়াটি দুর্গম পাহাড়ের উপরেই তাঁর কাছে বাঁধা থাকত। এলাকার বয়স্ক মানুষদের মতে খরসোয়ানের দিকে পালিয়ে যাবার সময় প্রথম তিনি পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন—সেখানে গর্তের মতো সৃষ্টি হয়। তার নাম 'সাত খাইট্যা'।

যাইহোক গঙ্গানারায়ণের মৃত্যুর খবর ঘোষণার সাথে সাথে অন্যান্য বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙে যায়। কালজনপুর এবং হলদিপোখর-এর দিকে লেফঃ টিমিনস-এর তাণ্ডব অন্য বিদ্রোহী নেতাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

জঙ্গলমহলের কর্মরত তৎকালীন সামরিক অফিসার ক্যাপঃ উইলসনের মতে—"সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশদের উপরোক্ত অভিযান কেবল তির, ধনুক ও কুঠারে সজ্জিত উপজাতীয় লোকেদের খণ্ডযুদ্ধের এক নগণ্য ঘটনামাত্র" হলেও—ধ্বংসাত্মক দিকের বিচারে এটা ছিল সম্পূর্ণমাত্রায় এক বিদ্রোহ। লড়াই-এর দিনগুলিতে অম্বিকানগর, আঁকরো, সুপুর, ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর প্রভৃতি এলাকার জমিদাররাও গঙ্গানারায়ণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দামপাড়ার জমিদার জগন্নাথ সিংপাতর এই সময়েই ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করে মারা যান। দামপাড়ারই নয়ন সিং এমনই বীর ছিলেন সরাসরি তাঁকে গ্রেপ্তার করার হিম্মৎ কারো ছিল না। দুপুরে যখন তিনি একদিন ঘুমাচ্ছিলেন বুকে সাঁঘা কাঠ চাপা দিয়ে তখন তাঁকে ধরা হয়। মা-বোনেদের কাতর কণ্ঠে এখনো শোনা যায়—

—"বড় ভেদে গো, নয়ান সিং এর বুকে দিল টাড়া;
দুনয়নে বহে ধারা...।"

বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পটমদা থানার বড়াম-এর কাছে রূপসান ডুংরির নীচে মাঘের ১লা তারিখে পূজা দেওয়ার সময় ভূমিজ আদিবাসীদের পুরুষ-মহিলার কণ্ঠে গানের আকারে এখনো উচ্চারিত হয় সংগ্রামের ওই দিনগুলির কথা...

"বিক্রমজিৎ রাজা ভেল
কলিত পড়ি গেল
ছাতা পখরি রাজার
ঘড়া ডুবি গেল।
লক্ক লক লকই রে,—লক্ আসছে লুকাও রে
ব্যাপারিক টাড়ারে/বাবুরাম সিঙ্গুলেনা
নবীনাকা টাড়ারে/সিঙ্গুলেকা টাড়ারে
বাবুরাম জাপালেনা।
মিছা হলেও বলবে রে, নিষ্টা হলেও বলবে রে;

লক্ আসছে লুকাও রে—আও।
আগু দিগেও ভালবে রে, পিছু দিগেও ভালবে রে,
লক্ আসছে লুকাও রে, আও।

গঙ্গানারায়ণের মৃত্যুর পর জঙ্গল এলাকায় বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। 'হাঙ্গামা'—আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশরা এর গুরুত্বকে লাঘব করার চেষ্টা করলেও তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। এই ভয়েরই প্রমাণ পাওয়া গেল জঙ্গলমহল জেলাকে আরো ভেঙে টুকরো করার মধ্য দিয়ে। গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ এবং অন্যদিকে রাঁচি, পালৌমো, হাজারিবাগ, চক্রধরপুর, বুন্ডু, তামাড় প্রভৃতি এলাকায় কোল বিদ্রোহের ভয়ে আতংকিত ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৩-এর ১৩নং ধারা অনুসারে জঙ্গলমহল জেলাকে ভেঙে গঠন করল মানভূম জেলা। ধানবাদ ও পুরুলিয়া মহকুমা সমেত ধলভূম মহকুমা এবং বর্তমান বাঁকুড়ার রায়পুর, সুপুর, ভেলাইডিহি, অম্বিকানগর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হল এই জেলার মধ্যে। এর মোট আয়তন দাঁড়াল ৭,৮৯৬ বর্গমাইল। ১৮৩৩-৩৮ সাল পর্যন্ত মানভূম জেলার রাজধানী ছিল মানবাজারে। ১৮৩৮ সালেই মানবাজার থেকে তা মধ্যবর্তী পুরুলিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। তখন মানভূমের বিস্তার ছিল পশ্চিমে বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং বিহারের ধলভূম পর্যন্ত। সীমানা ছিল উত্তরে হাজারিবাগ জেলা এবং সাঁওতাল পরগনা, পূর্বে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণে সিংভূম জেলা এবং পশ্চিমে রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলা।

জেলাটি উত্তর-দক্ষিণে ৯০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ছিল ৬০ মাইল বিস্তৃত। দামোদর নদ জেলাটিকে দুটি অসমান ভাগে ভাগ করেছে। নদের উত্তর দিকে ধানবাদ মহকুমার পরিমাণ ৮০৩ বর্গমাইল এবং দক্ষিণে পুরুলিয়া মহকুমার পরিমাণ ৩,৩৪৪ বর্গমাইল। নবগঠিত এই জেলায় ছিল মোট ৩১টি থানা। এর মধ্যে পুরুলিয়া সদর মহকুমায় ২১টি এবং ধানবাদ মহকুমায় ১০টি। সমগ্র জেলাটি ছিল মোট ৩৮টি পরগনায় বিভক্ত।

মানভূমে নীল বিদ্রোহ

১৮৫৯-৬০ সালে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অতিষ্ঠ কৃষকেরা যখন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে মানভূমের কৃষকরাও সেদিন পিছিয়ে ছিলেন না। এর বহু পূর্বেই মানভূমের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছিল নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। পুরুলিয়ায় 'নীলকুঠিডাঙা' পাড়ার নামকরণ, নডিহার কাছে নীলকুঠি, বরাবাজার থানার বেড়াদার নীলকুঠি, বলরামপুর থানার নেকড়ের নীলকুঠি, বর্তমান ঝাড়খণ্ডের মিনডি থানার কেতুঙ্কার নীলকুঠি এখনো তখনকার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেড়াদা এবং বেড়মার মাঠে-ঘাটে এখনো অনেক নীলের চারা চোখে পড়ে। দক্ষিণ পুরুলিয়াকে শাসন করার মূল ঘাঁটি যেহেতু ছিল বেড়াদা, তাই বেড়াদাতে নির্মিত হয়েছিল নীলকুঠি। নীলচাষে অবাধ্য হলে বেত্রাঘাত, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ছিল সাধারণ শাস্তি। বেড়াদার নীলকুঠির নীচে পাওয়া গেছে ফাঁসিমঞ্চ। অবাধ্য চাষিদের সেখানে ফাঁসিও দেওয়া হত।

বর্তমান ঝাড়খণ্ডের নিমডি থানার মধ্যে 'বাড়েদা' নামে একটি গ্রাম, যার উত্তরে বেড়াদা, দক্ষিণে আমঝোর, সামানপুর, পূর্বে পাহাড়পুর, জিলুম ডুংরি এবং পশ্চিমে মধুপুর ও আড়ালকচা পাহাড়। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত এই বাড়েদা গ্রামেরই জিলপা লায়া নীল চাষিদের নেতৃত্ব

দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৬০ সালের বহুপূর্বেই নীলকর সাহেবরা বেড়াদা, বাড়েদা, বুরুডি, লালডি, রায়ডি, বুড়িভাসা, হাতিকুন্দা, ভুষেণডি, পড়গড়া, শিয়ালগাড়া, বুরুগড়া প্রভৃতি স্থানে জোর করে নীল চাষ করাতেন। বেড়াদা ছিল ঘাঁটি। নীলকর সাহেবদের অফিসটিও ছিল এখানে। এখন যেখানে বেড়াদা হাইস্কুল অবস্থিত ওই জায়গাটিই ছিল নীলকুঠি। কুঠিবাড়ির পুরনো ইটের গাঁথনি এবং নীল শুকোবার চত্তর এখনো সেখানে বর্তমান। রাস্তা দিয়ে কোনো পথিক পেরিয়ে গেলেও জোর করে তাদেরকে দিয়ে নীল মেলানো হত। কৃষকরা যে জমিতে ধান কিংবা ভুট্টা চাষ করতেন তারই একদিকে নীলচাষ করতে তাদের বাধ্য করা হত। জৈষ্ঠ মাসে এই নীল বুনতে হত এবং কৃষকদের যখন ধান রোয়ার প্রকৃত সময় সেই শ্রাবণ মাসে ওই নীল কেটে নিজের গাড়িতে করে নিজের খরচে বেড়াদার নীলকুঠিতে তা পৌঁছাতে হত। বলরামপুর থেকে বেড়াদা যাওয়ার পথে আমারু নামক গ্রামের কাছে এখনো এক অভিশপ্ত বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। এলাকার কিংবদন্তী—নীলচাষে অবাধ্য হলে কৃষকদের ওই বটগাছে এনে দুটি দূরবর্তী ডালকে একজায়গায় এনে চাষির দু হাতে দুটি ডাল বেঁধে দেওয়া হত। ডালদুটি ছেড়ে দিলেই একবার মাত্র শোনা যেত একটা আর্তনাদ। দু অংশে বিভক্ত হয়ে বটগাছের ডালে ঝুলে থাকত রক্তাক্ত দুটি দেহখণ্ড। এরপরই কাক, শকুনের ভোজ বসত কয়েকদিন ধরে। আর পথিকরা শিউরে উঠত ওই দৃশ্য দেখে।

এইভাবে অন্যায়-অবিচার সহ্যের শেষসীমা অতিক্রম করায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। কৃষকদের প্রথম প্রতিবাদ ছিল নীরবে। নীলবীজ বুনতে দিলে পর পর দু-তিনবছর তারা সেই বীজকে বুটের মতো ভেজে নিয়ে বুনতে লাগলেন। কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাড়েদা গ্রামের জিলপা লায়া। নিজেদের তৈরি করা পাহাড়ি দেশে তাদের সাজানো 'শ্যামনাগিন' এলাকায় ব্রিটিশ আধিপত্যকে তিনি কোনোমতেই মেনে নিতে পারেননি। দলমার কোলে বাটালুকার জঙ্গল ছিল বিদ্রোহীদের গোপন ডেরা। একদিন দুপুরবেলা ঘুমন্ত অবস্থায় নয়ন সিং-এর মতো তাঁরও বুকের উপর টাড়া কাঠ দিয়ে গ্রেপ্তার করে মারতে মারতে বেড়াদার ফাঁসিমঞ্চে এনে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসি দেওয়ার পরও ব্রিটিশদের ভয় কাটেনি। জিলপার মৃতদেহটি মশাল দিয়ে পুড়িয়ে কালো করে বাঘরার কাছে প্রকাশ্য রাস্তায় একটি মহুল গাছে পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, আর যাতে কোনোদিন কেউ ব্রিটিশদের সাথে বেয়াড়াগিরি না করে। ১৯৮৩ সালে সি পি আই (এম) পুরুলিয়া জেলা কমিটির বিশেষ উদ্যোগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বরাবাজার থানার এই বেড়াদায় এসে ওই কুঠিটাঁড় নাম জায়গায় শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। তখন থেকেই শহিদদের ওই মহৎ আত্মত্যাগের কথা সবাই জানতে পারেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে মানভূম

১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে মহারণ তা শুধু বারাকপুরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মানভূমের মানুষও সমানভাবে এর অংশীদার হয়েছিলেন। এলাকার অগণিত মানুষ বিশেষ করে রাকাব এলাকার সাঁওতালরা প্রত্যক্ষভাবে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন কাশীপুরের মহারাজা গরুড়নারায়ণ সিংহের বীরপুত্র নীলমণি সিংদেও।

১৮৫৭ সালের ৫ আগস্ট, বাংলা ২২ শ্রাবণ মহারাজা নীলমণি সিং-এর নেতৃত্বে রাকাব এলাকার প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল রাকাব জঙ্গলে সমবেত হয়ে ব্রিটিশ রাজত্বকে উৎখাত করার শপথ নিয়েছিলেন। ওই এলাকার কিংবদন্তী হল--শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল রাকাব জঙ্গলের রাকাববুড়ি অর্থাৎ বনদেবীকে সাক্ষী রেখে। সাঁওতালি ভাষায় রাকাব মানে ওঠানো বা তাড়ানো।

'ইংরেজ দ-বন রাকাব কোআ'—অর্থাৎ ইংরেজদের তাড়াতে হবে। তখন থেকেই নাকি এলাকাটির নাম রাকাব। কেশরগড় ঢোকার মুখে ওই শপথগ্রহণের রাকাববুড়ি থানটি এখনো বর্তমান।

রকাব থানে শপথ নিয়ে বিদ্রোহীরা প্রথমে পুরুলিয়া আক্রমণ করেন। পুরুলিয়ার জেলে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। বন্দিদের এইভাবে মুক্ত করে ট্রেজারিও লুঠ করা হয়। ভয়ে ইংরেজরা রঘুনাথপুরের রাস্তা দিয়ে রানীগঞ্জে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করেন।

দেড়মাস ধরে পুরুলিয়াকে নিজেদের অধিকারে রাখার পর বিদ্রোহীরা এবার এই বিদ্রোহকে রাঁচি, রামগড় এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রামগড়ের দিকে চলে যান।

দখল হওয়ার পরও পুরুলিয়াতে বিদ্রোহীদের এই অনুপস্থিতির সুযোগটাকেই কাজে লাগালেন Captain G. N. Oaks সাহেব। রানীগঞ্জ থেকে দলবল সমেত এসে ১১ সেপ্টেম্বর তিনি পুরুলিয়ায় অভিযান চালান। জয়চণ্ডী পাহাড়সংলগ্ন মাঠে বিদ্রোহীদের সাথে ওকসের বাহিনীর সংঘর্ষে নীলমণি সিংকে বন্দি করা হয়। বন্দি করে প্রথমে তাঁকে শান্তিপুরে এবং পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে ১৮৫৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৫৯-এর মার্চ মাস পর্যন্ত বন্দি রাখা হয়। কাশিমবাজারের রানী স্বর্ণময়ী দেবীর সাহায্যে জামিন পেয়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই বিদ্রোহের মূল শক্তি আদিবাসী সাঁওতালদের তৎকালীন ওই বিদ্রোহীদের বংশধর খেলু মুর্মু, কালিচরণ মুর্মু, খেপু মুর্মু প্রমুখরা কেশরগড় সংলগ্ন কর্কটি গ্রামে এখনো আছেন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে মানভূম

১৯২০-২১ সালে গান্ধীজি নির্দেশিত পথে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল মানভূমেও। এই সময়কালেই সরকারি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করে ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। ২৩ বৎসরের সরকারি চাকুরি ছেড়ে দেশমাতৃকার সেবায় এই ধরনের আত্মত্যাগ ইতিহাসে খুব কমই আছে। ১৯২৫ সালে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে গান্ধীজি পুরুলিয়ায় এসে সাতদিন অবস্থান করলে এখানকার সত্যাগ্রহীরা আরো বেশি উৎসাহিত হন।

আইন অমান্য আন্দোলন ও মানভূম

১৯২৯-৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান এবং আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব পড়ে মানভূমেও। স্থানীয় সাপ্তাহিক 'মুক্তি' প্রত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এই পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন। ১৯২৮ সালে অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর উদ্যোগে রামচন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত হয় মানভূম জেলার প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলন। সেসময় সুভাষচন্দ্র বোস প্রথম পুরুলিয়ায় আসেন। দ্বিতীয়, সম্মেলনটি হয় ঝালদাতে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে। নিবারণ দাসগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে এই সময় জেলে পাঠানো হয়। মালভূম জেলা সত্যাগ্রহ কমিটির উদ্যোগে মানভূমে আইন অমান্য আন্দোলন এই সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে। সর্বত্র চলে পিকেটিং, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ওড়ানো হয় জাতীয় পতাকা। ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসের শেষভাগে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায়। মানভূম এলাকায় কংগ্রেসের তৎকালীন বিখ্যাত নেতা বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত, সেওসরান জয়সওয়াল, মোহনদাস বাবাজি, বীর রাঘবন আচারিয়া প্রমুখকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো

হয়। ১৯২৯ সালে ঝালদায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তেজস্বী যুবক সত্যকিংকর দত্ত। জমিদারদের গোপন চক্রান্তে প্রকাশ্য দিবালোকে বিষাক্ত টাঙির আঘাতে সত্যকিংকর দত্তকে হত্যা করা হয়। তখন থেকেই ঝালদায় শহিদ সত্যকিংকর দত্তের স্মৃতিতে পালিত হয়ে আসছে সত্যমেলা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও মানভূম

১৯৪২ সালে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'—ধ্বনিতে যখন কেঁপে উঠল সারা দেশ মানভূমেও তখন উত্তাল তরঙ্গ। ব্রিটিশ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বান্দোয়ানের জিতান গ্রামে ভজহরি মাহাতর বাড়িতে বসল গোপন সম্মেলন। জিতানের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা দেবী, বাসন্তী দেবী, বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত, চিত্তব্রত দাসগুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মুখার্জী, কৃষ্ণ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলন থেকেই দায়িত্ব বণ্টিত হল। মানবাজার থানা এলাকায় আন্দোলনের দায়িত্বে রইলেন সত্যকিংকর মাহাত, হেমচন্দ্র মাহাত, গিরিশ মাহাত এবং চুনারাম মাহাত। মানভূমের ইতিহাসে ৩০/৯/১৯৪২, বাংলা ১৩ আশ্বিন এক স্মরণীয় দিন। মানবাজার থানা দখলের জন্য এগিয়ে চলল এক বিরাট বাহিনী। মুখে তাঁদের স্লোগান—'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'বন্দেমাতরম'। মোহিনী মাহাত, ভাবী মাহাতদের নেতৃত্বে মহিলাদেরও বিশাল দল। থানার গোড়াতেই তাঁরা বাধা পেলেন। মানবাজার হাসপাতালের ডাক্তার অন্নদাময় কবিরাজ আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে প্রথম গুলি চালালেন। মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন কুদা গ্রামের চুনারাম মাহাত, নাথুড্ডির গোবিন্দ মাহাত এবং মেট্যালার গিরিশ মাহাত। দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন আঁকরোর হেম মাহাত, বিষ্ণুপদ মাহাত এবং গোবর্ধন মাহাত প্রমুখ। ঘটনাস্থলেই ব্রিটিশের গুলিতে মারা যান চুনারাম মাহাত। পা ভাঙা অবস্থায় পুরুলিয়ায় মারা গেলেন গোবিন্দ মাহাত। মেট্যালার গিরিশ মাহাতও ঘায়েল হন। পুলিশের ভয়ে আন্দোলনকারীরা কেউ কপালে ফেটি বেঁধে, কেউ বা গরুর গাড়িতে করে রাতে এসে আশ্রয় নিলেন পুড়দহার মদন মাহাতর বাড়িতে। ৩০ সেপ্টেম্বরের ওই একই দিনে মানবাজারের মতোই আক্রান্ত হয় বন্দোয়ান থানা। থানা আক্রমণ করে কাগজপত্র বের করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় পুলিশকে বেঁধে রাখা হয়। বন্দোয়ান থানার এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিতান গ্রামের ভজহরি মাহাত। বরাবাজার থানা আক্রমণে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন মথন মাহাত এবং পদক মাহাত। ওই একই দিনে পটমদা, হুড়া, পুঞ্চা প্রভৃতি থানাগুলিকেও দখল করার চেষ্টা করা হয়। আন্দোলনে শবরদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। এই সময়কালেই মহাদেব শবরকে জেলে দেওয়া হয় এবং রহস্যজনকভাবে জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বরাবাজারে থানার সাথে সাথে পোস্ট অফিস, মদের দোকান প্রভৃতিও আক্রান্ত হয়। রেকর্ডপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বন্দোয়ানে টটকো নদীর ধারেও সংঘর্ষ হয়। কুমারী গ্রামেও গুলি চলে। রুদড়ার হাট লুণ্ঠিত হয়। নেতৃত্বের নির্দেশে পরে প্রধান প্রধান নেতারা আত্মসমর্পণ করেন। বিচারের পর ভাগলপুর জেলে কারো সাড়ে সাত বছর, কারো চার বছর, কারো বা সাড়ে তিন বছর জেল হয়। নির্মম দমননীতির ফলে মানভূমে সমাপ্তি ঘটে এইভাবে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মানভূমের প্রথম শহিদ চুনারাম মাহাত এবং গোবিন্দ মাহাতর স্মরণে মানবাজার থানা এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে C. R. C. G. (চেপুয়া-রাঙ্গাটাড়, চুনারাম, গোবিন্দ) বিদ্যাপীঠ।

পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের ভূমিকা

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়কালে পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম ছিল আন্দোলনকারীদের প্রধান ঘাঁটি। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় সারা দেশ যখন উত্তাল ১৯২১ সালের ওই বিপ্লবী তরঙ্গের দিনেই পুরুলিয়া স্টেশনের কাছে স্থাপিত হয়েছিল শিল্পাশ্রম। উদ্দেশ্য ছিল মানভূমে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। এখন এটি তেলকলপড়ায় অবস্থিত। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলন কিংবা ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়কার বেশিরভাগ সমস্ত সিদ্ধান্তই শিল্পাশ্রমে বসে নেওয়া হত। ওই সময়কালে মুক্তি পত্রিকা এবং শিল্পাশ্রমকে বহুবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সুভাষ বোস, গান্ধীজি, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সবার পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল পরাধীন ভারতের এই রাজনৈতিক আখড়া।

১৯৪৮-এর ৩০ জুন জেল থেকে মুক্তিলাভের পর ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখের উদ্যোগে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই গড়ে ওঠে L. S. S বা লোকসেবক সংঘ। গান্ধীজি যেমন তাঁর প্রতিষ্ঠিত সবরমতী আশ্রমে রাজনীতির লড়াই অপেক্ষা অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন এবং সমাজ উন্নয়নের দিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন একইভাবে এই সংঘেরও উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে পড়া দলিত আদিবাসী এবং হরিজনদের মধ্যে শিক্ষার উন্নয়ন। পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমে, বলরামপুর থানার সাগমাতে, তৎকালীন নিমডিতে, মানবাজারের মাঝিহিড়াতে লোকসেবক সংঘের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ব্যাপক চাষবাস, সাথে চরকায় সুতো কাটা প্রভৃতি আত্মনির্ভরশীল কাজ। ১০৭ বছর বয়সী আশ্রমমাতা নামে পরিচিতা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ শিল্পাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ঘুরাও চরকা ঘর্ঘর ঘর্ঘর
মুক্তি দিতে ভারতকে
ভাই বহিনরা ঝগড়া ছাড়ে
মন লাগাও ভাই (২)...

গানটি ছিল তখনকার দিনে বেশ প্রচলিত।

মানভূমে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব

১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘটলেও ব্রিটিশ পুলিশ এবং তৎকালীন কংগ্রেস তথা লোকসেবক সংঘের দমনপীড়নে মানভূমে কমিউনিস্ট ভাবধারা এসেছিল একটু দেরিতে। গ্রাম উন্নয়নে L. S. S. এর ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি জোতদার, জমিদার এবং আরো বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত মানুষ মুক্তির এক অন্য রাস্তা খুঁজছিলেন। সংগ্রামের ওই দিনে সমর রায়, প্রবীর মল্লিক প্রভৃতি কমিউনিস্ট নেতারা মানভূমে এসে মানুষকে দেখিয়েছিলেন বাঁচার পথ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তখন থেকেই মানভূমে সংগঠিত হতে থাকেন এতদিন থেকে অত্যাচারিত হাজার হাজার কৃষক, শ্রমিক এবং অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষেরা। মানভূমে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪৬ সালে বলরামপুরে। বে-আইনি থাকায় তৎকালীন নেতৃত্বরা কানাপাহাড়ের গোপন গুহা কিংবা জুরাডি এলাকার জঙ্গলাবৃত গোপন ডেরা থেকে আন্দোলনের সূচিমুখ ঠিক করতেন। বাইরের থেকে সমর রায়, প্রবীর মল্লিক এঁরা এসে সময় সময় বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। মানভূমে কমিউনিস্ট আন্দোলন জঙ্গি রূপ নেয় ক্রমঃ

নকুল মাহাতর নেতৃত্বে। অযোধ্যা পাহাড়ে কখনো বা মাসের পর মাস বনের শেঁওয়া কুল খেয়ে, কখনো বা বাঁকুড়া, বিহারের প্রত্যন্ত এলাকায় কখনো হেঁটে, কখনো সাইকেলে গিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে মানুষকে তিনি সংগঠিত করেন। বলরামপুর এলাকায় তাঁর সাথী ছিলেন কানা গ্রামের লালমোহন সিং, বসন্ত পরামানিক, শ্রীপতি রজক প্রমুখেরা। পরে অবশ্য মতাদর্শের কারণে লালমোহন সিং, বসন্ত পরামানিক প্রমুখকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃতও করা হয়। পরবর্তীকালে বিক্রম টুডু, মণীন্দ্র গোপ প্রমুখের অপূর্ব সংগঠনিক দক্ষতায় বলরামপুর বরাবাজার এলাকায় কমিউনিস্ট আন্দোলন আরো জোরদার হয়। মানভূম কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম অফিস ছিল ধানবাদে। সারা মানভূম জেলাতেই আরো বিভিন্ন নেতৃত্বের অক্লান্ত পরিশ্রমে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন দিন দিন তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে।

মানভূমে ভাষা আন্দোলন

১৯১২ সালে মানভূমকে বিহারের সাথে জুড়ে দেওয়ার পর থেকেই এখানকার মানুষ আন্দোলন করেছেন নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে। তৎকালে মানভূমের ৭২% লোকের ভাষা ছিল বাংলা। তথাপি শাসনতান্ত্রিক সুবিধার অজুহাতে মানভূমকে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দিয়ে যত্রতত্র হিন্দি স্কুল নির্মিত হতে থাকলে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন এখানকার মানুষ। ১৯৫৩ সালে কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এই সময়কালের ব্যাপক গণবিক্ষোভ এবং শ্রীপট্টি শ্রীরামালুর আত্মদানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর গঠিত হয়েছিল তেলেগু ভাষা-ভাষী অন্ধ্রপ্রদেশ। অন্ধ্রের এই আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মানভূমেও বাংলাভাষা ও বঙ্গভুক্তির আন্দোলন যেন এক নতুন প্রাণ পেল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে (১৯০৫ খ্রিঃ) বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের সময়কালের চারণকবিদের মতো টুসু ও ঝুমুর গানের মাধ্যমে মানভূমের স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা বঙ্গভুক্তির প্রশ্নে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আন্দোলনের বার্তা। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, গিরিশ মাহাত, ভজহরি মাহাত প্রমুখ। তৎকালীন এম পি ভজহরি মাহাত দিল্লিতে বসেই টুসু গান রচনা করতেন।

নিম্নলিখিত গানটি তখনকার দিনে ছিল বেশ জনপ্রিয়।

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোরা কি তারে
বাংলা ভাষা রে।

এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাতপুরুষের আমলে
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে।

এই ভাষাতেই পর্চা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাতপুরুষের হকপাটা।

দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাগ্যের চির অধিকার
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার।

হিন্দিভাষীরা তখন বাংলাভাষীদের সহ্য করতে পারতেন না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাঙালি শিক্ষকদের তাড়িয়ে হিন্দি শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছিল। হিন্দিতে না পড়ালে শিক্ষকদের বেতন, ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে—এই বলে ডি আই স্বয়ং হুমকি দিয়েছিলেন। অনেক বাঙালি শিক্ষক এই সময় বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। প্রতিবাদী ছাত্ররাও সরকারি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গাছতলায় পড়াশোনা করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন। বিহার সরকারের এহেন অত্যাচারের জবাবও টুসু সত্যাগ্রহীরা দিয়েছিলেন টুসু গানের মাধ্যমে।

পাটনা বিহার বিধানসভায়
হিন্দি ভাষার দল ভঁারি
(তাই) ভোটের জোরে ভাঙছে তারা
লোকসেবকের কল গাড়ি।

মানভূমেরই মাতৃভাষা
বাংলা ভাষা চারধারে,
সেই কারণে বাংলা দমন
চালায় বিহার সরকারে।

হোক না যতই দমন পীড়ন
হিন্দি রাজের অত্যাচার
লোকসেবকের অটল গাড়ি
টলবেনাকো কোন ধার।

বিহার পুলিশের জুলুম এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল টুসু গানের মাধ্যমেই।

"শুন বিহারি ভাই—
তোরা রাখতে লারবি ডাং দেখাঁঞ...।"

মানভূমের বঙ্গভূমির পক্ষে ও বিপক্ষে প্রতিবাদে সেচ্চার হয়েছিল তৎকালীন মানভূমের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও। 'মুক্তি' তো প্রথমে থেকে ছিলই। এছাড়াও 'মর্মবীণা', 'কল্যাণবার্তা', 'হরিজন কল্যাণ সংবাদ', 'পল্লীসেবক', 'তপোবন', 'অগ্রগামী', 'মানভূম' প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এবং 'নিরালা', 'প্রগতি', 'জনসৈবক', 'সমবেত' প্রভৃতি হিন্দি প্রত্রিকাগুলি বঙ্গভূমির পক্ষে ও বিপক্ষে জোর সওয়াল চালাতে থাকে।

মানভূমে ভাষা আন্দোলনের এই উত্তাল তরঙ্গ দেখে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ সিংহ এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে একত্রিত করে পূর্ব প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে যার সরকারি ভাষা হবে হিন্দি ও বাংলা। ১৯৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের উপরোক্ত বিবৃতি

আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে। তখন শুধু আর মানভূমে নয় প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হল সারা বাংলা জুড়ে। জেলায় জেলায় এবং কলকাতায় শুরু হল আইন অমান্য অন্দোলন। অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পুরুলিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল দীর্ঘ পদযাত্রা। টুসু আর ঝুমুরে কম্পিত হল বাংলার আকাশ-বাতাস। শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমেত এক বিশাল বাহিনী মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে এগিয়ে চলল কলকাতা অভিমুখে। ১৯৫৬ সালের ৬ মে এই বাহিনী কলকাতা পৌঁছায়। ইতিমধ্যেই অবশ্য মানভূমে গণ-প্রতিবাদের ব্যাপকতা লক্ষ করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। তথাপি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে টুসু সত্যাগ্রহে ৩২০০ জন স্বেচ্ছাসেবী কারাবরণ করেন।

ক্ষুধামুক্তি এবং হাল-জোয়াল অন্দোলন

১৯৫৩ সালে শস্যহানির কারণে দেখা দিয়েছিল তীব্র খাদ্যাভাব। এই সময় আবার বিহার সরকার জেলার বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করা নিষেধ করে দেয়। মানভূমে দেখা দিল খাদ্যের জন্য হাহাকার। সত্যাগ্রহীরা এই সময় বাঁকুড়া থেকে ট্রাকে বোঝাই করে চাল এনে ক্ষুধার্তদের সরবরাহ করেন। ভাষা.আন্দোলন এইভাবে 'ক্ষুধামুক্তি' আন্দোলনের রূপ নিয়ে সমস্ত রকমের নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে সংগ্রামী মানভূমের সংগ্রামী ধারাকে বহমান রাখে।

টুসু সত্যাগ্রহে আন্দোলনকারীদের মধ্যে সবাই ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ। ওই কৃষকদের জব্দ করার জন্য বিহার সরকার জেলার মধ্যে কাঠের হাল-জোয়াল বিক্রি করা বন্ধ করে দেন। প্রতিবাদে সত্যাগ্রহীরা নিষেধ অমান্য করে অফিস-আদালতের সামনে হাল-জোয়াল বিক্রি শুরু করে দেন। আন্দোলনের চাপে বিহার সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। মানভূমের এই আন্দোলনই 'হাল-জোয়াল আন্দোলন' নামে পরিচিত।

পুরুলিয়ার সৃষ্টি

১৯৪৭ সালে এসেছিল বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। যদিও সেই স্বাধীনতার স্বাদ তেতো, জন্ম নিয়েছিল কীটদগ্ধ, বিকলাঙ্গ ভারতবর্ষ। তথাপি বলা যায় ১৯৫৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা বলা হয়। যাইহোক ১৯৫৩-এর ডিসেম্বরে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, লোকসেবক সংঘ এবং অন্যান্য সংগঠন মিলিতভাবে ওই কমিশনের কাছে এক মেমোরেন্ডাম পেশ করেন, যাতে মানভূমকে পশ্চিমবাংলার মধ্যে নিয়ে আসার কথা বলা হয়।

১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন রিপোর্ট দেয় যে—

"Manbhum is really composed of two different areas which are divided by the Damodar. These areas are now treated as two sub-districts–Dhandad which is the industrialised area, in which Hindi is predominant, differs from Purulia which is comparatively less industrialised, and has a greater concentration of the Bengali-speaking people..."

কমিশনের মতে ধানবাদকে এই কারণে পশ্চিমবাংলায় আনা হল না কারণ সেখানকার ৫৬% লোকের ভাষা হিন্দি। অপরদিকে পুরুলিয়া ছিল বাংলা প্রভাবিত। তাই একে আনা হল পশ্চিমবাংলার মধ্যে।

অবশেষে দীর্ঘদিনের ভাষা আন্দোলন, জেল-জরিমানা, ঘাত-প্রতিঘাত এবং টানা-পোড়েনের মাঝখানে ১৯৫৬ সালে পাশ হল— Bihar and West Bengal Transfer of Territories Act 1956, এই আইনের Clause (b) of Sub-Section I of Section I অনুযায়ী এতদিন থেকে বিহারে থাকা মানভূম জেলাকে ভেঙে তিন টুকরো করা হল। ধানবাদ মহকুমার ১০টি থানার সঙ্গে চাষ ও চন্দনকিয়ারি যুক্ত করে গঠিত হল ধানবাদ জেলা এবং তা থাকল বিহারে। পুরুলিয়া সদর মহকুমার ২১টি থানার মধ্যে দুটিকে আবার নিয়ে নেওয়া হল ধানবাদ জেলায়। মাতৃজঠর থেকে বাংলার সাথে যাঁদের প্রাণের সম্পর্ক, জীবনের প্রথম প্রভাতে 'মা', 'মা' বলে পৃথিবীর সাথে যাদের প্রথম পরিচয় সেই বাংলা ভাষা-ভাষীদের প্রবল আপত্তি এবং লড়াই-আন্দোলন সত্ত্বেও টাটা কোম্পানিকে খুশি রাখার জন্য চাণ্ডিল, পটমদা এবং ইঁচাগড় থানাকে জুড়ে দেওয়া হল বিহারের সিংভূম জেলার সাথে। বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অধীনে থাকলেও বাংলা ভাষার পক্ষে ওই এলাকাগুলিতে এখনো চলছে জোরদার লড়াই। এতদিনকার ঐতিহ্য, নবাব-বাদশাদের সেই সুবে বাংলা, জঙ্গলমহলের মধ্য দিয়ে যার সূচনা, পুরুলিয়ার মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি। খনিজভাণ্ডার এবং সমস্ত শিল্পাঞ্চলসমূহ থেকে গেল বিহারে। আখের রসটুকু শুষে নিয়ে কুমারী, শিলাই, দারকেশ্বর, কংসাবতীর দোহাই দিয়ে পুরুলিয়া নিক্ষিপ্ত হয় পশ্চিমবাংলায়। ১৯৫৬-এর ১ নভেম্বর থেকে পথ চলা শুরু হল—'পাষাণময় এই দেশের।'

ঋতুচক্রের আবর্তনে বৎসর ঘুরে চলে। চাষ, চন্দনকিয়ারি, দুমকা, চাণ্ডিল, পটমদা, ইঁচাগড়ের আপামর মানুষ এখনো স্বপ্ন দেখেন নিজেদের মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার। আল্‌চিকির প্রশ্নে সাঁওতাল ভাইদের নিত্য নব উন্মাদনা। পবিত্র সরকার কমিশনের প্রস্তাবনায় তারই সফল প্রয়োগের নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা।

জয়চণ্ডী, রাকাব জঙ্গল আর দলমার পাহাড়তলিতে আজও বহে যায় অশান্ত পাহাড়ি ঢেউ, আর তারই সুরেলা সোহাগ প্রতিধ্বনিত হয় ঋষিকন্যা কুমারী, কাঁসাই, টটকো, নেংসাই হনুমাতা, শিলাই, দ্বারকেশ্বরের তীরে তীরে, সাঁতুড়ি, নিতুড়িয়া, মালতীর উঁচু-নিচু ভূমিতে কয়লা আর পাথর খাদানে—দূরের পাহাড়ে শহিদদের সমাধিক্ষেত্রে। মৃদু বাতাসের অশরীরী কণ্ঠে শোনা যায় শহিদদের জয়গান। রুখা মাটির এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দিগন্তজোড়া বিস্তীর্ণ ক্ষেতে ক্ষেতে দোলে সেই গানের সঙ্গে সোনালি ধানের শীষগুলি। এই ধান আর জমি রক্ষার জন্যই প্রাণ দিয়েছিল জানা-অজানা জিলপা লায়া, ভরত ভুইঞা, গোবিন্দ-চুনারামের দল। শত শক্তি নিয়োগ করেও ব্রিটিশ বাহিনী যাদের মাথা নোয়াতে পারেনি, শক্ত মাটির শক্ত মানুষের সেই বংশধরেরা শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আজও বিদ্রোহ জানায়। রচিত হয় 'জঙ্গলমহল থেকে পুরুলিয়ার' মতো সংগ্রামের এক-এক রক্তাক্ত অধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। The Bhumij Revolt—(1832-33), Dr. J. C. Jha.

২। Bengal District Gazetteer, Purulia.

৩। মুক্তি পত্রিকা

৪। Modern India—Sumit Sarkar.

৫। ভারতের আদিবাসী—সুবোধ ঘোষ

৬। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা—কৃষ্ণ ধর

৭। শংকরীপ্রসাদ সিং—বামনী

৮। অসিত সিং—রূপসান

৯। সরস্বতী সিং—বাঁধডি

১০। মানভূম গেজেটিয়ার

১১। গঙ্গানয়ন সন্দেশ (১৯৯২)

১২। বাবুনাথ হাঁসদা—কালিপুর



মানভূমে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

সুদীপ্তা মুখার্জী (চক্রবর্তী)

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভের সময় থেকেই (১৭৬৫) মানুষের মনে অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পূর্বেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বার বার সশস্ত্র সংগ্রাম মানভূম অঞ্চলে দেখা দেয়। চুয়াড় বিদ্রোহ এবং গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামাগুলি তারই প্রমাণ। মহাবিদ্রোহের দুই বৎসর পূর্বে সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূমে অনুষ্ঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহও মানভূমের জনগণের অসন্তোষকে অপ্রত্যক্ষভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল। বিদ্রোহগুলির ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা তথা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবের ফলে ইংরেজের পক্ষে এই বিদ্রোহগুলি দমন করা সম্ভব হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ছিল ব্যাপক, যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভিত্তিপ্রস্তরকে কাঁপিয়ে দিয়ে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলে আপাতত কোনো বিক্ষোভ দেখা দেয়নি—কেননা ভারতীয় জমিদারবর্গ বা প্রজারা ঠিকমতো এই পরিবর্তন বুঝতেই পারেনি। দেওয়ানি লাভের পূর্বে ১৭৬০ সালে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম চাকলাগুলি কোম্পানি লাভ করে তথা কলকাতা ও চব্বিশ পরগনাতে কোম্পানির জমিদারিতেও আপাতশান্তি বজায় ছিল। এখন ইংরেজ কোম্পানির হাতে বর্ধমান চাকলার পঞ্চকোট জমিদারি[১] এবং মেদিনীপুর চাকলার দক্ষিণ মানভূমের মানভূম (মানবাজার), বরাহভূম, ধলভূম পাতকুম ইত্যাদি জমিদারিগুলিও পূর্ব থেকেই কোম্পানির করায়ত্ত ছিল। কাজেই ১৭৬০ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে মানভূমে কোনো বিক্ষোভ দানা বাঁধেনি। ১৭৬৫ সালের পর থেকেই মানভূম অঞ্চলে কোম্পানি রাজস্ব আদায় করতে যেতেই জনগণ এই পরিবর্তনটি ধরে ফেলে। সেই সময় থেকেই বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। ওই বৎসরেই ক্লাইভকে লেখা এক চিঠিকে কোম্পানির নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ জানান যে পঞ্চকোটরাজ কোম্পানির দস্তককে অগ্রাহ্য করে কোম্পানির গোমস্তা গোপীনাথকে বন্দি করে তার কাছ থেকে ১২৩টি কাঠের গোলা ছিনিয়ে নিয়েছে। রেজা খাঁ ক্লাইভকে আরও জানান যে **"The Zamindar did not pay the malguzary to the circar"** এবং তাঁর কোন এজেন্টকেও তিনি মুর্শিদাবাদে পাঠাননি।[২]

মহাবিদ্রোহের আগে মানভূম অঞ্চলে কয়েকটি বিদ্রোহ ও সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে জেলার

ভাগ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রধানতম ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। ফলে মানভূম অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ১৭৬৭ থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে যে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল— তাকেই ব্রিটিশ সরকার চুয়াড় বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছিল। ফলে মানভূম অঞ্চলের অঙ্গচ্ছেদ হয়ে—১৮০৫ সালে গড়ে উঠল জঙ্গলমহল জেলা, যাকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র (Non Regulated Area) বলে ঘোষণা করা হল। এরপর ১৮৩১ সালে বরাহভূম জমিদারিকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল—তা ইতিহাসে ভূমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা নামে পরিচিত। এর ফলে ১৮৩৩ সালে মানভূম জেলা জন্মলাভ করে। নবগঠিত মানভূম জেলার আয়তন হল ৭,৮৯৬ বর্গ মাইল। মানভূমও অনিয়ন্ত্রিত জেলারূপে ঘোষিত হল যেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে অতিরিক্ত সামরিক ক্ষমতা দিয়ে ডেপুটি কমিশনারকে বসান হল। প্রথমে মানবাজার ও পরে ১৮৩৮ সালে পুরুলিয়ায় হল জেলার সদর দপ্তর। মানভূম জেলাটি পূর্বের মতোই বঙ্গদেশের অন্তর্গত কিন্তু নবগঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম এজেন্সি বিভাগে সামিল হল। ১৮৫৪ সালে এই দক্ষিণ-পশ্চিম এজেন্সির নাম পরিবর্তন করে ছোটনাগপুর বিভাগ নামকরণ করা হল।[৩] কাজেই বঙ্গদেশের একটি বিভাগ রূপে ছোটনাগপুর আত্মপ্রকাশ করল। মানভূম জেলার পুরুলিয়া সদর এবং ১৮৫২ সালে গোবিন্দপুরে নূতন সাব-ডিভিসন স্থাপিত হল। সমগ্র মানভূম জেলায় সে সময় মাত্র ১০টি থানা ছিল।[৪]

এই মহাবিদ্রোহের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক শোষণ যা সমগ্র উত্তর ভারতকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আমাদের এই নব্য বিদেশি শাসকবর্গ তাঁদের স্বার্থপর অর্থনীতি দ্বারা স্থানীয় রাজা ও জমিদারগণকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করেছিলেন। ফলে এই নীতি জনগণের পক্ষেও ক্ষতিকারক ও মর্যাদাহানিকর হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষকসমাজ যারা সেদিন দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ ছিল। এই কৃষকসমাজ নিজেদের জীবনযাপনের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে ইংরেজ কোম্পানির জমি-রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি ছিল কঠোর, ত্রুটিপূর্ণ এবং অত্যাচারপূর্ণ। পূর্বতন মোঘল সম্রাটদের রাজস্বনীতি তারা পরিত্যাগ করেছিল। কেননা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশের নয়, নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা। প্রতি বৎসর অর্থ কিংবা সামগ্রী দিয়ে এই রাজস্ব আদায় করা হত। এই রাজস্ব আদায় হত ফেব্রুয়ারি এবং সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের অনেক আগে। ফলে জনগণের অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের ভুল শোধরাবার ব্যবস্থা তো করেইনি, উপরন্তু রাজস্ব আদায়ের সময় বৃহৎ সেনাবাহিনী তাদের সাথে থাকত। এইভাবে কৃষকদের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই মহাবিদ্রোহ শুরু হওয়ার তৎকালীন কারণ ছিল সেনাদলের মধ্যে এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন। এই নূতন রাইফেলের কার্তুজগুলি গরু ও শুয়োরের চর্বি দ্বারা সৃষ্ট আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হত। এই আবরণের চামড়াটি দাঁত দিয়ে কেটে তার কার্তুজগুলি ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে কোলকাতার এক বাঙালি করণিকের উপর কার্তুজগুলির তৈরি ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করার ভার দেওয়া হয়েছিল। কাজেই সর্বপ্রথম তিনি এই ব্যাপার জেনে ভীত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।[৫] ফলে ভারতীয় সিপাহিদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে তাদেরকে খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ইংরেজ সরকার এই প্রচেষ্টা শুরু করেছে। কাজেই ২৯ মার্চ বারাকপুরে সৈনিক ছাউনি থেকে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ ঘোষণা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। সিপাহিদের এই অসন্তোষ বারাকপুরে

সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র উত্তর ভারতকে বিশেষত মীরাট, আম্বালা এবং লখনৌকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে ক্লাইভের সময় গড়ে ওঠা বেঙ্গল নেটিভ ইনফেন্টারির মূল কাঠামোটি বিহার তথা উড়িষ্যা বিভাগগুলি থেকে তথা অযোধ্যা রাজ্য থেকে সংগৃহীত যুবকবৃন্দ নিয়ে তৈরি হয়েছিল। সেনা সংগ্রহের এই ধারা মহাবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এছাড়া মুঘল, মারাঠা, দেশীয় রাজা ও জমিদারদের ভেঙে দেওয়া সেনাবাহিনীর অনেকেই কোম্পানি সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সৈন্যদলের তিন-চতুর্থাংশ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। এদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের সংখ্যাধিক্য ছিল। মহাবিদ্রোহের সময় প্রেসিডেন্সি বিভাগে দেশীয় সৈনিকদের একাধিক ছাউনি ছিল। তাদের মধ্যে প্রধান-প্রধান ছাউনি ছিল ফোর্ট উইলিয়াম, দমদম, বারাকপুর, বহরমপুর ও মেদিনীপুর। অন্যদিকে ছোটনাগপুর বিভাগের প্রধান ছাউনিগুলি ছিল রামগড়, রাঁচি, পুরুলিয়া এবং হাজারিবাগে। যেহেতু সেনাবাহিনীতে অনেক ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবনা জাগ্রত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।[৭]

বিহারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ছাউনি ছিল দানাপুরে। এই স্থানটি কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাওয়ার পথে জল ও স্থলবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। এই স্থানের সৈনিকেরা কোনোরূপ অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও ব্রিটিশ সরকার তাদের উপর সন্দীহান হয়ে পড়ে এবং সিপাহিগণকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা শুরু করে। ফলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে আরার দিকে যাত্রা শুরু করে। সেখানে তারা জগদীশপুরের রাজপুত জমিদার কুনওয়ার সিংহের সেনাদলের সাথে মিলিত হয়। ফলে বিহার বিদ্রোহী সিপাহিদের দ্বারা উত্তাল হয়ে ওঠে এবং আগস্ট মাসে তারা বিহারের বিভিন্ন স্থানে লুটপাট শুরু করে। ৮ সেপ্টেম্বর তারা নওয়দায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার সরকারি ভবনগুলি ধবংস করে গয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে। এখানে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে তারা দুর্বার গতিতে গয়া শহরে প্রবেশ করে। তারা গয়া কারাগারের বন্দিগণকে মুক্ত করে এবং ব্রিটিশ অধিবাসীদের বাসগৃহগুলি ধ্বংস করে ফেলে। পরে তারা দেওঘরে গিয়ে উপদ্রব শুরু করলে ব্রিটিশ বাহিনী দ্বারা বিতাড়িত হয়। অন্যদিকে রামগড় ছাউনির সৈনিকেরা হাজারিবাগে এসে উপস্থিত হলে সেখানকার অবস্থা মারাত্মক রূপ ধারণ করে।[৮] বিদ্রোহীরা হাজারিবাগ জেল ভেঙে প্রায় ৮০০ বন্দিকে মুক্ত করে, ট্রেজারির ৭৪,০০০ টাকা লুণ্ঠন করে এবং সরকারি তিনটি বাংলো ও আদালতগৃহ ভস্মীভূত করে। এইভাবে বিদ্রোহীরা হাজারিবাগে ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করার পর রাঁচির দিকে যাত্রা করে।[৯]

মানভূম জেলার শাসনকার্য পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সত্ত্বেও বিদ্রোহ ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে জেলাকে রক্ষা করা যায়নি। বিহারে শুরু হওয়া মহাবিদ্রোহের প্রভাবে মানভূমও উত্তাল হয়ে ওঠে। মানভূমে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল প্রধানত ভূমিভিত্তিক অসন্তোষ (Agrarian discontent)। পঞ্চকোট-এর জমিদার রাজা নীলমণি সিংদেও-এর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ উগ্র আকার ধারণ করে। এইসময় নীলমণি সিংহ ছিলেন পঞ্চকোটের সুযোগ্য ও গণ্যমান্য রাজা। ১৮২৩ সালে কেশবগড়ে তাঁর জন্ম হয়। পরে কাশীপুরে নূতন রাজভবন তৈরি হলে ১৮৩২ সালে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪১ সাল থেকে তিনি জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা শুরু করেন এবং পিতা গরুড়নারায়ণের মৃত্যুর পর ১৮৫১ সালে তিনি সিংহাসনে বসেন।[১০]

৫ আগস্ট পুরুলিয়ায় বিদ্রোহ শুরু হয়। ইতিমধ্যে রামগড় ছাউনির সৈনিকেরা হাজারিবাগ

থেকে পুরুলিয়ায় এসে উপস্থিত হয়। পুরুলিয়া শহরে অবস্থিত রামগড় ছাউনির অপর বাহিনীটিও তাদের সাথে যোগদান করে। ফলে এখানে বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। পুরুলিয়ায় রামগড় বাহিনীর ৬৪ জন সিপাহি ও ১২জন ঘোড়সওয়ার পুরুলিয়া ট্রেজারি থেকে লক্ষাধিক টাকা লুট করে, প্রায় ৩০০ বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং সরকারি ভবনের আসবাবপত্র ভস্মীভূত করে।[১১] বিদ্রোহ চলাকালীন পঞ্চকোট রাজপরিবারের এক সদস্য এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে এই সমস্ত দলিলপত্র ভস্মীভূত করা হয়। বিদেশি শাসকদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে তারা ডেপুটি কমিশনারের রেকর্ড রুমটিও ভস্মীভূত করে। এরা পুরুলিয়া-রঘুনাথপুর রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করে।[১২] অন্যদিকে পুরুলিয়ায় তাদের কাজ শেষ হয়েছে মনে করে রামগড় ছাউনির সৈন্যদল রাঁচির উদ্দেশে যাত্রা করে।

মহাবিদ্রোহ কেবলমাত্র পুরুলিয়া শহরে সীমাবদ্ধ না থেকে পঞ্চকোট ও রঘুনাথপুর অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। রঘুনাথপুরের আদালতগৃহ ভস্মীভূত করা হয় এবং পুরানো দলিল-দস্তাবেজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিত হলেও বাংলার লেফটেনান্ট গর্ভনরের অধিন দুই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের অধিকাংশ স্থানই আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।[১৩] উড়িষ্যাসহ ছোটনাগপুরের সমগ্র অঞ্চল মহাবিদ্রোহে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলান্দাজ বাহিনী নিয়ে গঠিত রামগড় ব্যাটেলিয়ানের সৈন্যদল হাজারিবাগ রাঁচি, পুরুলিয়া, চাইবাসা ও সম্মলপুরে ছড়িয়ে ছিল।

হাজারিবাগে বিদ্রোহের সময় ঝালদার রাজা হাজারিবাগ জেলে বন্দি ছিলেন। সিপাহিরা তাঁকে পূর্বেই মুক্ত করে দিয়েছিল এবং তাঁকে পুরুলিয়া-রাঁচি রাস্তাটি রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে মানভূমের ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন জি এন ওক্‌সের কাছে এসে ইংরেজদের সাহায্যে হাজির হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মানভূমের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানগুলিতে যাতে বিদ্রোহীরা প্রবেশ করতে না পারে তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[১৪]

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্যাপ্টেন ওক্‌স পুরুলিয়ায় থাকা নিরাপদ মনে করলেন না এবং আতঙ্কিত অবস্থায় পুরুলিয়া ছেড়ে রানীগঞ্জে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই সময়ে ভীত ওক্‌স সাহেব জানিয়েছিলেন যে মানভূমের সাঁওতালগণকে নীলমণি সিংদেও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে তুলেছেন এবং সাঁওতাল বাহিনীই এই অঞ্চলে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। সাঁওতাল বাহিনী কেবলমাত্র পুরুলিয়াতেই নয়, তারা জয়পুরের জমিদারকেও আক্রমণ করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তৎসত্ত্বেও বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ই ডেপুটি কমিশনার ওক্‌স পঞ্চকোটরাজের কাছ থেকে সৈনিক সাহায্য চেয়েছিলেন। পঞ্চকোটরাজ তাঁকে কোনোরূপ সাহায্য প্রদান করা তো দূরের কথা, তিনি ওক্‌সকে সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্বও গ্রহণ করেননি। নিজ প্রাসাদ রক্ষার জন্য তাঁর কাছে সামান্য পরিমাণই সৈনিক আছে এই অজুহাতে তিনি ওক্‌সের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৫]

রামগড় ব্যাটেলিয়ানের সৈনিকেরা পুরুলিয়ায় বিদ্রোহ করলে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সেখায়তি ব্যাটেলিয়ানের একাংশও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। এদিকে ওক্‌স সাহেব রানীগঞ্জে পালিয়ে এসে সেখানে এক অস্থায়ী সামরিক শিবির গড়ে তোলেন। নভেম্বরে সেখায়তি ব্যাটেলিয়ানের একাংশকে কর্নেল ফস্টারের নেতৃত্বে কাশীপুরে পাঠানো হয়। তিনি অতর্কিতে কাশীপুর অবরোধ করে রাজা নীলমণি সিংহকে বন্দি করেন। প্রাসাদ ও দুর্গে তল্লাসি চালিয়ে কয়েকটি কামানও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই অবস্থায় ক্যাপ্টেন ওক্‌স পুরুলিয়া পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। স্থানীয় আদিবাসীদের নিয়ে তিনি এক সেনাদলও গড়ে তুলেছিলেন। এরপর সেপ্টেম্বর

মাসের গোড়ার দিকে তিনি বিনা বাধায় পুরুলিয়া দখল করেন। এই দীর্ঘ ২৩ দিন পুরুলিয়া শহর তথা মানভূম জেলায় বিদেশি শাসন ছিল না। পঞ্চকোট রাজাকে বন্দি করে তাঁকে প্রথমে শান্তিপুরে ও পরে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। এই ঘটনায় জেলার সাঁওতালেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে।[১৬]

কেবল মানভূমেই নয়, এই বিদ্রোহের বহ্নিশিখা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই সৈনিক বিদ্রোহ দমনের জন্য লেফ্টেনান্ট গ্রাহামকে হাজারিবাগে পাঠানো হয়, যেখানে মাধব সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা সরকারি ভবনগুলি ভস্মীভূত করতে শুরু করেছিল। বিদ্রোহীরা রাঁচিতে উপস্থিত হয়েও সেখানের সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং বন্দিগণকে জেল থেকে মুক্ত করে। এদিকে পুরুলিয়া থেকে আগত রামগড় ব্যাটেলিয়ানের সৈনিকেরাও এই বিদ্রোহীদের সাথে রাঁচিতে মিলিত হয়। রাঁচি থেকে তারা চাতরায় গমন করে। সিংভূমেও পোড়াহাটের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঝালদার কারখানায় প্রস্তুত বন্দুকের সাহায্যে সিংভূমের সিপাহিরাও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। সম্ভবত এই সমস্ত সিপাহি বাহিনীই রোহতাসগড়ে অবস্থিত কুনওয়ার সিংহের বিদ্রোহী সেনাদলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হতে থাকে।[১৭] ফলস্বরূপ বাংলার লেফ্টেনান্ট গভর্নর মানভূমসহ সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলে সামরিক (Martial Law) আইন জারি করেন।[১৮]

কলকাতায় অবস্থানকালে রাজা নীলমণি সিংহদেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন—এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়। ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং নীলমণি সিংহের লোকপ্রিয়তা লক্ষ করে তাঁকে কলকাতা থেকে মার্চ, ১৮৫৯ সালে কাশীপুরে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। নীলমণি সিংহ মানভূম অঞ্চলে যথেষ্ট সম্মান ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে বহু রাজোচিত গুণ ছিল। তিনি সাহসী, সুবক্তা ও হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী রাজা হিসেবে জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বিদ্যানুরাগ ও ছিল অসাধারণ। তাঁর রাজধানী কাশীপুরকে ওই সময় 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ' বলে অভিহিত করা হত।[১৯]

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক এই মহাবিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহিদের বিদ্রোহ হিসেবে বর্ণনা করলেও অনেকে একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দুটি যুক্তি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হলেও দুটির মধ্যেই আংশিক সত্যতা লক্ষ করা যায়। মানভূমে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল রামগড় ব্যাটেলিয়ানদের হাত ধরে, কিন্তু সেই বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন রাজা নীলমণি সিংদেও। তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছিল অনেক উপজাতিবৃন্দ বিশেষত সাঁওতালেরা। রাজার স্বদেশভক্ত কিছু সামরিক বাহিনী, যাদের মধ্যে ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল অধিক। রাজার এই Militia বাহিনী নিঃসন্দেহে রাজাকে সাহায্য করেছিল। অন্য কয়েকটি রাজ্যের মতো মানভূমের কোনো রাজা বা জমিদারকে গদিচ্যুত করা হয়নি—তৎসত্ত্বেও এখানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য জাতীয়তাবাদের আধুনিক যে সংজ্ঞা তা সেদিন আশা করতে পারা যায় না। তৎসত্ত্বেও বলা যেতে পারে এখানে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ না হলেও জনগণের আংশিক সমর্থন এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল। পুরুলিয়ার অরণ্য অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষের আগুনে ধূমায়িত হচ্ছিল। ভারতে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যে মন্তব্য করেছেন— তা মানভূম জেলার পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য বলা যেতে পারে। জনগণের সার্বিক জয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, "No visible symbol was left of its authority

in many localities, and there was almost a complete political vacuum and lack of any kind of authority."[২০]

মানভূমি অঞ্চলে মহাবিদ্রোহের পৃষ্ঠভূমি আগে থেকেই তৈরি ছিল। মহাবিদ্রোহের কিছুদিন পরে ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ মিস্টার ভি বল মানভূমে এসেছিলেন। তিনি তাঁর যাত্রাপথের প্রতিদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে যেতেন। পঞ্চকোটরাজ নীলমণি সিংহের মনোভাব ব্রিটিশদের প্রতি অনুকূল ছিল না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। মহাবিদ্রোহের প্রভাব হিসেবে মানভূম এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মি. বল দ্বিতীয়বার পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এসে এই দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক পরিণতি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। উড়িষ্যা থেকে দলে দলে মানুষ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে একমুঠো আহারের সন্ধানে আসতে শুরু করেছিল। পথের উপর উন্মুক্ত স্থানে তাঁরা দলে দলে প্রাণ হারাতেন। অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক প্যারীমোহন আচার্য দুর্ভিক্ষর করাল স্পর্শ সম্বন্ধে লিখেছেন "অনশনক্লিষ্ট শিশু সন্তানদের বন্য পশুর সামনে ছুঁড়ে দিতেন পিতা-মাতারা। কেউ কেউ রাক্ষসের মতোই নিজেদের সন্তানকেই আহার করতেন।" এই দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার লক্ষ-লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। উড়িষ্যার জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। এর ফলে পুরুলিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে উড়িষ্যাবাসীদের আগমন ও বসবাস শুরু হয়।[২১]

দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে মানভূমও রক্ষা পায়নি। ১৮৬৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ মানভূমে প্রবল আকার ধারণ করে। তৎকালীন জেলা পুলিশ অধীক্ষক ওই বৎসর ১৫ মার্চ তাঁর চিঠিতে এ সম্বন্ধে গভীর হতাশা ব্যক্ত করে লেখেন "These were largely due to scarcity." দুর্ভিক্ষে জেলার অধিবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি লেখেন: "Not only the very poor, but even the more respectable natives had been forced to eat mahua and the like".[২২] এই রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলার ডেপুটি কমিশনার সমস্ত জমিদারদের নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেন জেলার খাদ্যশস্য বাইরে যেতে না দেন। দুর্ভিক্ষের ফলে ওই বৎসর মে মাসে ডাকাতির সংখ্যা মানভূমে বৃদ্ধি পায়। ফলে ১২ জুন ডেপুটি কমিশনার পত্রে পুনরায় লেখেন, "There is fearful distress among the Santhals. Bhoomiz, Harrees, Bowree and such tribes known by the general terms chouhars. Thousands of these people have nothing to feed on but the grass, roots of trees and the seed of sal tree. Many have died on starvation or diseases caused by it and the distress is daily increasing."[২৩]

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের পরিসমাপ্তি হয় এবং ভারতের শাষণভার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজ হাতে গ্রহণ করে। রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের উন্নতির জন্য নানারূপ প্রতিশ্রুতি দিলেও এবং তদনুসারে রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, ডাকবিভাগের পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য পরিসেবা কার্যক্রম এবং পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নতি হলেও মানভূম অঞ্চলের জন-অসন্তোষ দূর করা সম্ভবপর হয়নি। এই অসন্তোষ ছিল মূলত ভূমি সম্বন্ধীয়। ফলে মানভূম অঞ্চলকে আরও দৃঢ় নাগপাশে বাঁধার উদ্দেশ্যে জেলার পরিধি কমিয়ে আনার কাজ শুরু হয়। ফলে ১৮৭১ সালে দামোদর নদের উত্তরে ও বরাকরের পূর্বদিকে অবস্থিত পাঁড়রা অঞ্চলটি বর্ধমানের সাথে এবং মহিষাড়া ও ছাতনাকে বাঁকুড়ার সাথে যুক্ত করা হয়। এছাড়া ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ সালের সরকারি আদেশবলে মানভূম জেলা থেকে সুপুর, রাইপুর, অম্বিকানগর,

সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, ফুলকুসমা ও শ্যামসুন্দরপুরকে বাঁকুড়ার সাথে যুক্ত করে ১৮৮১ সালে নূতন বাঁকুড়া জেলার গোড়াপত্তন হয়।[২৪]

মহাবিদ্রোহের প্রভাবের ফলে এইভাবে মানভূমের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে, ভূমি সম্বন্ধীয় অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই জনগোষ্ঠী যেন একই জেলায় সংঘবদ্ধ হতে না পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অসন্তোষকে দূর করা সম্ভব হয়নি। ১৮৫৯-৭০ সালে মানভূমের টুণ্ডি অঞ্চলে সাঁওতাল প্রজাদের সাথে সেখানকার জমিদারদের সংঘর্ষ তুঙ্গে ওঠে। জঙ্গলে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাঁওতাল ইজারাদারদের ৫২টি গ্রাম জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ ভয়ভীত জমিদার টুণ্ডি পরিত্যাগ করে কাতরাসে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেন। এই ঘটনার ফলে কমিশনার ডাল্টন হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন এবং সাঁওতালদের সাথে সরকারের এক অস্থায়ী সমঝোতা হয়।

কয়েক বৎসর পরেই ১৮৮১ সালে গোবিন্দপুর সাবডিভিসনে পুনরায় সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। জনগণনা করার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি গৃহে খোঁজখবর নিতে থাকলে নিরীহ ও সরল গ্রামবাসীরা সন্দিহান হয়ে পড়ে। ফলে কয়েকটি গ্রামে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। একটি ঘটনায় ম্যাজিস্টেটের গৃহ ভস্মীভূত করা হয়। আর অন্য এক ঘটনায় ম্যাজিস্টেটকে সাঁওতালেরা বন্দি করে ফেলে। এই সময় ওই অঞ্চলে এক বাবাজির আবির্ভাব হয়, যিনি সাঁওতালদের মধ্যে এক নূতন ধর্মবিশ্বাস জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। অনেক সাঁওতাল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু কালক্রমে এই আন্দোলনও কঠোরভাবে দমন করা হয়।[২৫]

এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে মানভূম অঞ্চলে ১৮৫৭ সালে যে মহাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাতে মানুষের ধার্মিক উত্তেজনা ও কৃষিভিত্তিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবের ফলে জনজীবনে যে জাগৃতি দেখা দিয়েছিল—তার থেকেই জাতীয়তাবাদ জন্মগ্রহণ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে মানভূমের ইতিহাসে এই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

সহায়ক গ্রন্থসূচি

১। W.K. Firminger, Fifth Report (Reprint, Calcutta, 1962) p.p.167-168

২। ক্লাইভকে লেখা রেজা খাঁয়ের পত্র, প্রাপ্তি ৬ নভেম্বর, ১৭৬৫ (J.Long (Edit), Selections from Unpublished Records, 1748-67. p. 554)

৩। W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal Vol-XVII (Delhi Reprint 1976) P. 358

৪। প্রথম অবস্থায় মানভূম জেলার ১০টি থানা যথা বরাহভূম, চাষ, গৌরাঙ্গডি, পুরুলিয়া, রাইপুর, রঘুনাথপুর এবং সুপুর সদর ডিভিসনের, তথা গোবিন্দপুর, নিরসা ও তোপচাঁচি গোবিন্দপুর সাবডিভিসনের অন্তর্গত ছিল।

৫। K.C. Yadav, The Revolt of 1857 in Haryana. (New Delhi, 1977) P.27

৬। ওই, পৃ-৩৯

৭। তরুণদেব ভট্টাচার্য, পুরুলিয়া (কলিকাতা, ১৯৮৫) পৃ. ১৬৪

৮। R.C. Majumdar, History of The Freedom Movement of India Vol-I (Calcutta, 1971), p.p. 149-150

৯। Usha Singh, Quit India Movement of 1942 in Bihar with special reference to old Hazaribag District. (An unpublished Ph.D. thesis of Patna University, 1993, p.20)

১০। রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত ও দিলীপ কুমার গোস্বামী সম্পাদিত, পঞ্চকোট ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ. পুরুলিয়া, ২০০৩) পৃঃ ১০৫

১১। Imperial Gazetteer of India. Manbhum, Vol-XVII (Oxford, 1908), p.113

১২। Gazetteer or India, West Bengal : Puruliya (Calcutta, 1985) p.103

১৩। এ সময় বাংলার লেফটনান্ট গভর্নরের প্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ছিল বাংলার ৮৫ হাজার বর্গমাইল, ছোটনাগপুরের ৬২ হাজার বর্গমাইল, উড়িষ্যার ২২,৫০০ বর্গমাইল ও আরাকানের ১৪,০০০ বর্গমাইল অঞ্চল।

১৪। তরুণদেব, পুরুলিয়া, পৃঃ ১৬৭

১৫। Sudipta Mukherjee, Agrarian Discontent in Manbhum District 1765-1857 (An unpublished M.Phil thesis of Banaras Hindu University, 1990-p.82)

১৬। West Bengal District Gazetters, Puruliya (Calcutta 1985) 103

১৭। Sudipta Mukherjee, Agrarian Discontent P.P. 82-83.

১৮। K.K. Dutta, History of Freedom Movement in Bihar. Vol-I (Patna 1957), p.61

১৯। কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিংদেওয়ের সভায় নবদ্বীপরত্ন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, নৈয়ায়িক পার্বতীচরণ বাচস্পতি, মুরাডি গ্রাম নিবাসী কবিকুলভাস্কর বেণীমাধব রায়, পানুড়িয়া গ্রাম নিবাসী কবিরাজ নীলকণ্ঠ কবিরত্ন এবং নডিহা গ্রাম নিবাসী তান্ত্রিক চূড়ামণি কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতেরা তাঁর সভায় ছিলেন। —পঞ্চকোট ইতিহাস, পৃঃ ১০৬-১০৭

২০। R.C. Majumdar, History of the Freedom Movement Vol-I, p.150

২১। তরুণদেব, পুরুলিয়া, পৃঃ ১৬৯-১৭০

২২। H. Coupland (Edt), Bengal District Gazetteers, Manbhum, Vol XXVIII (Calcutta, 1911) p.p. 130-131

২৩। P.C. Roychoudhuri (Edt), Bihar District Gazetteer. Dhanbad (Patna, 1964), p.64.

২৪। Puruliya, p. 103

২৫। B.D.G. Dhanbad, pp. 66-67।



পুরুলিয়ার ইতিবৃত্ত ও পুরুলিয়া শহর

অশোক চৌধুরী

অতীত কথা বলতে পারে কিনা জানি না—তবে প্রায় দেড়শত বৎসরের পরমায়ু নিয়ে এখন যদি কেউ আমাদের মধ্যে জীবিত থাকতেন তবে তাঁর স্মৃতিচারণে পুরুলিয়া সম্বন্ধে যে কথাগুলি মনে পড়ত তা নিঃসন্দেহে খুবই অস্পষ্ট হত। বলাবাহুল্য, স্মৃতিভ্রংশের মতো হয়ত অনেক কথাই বাদ পড়ে যেত—আবার কিছু কথাও হয়ত কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে হয়ে কাহিনির আকার নিত—আর কোনো কথা হয়ত অর্ধেক মনে পড়ত। তাই, প্রায় শ দেড়েক বৎসরের জের টেনে পুরুলিয়ার ইতিবৃত্ত ও পুরুলিয়া শহর সম্পর্কে আমার এই অক্ষম নিবন্ধের জন্য প্রারম্ভেই ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি।

... সে অনেক দিন আগের কথা। এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের তখন আদিপর্ব। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ বণিকেরা বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। সেই সময়ে পাঁচেট ও ঝালদার উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর ধীরে ধীরে বণিকের মানদণ্ড যখন শাসকের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হতে শুরু করে—তখন জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলকে শাসনাধীনে আনত, ব্রিটিশ শাসকবর্গকে সবিশেষ বেগ পেতে হয়। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ঢল ও কুইলাপালের জায়গিরদার সুবল সিং-এর বিদ্রোহ দমন করতে লেফটেনান্ট ফার্গুসন ও লেফটেনান্ট নান খুবই নাজেহাল হন। সেইজন্য স্থানীয় অধিবাসীদের বিদ্রোহ ও আক্রমণাত্মক অভিযান দমন করার সুবিধার্থে—রঘুনাথপুর ও ঝালদার দুটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

তারপর ১৮০৫ সালের ১৮নং রেগুলেসান অনুসারে—২৩টি মহল ও পরগনা এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা নিজে জঙ্গল মহল এলাকার সৃষ্টি হয়। বেশ কিছুকাল পরে, ১৮৩২ সালে বরাহবাজারে গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ শুরু হয়—আর দেখতে দেখতে সেই বিদ্রোহের আগুন পার্শ্ববর্তী সিংভূম, রাঁচি ও পালামৌ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসকেরা স্বভাবতই খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠল; এবং বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমিত হলেও—শাসন ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় ও রাজস্ব আদায় আরও সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৩ সালের ১৩নং রেগুলেশান অনুসারে জঙ্গল মহলকে খণ্ডিত করে, 'মানভূম' জেলার সৃষ্টি হয় এবং তার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় মানবাজারে। সেই সময়, মানভূম জেলার আয়তন ছিল—ধানবাদ, পুরুলিয়া ও ধলভূম এই তিন পরগনা ও তৎসহ সুপুর, রায়পুর, ফুলকুসুমা, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা ও শ্যামসুন্দরপুর মহল সমেত ৭৮৯৬ বর্গমাইল এলাকা।

জঙ্গল মহলের সন্তান মানভূম, তখন ছিল ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ ও হিংস্র শ্বাপদের বিচরণক্ষেত্র। রেললাইন ত দূরের কথা—তখন রাস্তাঘাটের নামগন্ধও ছিল না। তাই শাসনকার্যের সুবিধার্থে—১৮৩৮ সালে জেলা সদর দপ্তর মানবাজার থেকে অধিকতর কেন্দ্রস্থল পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হল। তখন থেকেই শুরু করা যায় পুরুলিয়ার কথা।

১৪০ বৎসরেরও আগের কথা। অর্থাৎ প্রায় দেড়শতাব্দী আগের পুরুলিয়ার ছবি এখন স্বভাবতই খুবই অস্পষ্ট। সারা বাংলাদেশে তখন নীলের চাষ—আর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও অনাচার ইতিহাসের কাহিনি হয়ে থাকে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো পুরুলিয়াতেও নীলের চাষ ছিল—আর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রমাণ এতদিনে হারিয়ে গেলেও—নীলকর সাহেবদের ঘাঁটি তথা নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ শহরের নীলকুঠি ভাঙার অতীতের সে সাক্ষ্য আজও বহন করছে। পরবর্তীকালে ঐ ভগ্নদশাপ্রাপ্ত নীলকুঠি, এক নূতন ইতিহাসের সূচনা করে, যখন নীলকর সাহেবদের উত্তর পুরুষের শাসন ও শোষণ লোপ করার প্রয়াসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল ১৯২১ সালে—আর ওই ভগ্নাংশগ্রস্ত নীলকুঠিতে স্থাপিত হল অসহযোগী সংগ্রামীদের আরামস্থল ও কর্মস্থলরূপে শিল্পাশ্রম।

সুদূর সেই অতীতদিনে, পুরুলিয়া তখনও শহরের গৌরব অর্জন করেনি। নীলকুঠি ভাঙা মহল্লারও আগে, মনুষ্য বসতির অন্যান্য কেন্দ্রস্থলরূপে চকবাজার, নামোপুরুলিয়া, নডিহা প্রভৃতি মহল্লা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে কেতিকা ও দুলমী মহল্লাও পুরুলিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন সমগ্র পুরুলিয়া লোকসংখ্যা তিন বা সাড়ে তিন হাজারের বেশি হবে না এবং এক মহল্লার সঙ্গে আরেক মহল্লার যোগাযোগের সূত্র ছিল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলার পথ।

সেই সময়ে এই সব অঞ্চলের ইংরেজ শাসকেরা সবাই ছিলেন মিলিটারি অফিসার—আর সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগের প্রধান সামরিক ছাউনি ছিল রামগড়ে। সুতরাং সামরিক প্রয়োজনে ও রামগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার তাগিদে ১৮৪০ সালে নির্মিত হল পুরুলিয়া, ঝালদা, গোলা, রামগড় সড়ক। অবশ্য মানভূম জেলা প্রাচীনতম সড়ক হল বাঁকুড়া জেলার তিলুড়ীর পাশ দিয়ে সাঁতুড়ী, রঘুনাথপুর, দুবড়া, চাষ প্রভৃতি দিয়ে যে রানি অহল্যাবাই রোড গেছে সেই সড়ক।

সদ্যগঠিত মানভূম জেলা তখন ছিল রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, সিংভূম প্রভৃতি জেলার মতো ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য জেলার শাসকের মতো পুরুলিয়ার জেলাশাসক তথা ডেপুটি কমিশনার ছিলেন একজন বিশিষ্ট সামরিক অফিসার। মানভূমের প্রথম ডেপুটি কমিশনার কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা নেই—তবে দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল টিকেল। সেই সময়ে পুরুলিয়ার দশের বাঁধ, পেঁড়কা বাঁধ, বুচাবাঁধ প্রভৃতি বাঁধ থাকলেও পানীয় জলের জন্য একটি সংরক্ষিত বাঁধের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই ক্রমবর্ধমান বসতির পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে হাজারিবাগ রাঁচির মতো পুরুলিয়াতেও 'সাহেব বাঁধ'-এর মতো এক বৃহৎ জলাশয় খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী ১৮৪৩ সালে, কর্ণেল টিকেলের আমলে বর্তমান সাহেব বাঁধটি খনন করা হয়। বর্তমান সাহেব বাঁধ (নিবারণ সায়র)-এর বাঁধানো ঘাটের নিকট পঞ্চকোটরাজ-এর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন পুষ্করিণী ছিল ; পঞ্চকোটরাজের সম্মতি নিয়ে ওই পুষ্করিণীকে কেন্দ্র করে প্রায় ৭০ বিঘা আয়তনের এক বৃহৎ জলাশয় খনন করা হয়। প্রধানত জেলখানার কয়েদি ও কিছু দীনমজুর দিয়ে কৃত্রিম হ্রদের মত এই সায়রটি খনন করা হয় এবং পরবর্তীকালে এই জলাশয়কে ঘিরে চতুষ্পার্শ্বে প্রায় তিন মাইল সড়ক নির্মাণ করা হয়। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে এই জলাশয়টি পুরুলিয়ার অধিবাসীদের পানীয় জলের চাহিদা মিটিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে এই অশান্ত জেলায় শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার প্রয়োজনে সামরিক অফিস, আদালত, ট্রেজারি, জেলখানা প্রভৃতি যে সব গড়ে উঠতে লাগল সেই সঙ্গে এইসব 'জংলি অঞ্চলের' শাসকদের হাতে অধিকতর 'জংলি ক্ষমতা' প্রদানের উদ্দেশে ১৮৫৪ সালের ২০ আইন জারি হল। এই আইনের বলে ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনার হলেন গর্ডার জেনারেলের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের এজেন্ট এবং ডেপুটি কমিশনারেরও যথেষ্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি হল।

কিন্তু সরকারি বাঁধন যতই শক্ত হতে লাগল—সেই বাঁধন ছেঁড়া জন্য গণবিক্ষোভও ধূম্রায়িত হতে থাকল। এই ধূম্রায়িত বিক্ষোভ বিরাট বিস্ফোরণের আকার নিল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে। সারা উত্তর ভারত জুড়ে বিদ্রোহের যে দারুণ অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হল—তাঁর স্ফুলিঙ্গ মানভূম জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়াতেও অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করল।

এই জেলার ডেপুটি কমিশনার তখন ক্যাপটেন ওক্স্। আর ব্রিটিশ শাসকের হয়ে জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ৬৪ জন দেশি সিপাহি ও ১২ জন ঘোড়সওয়ার-এর এক ক্ষুদ্র সামরিক ঘাঁটি পুরুলিয়ায় ছিল। এইসব সিপাহিরা বিদ্রোহ'ঘোষণা করল এবং ট্রেজারি লুঠ ও আদালত গৃহে অগ্নিসংযোগ করে জেলখানা ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করে দিল। বিদ্রোহী সিপাহিরা ক্রমশই মারমুখী হয়ে উঠল এবং ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ওকস প্রমাদ গণলেন। এই অসহায় অবস্থায় তিনি পঞ্চকোটরাজ নীলমণি সিংদেও-এর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু পঞ্চকোট রাজ অক্ষমতা প্রকাশ করে জানালেন সে তাঁর নিজের 'গড়' রক্ষা করার জন্য সিপাহিদের দরকার; এদিকে বিদ্রোহীরা সিপাহিদের প্রতি পঞ্চকোটরাজের সমর্থনের কথা কারও অবিদিত রইল না। তখন নিরুপায় হয়ে ক্যাপ্টেন ওকস আত্মরক্ষার জন্য রানীগঞ্জে পলায়ন করেন। প্রায় মাসখানেক পরে, রানীগঞ্জ থেকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এনে বিদ্রোহ দমন হয় এবং পঞ্চকোটরাজ নীলমণি সিংহ দেশকে গ্রেপ্তার করে কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ভিন্নমতে ফোর্ট উইলিয়াম বন্দি করে রাখা হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের পর যেমন কোম্পানির আমলের অবসান হয়ে ব্রিটিশরাজের সরাসরি শাসন চালু হয়, তেমনি মানভূম জেলা তথা পুরুলিয়ার ক্ষেত্রেও শাসনব্যবস্থার নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল করার জন্য সিপাহি বিদ্রোহ দমনের ১৫/২০ বৎসরের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের অফিস ও আদালত, থানা, পোষ্ট অফিস, সার্কিট হাউস, জেলখানা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। তখন জেলখানার নাম ছিল—'মানভূম ইণ্টারমিডিয়েট জেল'।

সেই সময়ে সাধারণ অসুখ-বিসুখ ছাড়াও, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনে ১৮৬৬ সালে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনে উক্ত চিকিৎসালয়ের সঙ্গে পুরুষ বিভাগে ২৬টি এবং মহিলা বিভাগে ৮টি শয্যারও প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এটি 'সি' ক্লাস—গ্রেড-২ স্তরের হাসপাতাল বলে গণ্য হত এবং একজন 'নেটিভ' ডাক্তার এই চিকিৎসালয় ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বৎসরকাল একই অবস্থায় থাকার পর এই চিকিৎসালয়টি গ্রেড-১ পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৮৮০ সালে এই চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল পরিচালনার ভার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির উপর অর্পিত হয়। সেই সময়ে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীনন্দলাল ঘোষ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

১৯২৫ সালে তদানীন্তন পঞ্চকোটরাজ শ্রীশ্রীজ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও-এর এক লক্ষ টাকা দান এবং শ্রীসচীন্দ্রমোহন ঘোষ (নসু বাবু) কর্তৃক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দানের ফলে পুরুলিয়ার বর্তমান সদর

হাসপাতাল নির্মিত হয় বরেণ্য দাতাদের স্মরণে মূল হাসপাতাল ভবন 'জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেঁও ইনডোর হসপিটাল' এবং শ্রীশচন্দ্র ঘোষের পিতৃদেবের স্মরণে 'নন্দলাল ঘোষ আউট-ডোর ডিসপেনসারি' নামে উৎসর্গীকৃত হয়। উত্তরকালে, সরকারি সাহায্যে এই হাসপাতাল ভবনের আরও প্রসারলাভ ঘটে।

কেবল ভারতবর্ষই নয় সারা বিশ্বের বিশেষ কুষ্ঠব্যাধি জর্জরিত অঞ্চলগুলির মধ্যে মানভূম জেলা অন্যতম। তাই এই জেলার আর্ত ও অসহায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের সেবায় দরদি জার্মান মিশনারি রেভঃ হাইনরিখ উফম্যান ১৮৮৬-৮৭ সালে পুরুলিয়া এক কুষ্ঠাশ্রম তথা কুষ্ঠ হাসাপাতাল তৈরি করেন। হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ক্রমশ ৫০০ হয় এবং এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কুষ্ঠাশ্রমরূপে গণ্য হয়। পরে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মানি শত্রুদেশ বলে গণ্য হয় এবং এই কুষ্ঠাশ্রমের পরিচালনার ভার থেকে জার্মান মিশনকে মুক্ত করা হয়।

দীর্ঘ ৫০ বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীনীলমণি সেনাপতির উদ্যোগে ও বিশিষ্ট বেসরকারি নেতৃবৃন্দের সহায়তায় শহরের পূর্ব উপকণ্ঠে কংসাবতীর নদীর তীরে 'নবকুষ্ঠ নিবাস' নামে ২০০০ শয্যাবিশিষ্ট দ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

পুরুলিয়া শহরের জন্ম

আজ থেকে ১০৩ বৎসর আগে, ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ৫নং ধারা অনুসারে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি তথা পৌরসভা গঠিত হয়। এই নবগঠিত পৌরসভার নাম ছিল 'পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিটি।' পুরুলিয়া পৌরসভা তখন চকবাজার, আমলাপাড়া, নামোপুরুলিয়া, নীলকুঠিডাঙা, নডিহা, ভাটবাঁধ এ মুন্সেফডাঙা মহল্লা সমেত প্রায় ৫ বর্গমাইল এলাকা ছিল এবং লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৬০০০ জন। পুরুলিয়া পৌরসভা স্থাপনের আগে ১৮৭১ সালে যে লোকগণনা হয় তার সঠিক লোকসংখ্যা দেখানো হয়েছে— ৯৩০৫ এবং এর মধ্যে ৫০৬১ পুরুষ এবং ৪২৪৪ মহিলা। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ৭৭৯৫ জন হিন্দু, ১২৪৮ জন মুসলমান এবং ২৬২ জন খ্রিস্টান।

এই নবজাত পুরুলিয়া শহরের প্রথম পৌরসভার পদাধিকারবলে প্রথম চেয়ারম্যান হলেন তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার আর্থার লয়েড ক্লে। এই মিউনিসিপ্যাল কমিটির অনারারি সেক্রেটারি হন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীনন্দলাল ঘোষ ও সদস্য হিসাবে ছিলেন শ্রীরামদয়াল মজুমদার, শ্রীপ্রিয়নাথ মিত্র প্রমুখ। ওই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে এক বিশেষ সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীগঙ্গানন্দন মুখার্জী ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন সরকারি কাজকর্মে গঙ্গানন্দবাবু যেমন সুদক্ষ ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্মেও সেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাছাড়া শহরের সমাজ জীবনেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং শহরের একটি দীর্ঘকালীন সাম্প্রদায়িক বিরোধ তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করেন। পুরুলিয়ার বড় মসজিদ সংলগ্ন সহরের কালী মন্দিরের পূজা-পার্বণ কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত। গঙ্গানন্দনবাবু তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে ওই বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসা করেন এবং হিন্দুরাও উদারতা প্রদর্শন করে মসজিদ সংলগ্ন কালী মন্দিরের স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান চকবাজারের মধ্যস্থলে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কোনও নিজস্ব ভবন ছিল না। ভাড়া ঘরে অফিস ও সার্কিট হাউসে সভা বসত। ১৮৮৮-৮৯ সালে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়া টাউন হল

এবং জুবিলী উৎসবের স্মারকরূপে জুবিলী টাউন হল নামকরণ হয়। এই সময়ে মিউনিসিপ্যাল অফিস ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়।

পুরুলিয়া শহরের চকবাজার ছিল কেনাবেচার প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু ১৮৮০ সালের ২৯ নভেম্বর জেলার ডেপুটি কমিশনার তথা মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৮৮১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল মার্কেট তথা হাটে যাবতীয় ক্রয়বিক্রয় চালু হয় এবং চকবাজারে কেনা-বেচা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বৎসরই অক্টোবর মাসে কেতিকা ও দুলমী মহল্লা পুরুলিয়া পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিক্ষা প্রসারের জন্যও পুরুলিয়ায় ধীরে ধীরে নানা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৮৫৩ সালে উচ্চ বিদ্যালয়রূপে জেলা স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ সালের মধ্যে ভার্ণাকুলারে স্কুল (এম-ভি) মাদ্রাসা (ইউ-পি) গার্লস স্কুল (ইউ-সি) এবং কালীমেলা পাঠশালা (এল-পি) প্রভৃতি গড়ে ওঠে এবং পৌরসভার সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, পরে এই ভার্ণাকুলার স্কুলটি বেসরকারি উদ্যোগে ১৯০০ সালে একটি উচ্চ বিদ্যালয়রূপে গড়ে উঠতে থাকে এবং ১৯০১ সালে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশান নামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে গার্লস স্কুলটি কিছুকাল মিউনিসিপ্যাল স্কুলরূপে পরিচালিত হয় এবং অবশেষে হরিপদ দাঁ মহাশয়ের বদান্যতায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রদত্ত জমির উপর শান্তময়ী উচ্চবালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরুলিয়া স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের সূত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী শ্রীমতী অমলা দাশ স্মরণীয়া হয়ে আছেন। পুরুলিয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু ও তাঁর পরিবারের স্মৃতি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর পিতামাতার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দেশবন্ধু পুরুলিয়া আসেন। এবং বসবাসের উদ্দেশে অলঙ্গাডাঙায় এমেরী সাহেবের বাংলোটি খরিদ করেন। এই ভবনেই দেশবন্ধুর পিতামাতা স্থায়ীভাবে জীবনের শেষ অধ্যায় অতিবাহিত করেন এবং উভয়েই এখানে দেহরক্ষা করেন। এই ভবনের সঙ্গে উভয়ের স্মৃতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে সমাধি স্তম্ভদ্বয়ের মাধ্যমে।

পিতামাতার মৃত্যুর পর দেশবন্ধু ভগিনী শ্রীমতী অনিলা দাস ওই ভবনেই বাস করতে থাকেন এবং মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া, গানবাজনা, সূচিশিল্প প্রভৃতি শেখানোর জন্য একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৮৯০ সাল থেকেই সরকারি সহায়তায় যদিও একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় চলে আসছিল—কিন্তু যুগ পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুরুলিয়া শহরে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে শ্রীমতী দাশকে পথিকৃৎ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কেবল শিক্ষাই এক সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত, কীর্তন, গীতিনাট্য চর্চা শুরু হয়।

১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর, তাঁর সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবী সপরিবারে পুরুলিয়ার এই বাসভবনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছেন। দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা রায়ও মাঝে মাঝে আসতেন এবং তাঁর সুমধুর কণ্ঠের কীর্তন ও সঙ্গীত পরিবেশন করে শহরের সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতেন। দেশবন্ধুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণীদেবীর সঙ্গে পুরুলিয়ার অবসর জীবনের স্থানীয় অধিবাসী জ্ঞানতপস্বী কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীভাস্কর মুখার্জীর বিবাহ বন্ধন পুরুলিয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু পরিবারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। সুভাষচন্দ্র বসু মাতৃস্বরূপা অসুস্থা বাসন্তীদেবীকে দেখার জন্য পুরুলিয়া এসে এই ভবনে কিছুকাল অতিবাহিত করেছেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশবন্ধু ভবনটি ক্রয় করে দেশবন্ধু-জননী পুণ্যশ্লোকা নিস্তারিণী দেবীর নামে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি ড: রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই কলেজের দারোদঘাটন করেন।

১৯২৫ সালে পুরুলিয়ার দ্বাদশ বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সূত্রে মহাত্মা গান্ধি প্রথম পুরুলিয়া আসেন। এই সময় মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীনিবারণ দাসগুপ্ত, সম্পাদক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজীমূতবাহন সেন প্রমুখ নেতৃবর্গ এই সম্মেলনের যাবতীয় ব্যবস্থাদি করেন। পুনরায় ১৯৩৩ সালে হরিজন আন্দোলনের সূত্রে মহাত্মা গান্ধি দ্বিতীয়বার পুরুলিয়া সফরে আসেন এবং প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে এই জেলায় অতিবাহিত করেন। এইভাবে রাজনৈতিক সম্মেলনের সূত্রে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহরু, ড: রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সরলাদেবী চৌধুরানী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ পুরুলিয়ায় এসেছিলেন।

পুরুলিয়া সাংস্কৃতিক চর্চার প্রথম প্রয়াসরূপে ১৮৮১ সালে 'পুরুলিয়া সঙ্গীত সমাজ' নামে প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত নাট্যানুষ্ঠানে উদ্যোগী হয়। পরে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠানের বাংলা নাম পরিবর্তন করে 'পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইন্সটিটিউট' সংক্ষেপে পি.এম.আই. নাম রাখা হয়। ১৯২৪-২৫ সালে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে গভীর বিরোধ দেখা দেয় এবং একটি নাট্যগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে 'সান্ধ্য বান্ধব ক্লাব' এবং পরে নাম পরিবর্তন করে 'ফ্রেণ্ডস ইভনিং ক্লাব' গঠন করে। শহরের নাট্যানুষ্ঠানাদি প্রধানত এই দুই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই শেষোক্ত ক্লাবের যত সদস্য শহরের সুপ্রাচীন ইউনিয়ন ক্লাবের সদস্য হওয়ায় ইউনিয়ন ক্লাব প্রাঙ্গণ অপেশাদার নাটমঞ্চরূপে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে নামোপুরুলিয়ার 'পি.এম.-আই.' প্রতিষ্ঠানও নানাবিধ নাট্য প্রয়াসের পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে থাকে।

শহরে একটি সাধারণের গ্রন্থাগার-এর প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯২১ সালে মুন্সেফডাঙায় কতিপয় উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে সাহিত্য মন্দির নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালে ঁহরিপদ দাঁ মহাশয়ের বদান্যতায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রদত্ত ভূখণ্ডে যে সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয় তা হরিপদ সাহিত্য মন্দির নামে প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীকালে, এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাবতীয় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হতে থাকে। সেই সূত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তারাশঙ্কর, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ড: নীহাররঞ্জন রায়, মনোজ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট সুধী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গ্রন্থাগারিকগণ পুরুলিয়ার মাটিকে ধন্য করেছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পুরুলিয়ায় পদার্পণের সমস্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত হবার পরও, ঘটনাচক্রে পুরুলিয়া সেই পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

পুরুলিয়ায় খেলাধূলার চর্চার মধ্যে ফুটবলই প্রাধান্য পায় শহরের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব 'টাউন ক্লাব বি.এফ, সি. ও অন্যান্য ক্লাবের প্রচেষ্টায় খেলাধূলার কেন্দ্রীয় সংগঠনরূপে ১৯৩১ সালে মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন সংক্ষেপে এম.এস.এ. গড়ে ওঠে। আকর্ষণীয় খেলার স্থান হিসেবে বেলগুমা ময়দানের (এখন যেখানে পুলিশ ব্যারাক হয়েছে) বিশেষ খ্যাতি ছিল। এখানে প্রতি বৎসর পোলো খেলা হত। ঘোড়ার পিঠে চড়ে হকি খেলার মত এই খেলা দেখতে শহর ভেঙে পড়ত। অতীতে বেলগুমা ময়দান বিমান অবতরণ ক্ষেত্ররূপেও ব্যবহার হত। পেশাদার বৈমানিকেরা মাঝে মাঝে ভাড়া নিয়ে লোকদের বিমানে চড়িয়ে শহরের উপর চক্কর দিতেন। পুরুলিয়া শহরে শরীরচর্চা, ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু শিক্ষা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গাড়িখানায় এক ব্যায়ামশালা গড়ে ওঠে যার নামকরণ হয় 'শ্রদ্ধানন্দ কর্ম মন্দির'। পরে মেয়েদেরও ব্যায়ামাদি চর্চার জন্য নীলকুঠিভাঙ্গায় কল্যাণী সংঘ গড়ে ওঠে।

পুরুলিয়ায় রেললাইন পাতার কাজ ১৮৮৯ সালে শুরু হয় এবং ১৮৯১ সালে সম্পূর্ণ হয়। রানীগঞ্জ, আসানসোল লাইন প্রথম পদক্ষেপে পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর ১৯০৮ সালে পুরুলিয়া, রাঁচি ছোট লাইন পাতা হয়। প্রায় দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে রেলযোগে রাঁচি সঙ্গে বহির্জগতের একমাত্র পথ ছিল এই রাঁচি পুরুলিয়া লাইন। ঝরিয়া, ধানবাদে কয়লা খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর আদ্রা, গোমো লাইনের মাধ্যমে পুরুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপিত হয়।

সড়ক পথে পুরুলিয়ার সঙ্গে চাঁইবাসা, টাটানগর, ধানবাদ, ঝরিয়া ও রাঁচির সঙ্গে যোগাযোগের প্রবল বাধা ছিল তিনটি নদনদী। আনুমানিক ১৯১০ সালে কাঁসাই নদীর উপর সেতু নির্মিত হয়। তারপর তুলিনের নিকট সুবর্ণরেখা নদীর সেতু। ধানবাদের সঙ্গে পুরুলিয়ার যোগাযোগের জন্য তেলমুচার দামোদর নদের উপর সেতু বন্ধন করেন তদানীন্তন মানভূম জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার মি: ওয়েলউড।

পুরুলিয়া শহর প্রথম মোটরগাড়ি দেখে ১৯০৫ সালে যখন বাংলার লাটসাহেব তাঁর মোটরে কলকাতা থেকে রাঁচির পথে পুরুলিয়া হয়ে যান। তার দীর্ঘকাল পরে পুরুলিয়ায় বাস পরিবহনের ব্যবসা শুরু হয়। কৃষ্ণবাস ও রামকৃষ্ণ বাস নামে দুই সার্ভিস বাসের পত্তন হয়।

১৯৪৮ সাল পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে দুটি বিশেষ কারণে। প্রথমত পুরুলিয়ার প্রথম কলেজ বা মহাবিদ্যালয় জগন্নাথ কিশোর কলেজ এই সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বিতীয়ত পুরুলিয়া শহরের বৈদ্যুতিকরণ, বেসরকারি উদ্যোগ শুরু হয়।

পুরুলিয়া শহর বা তার উপকণ্ঠ অঞ্চলে শিল্প কারখানাদি না থাকায় পুরুলিয়ার যা কিছু গুরুত্ব তা কোর্টটাউন বা আদালতকেন্দ্রিক শহর হিসেবেই। এখানের ব্যবসাবাণিজ্যও গড়ে ওঠে এরই উপর ভিত্তি করে। কিন্তু শাসনব্যবস্থা নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জেলার আকার ও আয়তন পরিবর্তিত হতে থাকে, তার সঙ্গে জেলাবাসী-তথা পুরুলিয়াবাসীর ভাগ্য নিয়ে নানা খেলা চলে।

পুরুলিয়া মানভূম জেলার সদর দপ্তর হওয়ার মাত্র সাত বৎসর পরে ১৮৪৫ সালে ধলভূম পরগনা মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিংভূমে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মানভূমের অ া ব া ব অঙ্গচ্ছেদ করে রায়পুর, অম্বিকানগর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল, প্রভৃতি মহলগুলি পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া ও বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এইভাবে মানভূমের প্রায় ৮ হাজার বর্গমাইল এলাকা মাত্র ৪ হাজার বর্গমাইল দাঁড়ায়। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত জেলার ডেপুটি কমিশনারই সিভিল কোর্টের সমস্ত বিচার করতেন, তারপর একজন বিশেষ সাবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত হন কেবলমাত্র দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া জেলা জজের অধীন ছিল। ১৯১০ সালের মার্চ পর্যন্ত ছোটনাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনার মানভূমের জেলা ও দায়রা জজের কাজ চালিয়ে যেতেন তারপর পুরুলিয়াকে সদর করে মানভূম, সিংহভূম, সম্বলপুরের জন্য স্বতন্ত্র জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হন। এই সময়ে পুরুলিয়ার লাল রঙ-এর দ্বিতল জজ কোর্ট তখন নির্মিত হয়। আর ১৯১১ সালে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানভূম জেলা নবগঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে এবং মানভূমের বঙ্গভুক্তির দাবিতে শ্রীশরৎচন্দ্র সেন, শ্রীরজনীকান্ত সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যবহারজীবীদের নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন হয়।

ধানবাদ, টাটানগরসহ সিংভূম ও সম্বলপুরের দেওয়ানি আদালত পুরুলিয়ায় হওয়ায় আদালতকেন্দ্রিক

শহররূপে পুরুলিয়ার যেমন গুরুত্ব পায় ব্যবসা-বাণিজ্যেও তেমনি শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আর সেই সময় লাক্ষা ব্যবসায়ের সুবর্ণযুগ এবং লাক্ষা শিল্পে মানভূমের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকায় অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়। উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়ায় ১৯৩৬ সালে সম্বলপুর পুরুলিয়া দেওয়ানি আদালত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার সময় থেকে মানভূমে হিন্দি প্রচার ও বঙ্গভাষা দমন সরকারি নীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় ফলে প্রাদেশিক মনোভাব উৎকট হতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন অভিযান মানভূমের বুকে শুরু হয় এবং এই ভাষার প্রশ্নে মানভূম কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়। হিন্দিপন্থীরা কংগ্রেসে থেকে যান এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে 'মানভূমের মাতৃভাষা বাংলা' এই দাবির সমর্থনে কংগ্রেস ত্যাগ করে লোকসেবক সংঘ গঠিত হয়। এই লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে জোরপূর্বক হিন্দি প্রচার ও বাংলা ভাষা দমনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ ভাষা বিভক্ত নীতিতে প্রদেশ গঠনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়। সেই দাবি অনুযায়ী মানভূমের বঙ্গভুক্তির প্রবল দাবির সমর্থনে লোকসেবক সংঘ-টুসু সত্যাগ্রহ প্রভৃতি আন্দোলন করেন। বঙ্গ বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে এবং মানভূমের বঙ্গভুক্তির দাবিতে শ্রী অতুলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা লোকসেবক সত্যাগ্রহী পদব্রজে বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানে পুরুলিয়া থেকে কলকাতা যাত্রা করেন এবং সেখানে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন।

সারা দেশব্যাপী ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রবল দাবিকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগে বাধ্য হন এবং সেই কমিশন মানভূমের প্রশ্নে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচার করে ধানবাদ মহকুমাসহ চাষ চন্দনকিয়ারী থানা বিহারভুক্ত রাখার এবং পুরুলিয়া সদর মহকুমার বাকি ১৯টি থানা বঙ্গভুক্তির সুপারিশ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' দেবার নীতি অনুসরণ করে দ্বিখণ্ডিত মানভূমকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই অনুযায়ী ধানবাদ ও চাস চন্দনকিয়ারীসহ নুতন ধানবাদ জেলা এবং পুরুলিয়া সদর থেকে চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা যা ছিন্ন করে সিংভূম জেলার অংশ হিসেবে বিহারভুক্ত হয়—আর ত্রিখণ্ডিত মানভূমের কবন্ধরূপী নবগঠিত পুরুলিয়া জেলা মাত্র ১৬টি থানা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর। এইভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত ও বহু ঘটনাবৈচিত্রের পটভূমি মানভূম জেলা ভূগোলের পৃষ্ঠা থেকে অন্তর্হিত এবং দেড়শত বৎসরের কম সময়ে ৮ হাজার বর্গমাইল এলাকা মানভূমের উত্তরসূরীরূপে নূতন পুরুলিয়া জেলা মাত্র ২৪০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে আবার মাতৃক্রোড়ে তথা পশ্চিমবাংলায় ফিরে এসেছে মানভূমের সদর পুরুলিয়া—আর পুরুলিয়ার সদর পুরুলিয়া এরই মধ্যে কত কাহিনিই লুকিয়ে আছে।



পুরুলিয়ার জনজাতি—রূপরেখা

ড. সুধন্বা দরিপা

বেশ কয়েক বৎসর ধরে বাংলা নৃতাত্ত্বিক পরিভাষাতে 'জনজাতি' শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শব্দটি কতটা যুক্তিসম্মত তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। শুরুতে এধরনের আলোচনাতে 'আদিবাসী' শব্দটিই ব্যবহৃত হত। সম্ভবত ঠক্কর বাপ্পা এই নামটি সৃষ্টি করেন। ইংরেজি 'tribe' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে সরকারি আইনের পরিভাষায় 'সিডিউল্ড ট্রাইব' এবং 'সিডিউল্ড কাস্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সাধারণত সিডিউল্ড ট্রাইবরাই আদিবাসী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে, অনেকটা বলা চলে বেসরকারি বিশেষজ্ঞ মহল থেকে 'জনজাতি' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।

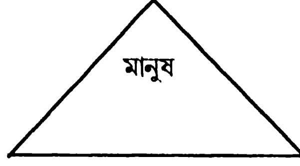
নৃতাত্ত্বিকগণ 'আদিবাসী' শব্দটি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বিশিষ্ট গবেষক Dr. W.H. Reverse বলেছেন—আদিবাসী হল "A social group of simple kind, members of which speak a common language live in common territory, have a single government, some times act together for some common purpose like warfare."

আর একজন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ড. তারকচন্দ্র দাসের মতে "A tribe consist a group of families who are found together by kinship, usually descending from a common region, speak a common dialect and have a common history. A tribe is invariably endogamous." প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় যে, বেশ কিছু ট্রাইব সরকারি তপশিল-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এক্ষেত্রে একটা যুক্তিই মেনে নিতে হয় যে, এদের মধ্যে বেশ কিছু গোষ্ঠী নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরণ্য জীবনের বাইরে চলে এসেছে, কোনো গোষ্ঠী হয়তো সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উদ্বর্তনের মধ্য দিয়ে বা প্রভাবশালী কোনো উন্নত জনগোষ্ঠীর চাপে আদিবাসী পরিমণ্ডলের বাইরে চলে এসেছে। কিন্তু, প্রাত্যহিক জীবনাচরণে সেই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রয়ে গেছে ফেলে আসা সংস্কৃতির নানা উপাদান।

আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণ তপশিল জাতি, তপশিল উপজাতি এবং একসময় যারা অরণ্যচারী ছিল কিন্তু পুরানো সাংস্কৃতিক অবশেষ নিয়ে বেঁচে রয়েছে এমন সব গোষ্ঠী—এই সবগুলিকে নিয়ে 'জনজাতি' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। আমাদের পুরুলিয়া জেলাতেই যেমন 'কুড়মি' সম্প্রদায় সরকারি পরিভাষায় আদিবাসী নয়, কিন্তু পুরুলিয়ার জীবনাচরণ 'কুড়মি'কে বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না। আদিবাসীর সঙ্গে এদের প্রচুর মিল।

এখন প্রশ্ন, কেন জনজাতি-জীবনাচরণ অনুসন্ধান ও গবেষণা করা প্রয়োজন? প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ড. প্রবোধকুমার ভৌমিক একটি ত্রিভুজের মধ্য দিয়ে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

অতিপ্রাকৃত শক্তি (২) গোষ্ঠীমানব (৩)



পরিবেশ পরিমণ্ডল (১)
বা
ভৌগোলিক অবস্থা।

মানব সমাজের নির্ভরতা পরিবেশ পরিমণ্ডল বা ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, দ্বিতীয় বাহু বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে permutation-combination-এর মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে এবং তৃতীয় বাহু বুদ্ধির অগম্য। এগুলির মধ্যেই জীবনচর্চার রূপরেখা গড়ে ওঠে। এগুলির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজমানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। আর সেজন্যই নিউক্লিয়াস মানুষের মূলস্রোতে সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মিলন ঘটাতে হলে জনজাতিগুলির জীবনাচরণের উপকরণগুলির অধ্যয়ন ও গবেষণার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

পুরুলিয়া জেলার সামাজিক জীবনে জনজাতিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: বিশেষ করে এই জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল জনজাতিগুলিকে কেন্দ্র করেই। এদের জন্মসংস্কার, মৃত্যু-সংস্কার, বিবাহপ্রথা—প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে লোকসাংস্কৃতিক উপাদান, যেগুলি এখানকার লোকজীবনকে বোঝার ক্ষেত্রে অন্যতম উপকরণ হিসেবে বিবেচিত।

পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী জনজাতিগুলি হল—ওরাওঁ, কিসান, কোরওয়া, কোড়া, গরেত, বিরহড়, বেদিয়া, ভূমিজ, মালপাহাড়িয়া, মাহালি, মুন্ডা, লেপচা, লোধা, খেড়িয়া, লোহার, শবর, সাওরিয়া-পাহাড়িয়া, সাঁওতাল এবং হো। এছাড়াও এ জেলার লোকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে আরও কয়েকটি জনজাতি। এগুলি হল—ডোম, মুচি, হাড়ি, ঘাসি, শুঁড়ি, বাউরি, বাগতি, কামার, কুমার, রাজোয়াড়, তাঁতি, জেলে, কুড়মি ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও রয়েছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ময়রা, তাম্বুলী, চাষা, বদ্যি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মানুষজন, মুসলিম ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষদেরও বসবাস রয়েছে এই জেলায়, তবে শেষোক্ত এ তিন ধর্মের মানুষজনের সাংস্কৃতিক প্রভাব জেলার জনজীবনে সামান্যই। স্বাভাবিকভাবেই এই তিন অংশের জীবনপ্রণালী সম্পর্কিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বাইরেই রাখতে হচ্ছে। সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় এগুলি অন্যত্র আলোচনার আশা রাখি।

সেনসাস রিপোর্টে পুরুলিয়া জেলার জনজাতিগুলির মধ্যে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি হিসেবে একটি সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব সেনসাস রিপোর্টে উল্লেখিত হয়নি। এমনকি জেলার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ও আদিবাসী জনকল্যাণ দপ্তরেও জাতভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব বা অন্য কোনো

ধরনের তথ্য পাওয়া যায়নি। এদের কাছ থেকে যে তথ্যটি পাওয়া গেছে তা দেওয়া হল—

ব্লক	তপশিলি জাতি	আদিবাসী উপজাতি
আড়ষা	১৩,২৩৩	২৫, ৬৬৭
বাঘমুণ্ডি	১০,০০৮	২৫, ২৮১
বলরামপুর	১১,৭৭৯	৩৩, ৬১৬
বরাবাজার	৯,৮২১	২৫, ০২৮
বান্দোয়ান	৪,৪১৯	৩৭, ৮৩১
হুড়া	২২, ৩২৪	৩০, ২৬৬
ঝালদা ১ নং	১০, ০৪৫	১১, ২৩৬
ঝালদা ২ নং	১১, ১৮৯	১৪, ২৭০
জয়পুর	১৪, ১১১	১০, ৬৪৮
কাশীপুর	৪৪, ৬৫৮	৪০, ৮৬১
মানবাজার ১ নং	২৫,৭৯৫	২৭, ১৮৮
মানবাজার ২ নং	৫,১৪৫	৩৯, ৬৪৯
নিতুড়িয়া	২৩, ২৭৪	১৯, ৩৫৪
পাড়া	৪৯, ০৮৭	৮, ০৮১
পুঞ্চা	১২,৫১৭	২৩, ৬১৭
পুরুলিয়া ১ নং	১৮,৯০৩	১০, ২৪৩
পুরুলিয়া ২ নং	৩৩, ৪০০	৬, ২৫৭
রঘুনাথপুর ১ নং	৩২, ১৮১	১০, ০৪১
রঘুনাথপুর ২ নং	২৯, ৯৬৭	৫, ৮৫৮
সাঁতুড়ি	১৫, ৪৮৪	২০, ৫৫১
পুরুলিয়া (এম)	২০, ১৬৫	১, ৯৬৪
রঘুনাথপুর (এম)	৫, ৮১৩	১২৬
ঝালদা (এম)	৫, ০৮৬	১৩৩

এ ছাড়াও নোটিফায়েড এরিয়া ও নন-মিউনিসিপ্যাল শহরগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষ বাস করে। সব মিলিয়ে পুরুলিয়া জেলাতে তপশিলি জাতির ৪,৩০,৫১৩ জন এবং আদিবাসী উপজাতির ৪,২২৭,৭৬৬ জন মানুষ বাস করেন। এদের মধ্যে তপশিলি জাতির পুরুষ হল ২,২১,৮৬৪ এবং মহিলা হল ২,০৮,৬৪৯ জন। আদিবাসীর পুরুষ হল ২,১৮,০২০ জন এবং মহিলা হল ২,০৯,৭৪৬ জন।

(সূত্র : সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৯১)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পিছিয়ে পড়া জনজাতিগুলির কল্যাণার্থে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বেশিরভাগ সরকারি উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ীত করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? আমাদের মনে হয়েছে, এর জন্য দায়ী হল জনজাতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা। জনজাতিগুলির সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার প্রভৃতিকে মাথায় রেখে সরকারি

আইন ও সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রসারিত হলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলি এখনও পর্যন্ত বঞ্চনার স্বীকার হত না। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিরহোড়দের জন্য তৈরি সরকারি আবাসন বিরহোড় জনজাতির মানুষেরা গ্রহণ করে নিতে পারেনি। কারণ নির্মিত সেই বাসস্থানের গঠনপ্রকৃতি তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে। তাই অনেকেই সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কর্তাব্যক্তিদের জনজাতি সম্প্রদায়গুলির ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদি বুঝতে হবে। একই রকমভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের জাহের থান সাসান। এগুলিকে জনজাতিদের হাতে রেখে দেওয়ার কোনো সরকারি নিয়মবিধি নেই, বিধি করার প্রচেষ্টাও নেই। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে প্রতিটি জনজাতি পরিচালিত হয় তাদের নিজস্ব Customary Law দ্বারা। কিন্তু আমাদের সরকারি আইনকক্ষে এদের প্রথাগত আইন সম্বন্ধে কিছু ভাবা হয়কি? হয় না। তাই আইনের দরবারেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তবে সুখের কথা, মধুকিশ্বর বনাম বিহার রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন—আদিবাসী মহিলারা হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন বা পরিষৎ দ্বারা শাসিত নয়। তারা তাদের আঞ্চলিক প্রথাসিদ্ধ আইনের দ্বারা শাসিত। [1996, 9cc, 663] । সরকারকেও জনজাতিগুলি সম্বন্ধে পরিকল্পনা করার সময় এদের প্রথাসিদ্ধ আইন ও মিথগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ ধারণাগুলি থেকে এদের ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। নতুবা হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই প্রবল। এই ভাবনার আলোকেই আমরা পুরুলিয়া জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জনজাতির সোস্যাল অ্যান্থ্রপলজিকে ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি এদের দৈনন্দিন জীবনের চালিকাশক্তিগুলি তুলে ধরতে।

শবর :

প্রাচীনতম জাতিগুলির মধ্যে শবর জাতিটি অন্যতম। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের লোককথাতেও শবরদের সন্ধান পাওয়া যায়। হাজার বছরের পুরানো পুঁথি 'চযাচর্যবিনিশ্চয়'-এ শবরদের উল্লেখ রয়েছে। ড. নিহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—"পূর্বভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবনযাত্রার নানাক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট।"

প্রাচীন লোককথা ও পুরাণগুলি শবরদের উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কিন্তু আধুনিককালে নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায় যে, এরা দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা উড়িষ্যা, পশ্চিমবাংলা, মাদ্রাস ইত্যাদি স্থানে শবর, শভর, শাওরা, শর, শুইর, শুইরি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ফ্রেডারিক মুলার, কানিংহাম, আর. কাস্ট প্রমুখ পণ্ডিতগণ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শবরদের কোলারিয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ভি. বল বলেছেন, গঞ্জামের মহেন্দ্রগিরি অঞ্চলের শবরেরা আকৃতিতে ছোট। এদের দৈহিক গঠন সুঠাম ও গাঁট্টাগোট্টা। এরা খুব বলশালী কিন্তু প্রচণ্ড সহ্যশীল। গায়ের রঙ কালো, নাক চওড়া, নাসারন্ধ্র আকৃতিতে বড়।

পুরুলিয়া জেলার শবরদের দুটি মাত্র টোটেমের সন্ধান পাওয়া গেছে—(ক) কাশিবক এবং (খ) শোল মাছ। এদের চারটি উপবিভাগ রয়েছে—(i) বেন্দকার, (ii) পরিরা, (iii) ঝাড়ুয়া এবং (iv) পল্লি।

বিবাহ :

সম উপবিভাগে বিবাহ নিষিদ্ধ। সমাজে বাল্যবিবাহের মর্যাদা রয়েছে যথেষ্ট। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রের বিয়ের পর পাত্রী দুদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকার পর বাপের বাড়ি চলে আসে। এরপর ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত স্বামীসন্দর্শন নিষিদ্ধ। বিবাহে কন্যাপণ লাগে। ছেলের জন্মবার ও শনিবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। শবরদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত।

ধর্মবিশ্বাস : শবরদের নিজস্ব দেবদেবী হল—থানপতি, বাঁশুরী, ঠাকুরাইন ও বনদুর্গা। কালী, মনসা ও শীতলা দেবীর পূজাও এরা করে থাকে। একটি লোককথার ভিত্তিতে এরা ব্রাহ্মণদের জামাতা বলে থাকে ; তাই এরা ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে না।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম প্রতিপালন করতে হয়—(১) সন্ধের সময় একা বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। (২) সাত বা নয় মাসে সাধভক্ষণ হয়। শিশুজন্মের পর ওই বাড়িতে ৯ দিন অশৌচ পালন করা হয়। ২১ দিন পর্যন্ত মাকে অপবিত্র ধরা হয়। একশো দিনের দিন পবিত্রকরণ উৎসব পালন করা হয়। ৯ থেকে ১১ মাসের মধ্যে শিশুর মুখেভাত হয়। এক থেকে দু'বছরের মধ্যে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান হয়।

মৃত্যুসংস্কার : শবরদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ বা কবর দেওয়া—দুটোরই প্রচলন রয়েছে। তবে বিয়ের পূর্বে মৃত্যু হলে মাটিতে কবর দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। মৃতের পরিবারকে দশদিন নিয়ম পালন করতে হয়। মৃতের উদ্দেশে খাদ্য উৎসর্গ করার নিয়ম রয়েছে।

নাচ ও উৎসব : বিবাহ ও জন্মকে কেন্দ্র করে প্রায়ই শবর সমাজে উৎসব-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এগুলিকে কেন্দ্র করে নাচ-গানের সমারোহ চলে। এদের মধ্যে দুধরনের নাচ লক্ষ করা যায়— i) ডোম নাচ এবং (ii) পাত্তাশালা নাচ।

অর্থনৈতিক জীবন : ইংরাজ আমল থেকে শবরদের কপালে জুটেছে শুধু নিপীড়ন অত্যাচার আর তাচ্ছিল্য। স্বাধীনতার পরেও তাদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। জঙ্গলের কাঠ কেটে বা মধুর চাক ভেঙে মধু বের করে বাজারে তা বিক্রি করে এরা সংসার চালায়। কেউ কেউ বা কাশি ঘাস ও সাবুই ঘাস থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে।

সাঁওতাল :

সাঁওতাল পুরাণ সংগ্রহকার Skrefsurd-এর মতে সাঁওতাল শব্দটি এসেছে 'সাওনতাড়' থেকে। বহু পূর্বে মেদিনীপুরের 'সাওন্ত' নামক স্থানে কয়েকপুরুষ বসবাস করার পর তারা এই নাম গ্রহণ করে। এর পূর্বে তারা নিজেদের 'খড়ওয়াড়' বলে পরিচয় দিত। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সাঁওতাল শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত 'সামন্তপাল' শব্দ থেকে এসেছে—সামন্তপাল > সামন্তআল > সাওন্তল > সাঁওতাল। স্যার জি.এ. গ্রিয়ারসন তাঁর 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, কোড়া, ভূমিজ প্রভৃতি গোষ্ঠীর ভাষাকে 'খেড়ওয়ারি' ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন।

সামাজিক গঠন : সাঁওতালরা ১২টি গোত্রে বিভক্ত। প্রতিটি গোত্রের নির্দিষ্ট টোটেম ও নির্দিষ্ট কর্মবিন্যাস করছে। যেমন —

গোত্র নাম	টোটেম	পেশা
১। হাঁসদা	হাঁস	লোহার জিনিসপত্র তৈরি করা ও উৎসব-অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো।
২। কিস্কু	শঙ্খচিল	রাজ-পাট চালানো।
৩। সরেন	সপ্তর্ষি	সৈনিকের কাজ।
৪। মান্ডি	মেরজা ঘাস	কৃষিকাজ।
৫। মুরমু	নীলগাই	পূজাপার্বণ।
৬। হেম্ব্রম	সুপারি	দেওয়ান বা কুয়ার।
৭। বাস্কে	পান্তাভাত	ব্যবসায়।
৮। টুডু	হাঁস	লোহার দ্রব্য তৈরি ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো।
৯। বেসরা	বাজপাখি	জানা যায়নি।
১০। পাঁওরিয়া	পায়রা	"
১১। চঁড়ে	গিরগিটি	"

১২। বেদেয়া — পুরুলিয়া জেলায় এই গোত্রের সাঁওতাল আমার নজরে আসেনি। প্রতিটি গোত্র কয়েকটি 'খুঁট'-এ বিভক্ত। খুঁটিগুলি হল—চাউরিয়া, গাড়, লাৎ, মাঝি খিল, নায়কে খিল, অবর, অক, পটম, সোনা, সিদুপ, বিন্দাড়, বিটল, চচারহাৎ, চপেয়ার, চিনি, নিজ, তিলক, বাঁবড়ে, চুরুচ, কুড়াম, ভক্তা, খরহারা, আঙ্গারিয়া, কুহি, সন, গুরা, রকগুতুর, চিড্রি হেন্দে জিহু, দাঁতেলা, টুরকুলুমাম, লাকিন সন্তুয়ার, জাবে ইত্যাদি।

গ্রাম সংগঠন : সাঁওতালদের নিজস্ব গ্রাম ব্যবস্থা আছে। রয়েছে নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এদের গ্রাম সংগঠন কয়েকটি স্তর বা পদে বিন্যস্ত—

ক) মাঁঝি — গ্রামের প্রধান।

খ) জগমাঁঝি — গ্রামের অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের-নৈতিক চরিত্র লক্ষ রাখার দায়িত্বে নিযুক্ত।

গ) জগপারানিক — জগমাঁঝির সহকারী।

ঘ) গেডেত — মাঁঝির বার্তাবাহক ও পূজা-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত।

ঙ) পারানিক — মাঁঝির সহকারী।

চ) নায়কে — পূজারী।

ছ) কুডাম নায়কে — নায়কের সহকারী।

বিচার ব্যবস্থা : জেলা কোর্ট, হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের মতো সাঁওতালদের বিচার ব্যবস্থার তিনটি স্তর রয়েছে—

সেদঁরা/ল বীর বাইসি (সর্বোচ্চ স্তর)

↑

পারগানা বাইসি (মধ্যবর্তী স্তর)

↑

মঁঝি বাইসি (সর্বনিম্ন স্তর)

প্রতিবৎসর শিকার উৎসবের রাত্রিতে সেঁদরা বা ল বীর বাইসি বসে। এই সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধানকে বলা হয় 'দিহরি'।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অনেকগুলি বিধিনিষেধ রয়েছে—
ক) উৎসব-অনুষ্ঠানে স্বামী ছাড়া যেতে পারবে না।
খ) উনুন তৈরি করতে পারবে না।
গ) পাতা সেলাই করতে পারবে না।
ঘ) সন্ধ্যাকালে একা ঘর থেকে বেরোবে না।
ঙ) নদী, ঝর্না ও বনে একা যাবে না।
চ) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় ঘর থেকে বেরোবে না।
শিশু জন্মাবার পর কয়েকটি নিয়মের স্তর রয়েছে—
i) জন্মের পরে পরেই 'সাড়িম দাল' অনুষ্ঠান হয়।
ii) পুরো গ্রামকেই অশুচি ধরা হয়।
iii) ছেলের ক্ষেত্রে পাঁচদিন, মেয়ের ক্ষেত্রে তিনদিনের মাথায় 'জানাম ছাটিয়ার' (শুদ্ধিকরণ) অনুষ্ঠান পালিত হয়।
iv) সাত বা ছ মাসে অন্নপ্রাশন হয়।

বিবাহ : সাঁওতাল সমাজে আট প্রকারের বিবাহ রয়েছে—
১। কিরিঞ বহু বাপলা
২। টুঙকি দিপিল বাপলা
৩। অর আদের বাপলা
৪। ঞির বল বাপলা
৫। ইতুৎ সিন্দুর বাপলা
৬। সাঙ্গা
৭। কিরঞ জাঁওয়া বাপলা
৮। কুঁড়েল ঞপাঙ

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহ দাহ করা হয়। মৃত্যুর পাঁচদিন পর 'তেলনাহান' (ছোট শ্রাদ্ধ) অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মারাং বুরু ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে মুরগি ও হাঁড়িয়া উৎসর্গ করা হয়। পরে 'ভাণ্ডান' অনুষ্ঠানে (বড় শ্রাদ্ধ) ছাগল, মুরগি ইত্যাদি উৎসর্গ করে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

ধর্মবিশ্বাস : সাঁওতালরা যে ধর্মে বিশ্বাস করে, তা হল 'সারি ধর্ম' বা 'সারনা'। সারি কথার অর্থ হল সত্য। এদের আদি দেবতা হলেন — 'ঠাকুর জিউর'। অন্যান্য প্রধান দেব-দেবীগণ হলেন— মারাংবরু, জাহের এরা, সিঞ বোঙা, মঁড়কো-তুরুইকো, সীমা বোঙা, বুরু বোঙা, বির বোঙা, কিসাঁড় বোঙা প্রমুখ। এছাড়া, প্রত্যেকটি পরিবারের নিজস্ব গৃহদেবতা 'অড়াক বোঙা' এবং পারিবারিক দেবতা 'আবগে বোঙা' রয়েছেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা : সাঁওতালরা মূলত কৃষিনির্ভর। ৩৩ শতাংশ সাঁওতাল হল কৃষক এবং

৫৫ শতাংশ ক্ষেতমজুর। এছাড়া বনজ সম্পদ তাদের অর্থ উপার্জনের আর একটি প্রধান উপায়। এখনও পর্যন্ত সংখ্যাধিক্য সাঁওতাল দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে।

মাহালি : নৃতাত্ত্বিক রিজলের মতে মাহালিরা দ্রাবিড়ীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মাহালিদের ৭টি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায় — (ক) বাঁশফুঁড় মাহালি, (খ) পাতর মাহালি, (গ) সুলুঙ্খী মাহালি, (ঘ) তাঁতি মাহালি, (ঙ) মাহালি মুণ্ডা, (চ) ওঁরাও মাহালি এবং (ছ) কোল মাহালি। মাহালিদের চৌত্রিশটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে — চরধগিয়া, চরধিয়ার, চরহর, ধিলকি, ডুমরিয়ার, গুঁদলি, হসদগিয়ার, হেমব্রম, ইঁদুর, কাঁতুয়ার, করকুসা, খঁগড়, খড়িয়াড়, কঠর গাছ, ক্যারকেটা, কুঁদিয়র, মহুকল, মন্দিয়ার, পত্‌রিয়ার, পিহুয়া, রঁদিয়র, সরিহিন, সিল্লি, টপ্যর, ত্ব, টিরকি, টুঁডুয়ার, টুরু, টুটিয়ার, ভুক্তুয়ার, ল্যাঙচ্যাঙরে, সাঙ্গা, মররি এবং মুরমুয়ার।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা মাহালি নারী সন্ধ্যাকালে একা বাড়ির বাইরে যায় না। একান্ত যদি বাইরে যেতে হয়, তাহলে হাতে লোহা নিয়ে বেরোতে পারে। তাদের ধারণা হাতে লোহা থাকলে অপদেবতা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শিশুজন্মের পাঁচ দিনের মাথায় অশৌচ পালন করা হয়। এদিনই শিশুর নামকরণ করা হয়। পাঁচ মাস পর মুখে-ভাত অনুষ্ঠান হয়।

বিবাহ : বাল্যবিবাহ ও প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ—দুটোরই প্রচলন রয়েছে। বিবাহে কন্যাপণ চালু রয়েছে। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। বরযাত্রীরা কন্যার বাড়ি যাবার আগে পাত্র একটি আমগাছকে বিবাহ করে। অন্যদিকে বর আসার আগে পাত্রীকে একটি মহুয়া গাছের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। মাহালি সমাজে বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত। বিচ্ছেদের পর স্বামী বা স্ত্রী তাদের পছন্দমতো অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহ কবর এবং দাহ — উভয় প্রথাই প্রচলিত। এরা দশদিন অশৌচ পালন করে। এগারো দিনে শ্রাদ্ধ হয়। মৃতের প্রতি খাদ্য-দ্রব্য উৎসর্গের প্রথা রয়েছে।

ধর্মবিশ্বাস : মাহালিদের দেব-দেবীরা হলেন মনসা, সিঞ বোঙা, ধরমদেবতা, গরাম ঠাকুর ও যুগনী। এছাড়াও রয়েছে প্রত্যেকের নিজস্ব গৃহদেবতা।

অর্থনৈতিক অবস্থা : মাহালিদের জাতিগত পেশা হল ঝুড়ি, কুলা, চ্যাঙারি, পাখা, ঘুঁঘি ইত্যাদি বাঁশের দ্রব্যাদি তৈরি করা। বর্তমানে এগুলির চাহিদা তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ার জন্য অনেকে পেশান্তরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে তারা এক অনিশ্চিত অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছে।

মুন্ডা : এইচ. এইচ. রিজলের মতে মুন্ডারা বৃহত্তর দ্রাবিড়ীয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট গবেষক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের মতে, মুন্ডারা আদি অস্ট্রাল শ্রেণি থেকে এসেছে। 'মুন্ডা' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এলেও মুন্ডারা পূর্বে নিজেদের 'হোরো কো' নামে অভিহিত করত। 'হোরো-কো' কথাটির অর্থ হল মানুষ।

মুন্ডারা মোট ১৩টি উপবিভাগে বিভক্ত। এগুলি হল — ভুঁইহার, করঙ্গা, কঙ্গর, খাড়িয়া, কোল, কঙ্ক্‌পাত, মাহালি, মানকি, মাঁঝি, নাগবংশী, ওঁরাও, সদ্‌ ও শবরমুন্ডা। সারা দেশে মুন্ডাদের ৩৪০টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেলেও পুরুলিয়া জেলায় ১০টি গোত্রের সন্ধান পেয়েছি। এগুলি হল — ক্যারকেটা, পরতি, মন্ডারি, কানদরু, গোঁদলি, আন্বা, বুগুম, জিরহুল, ভ্যাঙরা ও হার্নসা।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা মুন্ডা নারী কোনো জীবহত্যা করবে না। তবে অন্তঃসত্ত্বা হবার পর অন্তঃসত্ত্বা নারী গরাসি বোঙার কাছে একটি মোরগ মানত করে। শিশুজন্মের দিনে এটিকে এই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। শিশু জন্মানোর পর আট দিন অশৌচ পালন করতে হয়।

আট দিনের দিনে 'নাড়াত' (শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান) হয়। এদিন শিশুর পিতা সিঞ বোঙার উদ্দেশে একটি সাদা মোরগ উৎসর্গ করে। পরের দিন নামকরণ অনুষ্ঠান। এদিন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে আর একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

বিবাহ : একই গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ। বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গোত্র পায়। বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্ককে উপেক্ষা করা হয়। সাধারণত ছেলের বাড়ি থেকে 'আগুয়া'-র (ঘটক) মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব যায়। কনে দেখতে যাবার পথে জলভরা কলসি, গাইবাছুর পরস্পরকে ডাকছে কিম্বা শিয়াল বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে — এসব দৃশ্য দেখলে শুভ বলে ধরা হয়। কিন্তু শূন্য কলসি, গাছকাটা, অকারণ গরুর ডাককে অশুভ বলে ধরা হয়।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতকে দাহ করার নিয়ম রয়েছে। মৃতের চিতার ওপর মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য জিনিসপত্র রেখে দেওয়ার প্রথা রয়েছে। বড় ছেলে মুখাগ্নি করে।

ধর্মবিশ্বাস : মুন্ডাদের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন সিঙ বোঙা। এরপরেই দুজন দেবীর স্থান, কৃষির দেবী 'জাহের বুড়ি' এবং শিকারের দেবী 'চণ্ডী বোঙা'। এছাড়াও রয়েছেন — বুরু বোঙা, ইকিড় বোঙা, নাগে এরা এবং কাড়া সড়না। তাছড়া প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব গৃহদেবতা রয়েছে।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা : অর্থনৈতিকভাবে মুন্ডারা অনেক পিছিয়ে। এদের মধ্যে শিক্ষার হার এতই কম যে, সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলি এদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। যে মুন্ডারা একদিন নিয়ন্ত্রক ছিল, তারাই আজ ভরণ-পোষণের জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে। এদের বেশিরভাগটাই বর্তমানে ক্ষেতমজুরির কাজে নিয়োজিত।

বিরহোড় :

বিশিষ্ট জনজাতি বিশেষজ্ঞ মহামতি রিজলে বিরহোড় জনগোষ্ঠীকে Wood-man হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এই জনগোষ্ঠীটি ছোটনাগপুর অঞ্চলের একটি ছোট্ট দ্রাবিড়ীয় উপজাতিবিশেষ। বহু বছর আগে, এরা আর্য আক্রমণের ফলে ছোটনাগপুরের অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ — এই ছ'টি রাজ্যের অরণ্যভূমিতে বিরহোড় সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে। পশ্চিমবঙ্গে এর বিশেষত্ব হল যে, এই রাজ্যের কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলাতেই এদের বসবাস। এই জেলায় বিরহোড়দের সংখ্যা তিনশতরও কম। ভাষা-নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় জানা গেছে যে, এরা হল অস্ট্রো-এশিয়াটিকে ভাষা-বংশের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে শারীর-নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টি অনুযায়ী এরা প্রোটো-অস্ট্রলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেহের দীর্ঘতা মাঝারি ধরনের, গায়ের রঙ কালো, নাক চওড়া ও কিছুটা থ্যাবড়ানো এবং কেশ কুঞ্চিত।

বিরহোড় জনজাতি দুটি উপবিভাগে বিভক্ত — (ক) উথস্থ এবং (খ) ড্যামি। প্রথম অংশের বিরহোড়রা পুরোপুরি যাযাবর এবং দ্বিতীয় অংশের বিরহোড়রা কোথাও না কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করে। পুরুলিয়া জেলাতে দ্বিতীয় অংশের বিরহোড় গোষ্ঠী বসবাস করে। এছাড়াও বিরহোড়দের মোট দশটি গোত্র রয়েছে। সেগুলি হল — হেম্ব্রম, জগসারিয়া, কুইরি, সাঁওরিয়া, লিলুয়াই, মাহলি, নাগ, নাগপুরিয়া, সিংপুরিয়া এবং সিরুয়ার।

বিবাহ : পূর্বে বিরহোড়দের মধ্যে স্বাধীন প্রণয় নিবেদনের প্রথা ছিল। অর্থাৎ নারী বা পুরুষ নিজেদের পছন্দের ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারত। তবে বর্তমানে, পিতা-মাতার

পছন্দের ভিত্তিতে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়। এই গোষ্ঠীতে বাল্যবিবাহের প্রথা সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য ; বিশেষ করে, মেয়েদের ক্ষেত্রে, এটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত, কন্যার বাবা পাত্রের বাড়িতে বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য প্রথম যোগাযোগ করে। বিরহোড় জনগোষ্ঠীর বিবাহ পদ্ধতি খুব সহজ ও সরল। এদের এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। এমনকি গোষ্ঠী পূজারীরও দরকার পড়ে না। বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্র এবং পাত্রী প্রথমে নিজেদের কড়ে আঙুল কেটে রক্ত বের করবে। তারপর সেই রক্ত পরস্পরকে মাখিয়ে দেবে। এখানেই বিবাহের যা কিছু অনুষ্ঠান শেষ। বিয়ের পর, পাত্রী মাত্র দুদিন পাত্রের বাড়িতে থাকবে। তারপর বাপের বাড়ি চলে আসবে। এরপর ঋতুমতী হলে সে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করবে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবে।

মৃত্যুসংস্কার : এদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করার প্রথা রয়েছে। দাহের পর মৃতের হাড়ের টুকরো, ছাই ইত্যাদি পাশাপাশি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের পরিবারকে দশদিন অশৌচ পালন করতে হয়। এ কদিন তারা চুল, দাড়ি, নখ কাটে না। এগারো দিনে দাড়ি কেটে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়।

ধর্মবিশ্বাস : বিরহোড়দের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রিজলে সাহেব বলেছেন — The Birhor religion is, as might be expected, a mixture of Animism and Hinduism." হিন্দু দেব-দেবীদের যেমন পুত্র-কন্যা থাকে, তেমনি এক পারিবারিক সম্পর্কভিত্তিক দেবভাবনা বিরহোড় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেয়। এদের ধর্মস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশে অবস্থান করেন দেবী। সেই ধর্মস্থানের আর এক অংশে একটি চওড়া অথচ লম্বাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড সিঁদুর মাখানো থাকে। এই কাষ্ঠখণ্ডটি হলেন মহামায়া, দেবীর কন্যা। এঁর পাশেই অবস্থা করেন 'বুরিয়া মাই'—একটি সাদা পাথর, যাতে তেল-সিঁদুর মাখানো থাকে। এই 'বুরিয়া মাই' হলেন মহামায়ার কন্যা এবং দেবীর নাতিনি। আবার 'বুরিয়া মাই'-এর কন্যা হলেন 'দুধা মাই'। এঁর মস্তক তীরের আকৃতিবিশিষ্ট। ওই ধর্মস্থানেই একটি সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল প্রোথিত থাকে। ইনি হলেন হনুমান। ইনি দেবীদের আদেশ প্রতিপালন করেন। এছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন গৌণ দেব-দেবী। যেমন — 'বিরুভাট' —একটি অর্ধগোলকাকৃতি পাথরের টুকরো, 'ডরহা' — একটি বাঁশের টুকরো প্রমুখ। তাছাড়া, জঙ্গলের দেবী হলেন 'বনহি', পাহাড়ের দেবতা 'সুগু' তো রয়েইছেন। প্রতিটি পরিবারের রয়েছে গৃহদেবতা। অপদেবতা হলেন — 'বোঙ্গা বুরু'।

অর্থনৈতিক অবস্থা : বনজ সম্পদ হল বিরহোড়দের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উৎস। যদিও বর্তমান সময়ে এদের সেই উৎসের সমৃদ্ধি নষ্টপ্রায়। পশুশিকার ও ফলমূল সংগ্রহ এদের জীবিকার প্রধান উপায়। তাছাড়া বন্য চিহড় লতা দিয়ে তৈরি করে বিক্রয়যোগ্য স্থূলধরনের দড়ি। প্রথমেই বলেছি, এরা যাযাবরের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করত। বিরহোড়দের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৬০ সালে বাঘমুণ্ডি থানাতে তৈরি করা হল ভূপতি পল্লি। ইঁটের ও টালি দিয়ে নির্মিত এই বাড়িতে তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হলেও তারা সেখানে থাকতে পারেনি। সেখান থেকে তারা পালিয়ে যায়। কেন এমন হল? এর কারণের পেছনে রয়েছে এক ধর্মীয় নির্দেশ। বিরহোড়রা নিজেদের বাড়িকে বলে 'কুম্বা' — জঙ্গলের লতা দ্বারা নির্মিত। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে এমন একটি প্রবেশপথ ছাড়া কুম্বা-তে আর কোনো জানালা-দরজা থাকত না। তাদের বিশ্বাস বড় বড় জানালা-দরজা থাকলে অপদেবতা 'বোঙ্গা বুরু' কুম্বাতে ঢুকে তাদের ক্ষতি করতে পারে। ধর্মীয় এই বিশ্বাসের কথা না জেনেই সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা বড় বড় জানালা-দরজাসহ বাড়ি নির্মাণ

করলেন বিরহোড়দের জন্যে। তাই তারা পালাল। যদিও পরবর্তীকালে এদের কাউকে কাউকে ধরে এনে আবার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হিতৈষী সরকারের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই জেনে তারা তখন সরকারি বাড়ির দরজার সামনে পাতা দিয়ে এমনভাবে চালা বানিয়ে নিয়েছে যে, বাইরে থেকে দরজা দেখা যায় না। এই ঘটনা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আগামী দিনে জনজাতিদের জন্য সরকারি সাহায্য করতে হলে, তাদের ধর্ম-সংস্কৃতিকে যেন উপেক্ষা না করা হয়।

বাগদি:

প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাগদি জনগোষ্ঠী। এরা ন'টি উপবিভাগে বিভক্ত — i) দুলিয়া, ii) ওঝা, iii) তেঁতুলিয়া, iv) কাঁসাই কুলিয়া, v) মাছুয়া, vi) গুলিমাঝি, vii) দণ্ডমাঝি, viii) কুসমতিয়া, এবং ix) মেটা। বাগদিদের মোট বারোটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। গোত্রগুলি হল — ক) শোল মাছ, (খ) শাঁখ, (গ) কচ্ছপ, (ঘ) বাঘ, (ঙ) পুকুড়ি (এক ধরনের মাছ), (চ) কাল সাপ, (ছ) পলাশ গাছ, (জ) কাশিবক, (ঝ) কাঠ ফড়িং, (ঞ) সূর্য, (চ) চাঁদ এবং (ছ) চড়ুইপাখি। এদের বেশির ভাগ অংশই পদবি হিসেবে 'বাগদি' কথাটিকেই ব্যবহার করে। তবে রাউত, দিগার, সর্দার, প্রতিহার, মাঝি প্রভৃতি পদবি ব্যবহার করতেও দেখা যায়।

বিবাহ : বাগদিদের আন্তঃউপবিভাগে ও সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের পর পাত্রী স্বামীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও বর্তমানে এসব তেমন দেখা যায় না। বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্ক নিন্দনীয় নয়। তবে প্রসবের পূর্বেই মেয়েকে কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ দিয়ে দিতে হবে। একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ বাগদিপুরুষ পুরোহিতের কাজ করে। আনুষ্ঠানিক বিবাহের পূর্বে পাত্রের সঙ্গে একটি মহুল গাছের বিবাহ দেবার প্রথা রয়েছে। সমাজে বিধবা বিবাহ সিদ্ধ। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কারণ দর্শিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে এবং নিজের পছন্দমতো অন্য কোথাও পরে আবার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহ দাহ করার প্রথা রয়েছে। একমাস অশৌচ পালন করতে হয়। একমাস পর শ্রাদ্ধ হয়।

ধর্মবিশ্বাস : আদিতে বাগদিরা মূলত জন্তুজানোয়ার ও প্রকৃতির উপাসক ছিল। এঁদের প্রধান দেবতা হলেন — 'গোঁসাই এরা' এবং 'বড় পাহাড়ি'। প্রধানা দেবী হলেন 'মনসা'। বর্তমানে হিন্দু দেবদেবীদেরও এরা উপাসনা করে থাকে।

অর্থনৈতিক অবস্থা : একটি প্রাচীন লোককথা থেকে জানতে পারা যায় যে, এদের আদি পেশা ছিল মাছ ধরা। তবে, বর্তমানে এরা অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। বাগদিদের একটা বড় অংশ ক্ষেতমজুরের কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রমনির্ভর কাজেও এরা নানাভাবে যুক্ত। এই জনজাতির অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে।

মুচি:

মুচি ও চামার একই শাখাভুক্ত হলেও, এদের উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মুচিরা চামারদের মতো বাসি মাংস খায় না। এরা ধাত্রীবিদ্যাকে ঘৃণা করে। চামারেরা কাঁচা চামড়াকে সংস্কার করে পাকা করে, আর মুচিরা সেই পাকা চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের চামড়াজাত দ্রব্য

নির্মাণ করে। মুচিদের মূলত দুটি উপবিভাগ রয়েছে— ক) বড়ভাগিয়া এবং খ) ছোটভাগিয়া। এদের দুটি গোত্রের সন্ধান পেয়েছি — ১। কাশ্যপ, ২। শাণ্ডিল্য।

জন্মসংস্কার : শিশুর জন্মমুহূর্তে ঘরের চালায় পাথর ছুঁড়ে শব্দ করা হয়। এদের বিশ্বাস, এর ফলে শিশু সাহসী হয়। পাঁচদিনের দিন নামকরণ হয়। পঞ্চরাত্রিতে শিশুর বিছানায় কাগজ ও কলম রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হয়। সংস্কার, এ সময় নাকি ভগবান এসে শিশুর ভাগ্য লিখে দিয়ে যায়। ন'দিনের দিন নরাত হয়। এদিন মা স্নান করে শুদ্ধ হয়।

বিবাহ : বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও বর্তমানে এর তেমন প্রচলন নেই। প্রথমে ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়ি যাওয়া হয় বিবাহের কথা বলতে। বিয়ের দিন পাত্র ও পাত্রী উভয়কেই আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়। বিয়ের দিন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হল 'তেল চঢ়ান'। সেদিন বর যখন স্নান করে, তখন তার পায়ের গড়িয়ে যাওয়া জল একটা শিশিতে ধরে রেখে পাত্রীর বাড়ি পাঠানো হয়। সেই জল স্নানের জলের সাথে মিশিয়ে পাত্রীকে স্নান করানো হয়। এটাই ' তেল চঢ়ান' অনুষ্ঠান। পাত্রীর বাড়িতে ছাঁদনাতলায় সিঁদুর দান ও মালা বদলের মতো সরল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মৃত্যুসংস্কার: মৃতদেহ দাহ করা হয়। বারোদিন অশৌচ পালন করতে হয়। তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধ হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা হয় না। তবে এর জন্য পরিবারের সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা : এদের গোষ্ঠীগত পেশা হল চামড়া-জাত দ্রব্যাদি নির্মাণ করা। বিশেষ করে জুতা শিল্পে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যদিও বৃহৎ কোম্পানির বিস্তার প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার ফলে জুতা শিল্পে এদের পসার অনেক কমে গেছে। তাই এদের বেশির ভাগটাই এখন বুট পালিশের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

বাউরি:

বাউরি অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী। এদের মধ্যে অনার্যতার ছাপ স্পষ্ট। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ জন বাউরির মাথা গোল ধরনের (Brochy Ceppalic) ১২ $\frac{১}{২}$ টি লম্বাটে (Dolicho Ceppalic) এবং অবশিষ্ট ১২ $\frac{১}{২}$ টি মাথা মাঝারি মাপের (Meso-Ceppalic) । অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ৮৯ শতাংশ বাউরির নাক মাঝারি ধরনের। এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাউরিদের মধ্যে মুন্ডা, দ্রাবিড় ও আলপাইন গোষ্ঠীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

বাউরিরা ৯টি sub cast-এ বিন্যস্ত। (১) মল্লভূমিয়া, (২) শিখরিয়া, (৩) পঞ্চকোটিয়া, (৪) মলা বা মুলো, (৫) ধুলিয়া বা ধুলো (৬) মলুয়া বা মালুয়া, (৭) ঝাটিয়া বা ঝেটিয়া, (৮) কাঠুরিয়া এবং (৯) পাথুরিয়া। ঝুঁটিওয়ালা বক, ঘোড়া ও কুকুর বাউরিদের টোটেমরূপে চিহ্নিত।

বিবাহ : বাউরিদের আন্তর্গোত্র বিবাহ প্রথাসিদ্ধ। তবে বর্তমানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে আন্তগোত্র বিবাহ ক্রমেই প্রাধান্য পাচ্ছে। বৈবাহিক সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট সূত্র মেনে সাধিত হয়। পুরুষদের কুলে সাতপুরুষ এবং মেয়েদের কুলে তিনপুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। সমাজে বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য। প্রতিটি বিবাহিতা নারীকে লোহার আঙটি পরতে হয়। বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের কাছে কারণ দর্শিয়ে স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

মৃত্যুসংস্কার : আদিতে এই জনজাতির মানুষেরা মৃতদেহ কবর দিত। তবে বর্তমানে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে এদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করার প্রথা চালু হয়েছে।

ধর্ম: বাউরিদের পূজ্য দেবদেবীরা হলেন — মনসা, ভাদু, মানসিং, বড়পাহাড়ি, ধর্মরাজ ও কুদ্রাসিনী। উল্লেখ্য, বাউরিদের বড়পাহাড়িই হল সাঁওতালদের মারাং বুরু। কুদ্রাসিনীর পূজা হয় শনি ও রবি বার। প্রতিটি পূজায় শূকর বা ছাগল বা পাখি, চাল, চিনি ও ঘি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। বাউরি জনজাতির পূজারীর নাম হল 'দেঘরিয়া' বা লায়া।

অর্থনৈতিক অবস্থা : একটি লোককথা থেকে জানতে পারা যায় যে, আদিতে বাউরিরা ছিল পালকিবাহক। কিন্তু বর্তমানে পালকির প্রচলন লুপ্তির পথে। তাই কাহারের পেশা ছেড়ে বাউরিদের বড় অংশটাই এখন ক্ষেতমজুরের কাজে নিযুক্ত। শহরে বসবাসকারী বাউরিরা রিকসা ও ঠেলা টানার কাজে নিযুক্ত। দারিদ্র এদের নিত্যসঙ্গী।

ডোম

প্রাচীনতম বাংলা কাব্য চর্যাপদে ডোম জাতিটির উল্লেখ রয়েছে— 'কইসনি হালো ডোম্বী তোহারি ভাভরি আলি' কিংবা, 'তঁইল ডোম্বী সঅল বিটালিউ'। চর্যাপদে 'ডোম্বীপাদ' নামে একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের নামও পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে ডোমদের মধ্যে দ্রাবিড় প্রভাব রয়েছে। কারো কারো মতে এরা আর্যদেরই একটি বিশেষ শাখা। Dr. Caldwell-এর মতে ডোমরা মূলত উত্তর ভারতের অধিবাসী।

ডোম জনজাতির মানুষেরা পদবি হিসেবে 'ডোম' অথবা কালিন্দি' শব্দটি ব্যবহার করে। এরা ১৮টি উপবিভাগে বিভক্ত — (১) আঁকুরিয়া, (২) বাজরিয়া, (৩) বানুকিয়া, (৪) বিসদেলিয়া, (৫) ধাই ডোম, (৬) ধেসিয়াধাকাল, (৭) ধোলা, (৮) ঘসেরা, (৯) কালিন্দি, (১০) কাউরা, (১১) মগহিয়া, (১২) মন্দারনা, (১৩) মুর্দাফরাস, (১৪) সাঁচি (১৫) তালাইবনা, (১৬) আটুরা, (১৭) মোলা এবং (১৮) শিখরিয়া। এ অঞ্চলের ডোম জনজাতির মধ্যে তেরোটি গোত্রের সন্ধান পেয়েছি — (ক) অজঘলা, (খ) ধুসিয়া, (গ) হড়বনাস, (ঘ) কছুয়া, (ঙ) করওয়া, (চ) ক্যারকেটা, (ছ) মহুয়া, (জ) মুশ, (ঝ) নাগ, (ঞ) রওত, (ট) সন্ধ, (ঠ) শোল এবং (ড) তিরকি।

বিবাহ : এই জনজাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। শুধু তাই নয়, দশ বৎসরের উর্ধ্বে অবিবাহিত বালিকা ঘরে থাকলে, মেয়ের পিতা নিন্দার পাত্র হন। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের একটি নির্দেশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

"অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিনি।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত উর্ধর্বং রজঃস্বলা।।
মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকঃ যান্তি দৃষ্টবা কন্যাং রজঃস্বলাম্।।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই নির্দেশিকা ডোম জনজাতির মধ্যে পালিত হয় অন্যরূপে অন্যভাবে । এভাবেই হয়তো ডোমদের আর্যত্বের বন্ধন-সূত্রে বাঁধা যেতে পারে। যদিও অন্যান্য জনজাতির মতো এদেরও কন্যাপণ রয়েছে, রয়েছে স্বেচ্ছায় বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি এবং বিচ্ছেদের পর নিজের পছন্দ মতো অন্যত্র বিবাহপাশে আবদ্ধ হবার প্রচলিত প্রথা। উল্লেখ্য, বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্ক নিন্দার্হ নয়।

ধর্ম : বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের মতো এদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণের উপাসক। ধর্ম বা ধর্মরাজ হল এদের প্রধান উপাস্য দেবতা। শ্রাবণ মাসে 'শ্রাবণ্নিয়া' পূজা করে। পূর্বে এই পূজার সময় শুয়োর বলি করা হত। সেই শুয়োরের রক্ত এক কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নারায়ণকে উৎসর্গ করা হত। বর্তমানে এ প্রথা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত। এছাড়া দুর্গাপূজার সময় নিজেদের ঢোল-ধামসার পূজা করে। এদের আর একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন কাসুধার।

অর্থনৈতিক অবস্থা : অর্থনৈতিকভাবে ডোমেরা একটি পিছিয়ে পড়া জাতি। এদের মধ্যে লেখাপড়ার হার কম। বেশিরভাগ পুরুষ ও স্ত্রী বাঁশের ঝুড়ি, তালপাতার চাটাই, বাঁশের ঝাঁটা ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাজুনিয়া ডোমেরা হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা ও অনুষ্ঠানে বাদ্যকারের কাজ করে। কেউ কেউ কৃষিমজুরেরও কাজ করে থাকে।

ভূমিজ :

ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে বিচার করলে ভূমিজরা কোল গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। রিজলের মতে ভূমিজরা মুন্ডাদেরই একটি শাখা। একসময় ভূমিজদের নিজস্ব ভাষা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে ভাষা লুপ্তপ্রায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিজদের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

ভূমিজ জনজাতি নির্দিষ্ট কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল— দেশি, তামারিয়া, মানকিমুড়া, শিখরিয়া বা মেনো, পাতকুবিয়া, শেলো এবং বরাভূমিয়া। এদের গোত্রগুলি হল— (ক) বড্ডা কুরকুটিয়া, (খ) বার্ডা, (গ) ভুইয়া, (ঘ) চাঁদিল, (ঙ) গুল্‌গু, (চ) হাঁসদা, (ছ) হেম্রঙ, (জ) জারু, (ঝ) কাশ্যপ, (ঞ) লেঙ, (ট) নাগ, (ঠ) অবারসারি, (ড) পিলা, (ঢ) সাগমা, (ণ) সালরিসি, (ত) শাণ্ডিল্য, (থ) সাওলা, (দ) তেসা, (ঠ) টুমারুঙ, (ন) তুতি ইত্যাদি।

ভূমিজদের নিজস্ব পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা রয়েছে। পঞ্চায়েতের সর্বোচ্চ পদে যিনি থাকেন তাকে 'প্রধান' বলা হয়। পদটি পুরুষানুক্রমিক। ব্যাভিচার, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার নির্ণয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদের গোষ্ঠী পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত হয়।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় মেয়েদের নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। তাদের সে সময় জীবহত্যা ও সন্ধেবেলা একা বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। শিশুজন্মের ন'দিনের মাথায় 'নাড়াত' অনুষ্ঠান হয়। এর মধ্য দিয়ে পরিবারের সকলে শুদ্ধ হলেও ২১ দিন পর্যন্ত মা ও শিশু অশুদ্ধ থাকে। একুশার দিনে মা ও শিশু স্নান করে পবিত্র হয়।

বিবাহ : স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। তিন থেকে পাঁচ পুরুষের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকলে সেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলে না। সাধারণত বৈশাখ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে বিবাহ হয়। বিয়ের দিন বিবাহ-অনুষ্ঠানের পূর্বে আম গাছের সঙ্গে বরের এবং মহুল গাছের সঙ্গে কনের বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজে স্বীকৃত। তবে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি জানাতে পারে না। স্বামীর আবেদনের ভিত্তিতে গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের সামনে স্বামী স্ত্রীর হাত থেকে নোওয়া খুলে নেয় এবং একটি শালপাতাকে জলে ভিজিয়ে সেটিকে ছিঁড়ে ফেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই স্ব-ইচ্ছায় অন্যত্র বিবাহ করতে পারে।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহ দাহ করা হয়। বড়পুত্র মুখাগ্নি করে। চিতাভস্ম ও অস্থি একটি হাঁড়িতে সংগ্রহ করে তিন-চারদিন পর 'লায়া'-র পৌরোহিত্যে তা গোষ্ঠীর নিজস্ব শ্মশানে সমাধিস্থ করা হয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হলে তাকে কবর দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মৃতার পেট কেটে ভ্রূণ বের করে দুজনকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। দশদিন অশৌচ পালন করা হয়।

ধর্মবিশ্বাস : ভূমিজদের প্রধান দেবতা হলেন সিং বোঙা বা সূর্য-দেবতা। এরপরেই রয়েছেন গরাম ঠাকুর, গড়াই ঠাকুর, বাঘুত, জাহির বুরু, কুদ্রা, বিশাই চণ্ডী, পাঁচবহনি, বারডেলা প্রমুখ। পূর্বে ভালো বৃষ্টি ও ফসলের কামনায় কৃষি-দেবতার উদ্দেশে মহিষ বলি দেওয়া প্রথা ছিল। এটিকে 'কাড়া কাটা' অনুষ্ঠান বলা হত।

অর্থনৈতিক অবস্থা : ভূমিজ অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। কিন্তু একসময় তারা বেশ স্বচ্ছল ছিল। ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে ভূমিজরা পাইক-বরকন্দাজ ও ঘাটওয়াল-এর কাজ করত। এর বিনিময়ে তারা নামমাত্র খাজনায় কৃষিযোগ্য জমি পেত। কিন্তু ইংরেজ সরকার আইন করে সেই জমি কেড়ে নেয়। তারপর থেকেই শুরু হয় তাদের দারিদ্রের ইতিহাস। এর বিরুদ্ধে তারা বারবার রুখে দাঁড়িয়েছে। মানভূমেও গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে ভূমিজ বিদ্রোহ প্রবলরূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রবলপরাক্রম ইংরেজশক্তির কাছে তারা পরাজিত হয়। দারিদ্র তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ভূমিজরা এ থেকে বিশেষ একটা উপকৃত হয়নি।

হো:

প্রাচীনতম জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'হো' জনজাতিটিও পড়ে। এরা মুন্ডা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, হলেও মুন্ডা গোষ্ঠীর অন্যান্য জনজাতিগুলির তুলনায় এরা গৌরবর্ণের এবং সুশ্রী। পুরুষেরা সাধারণত সাড়ে পাঁচফুট লম্বা হয় এবং মেয়েরা পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা হয়। এদের আদি বাসস্থান হল ছোটনাগপুর।

হো-জনগোষ্ঠী অনেকগুলি কিলি বা গোত্রে বিভক্ত। এই গোত্রগুলি হল—অলরু, অঙ্গরিয়া, ববঙ্গা, বঁদি, বানসা, বড়পাই, বিরুয়া, বদ্রু, বুড়িয়ালি কালুন্দিয়া, বাড়িসাম্‌তা, চাকিড়ুকরি, চঁপিয়া টুবিড়, চত্‌রাতুইউ, চরাই, অ্যামবর, গগরিয়া, গাটসোরা, হইবুরু লাঙ্গি, হাঁসদা, হেমব্রম, হেসা, হোন-হোগা, জামুলা, জাঁকু সমরাই, কিসকু, কোড়া, কুঁটিয়া, লগরি, মড়লি, মুন্‌ডুইয়া, মুরমু, নাগুরিয়া, পরইয়া, পাতা সইয়া, পিঁগুয়া, সিঁকোই, টিহু, টুডি ইত্যাদি।

এক সময় 'হো'দের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। কারণ পূর্বে তারা সংঘবদ্ধভাবে নিজস্ব গ্রামে বাস করত। এখন তারা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নানারকম বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। এ সময় সে 'ইলি' বা হাঁড়িয়া মদ তৈরি করতে পারে না। শিশুর পিতা-মাতাকে আটদিন অশৌচ পালন করতে হয়। বিশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে হাঁড়িয়া উৎসর্গ করা হয়। এর কিছুদিন পর গোষ্ঠী পুরোহিত 'দিউরি'-র উপস্থিতিতে শিশুর নামকরণ করা হয়।

বিবাহ : স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্যান্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মতোই 'হো' জনজাতির মধ্যে 'দে-বরণ' ও 'শালি-বরণ' রয়েছে। অর্থাৎ বড়ভাই-এর মৃত্যু হলে দেবর বড়ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। অন্যদিকে স্ত্রীর জীবিতকালে বা মৃত্যুতে স্বামী স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করতে পারে।

হো জনসমাজে চার ধরনের বিবাহ রয়েছে— (ক) আঁদি বিবাহ, (খ) অপরতাপি বিবাহ, (গ) রাজি খুশি বিবাহ এবং আমাদের বিবাহ। এদের বিবাহ অনুষ্ঠানে অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানটি হল জমসিং অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদিত। অন্যান্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মতো এই গোষ্ঠীতে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারে।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহ দাহ ও কবর দেওয়া— উভয়ই হতে পারে। মৃতদেহ সৎকারে মেয়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। চিতায় আগুন দেওয়ার কাজ স্ত্রী, অবিবাহিত কন্যা বা বোন করে। মৃতের চিতাভস্ম নিজস্ব 'সাসানে' 'জাঙ তপা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুঁতে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য মৃতদেহ সৎকারে মেয়েদের ভূমিকা অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে নেই বললেই চলে।

ধর্মবিশ্বাস : 'হো' জনগোষ্ঠী সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তাদের প্রধান দেবতা হলেন 'সিঙ বোঙা'। 'মারাং বোঙা' বা 'বুরু বোঙা' হলেন পাহাড়ের দেবতা। ছোট জলাশয়ের দেবী হলেন 'নাগে এরা'। গভীর জলাশয়ের দেবতা হলে 'পাউড়ি চুরডু বোঙা'। এছাড়াও রয়েছেন— 'বাগিয়া বোঙা', ইকির বোঙা, সাঙার বোঙা, সনা-চুরডু বোঙা, জিদ বোঙা, কুমবু বোঙা, ডাটা বোঙা, হাঙ্কার বোঙা ইত্যাদি। এদের নিজস্ব দেবস্থানকে বলা হয় 'দেসাউলি'—এখানে গ্রামদেবতার অবস্থান।

অর্থনৈতিক অবস্থা : প্রথমাবধি হো জনগোষ্ঠী তীব্র অর্থনৈতিক দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে আসছে। বিশেষ করে বিনিময় প্রথার পরিবর্তে মুদ্রা অর্থনীতি চালু হওয়া পর তাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। জমিদাররাও হো-দের জমির ওপর ইচ্ছামতো খাজনা বসাত, এমনকি প্রয়োজনে বেগার খাটত। স্বাধীনতার পর ১৯৫৬ সালে 'দা সিডিউল্ড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস অর্ডার (অ্যামেন্ডমেণ্ট) অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে হো-দের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। আদিবাসীদের জন্য নানা জনকল্যাণকর আইন প্রণীত হলেও এরা এই আইনগুলির প্রসাদ থেকে প্রায় বঞ্চিত। এমনকি সাক্ষরতার হার এদের মধ্যে নিতান্তই কম। বর্তমানে তারা কৃষিমজুরে পরিণত হয়েছে।

লোধা:

সংস্কৃত 'লুব্ধক' শব্দ থেকে 'লোধা' নামের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়। লুব্ধক শব্দের অর্থ 'ব্যাধ'। এদের আদি নিবাস হল মধ্যপ্রদেশ। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে নৃতাত্ত্বিকগণ লোধাদের প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

লোধাদের নয়টি গোত্র রয়েছে— ভক্তা বা ভুক্তা, মল্লিক, কোটাল, ভুঁইয়া, আহরি, নায়েক বা লায়েক, পরামানিক, দিগার ও দণ্ডপাট। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব গোত্র-প্রতীক রয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে—চিরকা আলু, মকর, চাঁদ এবং কচ্ছপ, শোল মাছ, চাঁদা মাছ, শালমাছ, একটি বিশেষ ধরনের পাখি, শুশুক এবং বাঘ।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা নারীকে সাত মাসে সাধভক্ষণ করানো হয়। অস্বাভাবিক বা কষ্টকর প্রসব হলে ওঝা বা গুনিনের সাহায্য নেওয়া হয়। শিশুজন্মের কুড়ি দিন পর 'একুশা' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অশৌচ ভঙ্গ করা হয়। শিশুটির ছ'মাস বয়স হলে মুখে-ভাত অনুষ্ঠান হয়।

বিবাহ : স্বগোত্র এবং জ্ঞাতি বিবাহ নিষিদ্ধ। মেয়ের মা বরের কাছ থেকে কন্যাপণ গ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিক বিবাহের পূর্বে বাড়িতে 'মঙ্গল হাঁড়ি' বসানো হয় জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা 'সিধা মাটির' ওপরে। বিবাহ অনুষ্ঠানে মালাবদল হয় কনের ভাই-এর সঙ্গে। এরপর কনেকে ছাঁদনাতলায় আনা হয়। 'দেহরি' বা গোষ্ঠী পুরোহিতের উপস্থিতিতে কনের মামা পাত্র-পাত্রীর হাত এক করে দেন এবং তারপর বর-কনের কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর মাখিয়ে দিলেই বিবাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহ দাহ করা অথবা কবর দেওয়া—উভয় প্রথাই রয়েছে। দশদিন অশৌচ

পালনের নিয়ম রয়েছে। এই দশদিন রোজ জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি নতুন হাড়িতে ভাত রান্না করে মৃতের উদ্দেশে নিবেদন করে। এগারো দিনে শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যে জায়গাটিতে মৃত ব্যক্তি মারা গেছে, সেই জায়গাটিতে এদিন আমপাতা ও ঘি পোড়ানো হয়। মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে মোট চারপুরুষের নামে শ্রাদ্ধ হয়।

ধর্মবিশ্বাস : লোধাদের প্রধান দেবতা হলেন 'বড়াম দেবতা'—ইনি শক্তিশালী বনদেবতা। বনদেবী হলেন 'চণ্ডী'—ইনি বন্যজন্তু ও বিষধর সর্প থেকে লোধাদের রক্ষা করেন। সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করেন 'শীতলা মা'। এছাড়াও রয়েছেন 'বসুমাতা' ও 'ধরম দেবতা'।

অর্থনৈতিক অবস্থা : ইংরেজ সরকার লোধাদের criminal tribe হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এর ফলে মিশনারিরাও এদের জন্য কোনো কাজ করেনি। স্বাধীনতার পরেও এরা আরও পাঁচ বছর পর্যন্ত অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবেই আইনত চিহ্নিত ছিল। বনজ সম্পদ সংগ্রহ বা দিনমজুরি করে এরা কায়ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করে। অপরাধপ্রবণতার দাগ আইনত উঠে গেলেও এখনও এদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

খেড়িয়া

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে টি.ভি. স্টিফন একটি বিল তৈরি করেন। এই বিলে কয়েকটি জাতিকে বংশ পরম্পরায় অপরাধ প্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কয়েকটি জাতির সঙ্গে খেড়িয়া জনগোষ্ঠীকেও অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারপর বহুবৎসর সরকারিভাবে খেড়িয়ারা এই জন্মদাগ নিয়ে বেঁচে থাকে। অবশেষে স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে এদের ভাগ্য থেকে জন্ম-অপরাধীর চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য আইন পাশ হয়।

পুরুলিয়া জেলায় এরা 'পাহাড়ি খেড়িয়া' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এরা আদি কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর।

খেড়িয়া জনগোষ্ঠী কয়েকটি উপ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সেগুলি হল— (১) পাহাড়ি খেড়িয়া, (২) ঢেলকি খেড়িয়া এবং (৩) দুধ খেড়িয়া। এরা কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক রয়েছে। এই প্রতীকগুলি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধগুলি তারা কঠোরভাবে মেনে চলে। যদিও ধান এবং লবণ-এর ক্ষেত্রে তাদের 'টাবু' মানার কোনো উপায় নেই। নীচে এদের গোত্র ও টোটেমগুলি উল্লিখিত হল—

গোত্রের নাম	**ধর্মীয় প্রতীক**
(১) বাদ্যা	ওল
(২) হেম্রম	সুপারি
(৩) গুলগু	শালমাছ
(৪) টেসা	একজাতীয় পাখি
(৫) জারু	ইঁদুর
(৬) ভুইয়া	একরকম মাছ
(৭) সরেন	পাথর
(৮) মুরু	কচ্ছপ
(৯) মেল	গোবর

(১০) সামাদ হরিণ
(১১) টোপনো টোপনো পাখি
(১২) বারলিহা বারলিহা ফল
(১৩) হাঁসদা পাঁকাল মাছ
(১৪) চারহা চারহা পাখি
(১৫) কিরো বাঘ
(১৬) ডুং ডুং পাঁকাল মাছ
(১৭) টোপো টোপো নামের পাখি
(১৮) কুলু কচ্ছপ
(১৯) বা ধান
(২০) সামাদ তিতির
(২১) সরেং পাথর
(২২) বিলুং লবণ

এদের নিজস্ব পঞ্চায়েত রয়েছে। 'গ্রামপ্রধান' ও 'দিহুরি' পঞ্চায়েত পরিচালনা করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরের স্তরে রয়েছে 'পারহা পঞ্চায়েত'। গ্রাম পঞ্চায়েতের অমীমাংসিত বিষয়গুলি এখানে মীমাংসা করা হয়।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন খেড়িয়া নারী (১) একা বাইরে বের হয় না (২) জীব হত্যা করে না। গোষ্ঠীর নিজস্ব ধাইমা প্রসবে সাহায্য করে। একে 'সুতরেন' বলে। নয়দিন অশৌচ পালন করতে হয়। এক বৎসর পর 'নিমি টানজানা' বা 'নিমি রেনা' উৎসবের মধ্য দিয়ে খেড়িয়া শিশুর নামকরণ করা হয়।

বিবাহ : বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। বহুবিবাহের প্রচলন থাকলেও অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের দিনে আনুষ্ঠানিক বিবাহের পূর্বে বর আমগাছকে এবং কনে মহুয়া গাছকে যথাক্রমে কনে ও বর মনে করে বিবাহ করে। 'দিহুরি' বর-কনের মঙ্গল কামনা করে। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। বিবাহ বিচ্ছেদ অতি সহজেই করা যায়। একে তারা 'সাওরাইদোম মেলায়ানা' বলে।

মৃত্যুসংস্কার : বিবাহিত মৃতদেহ দাহ করা হয়, অবিবাহিত মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। শিশুর মৃতদেহ বট গাছের নীচে কবর দেওয়া হয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হলে স্বামী প্রথমে পেট কেটে সেই ভ্রূণ বের করে। তারপর মৃতদেহ ও ভ্রূণ পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। ৭-১০ দিন অশৌচ পালন করা হয়।

ধর্মবিশ্বাস : খেড়িয়াদের প্রধান দেবতা হলেন 'গিরিং' বা বেরো। অন্যান্য দেবতা হলেন 'গিরিং'-এর পুত্রসন্তান। প্রতিটি পাহাড়কেই তারা দেবতা মনে করে। পাহাড়ের নাম অনুসারে দেবতার নাম হয়। গ্রামদেবতা ও গৃহদেবতার অস্তিত্ব রয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা : ১৯৫০ সালের 'সিডিউল্ড ট্রাইবস অর্ডার'-এ খেড়িয়াদের নাম ছিল না। ১৯৫৬ সালে 'দা সিডিউল্ড কাস্ট অ্যাণ্ড ট্রাইবস অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট)-এ এদের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৬১ সালের পূর্বে এদের জাতিগতভাবে স্বতন্ত্র ধরা হলেও ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের লোকগণনায় এদেরকে লোধা জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ধরা হয়েছে। অথচ এদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এর ফলে স্বাধীনতার পরেও এদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো

পরিবর্তন হয়নি। পরাধীন ভারতে তারা 'অপরাধপ্রবণ' জাতি হিসেবে অত্যাচারিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে শোষিত হয়েছে ঠিকাদার ও জোতদারদের দ্বারা। জাতিগত স্বতন্ত্র পরিচয় সরকারিভাবে না থাকায় এদের জন্য বিশেষভাবে কোনো পরিকল্পনাও করা হয়নি। বর্তমানে, খেড়িয়াদের ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষি-শ্রমিক। অসহনীয় দারিদ্রের মধ্যে এদের বেঁচে থাকতে হয়। তার ওপর রয়েছে নিরক্ষরতার অভিশাপ।

কোড়া:

কোড়া জনগোষ্ঠী আদি অস্ট্রাল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা ছোটনাগপুরের প্রাচীন অধিবাসী। এদের ১১টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল—কাছুয়া, সমর, তামগেঁড়িয়া, ছাগের, কিসাড়, সুয়ের, হুরদুয়ার, চিডু , কাড়ি, সামা ও সানদোয়ার। এদের ধর্মীয় প্রতীকগুলি হল—কচ্ছপ, ছাগল, শোল মাছ, তামা, ষাঁড়, কাশিবক, শুয়োর, হলুদ, কাঠবিড়াল, ঢেঁকির রিং ইত্যাদি।

এদের নিজস্ব পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা রয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রধানকে 'মাহাত' বলা হয়। 'পারামানিক' হল মাহাতর সহকারী। কোড়া গ্রামে একজন বার্তাবাহক থাকে। তাকে 'গোড়াইত' বলা হয়। প্রতিটি কোড়া পঞ্চায়েতে একজন পঞ্চায়েত সহায়ক থাকে। তাকে 'নেকি' বলা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরের স্তরটি হল 'টোঠা' পঞ্চায়েত। টোঠা-র প্রধানকে বলা হয় 'পাঁড়ে'। পাঁড়ের মন্ত্রণাদাতা ও দেওয়ান হল 'ছেঁড়িদার'। 'টোঠা'—তত্ত্বাবধায়ক হলেন 'এইন মোড়ল'।

জন্মসংস্কার : অন্তঃসত্ত্বা নারী দুপুরবেলাও সন্ধ্যাকালে একা বাইরে যেতে পারে না। এদের নিজস্ব ধাইমা রয়েছে। ধাইমাকে এরা 'কুসরেন' বলে। নয়দিন অশৌচ পালিত হয়।

বিবাহ : স্ব-গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। তিনপুরুষের আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কন্যাপণের প্রথা রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারে। তবে মেয়ের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ চাইলে কন্যাপণ ফেরত দিতে হয় । দাদার বিধবা স্ত্রীকে ছোট ভাই বিয়ে করতে পারে। অর্থাৎ সমাজে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ নয়।

মৃত্যুসংস্কার : মৃতদেহ কবর দেওয়া কিংবা দাহ করা—উভয় প্রথাই চালু রয়েছে। সৎকারের সময় মৃতের ব্যবহৃত জিনিস মৃতের সঙ্গে দেওয়া হয়। দশদিন অশৌচ পালন করতে হয়।

ধর্মবিশ্বাস : কোড়া জনগোষ্ঠীর সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। বনজঙ্গলের দেবতা হলেন 'বাগেশ্বর', গ্রামের দেবতা হলেন 'গরাম ঠাকুর'। এছাড়াও শিব, মনসা, শীতলা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীগণ কোড়া সমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থনৈতিক অবস্থা : কোড়া-জনগোষ্ঠী পরিশ্রমী জাতি। পূর্বে এরা জমিদার-মহাজনদের জমিতে কৃষি মজুরের কাজ করত। পুকুরকাটা, রাস্তায় মাটি ফেলা, চাষযোগ্য জমি তৈরিব মতো শ্রমসাধ্য কাজে এরা পারদর্শী। এতৎ সত্ত্বেও এদের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনোদিনই ভালো ছিল না। ১৯৭১ সালের সেনসাস থেকে জানতে পারা যায় যে ৯১,৫৭ শতাংশ কোড়া নিরক্ষর, ৩০.৬১ শতাংশ কোড়া ছোট চাষি, ৫৪,১৭ শতাংশ কোড়া ক্ষেতমজুর। বর্তমান সময়ে বেশির ভাগ কোড়াই কেবল কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়েছে। জনজাতিগতভাবে এদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারি পরিকল্পনাতে অপ্রতুলতা রয়েছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনা: পুরুলিয়া জেলার বসবাসকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জনজাতির

জীবনচারণের প্রকৃতিটি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আরও কয়েকটি জনজাতির আলোচনা সময়াভাবে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। কিন্তু এগুলির মধ্য থেকেই আমরা জেলার জনজাতিগুলির কয়েক সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করছি। এগুলি হল—

১। প্রায় প্রতিটি জনজাতির নিজস্ব গ্রাম সংগঠন রয়েছে।

২। জনজাতিগুলি নিজস্ব পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার অধীন।

৩। সাধারণ জন্মসংস্কার ও মৃত্যুসংস্কার রয়েছে।

৪। প্রতিটি জনজাতির একাধিক গোত্র ও গোত্রপ্রতীক রয়েছে।

৫। গোত্র-প্রতীকগুলি সাধারণত উদ্ভিদ, ফল, পশু-পাখির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো কোনো গোত্রের পাথর প্রতীক রয়েছে।

৬। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী।

৭। বিবাহ : ক) বহুবিবাহ প্রচলিত।

খ) বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয়।

গ) বিধবা বিবাহ বা স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করা চলে।

ঘ) স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। পরে নিজ ইচ্ছায় অন্যত্র বিবাহ করতে পারে।

ঙ) আনুষ্ঠানিক বিবাহের পূর্বে বৃক্ষ বিবাহ করার প্রথা রয়েছে।

৮। প্রতি জনজাতির নিজস্ব প্রথাগত আইন রয়েছে।

৯। প্রতিটি জনজাতি একাধিক উপবিভাগ বা 'থাক'-এ বিভক্ত।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি জনজাতির মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। পরাধীন ভারতে ইংরেজ সরকার এদের নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা করেনি। স্বাধীন ভারতেও এদের নিয়ে যথেষ্ট পরিকল্পনা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী জনকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে জনজাতিগুলির জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে সরকারি কর্তা-ব্যক্তিদের স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকায় জনজাতি-মুখী কাজগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ভাবতে অবাক লাগে পুরুলিয়া জেলার কোনো দপ্তরেই জনজাতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন হিসাব নেই। অন্যান্য তথ্য পাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না। যেখানে প্রতি জাতি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোনো ধারণাই সরকারি কার্যালয়গুলিতে নেই, সেখানে এদের মহামানবের মূল স্রোতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা কতটা বাস্তব, তা ভেবে নিতে অসুবিধে হয় না।

আন্তরিক ভাবে যদি প্রতিটি জনজাতির সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হয়, যদি সত্যি সত্যি তাদের মানুষের মতো বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে হয়, তাহলে আশু কয়েকটি বিষয় পরিকল্পিত ভাবে বিবেচনা করতে হবে সেগুলি হল—

১। প্রতিটি জনজাতির সংখ্যাতত্ত্ব নির্ধারণ করা।

২। জনজাতিগুলির জীবনাচরণ ও ধর্মীয় ভাবনাগুলির সূত্রীকরণ।

৩। Customary law-গুলিকে সূত্রবদ্ধ ও বিন্যস্ত করা।

৪। জেলার জনজাতি-মানচিত্র প্রস্তুত করা।

৫। জনজাতিগুলির মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো।

৬। সারা বৎসর ধরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭। বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা।

৮। ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।

৯। খুব ধীরে ধীরে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটানো।

১০। সর্বোপরী, মূল স্রোতের সঙ্গে যে সামাজিক দূরত্ব রয়েছে তা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো।

এ সমস্ত কাজ কখনোই একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি বেসরকারি সংস্থাকে। 'মহামানবের মিলনতীর্থ'-এ কেউ অপাঙক্তেয় নয়— শুধু কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের তা প্রমাণ করতে হবে। আগামী দিনে এটাই যেন আমাদের শপথ হয়।



পঞ্চকোট রাজপরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দিলীপকুমার গোস্বামী

পঞ্চকোট রাজ্য মানভূম-পুরুলিয়ার সর্বপ্রাচীন রাজ্য। সুপ্রাচীন কালে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (৮০ খ্রিস্টাব্দে)। বজ্রভূমি, অটবীদেশ, ঝারিখণ্ড, শিখরভূম, মানভূম, পুরুলিয়ার মানসলোকের যাবতীয় গড়ন পঞ্চকোটের ছত্রছায়ায়। প্রাচীন এই অনার্যভূমি পঞ্চকোট রাজপরিবারের প্রভাবে ধীরে ধীরে আর্যয়ানায় রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাস বলে এই বজ্রভূমিতে প্রথম আর্য-মানুষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর। আজ থেকে ২৬০০ বছর আগে তিনি এই এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। আর্য জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এই এলাকায় তৎপরবর্তীকালে এলেন পঞ্চকোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দামোদর শেখর। দামোদর শেখর ঝালদায় জন্মগ্রহণ করেন। উজ্জয়িনীর নিকটস্থ ধার স্টেট বা ধারানগরের অধীশ্বর জগদ্দেও ছিলেন তাঁর পিতা। সুদূর ধার স্টেট থেকে ঝালদায় এসে রাজ্ঞীর রাজপুত্রের জন্মদান ঘটনাটি নিম্নরূপ :-

"পঞ্চকোট রাজবংশের বংশতালিকায় লিখিত আছে যে তিনি ও তাঁর পত্নী দেবীর নিকট স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ৩১৮১ কল্যব্দে ১৩৭ সম্বতে ২ শকাব্দে ৮০ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যাদেশান্তর্গত পুরুষোত্তম দর্শনে তাঁহার ঐকান্তিকী বাসনা থাকায় তিনি মহারাজ জগদ্দেও-এর নিকট এ বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া তীর্থযাত্রায় সঙ্গিনী হয়েন। সাধকপ্রবর রাজা আপন কুলগুরু পণ্ডিত বনমালী উপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়াছিলেন। উক্ত মহারাজা আপন চতুরঙ্গ বলসহ মধ্যে মধ্যে সচ্ছন্দ বিশ্রাম পূর্বক বিভিন্ন দেশসকল অতিক্রম করিতে থাকিলেন। ক্রমে বহু দেশ বহুতীর্থ অতিক্রম করত : সুদূর বঙ্গদেশের পশ্চিমপ্রান্ত সীমার পর্বতমালা সমাকুল মানভূম প্রদেশের ঝালদা নামক গ্রামের সন্নিকট রমণীয় প্রাকৃতিক শোভা সম্পন্ন এক পর্বতের পাদদেশে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন।"[১]

রানী ঝালদায় এক মৃত সন্তান প্রসব করেন। সন্তান জন্মের পূর্বে বনমালী পণ্ডিত, জ্যোতিষ গণনায় সিদ্ধান্তে এসেছিলেন "মহারানীর এই গর্ভে এক অসাধারণ সৌভাগ্য সম্পন্ন দীর্ঘজীবী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে ও নিজ ভুজবলে নবরাজ্য উপার্জন করিয়া তাহার অধীশ্বর হইবে।"[২] সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হওয়ায় ওই মৃত সন্তানকে পরিত্যাগ করে রাজা পুরুষোত্তম দর্শনে গেলেন। ফেরার সময় পুনরায় ঝালদায় উপস্থিত হলে লোকপরম্পরা বনমালী পণ্ডিত শুনলেন "তাঁহারা ঝালদার শিবির উঠাইয়া পুরুষোত্তম যাত্রাভিমুখে প্রস্থান করিবার পরদিবস স্থানীয় সর্দারগণের জনৈক ভৃত্য মহারাজ জগদ্দেও যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন তাহার অনতিদূরবর্তী বনমধ্যে একটি সদ্যপ্রসূত

শিশু দেখিতে পায়। ......তদবধি সেই শিশু সর্দার গৃহে সযতনে পালিত হইতেছে।"[৩]

এই শিশুই দামোদর শেখর। বনমালী পণ্ডিতের শিক্ষায়, পরিচালনায় পঞ্চকোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত যুগে ক্ষত্রিয়দের মূল সহায়কশক্তি, বুদ্ধিদাতা, রাজনীতি শিক্ষক হিসেবে ব্রাহ্মণদের স্থান এই ভারতবর্ষে স্বীকৃতি পেয়েছে। পঞ্চকোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠালগ্নের প্রচলিত এই Myth অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। সে যুগের পুরুলিয়া তো আদিম মানব সমাজের প্রতিবিম্ব ছিল। জঙ্গলময়, পর্বতসঙ্কুল এই মালভূমি প্রদেশে সভ্যতার আলো বহুদিন পর্যন্ত পড়েনি। সেসময় জনসংখ্যাও ছিল নগণ্য। আর্য-উপনিবেশ সর্বপ্রথম উত্তর ও মধ্য ভারতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তৎপরবর্তী বহুকাল পরে পূর্বভারতে আর্য উপনিবেশ সম্প্রসারিত হয়েছিল, বিশেষত পাহাড়-জঙ্গলের ওই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তুলনায় অগ্রসর চিন্তার মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়া সহজ ছিল। বাংলাদেশের সব রাজা-নৃপতিই বহিরাগত। বল্লাল সেন থেকে আলিবর্দী সকলের ক্ষেত্রেই তা খাটে। বিশেষত বীরভূম থেকে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত উত্তর থেকে দক্ষিণে একটি সরলরেখা টানলে যে ভূম অঞ্চল পরিদৃষ্ট হয়—বীরভূম, শিখরভূম, মানভূম, ধলভূম, বরাভূম হয়ে ভঞ্জভূম পর্যন্ত সেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে শাসন করেছেন যে শাসক সম্প্রদায়, কারোর কারোর অনুমান এরা ভাগ্যতাড়িত ক্ষত্রিয়সন্তান অথবা সর্দার যাঁরা নিজেদের বাসভূমে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি না পেয়ে এই জঙ্গলময় দুর্গম এলাকায় পালিয়ে এসে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শাসক হিসেবে।

পঞ্চকোট রাজ্য প্রতিষ্ঠায় দামোদর শেখরের জন্মবৃত্তান্ত অনেকটাই এই ব্যাখ্যার সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায়। ব্রিটিশযুগ ও মোঘলযুগের পূর্বে এই রাজপরিবারের শাসনের স্বীকৃতিস্বরূপে কোন সরকারি তথ্য এখনও পর্যন্ত গবেষকদের হাতে আসেনি। রাজপরিবারের কুর্শিনামা, এলাকার প্রচলিত কিংবদন্তী, রাজপরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য পরিবারগুলির ইতিহাস, প্রাচীন দুর্গ, মন্দির প্রভৃতি থেকে রাজপরিবারটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। রাজপরিবারটি সম্পর্কে লিখিত ইতিহাস দুটি—রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'পঞ্চকোট ইতিহাস' ও নিখিলনাথ রায়ের 'ইতিকথা'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য দু-একজন পঞ্চকোট নিয়ে গবেষণা করেছেন। তবে সেসব গবেষণাগ্রন্থগুলি মানুষ কখনও চোখে দেখেননি। বহু চেষ্টা করেও সেগুলো সংগ্রহ করা যায়নি। দীর্ঘকালব্যাপী শাসন করার জন্য পুরুলিয়ার জনজীবনে এই রাজপরিবার কী কী প্রভাব রেখে গেছেন সে সম্পর্কে আমরা আলোকদীপ্ত হতে পারতাম, যদি গবেষণাগ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা যেত। রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে ঝালদার সংলগ্ন এলাকার জমিদার-সর্দারগণ দামোদরশেখরের অধীনতা মেনে নেন। দামোদরশেখরের শাসনে ওই অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দামোদরশেখরের সহায়কশক্তি ছিলেন বনমালী পণ্ডিত ও সাত সর্দার। ঝালদা ও পাট ঝালদা এই দুটি পরগনায় এলাকাটি বিভক্ত করেন। নিজ ব্যয় নিবারণের জন্য পাট ঝালদা, চেক্যা, জোড়দা, ইলু, জারগো এই পাঁচটি গ্রাম রেখে অন্যান্য এলাকাগুলি উন্নতি সাধনের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত করেন। ছোটনাগপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করার পর দামোদরশেখরের রাজ্যাভিষেক হয়। দামোদরশেখর সিংহদেও এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্র ইন্দ্রশেখর ও প্রতাপশেখর। এই সময় পাড়ার রাজা ছিলেন মানসিংহ। তিনি দামোদরশেখরের রাজ্য আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিলেন। দূতমুখে এই সংবাদ শুনে মন্ত্রণাসভায় সিদ্ধান্ত হল সেই দিনই মানসিংহের রাজ্য আক্রমণ করতে হবে। শত্রুকে সময় দেওয়া অবিবেচনা হবে। তিনদিন যুদ্ধের পর মানসিংহ পরাজয় স্বীকার করে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধে দামোদরশেখরের পালক সাত সর্দারই নিহত হন।

পঞ্চকোট রাজবংশের লোকেরা "সকল শুভকার্যের পূর্বদিন অধিবাস কার্যাবসানে রাত্রিতে সাত রানার ভাত রন্ধন করাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে" দেওয়ার রীতি এখনও মেনে চলেন।

পাড়া অধিকার করার পর দামোদরশেখর পাড়াতেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। পঞ্চকোট রাজবংশের দ্বিতীয় রাজধানী পাড়া। "অচিরে পাড়া রাজধানী প্রশস্ত রাজপথ, নব নব দেবালয়, অতিথিশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, গোশালা, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পুষ্পোদ্যান, রনক্ষেত্র, ক্রীড়াক্ষেত্র, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় ও বহুবিধ প্রাসাদসমূহ দ্বারা সুশোভিত হইয়া সুরপুরী তুল্য শোভা ধারণ করিল।"[৪] দামোদরশেখরের রাজ্যের পরিমাণ ন্যূনাধিক ১৫০০ বর্গমাইল ছিল। ২ শকাব্দ থেকে ৬২ শকাব্দ পর্যন্ত ৬১ বৎসরকাল তিনি জীবিত ছিলেন (৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।

পঞ্চকোট রাজ্যের প্রথম রাজধানী ঝালদা, দ্বিতীয় রাজধানী পাড়া। পাড়ায় কখন রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল তার সঠিক সময়কাল নির্ণয় অতীব দুষ্কর। ১২০ অথবা ১২৫ খ্রিস্টাব্দে পাড়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। দামোদরশেখর থেকে পৃথ্বীনাথশেখর পর্যন্ত প্রায় ৩১ জন রাজা ৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাড়ায় রাজত্ব করেছিলেন। পাড়া গ্রামের মানুষজনের গল্পকথায় এই রাজধানীর কথা শোনা যায়। এই গ্রামের কিছু প্রাচীন পুষ্করিণী পঞ্চকোট নৃপতিদের স্মৃতি বহন করছে। তবে রাজধানীর কোনো চিহ্ন এখন আর চোখে পড়ে না। পাড়া গ্রামটি যে পুরুলিয়ার প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রামগুলির একটি তা এখানের প্রাচীন কিংবদন্তী শুনে ও মন্দির, পুষ্করিণী দেখে বোঝা যায়।

পাড়া থেকে পঞ্চকোট পাহাড় পাদদেশে রাজধানী স্থানাওরিত হয় মহারাজ কীর্তিনাথ-শেখরের রাজত্বকালে (৯২৬ খ্রিস্টাব্দে / মতান্তরে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে)। পঞ্চকোট রাজবংশের তৃতীয় রাজধানী পঞ্চকোট। পঞ্চকোট পর্বতের নিম্নে পাঁচটি পরিখাবেষ্টিত পঞ্চকোট দুর্গ কীর্তিনাথ-শেখরের কীর্তি। দীর্ঘ আট শতাধিক বৎসর পঞ্চকোট পাদদেশে পঞ্চকোট রাজবংশের রাজধানী ছিল। সর্বমোট ৩২ জন রাজা এই সময়কালে রাজত্ব করেছেন। একটি রাজবংশের কোনো একটি কেন্দ্র থেকে এত দীর্ঘকাল শাসন করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বাংলা দেশের মূল রাজবংশগুলির উত্থান-পতন হয়েছে বহুবার। পালবংশ থেকে শুরু করে সেনবংশের ধারাপথে হিন্দু শাসককুল বাংলাদেশের শক্তিকেন্দ্র থেকে চিরনির্বাসিত হয়ে গেলেন—মুসলমান শাসকবর্গ দখল করল বাংলাদেশ—১৭৫৭ তে তাদের ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে রাজদণ্ড ব্রিটিশের হাতে এল, আমরা বিস্ময় মানি বাংলাদেশের মূল ক্ষমতাকেন্দ্রে এত বিচিত্র পরিবর্তনের মাঝেও পুরুলিয়ার একটি রাজবংশ দীর্ঘদিন স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল কীভাবে, কীভাবেই বা রেখেছিল জনমনে এমন প্রভাব। রাজশক্তি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে তা জনগণের কাছে পীড়নযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চকোট রাজবংশ এই অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল। বিস্ময় মানবজাতির একটি দুর্লভ অনুভূতি, এই অনুভূতি গাঢ়তর হয় যখন মানুষ ভাবতে পারে তারই পূর্বপুরুষরা একসময় যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হলেও পৃথিবীর ব্যতিক্রমনীয় ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পুরুলিয়া-বরাকর পাকা রাস্তার গোবাগ মোড়ের কাছে গড়পঞ্চকোট গ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে সোজা উত্তরে প্রায় দেড় কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে মন্দিরক্ষেত্র। তারও উত্তরে পাহাড়ের ৫০০ ফুট উপরে দুর্গ-মন্দির-ধারা (জলধারা)। দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের রামকালানি স্টেশনে নেমেও রাজধানীতে পৌঁছানো যায়। গড়পঞ্চকোট গ্রামে ঢোকার মুখেই দুয়ারবাঁধ তোরণ। তোরণটি ঐতিহাসিক। পাথরের তৈরি বর্তমানে জীর্ণ তোরণটির কারুকার্য, গঠনরীতি

মুসলিম স্থাপত্যের কথা মনে করায়। J. D. BEGLAR 1872 খ্রিস্টাব্দে পঞ্চকোট ভ্রমণের সময় এমনি চারটি তোরণ দেখেছিলেন। তাদের নামগুলিও তিনি উল্লেখ করেছেন—আঁখ দুয়ার (Ankh Duar), বাজার মহল দুয়ার বা দেশবাঁধ দুয়ার, খড়িবাড়ি দুয়ার, দুয়ার বাঁধ। এদের মধ্যে দুয়ারবাঁধ তোরণ বাদ দিয়ে সবগুলিই Beglar-এর সময়েই জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছিল। তোরণ চারটি দুর্গে প্রবেশ-প্রস্থানের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। রাজধানীটি সম্পর্কে Beglar এর উদ্ধৃতি এইরকম—

The Fort is very large. The outermost ramparts having a total length of more than five miles. While the traditional outermost defence viz.ridge lines round the fort enclose a space of about 12 square miles, exclusive the hill itself.[৫]

"দুর্গটি ছিল বিশাল, দুর্গপ্রাচীরের দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইলের বেশি, দুর্গটি প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত, দুর্গ ঘিরে ছিল দীর্ঘ উচ্চভূমি, পাহাড় বাদ দিয়ে স্থানটি (রাজধানীটি) ছিল ১২ বর্গমাইল"। (ভাষান্তর লেখকের)। রাজধানীতে প্রায় শতাধিক প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট'জলাশয় ছিল, কাঁটা বাঁশ গাছে ঘেরা ছিল রাজধানীটি। গ্রাম পেরিয়ে ক্রমাগত হেঁটে দেশবাঁধের উত্তর পাড়ে দাঁড়ালে মন্দিরক্ষেত্রের সমস্তটিই আপনার চোখে ধরা দেবে। প্রায় দেড় বর্গমাইল জায়গা জুড়ে অসংখ্য মন্দির দাঁড়িয়ে আছে—তবে ভগ্ন মন্দিরের সংখ্যাই বেশি। সবচেয়ে সুন্দর মন্দিরটি পঞ্চচূড়ার, টেরাকোটার কাজগুলি খুব সুন্দর। মন্দিরটি রাসমেলা নামে পরিচিত। দ্বিতল দক্ষিণমুখী, পূর্বদিকে বহির্গমনের একটি পথ আছে। পাঁচটি চূড়াতেই ওঠার ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে সিঁড়িগুলি ভেঙেছে। মাঝের চূড়াটির আনুমানিক উচ্চতা ৬০', দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ২৩১/২' একতলার গর্ভগৃহটি ৫' × ৪১/২' প্রবেশপথের উচ্চতা ৬', দৈর্ঘ্য ২' × ১'—পশ্চিমকোনার মন্দিরটি—এটি ৪৫' ফুট উঁচু—দ্বিতল, সিঁড়িগুলি অক্ষত, এটিও ছিল পঞ্চচূড়ার মন্দির, তবে প্রধান চূড়াটি বাদ দিয়ে বাকিগুলি ধ্বসে গেছে। কল্যাণেশ্বরী মন্দির, একসময় মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছিল। মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। মূল মন্দিরটি নেই, শুধু কাঠামোটি আছে—এর গর্ভগৃহটি ১২' × ১২'। মন্দিরক্ষেত্রের পূর্বপ্রান্তে কঙ্কালীদেবীর মন্দির (সুন্দররায় মন্দির)—মন্দিরটির পাথরের তৈরি স্থাপত্যশৈলি অতি উন্নত—সামনের অংশটি অক্ষত থাকলেও পেছনের মূল মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের সামনে প্রবেশদ্বারের উপরে পরিচয়জ্ঞাপক লিখিত বিবরণ ছিল—লেখাটি খুলে পড়ে গেছে। নবগোপাল মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আছে জোড়বাংলা মন্দির। দেবীবাড়ি ধবংস হয়ে গেছে। কোনো চিহ্ন এখন আর নেই।

মন্দিরক্ষেত্রের মধ্যিখানে ছিল রানীমহল। একে R. S. Record-এ রাজার গড় বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। আগ্রহী দর্শকবৃন্দ প্রবেশপথের দরজার কারুকার্য এখনও দেখতে পাবেন। তবে স্থানটি লতাগুল্মে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে থাকায় এর ধ্বংসস্তূপের বিশালত্ব সম্পর্কেও ধারণা করা যায় না। দৃশ্যমান মন্দিরগুলি ছাড়াও বহু মন্দির জঙ্গলের মধ্যে থাকায় সেখানে পৌছানো সহজসাধ্য নয়। তবে জঙ্গল ভেদ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু সৌধ যত্রতত্র দেখা যায়। পাহাড়ের ৫০০ ফুট উপরে মূল দুর্গ। পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল এটি। দুর্গটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দুর্গের মধ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থাটি ছিল চমকপ্রদ। একটি প্রাকৃতিক ঝরনা থেকে শক্তপোক্ত প্রণালি দিয়ে দুর্গের মধ্যে জল আনা হত। নালাটি এখনও দৃশ্যমান। দুর্গমধ্যে রাজপরিবার ও কর্মচারীদের বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল বিশাল রঘুবর মন্দির। এতাবৎকালের পুরুলিয়ার মন্দিরগুলির মধ্যে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায় সর্ববৃহৎ। লতাগুল্মে পরিপূর্ণস্থানে প্রায় লুক্কায়িত জীর্ণ মন্দিরটির বিশালত্ব, সৌন্দর্য, মহিমান্বিত রূপ দেখলে দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হবেন।

পঞ্চকোট পাদদেশে রাজধানী করার সময় থেকে রাজধানী পরিত্যাগ সময়কালটি আলোচনা করলে বহু বিষয় পরিষ্কার হবে। ৯৫০ (অথবা ৯২৬) খ্রিস্টাব্দে রাজধানী তৈরির সময় বাংলাদেশের শাসক ছিলেন পালবংশীর দেবপাল। দেবপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুমাত্রা, জাভা, মালয় উপদ্বীপের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, উত্তরে আসাম পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমরা অনুমান করতে পারি পঞ্চকোটরাজের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়।

পালবংশের পর সেনবংশ বাংলাদেশের প্রধান রাজশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পঞ্চকোট রাজবংশের রাজা কল্যাণশেখর বল্লাল সেনের দ্বিতীয়া মহিষীর রূপলাবণ্যবতী কন্যা সাধনাকে বিবাহ করেন। বিবাহের যৌতুক হিসেবে তিনি পান সেনবংশের কুলদেবী শ্যামরূপা, দেবীর হাতের তরোয়াল, কালিঘুড়ী নামক এক ঘোটকী। এই দেবীই কল্যাণেশ্বরী নামক স্থানে অবস্থান করছেন। কল্যাণশেখরই কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রকাশ থাকে যে বাংলাদেশের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন বক্তিয়ার খিলজীর দ্বারা বিতাড়িত হন। পঞ্চকোট রাজ্য কিন্তু তখনও স্বাধীন রাজ্য হিসেবেই অবস্থান করছিল।

পঞ্চকোট এলাকার দেবমন্দির ও দেবমূর্তিগুলি কালাপাহাড় কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে--আকবরের রাজত্বকালে)। গরুড়নারায়ণ তখন পঞ্চকোট অধিপতি। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রশেখরের রাজত্বকাল বহুভাবে উল্লেখযোগ্য (১৫৯৮-১৬২৫)। মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। পঞ্চকোট দুর্গ সংস্কার, পূর্বপুরুষদের দেবালয়গুলি সংস্কার, নব দেবালয় প্রতিষ্ঠা, হরিশ্চন্দ্রসায়র খননসহ বহু কাজ তাঁর আমলে হয়েছে। আবার এই খ্যাতিমান রাজার আমলেই শাজাহান যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার (সুবাবাংলা) শাসক ছিলেন তখন পঞ্চকোটের মহারাজা ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হিসেবে মোঘলদের অধীনতা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

মহারাজা বলভদ্রশেখরের রাজত্বকালে পঞ্চকোটের স্বাধীনতাসূর্য চিরতরে অস্তমিত হল। মোঘল সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হল পঞ্চকোট। পঞ্চকোট রাজাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেন ইনি (১৬৩৭-১৭০৩)।

১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি দ্বিতীয়বার উড়িষ্যা অভিযানের সময় দামোদর নদ পেরিয়ে পঞ্চকোটের উপর দিয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে গেছিলেন। পাড়ার একটি মন্দির, ছোটবলরামপুরের মন্দিরটির সংস্কার সে সময়ই হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির সে সময় মোঘল বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলেন। অনুমান করা হয় বীর হাম্বির অল্প সময়ের জন্য পঞ্চকোটের দখল নিয়েছিলেন। দুয়ারবাঁধ ও খড়িবাড়ি তোরণদুটির গায়ে বীর হাম্বিরের নাম দেখে জে ডি বেগলার (১৮৭২) এই অনুমান করেন।

জীব গোস্বামীর প্রপিতামহ পঞ্চকোটে বসবাস করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ রাঘবানন্দ চক্রবর্তী পঞ্চকোট দরবারে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে থাকতেন। তাঁর সিদ্ধান্তরহস্য ও দীনচন্দ্রিকা গ্রন্থদ্বয় পঞ্চকোটে লিখিত হয়েছিল। শোনা যায় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ পঞ্চকোট দুর্গে এসেছিলেন। মহারাজা বলভদ্রশেখরের (১৬৬৮-১৭০৩) রাজত্বকালে কূটনীতিজ্ঞ ঔরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এঁর আমলে পঞ্চকোটকে নিয়মিত রাজস্ব পাঠাতে হত দিল্লির দববারে। এঁর আমলে রাজপরিবার বনমালী পণ্ডিতের বংশধরদের শিষ্যত্ব ত্যাগ করে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ রঙ্গরাজ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন—রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পঞ্চকোট দুর্গমমধ্যস্থ রঘুনাথ মন্দিরটি এই সময়ই তৈরি হয়। ধর্মান্তরের সময়কাল ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ।

বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা গোপাল সিংহ (১৭১২-১৭৫২) ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চকোটের অর্ধস্বাধীনতা হরণ করেন। শত্রুঘ্নশেখর ওরফে গরুড়নারায়ণ এ সময় রাজা ছিলেন। এঁর আমলেই বাংলাদেশ বর্গি হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত হয় বলে অনুমান করা হয়। তবে বর্গি হাঙ্গামার নির্দিষ্ট কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সময় রানী অহল্যাবাঈ পঞ্চকোটের উপর দিয়ে অহল্যাবাঈ রোড তৈরি করান। তেলকুপির উপর দিয়ে চলে আসা বাণিজ্যপথটির মতোই অহল্যাবাঈ রাস্তাটিও এই এলাকার একটি বিখ্যাত রাজপথ।

পঞ্চকোটগড়ের শেষ রাজা মণিলালশেখর (১৭৫১-১৭৯২)। এঁরই আমলে রাজধানী পঞ্চকোট থেকে প্রথমে মহারাজনগর, পরে রামবনীতে স্থানান্তরিত হয়। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। মণিলালের বাল্যকালের রাজ্যপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে পঞ্চকোটগড়ে এমনই নৃশংস হত্যালীলা সংঘটিত হয় যা শুধু পঞ্চকোট রাজবংশের নয় ভারতবর্ষের রাজবংশগুলির ইতিহাসেও ব্যতিক্রমনীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

মণিলালের সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁর পিতা মারা যান। মাতাও সহমৃতা হন। মণিলালের পিতামহ ভিখমলালশেখর তখন বৃদ্ধ। তিনি মণিলালের মাতামহ গোপালদেও ও মামা লালদেওকে মণিলালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন। এঁরা ডুমুরকলা গ্রামে থাকতেন। মণিলালের কয়েকজন খুল্লতাত অনন্তলাল, আনন্দলাল ও মোহনলালও রাজা হওয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন। স্বভাবতই কিশোর মণিলালের উপর তাঁদের ঈর্ষা ছিল। হঠাৎ মণিলালের পিতামহ রাজা ভিখমলালশেখর মারা যান। খুল্লতাতগণ কোষাগার, রাজগৃহ তালাবন্ধ করে দেন। মণিলালের মাতামহ ও মামা লালদেও সৈন্য সংগ্রহ করে পঞ্চকোট রাজধানীতে উপস্থিত হন। অনন্তলালও (মুর্শিদাবাদে থাকতেন—নবাবের প্রিয়পাত্র ছিলেন) পাঠান সৈন্য নিয়ে হাজির হন। তুমুল যুদ্ধে মণিলালের মাতামহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। লালদেও পলায়ন করেন। অনন্তলাল যুদ্ধে জয়ী হয়ে লালগড় নামক স্থানে বিশ্রামের জন্য গমন করেন। আনন্দলাল, মোহনলালও দুর্গ-বাহিরে বিশ্রামার্থে চলে যান। ইতিমধ্যে প্রতিহিংসাপরায়ন লালদেও অনুচরবৃন্দ নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে রাজপরিবারের শিশু নারী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের দেহ নির্বিচারে খণ্ড-দ্বিখণ্ড করে হত্যালীলা সংঘটিত করেন। মণিলালকে হত্যা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শোভারাম নামক এক রাজভক্ত ব্রাহ্মণ (কিনাইডি গ্রামের) কর্মচারী মণিলালকে দুর্গের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। শোনা যায় আসমান ও নয়ান নামে দুই দস্যু এই হত্যালীলায় সহায়তা করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে ডুমুরকলা গ্রাম ত্যাগ করে লালদেওয়ের পরিবারকে বেন্দীগ্রামে (চাষের কাছে) চলে যেতে হয়।

মণিলালই পঞ্চকোটগড়ের শেষ রাজা।

মণিলাল দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পর মহারাজনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজনগর পঞ্চকোটের চতুর্থ রাজধানী। কতদিন এখানে রাজধানী ছিল সঠিক বলা যায় না। মহারাজনগর থেকে মণিলাল রামবনীতে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। রামবনী হল দারকেশ্বর নদীতীরের একটি ছোট গ্রাম। কাশীপুরে যেখানে বর্তমান রাজবাড়ি অবস্থিত তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় এক কিলোমিটার দূরে রামবনীর রাজধানী ছিল। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে মণিলালের মৃত্যু হয়। "কথিত আছে চারিজন রাজমহিষী চিতানলে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি মন্দির অদ্যাপি কাশীপুর রাজধানীস্থিত কল্লোলী সরোবর গর্ভে অবস্থিত থাকিয়া অতীত গৌরব স্মৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।"[৫]

মণিলালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভরতশেখর ওরফে গরুড়নারায়ণ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে রামবনী থেকে কাঁসাই নদীতীরস্থ কেশরগড়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন। কেশড়গড় পঞ্চকোট রাজ্যের ষষ্ঠ রাজধানী। এই রাজধানীর স্থায়িত্ব ছিল ৩৯ বৎসর (১৭৯৩-১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। সর্বমোট

তিনজন রাজা কেশরগড়ে রাজত্ব করেছিলেন। ভরতশেখর (১৭৯২-১৮৫৩), চেৎসিংহ (১৮১৫-১৮১৮) ও জগজীবন (১৮১৮-১৮৫১)। কেশরগড়ে অবস্থানকালীন সময়ে পঞ্চকোট রাজ্য রাজস্ব দিতে না পারার জন্য নিলাম হয়। পরবর্তীকালে সেই নিলাম রদও হয়। কিন্তু সেরগড় পরগনার ১৮টি মৌজা আর কোনোকালেই রাজ্যভুক্ত হয় নাই। কেশরগড়ে থাকাকালীন সময়ে রাজপরিবার কাঁসাইপার পরগনার অধিকার নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী মামলায় জড়িয়ে পড়েন। বহুদিন পর কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তর হওয়ারও পর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে কাঁসাইপার পরগনা পুনরায় ফেরত আসে। কেশরগড়ে পঞ্চকোট রাজপরিবারের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ নীলমণি সিংদেও এর জন্মস্থান (১৮২৩)। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চকোটের রাজধানী স্থানান্তরীত হয় কাশীপুরে। অদ্যাবধি রাজপরিবারটির অধিষ্ঠানক্ষেত্র কাশীপুর। সর্বমোট ৭ জন রাজা কাশীপুরে রাজত্ব করেছিলেন। জগজীবন (১৮১৮-১৮৫১), নীলমণি (১৮৫১-১৮৯৮), হরিনারায়ণ (১৮৯৮-১৯০১), জ্যোতিপ্রসাদ (১৯০১-১৯৩৮), কল্যাণীপ্রসাদ (১৯৩৮-১৯৪৭), শঙ্করীপ্রসাদ (১৯৪৭-১৯৫৪), ভুবনেশ্বরীপ্রসাদ (জন্ম ১৯৪৩ ২রা অক্টোবর, মৃত্যু ১৯৭২ ২রা অক্টোবর)।[৬]

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে কাশীপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৭৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়কালে মানভূম জেলা তৈরি হয় (১৮৩৩)। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহে নীলমণি অংশ নেওয়ায় তাঁকে প্রথমে শান্তিপুর পরে কলকাতায় অন্তরীণ করে রাখা হয়। লর্ড ক্যানিং পরবর্তীকালে তাঁকে মুক্তি দেন। রাজ্যটি বাজেয়াপ্ত হয়—পরবর্তীকালে ফেরত দেওয়া হয়। একটি মফস্বলের গ্রাম থেকে কাশীপুর সাংস্কৃতিক রাজধানীতে রূপান্তরীত হয়। রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়। 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ' বলা হত কাশীপুরকে। বহু পুষ্করিণী খোঁড়া হয়, উদ্যান তৈরি হয়। আসানসোল-আদ্রা রেলপথ স্থাপিত হওয়ার পর কাশীপুরের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। এসময় রানীগঞ্জ-আসানসোল এলাকায় কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তার রয়েলটি রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। তৈরি হয় রাজরাজেশ্বরী মন্দির (দেবীমেলা)। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ম্যানেজার হিসেবে কিছুকাল কাশীপুরে অবস্থান করেন (১৮৭২)। কাশীপুরে বহু সংগীতজ্ঞ, পণ্ডিত, জ্যোতির্ষবিদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র হয়। সারা রাজ্যে সংগীত, নাটক, লোকগান, লোকউৎসবের প্লাবন বইতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে কাশীপুর।

মহারাজ জ্যোতিপ্রসাদ পঞ্চকোটের শেষ খ্যাতিমান রাজা। তাঁর পরবর্তীকালে কোনো রাজা তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতো মহনীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। অবশ্য ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় জমিদারি প্রথার বিলোপ হয়—রাজত্বও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যায়। ভুবনেশ্বরীপ্রসাদের অকালমৃত্যু রাজপরিবারটির ১৯০০ বৎসরের ইতিহাসে যবনিকা টেনে দেয়। বর্তমানে রাজবাড়ি দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন ভুবনেশ্বরীর ভগ্নী মহেশ্বরী।

তথ্যসূত্র:

১. পঞ্চকোট ইতিহাস—পৃঃ ১৯—রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, সম্পাদনা—দিলীপকুমার গোস্বামী।

২. পঞ্চকোট ইতিহাস—পৃঃ ১৯-রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, সম্পাদনা-দিলীপকুমার গোস্বামী।

৩. পঞ্চকোট ইতিহাস—পৃঃ ২০।

৪. পঞ্চকোট ইতিহাস—পৃঃ ২৪।

5. J. D. Beglar—A Tour Through Bengal Provinces. (Pachet)

৫. পঞ্চকোট ইতিহাস—পৃঃ ৯৫।

৬. হীরালাল শাণ্ডিকারী—ধারা ডিসেম্বর ২০০০ (শিখরভূম পঞ্চকোট রাজবংশের আদি অন্ত পরিচয়)

পুরুলিয়ার ইতিহাসের লিখিত উপাদান

বনমালী

পুরুলিয়া জেলার ইতিহাসচর্চা দীর্ঘদিনের। তবে এখানকার ইতিহাসচর্চার সামগ্রিক ছবিটি বিদ্বৎসমাজের নিকট খুব স্পষ্ট নয় অথবা সৃষ্টিশীল সুধীবৃন্দের নজরে আসেনি। তার অনেক কারণ, কয়েকটি উল্লেখ করছি—জেলার ইতিহাস চর্চার কাজটি সবসময় সমান গতিতে এগোয়নি; ইতিহাস লেখকগণ কিছুটা হলেও প্রচারবিমুখ ছিলেন, পাশ্চাত্য দেশীয় বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখার রীতি এখানকার ইতিহাসবিদ্‌গণ সবসময় অনুসরণ করতেন না, ইতিহাস-লেখকদের পরবর্তী প্রজন্ম এই সৃষ্টিকর্মগুলিকে মর্যাদা না দিয়ে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছেন—ইতিহাস রচনার ধারাটিকে লালন করা তো দূরের কথা, ভোলার চেষ্টা করেছেন এবং জাতি হিসেবে আমরা সর্বাংশেই ইতিহাসবিমুখ। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ যাঁরা এই জেলার উপর মূল্যবান আলোচনা করেছেন সেগুলো যেহেতু ইংরেজি ভাষায় লেখা এবং লেখাগুলি অবশ্যই উচ্চস্তরের সেজন্য এই এলাকায় না হলেও বহির্দেশে নানাভাবে সেগুলির পঠনপাঠন অব্যাহত আছে।

অতীতে পুরুলিয়া বহু নামে পরিচিত ছিল—বজ্রভূমি, অটবীদেশ, ঝারিখণ্ড, শিখরভূম, জঙ্গলমহল, মানভূম। শেষ দুটি জেলার নাম—বাকিগুলি এই ভূখণ্ডকে বৃহত্তর অর্থে চিহ্নিত করত। জেলার নামকরণ এবং জেলার এলাকা চিহ্নিতকরণ করেছিলেন কোম্পানি-শাসকগণ। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলা তৈরির সময় এলাকাটি Bengal Presidency-র অন্তর্গত ছিল। ১৯১২-তে Bengal Presidency ভেঙে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ হলে মানভূমকে বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে রাখা হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা পৃথক রাজ্যে রূপান্তরীত হয়। মানভূম থাকল বিহারেই। স্বাধীনোত্তর কালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হলে মানভূম জেলার একটি অংশ নিয়ে পুরুলিয়া জেলা আত্মপ্রকাশ করে; এই জেলা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। দূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত চিরদিনই এই এলাকা কখনো সুবা বাংলায় কখনো বাংলাদেশের মধ্যে ছিল। শুধু ১৯১২ থেকে ১৯৫৬—এই ৪৪ বৎসর জেলাটিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চক্রান্তে বাংলাদেশের বাইরে রাখা হয়।* এই জেলার অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশের জীবনচর্যার প্রতি ক্ষেত্রে বাংলা/বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চার বৃত্তের মধ্যে পুরুলিয়ার ইতিহাসচর্চাকে রাখলে আলোচনার পারম্পর্য বজায় থাকবে।

* ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের বিহারভুক্তির বিরুদ্ধে পুরুলিয়াবাসীর আন্দোলন—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, স্মরণিকা—নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ৪র্থ দ্বি-বার্ষিক রাজ্যসম্মেলন।

পুরুলিয়া সম্পর্কিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা H. Coupland-এর Bengal District Gezetters 'MANBHUM' 1911 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসকের গভীর প্রজ্ঞা ও তথ্যনিষ্ঠা গ্রন্থটিতে বিবৃত হয়েছে। পুরুলিয়া সম্পর্কিত সর্ববিধ আলোচনাতে গ্রন্থটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত J. D. Beglar তাঁর 'Report a tour throug the Bengal Provinces' গ্রন্থের Vol-VIII -এ পুরুলিয়া জেলার প্রধান প্রধান প্রত্নস্থল/মন্দিরগুলির মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সর্বমোট ১৬টি প্রবন্ধ আছে পুরুলিয়া বিষয়ক—মন্দির ও প্রত্নস্থলগুলির আলোচনার সাথে সাথে প্রবন্ধগুলিতে জেলার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে। জেলার ইতিহাস রচনায় সাহায্যকারী পুস্তক হিসেবে Beglar-এর গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে DULTON-এর 'Note on a Tour of MANBHUM' প্রকাশিত হয়।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় J. C. Price রচিত 'The Chuar Rebellion of 1799' জেলার কৃষক বিদ্রোহের উপর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। উল্লেখ করতে হয় যে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করার সাথে সাথে সমগ্র Bengal Presidency তে নতুনভাবে খাজনা নির্ধারণ করার উদ্যোগ নিলে বর্তমান পুরুলিয়ার দক্ষিণাংশে বরাবাজার, বলরামপুর, কুইলাপাল এলাকার কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৬ বৎসর ধরে এই বিদ্রোহ চলে, তিনবার প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এই বিদ্রোহ। অবশেষে ১৮৩২-এ 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা'-র মধ্য দিয়ে এই বিদ্রোহ সমাপ্ত হয়। অনেকে মনে করেন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'মানভূম' জেলা তৈরিতে গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে। নীলকর সাহেবদের প্রভাবও এই জেলা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। J. C. Price-এর গ্রন্থটিতে এই বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যের অধীন পুরুলিয়া থেকে আর একটি পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশিত হল, হরিনাথ ঘোষ রচিত "লালসিংহ বা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায়"। বইটিতে আলোচিত হয়েছিল বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের জঙ্গলমহলে লালসিংহের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কিত নানা ঐতিহাসিক ঘটনাবলি। বইটি বরাভূম রাজপরিবারের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত।

১৯১৮-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের B. K. Ghokle রচিত 'Final Report on the Survey and Settlement operations in the district of Manbhum' জেলার ইতিহাস রচনার একটি আকরগ্রন্থ।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মচারী শীতলাপ্রসাদ রচিত 'বিহার-উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশীয় সরাক (শ্রাবক) জাতির প্রাচীন ইতিহাস'-এ মানভূমের এক সুসভ্য জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় W.W. HUNTER-এর লেখা 'Statistical Account of Bengal VOL XVII.' গ্রন্থটি মানভূমের রাজস্বের উৎস সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ। সুবা বাংলার দেওয়ানি লাভের পর সমগ্র এলাকায় রাজস্ব আদায়ের উপায় অনুসন্ধানের জন্য কুড়ি খণ্ডে Hunter-এর গ্রন্থ লিখিত হলেও এলাকার মানবসম্পদ ও তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও অতি প্রয়োজনীয় তথ্য আছে এতে।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে) পঞ্চকোট রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বনে রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক দুটি নাটক 'জগদ্দেও' ও 'পঞ্চকোট প্রতিষ্ঠা' লিখিত হয়। এই সময়েই পঞ্চকোট রাজবংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস 'পঞ্চকোট ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থত্রয়ে মানভূমের সুপ্রাচীন রাজবংশ পঞ্চকোটের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে লিখিত হওয়ার ফলে এতদ্ অঞ্চলের বহু বিস্মৃত তথ্য ও ঘটনাপঞ্জি জনমানসে উদ্ভাসিত হয়। পঞ্চকোট ইতিহাস গ্রন্থটি এই রাজবংশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হিসেবে গবেষকদের নিকট স্বীকৃত। 'পঞ্চকোট প্রতিষ্ঠা' নাটকটির মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, "বঙ্গাব্দ ১৩৩১ (১৯২৪ খৃ.) ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত পঞ্চকোট অধিপতি জ্যোতিপ্রকাশ সিংহদেও পঞ্চকোট প্রতিষ্ঠা বিষয়ক নাটক লেখার জন্য লেখককে অনুরোধের ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থত্রয় লিখিত হয়।"

এই লেখকের 'কল্যাণেশ্বরী মাতার শঙ্খপরিধান' নামক একটি কবিতার বইও এই সময়ই প্রকাশিত হয়। কাব্যটিতে তৎকালীন মানভূমের 'কল্যাণেশ্বরী' মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে যা পঞ্চকোট রাজবংশের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই একই সময়কালে ঝালদার কিংবদন্তী সমরাজপুরুষ নটবর সিং-এর জীবনী সংবলিত নাটক 'নটবর চরিত্র' লেখেন ঝালদার নাট্যকার গোবিন্দচন্দ্র। নাটকটির অভিনয় হয়েছে বহুবার, পেয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা। নাটকটি কিন্তু গ্রন্থাগারে মুদ্রিত হয়নি কোনোকালেই। অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপিটি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি সরোজরঞ্জন চৌধুরী লিখিত 'মানভূমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রকাশিত হয়। মূলত বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে লিখিত হলেও পুরুলিয়া বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লেখক নিজে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের 'ইতিকথা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। এটি পঞ্চকোট রাজবংশের ইতিহাস।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৫৬) জেলার অন্যতম প্রধান শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় হরিপদ রায়ের 'মানভূমের কথা' প্রকাশিত হয়। বইটি তৎকালীন সময়কার মানভূম জেলার জীবনচর্যার একটি উজ্জ্বল দর্পন।

১৯৩৩-৩৯-এ প্রকাশিত হয় 'মানভূমের ভূগোল ও ইতিবৃত্ত' এবং 'ছোটনাগপুরের ভূগোল ও ইতিবৃত্ত'। জেলার প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দুটি পুস্তকের রচয়িতা। দুটি বই-ই ছিল বিদ্যালয়-পাঠ্য, তবুও বিশ্লেষণ ও তথ্য সংযোজনায় বিশিষ্ট স্থান আছে গ্রন্থদুটির।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ঝা মহাশয়ের 'Bhumij Revolt (Ganganarayan Hangama or Turmoil) গবেষণাগ্রন্থটি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত চুয়াড় বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণী। ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু পাঠক-গবেষকদের কাছে গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে।

এই লেখকের (জগদীশ ঝা) Kol Rebellion গ্রন্থটিও মূল্যবান।

চুয়াড় বিদ্রোহ বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ড. সুরজিৎ সিংহের 'বরাভূম'।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রিয়রঞ্জন সেন লিখিত 'রঙ্কিনি দেবী' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পুরুলিয়া জেলার পাড়া গ্রামের 'রঙ্কিনি দেবী' একসময় জাগ্রত দেবী

ছিলেন—বর্তমানে তিনি ধলভূমের দেবী। এক বাগালের তাড়নায় তিনি পাড়া থেকে ধলভূমে গেছেন। এই কাহিনি এই প্রবন্ধে আছে। প্রবন্ধটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে কি না আমরা জানি না।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত ৩০ তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত অশোক চৌধুরীর প্রবন্ধ পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'মানভূমের পরিচয়' নামে।

১৯২৬-এ হরিনাথ ঘোষ-এর একটি প্রবন্ধ 'মানভূমের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় মুক্তি পত্রিকায়।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেবলা মিত্রের 'Telkupi' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি মানভূমের প্রাচীন রাজধানী তৈলকম্পের অনুপম মন্দির-স্থাপত্যগুলি দামোদর নদীবাঁধ তৈরির সময় কীভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে একটি মূল্যবান রিপোর্ট।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেলা'। গ্রন্থটি লেখিকার আত্মজীবনী। গ্রন্থটিতে বিংশশতাব্দীর সূচনালগ্নের পুরুলিয়ার বর্ণনা আছে। লেখিকা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগিনেয়ী। চিত্তরঞ্জনের বাগানবাড়ি যা বর্তমানে 'নিস্তারিণী কলেজ' সেখানে দাশপরিবার বিংশশতাব্দীর প্রথমাংশে থাকতেন।

পূর্বতন মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী জগবন্ধু ভট্টাচার্য লিখিত 'বীর বিভূতি' গ্রন্থটি ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়—গ্রন্থটি জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ দলিল।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় West Bengal District Gezetteers PURULIA।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তরুণদেব ভট্টাচার্যের লেখা 'পুরুলিয়া' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইদানীং কালে লিখিত পুরুলিয়া সম্পর্কিত পুস্তকগুলির মধ্যে এই পুস্তকটি ব্যাপক পঠিত ও আলোচিত।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ডঃ সুমিত্রা মিত্রের 'সদর মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন'। গ্রন্থটি শ্রীমতি মিত্রের গবেষণাগ্রন্থ।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভজহরি মাহাত ও পদকচন্দ্র মাহাতর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনি 'রক্তে রাঙা মানভূম'। গ্রন্থটি মূলত লোকসেবক সঙ্ঘের অনুগামীদের দ্বারা লিখিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভাষা আন্দোলনের নেতা গিরিশচন্দ্র মাহাতর 'নব ভারত ও মানভূমের সংগ্রাম' বইটিতে স্বাধীনতাপূর্ব ও তৎপরবর্তী কালের কাহিনিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় স্বামী অসীমানন্দের আত্মজীবনী 'আমার জীবন'। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, পরবর্তীতে ছয়টি খণ্ড একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে অখণ্ড 'আমার জীবন' প্রকাশ লাভ করে। লেখক পুরুলিয়া-মানভূমের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন। অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী নামের বিপ্লবী, সমাজসেবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বহু প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা একসময় স্বামী অসীমানন্দ নামে সন্ন্যাস জীবনকে বরণ করলেন। গ্রন্থটিতে সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। আধুনিক পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি মহাভারত-সদৃশ। গ্রন্থটি বিশশতকের পুরুলিয়ার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ। স্বামী অসীমানন্দকে না জানলে যেমন

পুরুলিয়াকে জানা যাবে না তেমনি 'আমার জীবন' বাদ দিয়ে পুরুলিয়ার ইতিহাস রচিত হবে না।

পুরুলিয়ার তথ্য দপ্তরের আধিকারিক সুফল মণ্ডলের সম্পাদনায় 'পুরুলিয়া' নামক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৮০-র দশকে।

ওই দশকেই লীলাময় মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'জেলার নাম পুরুলিয়া' প্রকাশ পায়। বইটি ছোট হলেও সুলিখিত।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আচার্য কীর্তানন্দ অবধূত লিখিত ছয় খণ্ডে 'রক্ত মৃত্তিকা রাঢ় (ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে)' প্রকাশিত হয়।

P. C. Roychoudhury-এর লেখা 'Jainism in Manbhum' গ্রন্থটিতে জেলার জৈন সভ্যতার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুটি গ্রন্থ 'Glimpses of the History of Manbhum এবং Jain Temples of PURULIA সুলিখিত। বিষয়গুলির উপর লেখকের নিষ্ঠা প্রশংসার দাবি রাখে।

অতুলচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের এক ক্ষুদ্র জীবনী লিখিত হয়।

জেলার স্বাধীনতাসংগ্রামী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সংক্ষেপে অতুলচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেন।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তর উপন্যাস-সদৃশ বন্দিদশার কাহিনি 'সেই মহাবরষার রাঙাজল' সুখপাঠ্য। তরুণ শহিদ বৈকুণ্ঠ শুকুলের বন্দিদশায় ফাঁসিকাঠে আত্মদানের পূর্বরাত্রের কাহিনিটি মর্মস্পর্শী। বইটিতে স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকানীল সময়কার মানভূমের জেল-বন্দিদের কাহিনি আছে।

জেলার কয়েকটি অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। শ্রী দেবকুমার চক্রবর্তীর 'Manbhum Under East India Company 1765-1857' এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডী চক্রবর্তী মহাশয়ের 'A History of Panchakot Raj (Manbhum District) till 1900'। এঁরা দুজন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ছিলেন। গবেষণাগ্রন্থদুটি এতাবৎকাল লোকচক্ষুর অন্তরালেই আছে—দুটি গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হলে জেলাবাসী অশেষ উপকৃত হতেন। এই দুটি গবেষণা হয়েছিল রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এমনই আরেকটি অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ হল সুদীপ্তা মুখার্জীর Agrarian Discontent in Manbhum District (1765-1857), গবেষণাটি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Phil thesis.

অতি সাম্প্রতিককালে (১৯৯৯) পুরুলিয়া সম্পর্কিত তিনটি বই বাজারে এসেছে। লেখকবৃন্দ প্রচলিত তথ্যগুলিকে একত্রিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বইগুলি হল 'একনজরে পুরুলিয়া'—শ্রমিক সেন; 'সেকাল-একাল পুরুলিয়া'—সুভাষচন্দ্র ভৌমিক; 'আমাদের পুরুলিয়া'—অমিয়কুমার সেনগুপ্ত। ২০০১ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে দিলীপকুমার গোস্বামীর একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'পুরুলিয়ার মন্দির'। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলায় নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'পঞ্চকোট ইতিহাস'। সম্পাদনা করেছেন দিলীপকুমার গোস্বামী। পশ্চিমবাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসের পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ সচরাচর হয় না, এই হিসেবে গ্রন্থটি নতুন প্রজন্মের পাঠকদের নিকট নতুন স্বাদের খোরাক হবে।

জেলার ইতিহাসের লিখিত উপাদানের মধ্যে কিছু পত্রিকা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তাদের মধ্যে কিছু পত্রিকা এখন কারোরই সংগ্রহে নেই। কিছু পত্রিকা এখনও আছে কিন্তু সংরক্ষণের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় সেগুলিও হয়তো অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'মুক্তি' পত্রিকা। মানভূম কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে 'মুক্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে, ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের সম্পাদনায়। পরবর্তী কালে লোকসেবক সঙ্ঘের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতাপূর্ব ও উত্তর স্বাধীনতা যুগের জেলার ইতিহাস রচনায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লিখিত উপকরণগুলির মধ্যে পত্রিকাটি প্রথম সারিতে রাখার যোগ্য।

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'মানভূম সমিতি' পত্রিকা ও ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'সংগঠন' পত্রিকা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

'মানভূম' জেলা ছিল তৎকালীন বিহার প্রদেশের অধীন। বিহারের হিন্দিভাষী নেতৃবৃন্দ মানভূম জেলাকে হিন্দিভাষী এলাকা হিসেবে দেখাতে চাইতেন সেজন্য তাঁরা তৈরি করেছিলেন 'মানভূম বিহারী সমিতি' নামে একটি সংগঠন। ওই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন বিহার প্রদেশ তথা দেশের প্রথম সারির রাজনীতিবিদ্ ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এরই পালটা হিসাবে মানভূমে তৈরি হয়েছিল 'বাঙালী সমিতি'। ওই সংগঠনটির মুখপত্র ছিল 'মানভূম সমিতি' পত্রিকা।

'সংগঠন' পত্রিকার ভূমিকা আরও গৌরবোজ্জ্বল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ড. ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী ও সন্তোষ মিত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানভূম সমিতি পত্রিকা ও সংগঠন এই দুটি পত্রিকারই মূল চালিকাশক্তি ছিলেন জেলার প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অন্নদাকুমার চক্রবর্তী।

জেলার ইতিহাসের বহু উপাদান ছড়িয়ে আছে সুবোধ বসুরায় সম্পাদিত 'ছত্রাক' পত্রিকায়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) পত্রিকাটির যাত্রাপথ শুরু হয়। ৩০ বৎসর কাল ধরে এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে জেলার সংস্কৃতি, ভাষা, নৃত্য, গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব বিষয়ে বহু বিচিত্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। বহু লেখকের বহুতর ভাবনায় সমৃদ্ধ 'ছত্রাক' পত্রিকা জেলার লিখিত ঐতিহাসিক উপাদানের ভাণ্ডার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।



পুরাতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি

পুরাতত্ত্ব ও মন্দির-পুরাকীর্তির আলোয় পুরুলিয়া

ড. শান্তি সিংহ

১

ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত 'মানভূম' নামটি আজ মনোভূমে, অথচ মানভূম-পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মৌনমহিমায় আজও প্রাচীন ইতিহাসের বিশ্বস্ত নিদর্শন অসংখ্য পুরাকীর্তি!

আমরা জানি, 'বঙ্গ' নামটির সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে 'ঐতরেয় আরণ্যক'-গ্রন্থে। অথচ তা ভৌগোলিক অর্থে নয়, কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে—

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যয় মায়ং স্তানী মানি বয়াংসি।

বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যান্যা অর্কমভিতো বিমিশ্র ইতি।[১]

আর্যগণের বিচারে বৈদিক পথ লঙ্ঘন করে যারা নিরুদ্দিষ্ট বা নষ্ট হয়েছিল, তারা বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের তির্যক প্রাণীতুল্য মানুষ।

লক্ষণীয়, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাভাষ্য-রচয়িতা পতঞ্জলি পূর্ব ভারতের তিনটি বিভাগের নাম করেছেন। তা হল—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম। অঙ্গের বেশিরভাগ বর্তমান বিহার-ঝাড়খণ্ডে, কিছু অংশ বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে। গঙ্গা নদীর মোহনা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ স্থান, যা সুজলা—তা হল বঙ্গ। ড. সুকুমার সেনের মতে 'বঙ্গ' কথার মূল অর্থ—জলাভূমি।[২] আর আর্কিয়ান যুগের শিলা দিয়ে গড়ে ওঠা রাঢ় অঞ্চলকে বলা হত সুহ্ম। মহাভারতের আদিপর্বেও আছে—

অঙ্গো বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মঃশ্চতে সুতাঃ।

তেষাংদেশঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।।[৩]

বাল্মীকির রামায়ণেও সুহ্ম এবং বঙ্গের নাম পাওয়া যায়—

সুহ্মান মাল্যান বিদেহাংশ্চ মলয়ান কাশীকোশলান্।

মগধান দন্ত-কুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈচ।।[৪]

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে—'সুহ্মাঃ রাঢ়া'[৫]। অর্থাৎ সুহ্ম হল রাঢ় অঞ্চল।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় পূর্বভারতে দুটি বড় রাজ্য ছিল—(১) প্রাচী (২) গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাঢ়ী। গ্রিকগণ 'প্রাচী'-কে প্রাসই, এবং 'গঙ্গারাঢ়'-কে

'গঙ্গারিডই' (Gangaridai) উচ্চারণ করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পরিচিত, তার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড 'গঙ্গারাঢ়' নামে পরিচিত।

প্রাচীন জৈনধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্ত'। সেখানে 'লাঢ়' বা 'রাঢ়' অঞ্চলের কথা আছে। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে রাঢ়দেশের দুটি বিভাগ—১. বজ্জ বা বজ্রভূমি ২. সুবভ্ বা সুহ্মভূমি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর পর্বত-অরণ্য-পূর্ণ রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তখন এ অঞ্চলের প্রাকৃত জনগণ তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে 'সুহ্ম' নামের পরিবর্তে 'রাঢ়' নাম হয়। ধোয়ীর 'পবনদূতম্' কাব্যে এই অঞ্চলের রসভরা বিস্ময়ের কথা উল্লেখ আছে।[৬]

দক্ষিণ ভারতের রাজেন্দ্র চোল দেব তাঁর তিরুমলয় লিপিতে (Tirumalai inscription) উল্লেখ করেছেন—'উত্তীর-লাঢ়ম' (উত্তর-রাঢ়) এবং 'তক্কণ-লাঢ়ম' (দক্ষিণ-রাঢ়)। সাঁওতাল পরগনার কিছু অংশসহ বীরভূম, দামোদর নদের উত্তর তীরবর্তী বর্ধমান জেলা উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে দক্ষিণ-রাঢ়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর অনন্যসাধারণ গবেষণা গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণসূত্রে বলেছেন—'ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাঙ্‌লাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিমে বাঙ্‌লার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংহভূম, ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি। ইহাও সদ্যোক্ত পুরাভূমির অন্তর্গত। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, জাঙ্গলময়, অজলা এবং অনুর্বর। এখনও এই অংশে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর ও কয়লার খনি এবং ইহা সাধারণত অনুর্বর। প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের অনেক অংশ, দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং তাম্রলিপ্তি রাজ্যেরও কিয়ৎ-পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর গৈরিক ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ-রাঢ়ের রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বন-বিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনি-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল সমস্তই এই পুরাভূমিরই নিম্ন অংশ। এইসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কপিশা (কাঁসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে।'[৭]

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, নবাব মীরকাশিমের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের সনদ হিসাবে পান দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করার পর কোম্পানির অধিকার পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষিত হয়। ফলে, কোম্পানি দুর্গম অরণ্য রাজ্যগুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ অভিযান চালান। ঝাড়গ্রাম পতনের পর—রামগড়, শাঁখাকুলি (লালগড়), ঝাঁটিবনি (শিলদা), জামবনি, আমাইনগর (অম্বিকানগর), রাইপুর, সুপুর, ছাতনা, বরাভূম প্রভৃতি অঞ্চলও আনুগত্য দেখায়। ধুরন্ধর কোম্পানি সুকৌশলে পাতকুম, তোড়াং, বুণ্ডু, সিল্লি, তামাড়, পাঞ্চেত, কাশীপুর, ঝালদা, ঝরিয়া দখল করে। ধলভূম ব্যতীত অবশিষ্ট অরণ্য রাজ্যগুলির নাম হয় জঙ্গলমহল।

১৮৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গানারায়ণী বিদ্রোহ বা ভূমিজ বিদ্রোহ হওয়ায় 'নন-রেগুলেশন এরিয়া' গড়া হয়। তার শাসন-দায়িত্ব দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে বিশিষ্ট কমিশনারের হাতে যায়।

১৮৩৪-এ তিনটি বিভাগ হয়—১. মানভূম বিভাগে আনা হয় রেগুলেটেড জঙ্গলমহলসহ ধলভূম, ২. লোহারডাগা বিভাগে বুণ্ডু-সিল্লি-তামাড়-সোনাহাতু-আদি পাঁচ পরগনার সঙ্গে চুটিয়া-নাগপুর ও পালামৌ, ৩. হাজারিবাগ বিভাগে রামগড়, খড়কডিহা এবং রেগুলেশনের বাইরে অথচ সন্নিহিত অঞ্চল।

১৮৩৩-এ মানভূম জেলার সৃষ্টি। তার সদর দপ্তর হয় মানবাজারে। ১৮৩৮-এ মানভূমের সদর দপ্তর আনা হয় পুরুলিয়ায়। ১৮৪৫-এ সিংভূমের সঙ্গে ধলভূম জুড়ে দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে, মানভূম-পুরুলিয়ায় মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে ভাষা-আন্দোলন ও টুসু-সত্যাগ্রহ ১৯৪৮ থেকে ক্রমশ জোরালো হয়। যার লক্ষ্য ছিল পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। ফলে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে তৎকালীন বিহার রাজ্যের মানভূমকে তিন ভাগ করা হয়। উত্তরের চাষ-চন্দনকিয়ারিসহ শিল্পাঞ্চলসমৃদ্ধ ধানবাদ বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বিহারে রাখা হয়। গড়ে ওঠে ধানবাদ জেলা। তার সঙ্গে ঝরিয়া, কাতরাস খনি অঞ্চল জুড়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যুক্ত করা হয় সিংভূম জেলার নতুন মহকুমা সেরাইকেল্লার সঙ্গে। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তোড়াং, পাতকুম, চাণ্ডিল, পটমদা অঞ্চল। অবশিষ্ট মধ্যবর্তী টাঁইড়্-বাইদ, অনুর্বর, কৃষি এলাকা পুরুলিয়া জেলা নামে পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর পুরুলিয়া জেলা গড়ে ওঠে।

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. সুধীরকুমার করণ শিকড়সঞ্চারী চেতনায় যথার্থই বলেছেন, 'বস্তুত উত্তর বিহারের দক্ষিণ সীমায় গঙ্গা নদী অতিক্রম করে, বাংলা-বিহার সীমান্ত ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ আরম্ভ হোক; বন-পাহাড়-নদী-নালা-মাঠঘাট, শাল-মহুয়া-পলাশ-কুর্চির স্পর্শ নিয়ে চলে আসুন, দেখতে পাবেন রাজনৈতিক সীমারেখার এপারেও বাঙ্‌লা, ও পারেও বাঙ্‌লা। এ পাশে বীরভূমের পশ্চিম সীমানা, ওপাশে সাঁওতাল পরগনা; এপাশে পশ্চিম বর্ধমান, ওপাশে ধানবাদের খনি অঞ্চল; এপাশে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর, ওপাশে চাষ-চাণ্ডিল-ধলভূম। বলা বাহুল্য, কৃত্রিম এই সীমারেখা। এ রেখা দু'পাশের মানুষকে ভাগ করতে পারেনি। ভূ-প্রকৃতি, সমাজবিন্যাস, ভাষা-সংস্কৃতির আত্মিক বন্ধনে এই দুটি পাশ এক এবং অভিন্ন।'[৮]

রাঢ়-বঙ্গের সুপ্রাচীন ইতিহাস এবং ধারাবাহিক ঐতিহ্য সংস্কৃতির মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদ নেই; অথচ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্তর্গত পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ বাঁকুড়ায় কেউ কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝাড়খণ্ডী চেতনায়, কিংবা তথাকথিত জনযুদ্ধের হিংসাত্মক মনোভাবে ইন্ধন জোগানোর অপচেষ্টা করছেন। মনে রাখা দরকার—এই প্রান্তিক বাংলার জনজীবন ও জনসংস্কৃতি বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। বিশ্ববিশ্রুত ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে, বিগত ১৩/৪/১৯৭৩ বিশেষ ভাষণে বলেন, 'পশ্চিম রাঢ়ভূমির অন্তর্গত পশ্চিম মেদিনীপুরের সংলগ্ন বীরভূম ও মানভূম এবং উত্তর রাঢ়ভূমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগনা ও হাজারিবাগের পূর্ব অংশ—এই সমস্ত অঞ্চল, রাঢ় খণ্ডেরই অধীন—ভাষা ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ বঙ্গেরই অংশ।'[৯]

২

পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দির ও পুরাকীর্তিমালা আলোচনায় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলা এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের সুপ্রাচীন ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানা আবশ্যক বিধায়, তা সংক্ষেপে বিবৃত করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাচীন বাংলার এইসব অরণ্যসংকুল পাহাড়িয়া এলাকায় আদি-অস্ত্রালদের (Proto-Astroloid) বাসভূমি থাকায় উত্তর ভারতের আর্যদের কাছে ভারতের পূর্বাঞ্চল ছিল উপেক্ষা-অবজ্ঞার বিষয়। 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ, বঙ্গ তথা মগধের অধিবাসীদের 'অসুর' এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রদের 'দস্যু' অভিহিত করা হয়েছে। তবু বহমান জীবনধারায় আর্যদের কোনো কোনো গোষ্ঠী মগধ-বিহার থেকে ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এখানের আদি-অধিবাসী অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির সমন্বয় কালপ্রবাহে ধীরে ধীরে ঘটে। অর্থাৎ যাদের তারা 'অন্যব্রত' বা 'অনার্য' বলত এবং তাদের সংস্পর্শে এসে 'ব্রাত্য' জীবনের মাঝে মানবসংস্কৃতির মিলনই ঘটাত। এই বিষয়টি ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলমে সুন্দরভাবে চিত্রিত—'আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙ্লাদেশে আর্যদের আগমন হয়নি, আর বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার অঞ্চলে যে-সব আর্য প্রথমে এসে বসবাস করে তারা ঘরবাসী কৃষাণজাতীয় ছিল না, তারা ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে; তারা তাদের ঘোড়া-গোরু-ছাগল-ভেড়া নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত; পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আর্যেরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তারা অবশ্য আর্যভাষা বলত, কিন্তু তাদের আর্যভাষা উদীচ্য আর কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলের আর্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল; আর তাদের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা—খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা করত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ, হোম, অগ্নিপূজা ইত্যাদি করত না, আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও মানত না। বেদমার্গী পশ্চিমা আর্যরা এইসব কারণে তাদের অবজ্ঞা করত; এইজন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান নিন্দার কথা লিখে গিয়েছে। কিন্তু এরা যে আর্য ছিল, আর আর্যভাষা বলত, (যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না), ব্রাহ্মণগ্রন্থে একথাও স্বীকার করা হয়েছে, আর বৈদিক আর্যরা এদের শুদ্ধি করে বেদমার্গী করে নিত খুব; যে-অনুষ্ঠানের দ্বারা এই বৈদিক দীক্ষা নিত, সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম'। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য, দ্রাবিড় লোকেদের সঙ্গে কতকটা মিশে গিয়েছিল। যে-যুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য-আর্যরা মধ্যদেশীয় আর্যদের দ্বারা স্বীকৃত বর্ণভেদ মানতই না। এই ব্রাত্য আর্যরা বেদমার্গী আর্যদের আগে মগধ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়; আর এটা খুবই সম্ভব যে তারা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করলেও সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হতে পারে নি। তাই বৈদিক ধর্মের যজ্ঞ -অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে দুটি বড় ধর্মমত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছিল—বৌদ্ধমত আর জৈনমত—সেই দুটি মত এই মগধ অঞ্চলেই উদিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকেদের মধ্যেই প্রসার লাভ করে।' [১০]

খ্রিস্টপূর্ব ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে রচিত 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র' থেকে জানা যায়—মগধ ও অঙ্গদেশ আংশিকভাবে আর্যীকৃত (Aryanised) হলেও পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ আর্যপ্রভাব-বহির্ভূত ছিল। বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যকুল বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কোশল, বিহার প্রভৃতি উত্তর ভারতের অঞ্চলে জোর দেন, অথচ মহাবীর ও তাঁর অনুগামীরা জৈনধর্ম প্রচারের জন্য প্রাচীন বঙ্গদেশ থেকে ক্রমশ পশ্চিম ভারতে আসার চেষ্টা চালান। তাই রাঢ়ভূমি সমেত প্রাচীন বঙ্গের বহুস্থানে জৈনধর্মের

প্রসার ঘটে। লক্ষণীয়, পূর্বভারত তথা প্রাচ্যদেশে আর্যীকরণ (Aryanisation) হয় জৈনধর্ম প্রসারের মাধ্যমে। পুরাণমতে রাঢ়ভূমিসমেত প্রাচীন বঙ্গভূমির বহু অংশ 'প্রাচ্যদেশ'। প্রাচীন বঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়) জৈনধর্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেছেন, 'বঙ্গদেশে জৈনধর্ম অন্তত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আর, উত্তরবঙ্গে যে সে-সম্প্রদায়ের প্রভাব খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবল ছিল, তার প্রমাণ হিউয়ান সাং-এর বিবরণী হতেই পাওয়া যায়। তাঁর সময়েও পুণ্ড্রবর্ধন নগরে নির্গন্থদের সংখ্যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী।' ('বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ' প্রবন্ধ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৬ সনের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত)

'জৈনকল্পসূত্র'-এ 'গোদাস-গণ' সম্প্রদায়ের প্রথম শাখাকে 'কোটিবর্ষীয়' বলা হয়। কারণ, তাঁরা প্রাচীন বঙ্গের কোটিবর্ষ নগরে (বর্তমান দিনাজপুরের বাণগড়) বাস করতেন। আবার তাম্রলিপ্তের (তমলুক) বসবাসকারী সম্প্রদায় 'তাম্রলিপ্তীয়'।

'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা' গ্রন্থেও বলা হয়েছে পুণ্ড্রবর্ধন জৈনধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। তাছাড়া হাজারিবাগ, মগধ অঞ্চলেও জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়কে জৈনধর্মগ্রন্থে 'সমেতশিখর' বলা হয়েছে। এই পবিত্রস্থানে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে কুড়িজন (মতান্তরে উনিশজন) সিদ্ধিলাভ করেন। জৈনধর্মের নির্গন্থ শাখার প্রবর্তক পার্শ্বনাথের নামানুসারে পরেশনাথ (পার্শ্বনাথ শব্দজাত) পাহাড়।

পালিভাষা তথা বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জার্মান গবেষক গাইগারের অভিমত— গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে আবির্ভূত হন এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে। জৈন মতানুসারে মহাবীর বর্ধমানের কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দ। (মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৮ অব্দ।) লক্ষণীয়, মহাবীরের তিরোধানের দুশো বছর পর থেকে প্রাচীন বঙ্গদেশ, রাঢ় অঞ্চলসহ ক্রমশ পশ্চিম ভারতে জৈনধর্মের প্রসার বাড়তে থাকে।

হাজারিবাগের পরেশনাথ পাহাড় বর্তমান পুরুলিয়া জেলার অনতিদূরে। ফলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে জৈন শ্রমণ বা জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ বড়-বড় নদী তীরবর্তী পথ ধরেই যাতায়াত করত। ফলে কাঁসাই, দামোদর, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, কুমারী প্রভৃতি নদীর তীরবর্তী নানাস্থান গড়ে উঠেছিল বহু জৈনমন্দির ও পান্থশালা।

তৎকালীন বাংলার পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মের সমর্থক হওয়ায় জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ কোণঠাসা হন। ফলে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বাংলায় জৈনধর্ম ক্ষীণরূপ লাভ করে। তা ছাড়া চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলায় মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। পাল রাজবংশের পর বাংলায় সেন রাজবংশের সূচনা হলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাবল্যে জৈনধর্ম বাংলায় হীনবল হওয়ায় অরণ্য-পাহাড় ঘেরা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে এবং সন্নিহিত সিংভূম, উড়িষ্যা, বিহার, হাজারিবাগ অঞ্চলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়। কারণ, অরণ্য-পাহাড় ঘেরা পশ্চিম রাঢ়ে পাল রাজাদের বা সেন রাজবর্গের প্রভাব ছিল না।

মানভূম-পুরুলিয়ার দেউলঘাট, বড়াম, সুইসা, দেউলি, শীতলপুর, আনাই, বুধপুর, পাকবিড়র‍্যা, লৌলাড়া, ছড়রা, পাড়া, কাশীপুর, মৌতড়-বান্দা, তেলকুপি প্রভৃতি নানা জায়গায় এখনও বহু জৈন তীর্থঙ্করের শিল্পশোভন প্রস্তরমূর্তি এবং জৈন মন্দিরসমূহের নিদর্শন ভগ্নপ্রায় বা অক্ষত অবস্থায় আছে। সবিনয়ে জানাই, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' এবং আরও নানা গবেষণাগ্রন্থ ক্ষেত্রসমীক্ষা সূত্রে

রচনা করেছেন বিনয় ঘোষ। তিনি পুরুলিয়ায় ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে আমাকেও সঙ্গী করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় ১৯৬৯ থেকে পুরুলিয়ার মন্দির-পুরাকীর্তি সম্পর্কে প্রথাগত সমীক্ষার 'কাজ' করতে শুরু করি। এবং তাঁরই পরামর্শে তারাপদ সাঁতরা সম্পাদিত 'কৌশিকী' পত্রিকায়, সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় এবং 'যুগান্তর' দৈনিকে পুরুলিয়ার মন্দির-পুরাকীর্তি বিষয়ে সমীক্ষাধর্মী কিছু লেখা একদা প্রকাশ করেছিলাম। মনে আছে, দামোদর নদের পাঞ্চেত জলাধারে—তেলকুপির বেশ কিছু জৈন মন্দির ১৯৬৯ সালে জলমগ্নপ্রায় দেখেছিলাম। নীল জলরাশির মাঝে কয়েকটি মন্দির তখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তা দেখে বিস্ময়ে-বেদনায় নির্বাক হয়েছিলাম। তখনই মনে জেগেছিল গবেষক নির্মলকুমার বসুর অনুসন্ধানী মন্তব্য—'উড়িষ্যার সহিত তেলকুপির সম্বন্ধের আর একটি প্রমাণ এই যে, প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে তেলকুপিতে দামোদরের চড়ার উপর 'ছাতা-পরব' নামে একটি উৎসব হয়। তখন বালির চড়ায় দুইটি বাঁশের বড় ছাতা পুঁতিয়া, ফুল চন্দন দিয়া তাহাদের পূজা করা হয়। একটি স্থানীয় পঞ্চকোটের রাজার নামে, ও অপরটি, আশ্চর্যের বিষয়, পুরীর গজপতি সিংহের নামে স্থাপনা করা হয়। কতকাল পূর্বে এই দেশটি হয়ত পুরীরাজের অধীনে ছিল। আজ তাঁহার রাজত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে অথচ তাঁহার নাম আজও সুদূর পল্লীতে পূজিত হইয়া আসিতেছে।' ('মানভূম জেলার মন্দির' প্রবন্ধ। 'প্রবাসী' পত্রিকা : ভাদ্র, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।)

জৈন ধর্মাবলম্বী 'শ্রাবক'-সম্প্রদায় মানভূম-পুরুলিয়ায় 'শরাক' নামে পরিচিত। এই শরাকগণ এখনও নিরামিষাশী। নৃতত্ত্ববিদ রিজলির 'Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। হিন্দুধর্মের প্রভাব শরাকদের মধ্যে পড়লেও অন্তর্লীন চেতনায় তাঁরা আজও জৈনপন্থী।

১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে বেগলার সাহেব আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের সুবাদে তৎকালীন মানভূম-পুরুলিয়ার দুর্গম অঞ্চলে জৈন মন্দির এবং প্রাচীন পুরাকীর্তির নানা নিদর্শন দেখে বিস্মিত-মুগ্ধ হন। তাঁর হাতির পিঠে পরিক্রমার প্রায় একশো বছর পর, ১৯৭০ সালে এই লেখক সমীক্ষাসূত্রে বলরামপুর, বাগমুণ্ডি, কালিমাটি গ্রাম পেরিয়ে সুইসা গ্রামে যান। গ্রামের এক খোলামেলা জায়গায় সংগৃহীত প্রাচীন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তির নানা আকার দেখেছিলাম। পরে আবার গিয়ে দেখেছি, সেসব মূর্তি সংরক্ষণের জন্য গৃহনির্মাণ হয়েছে।

সুইসা পেরিয়ে ধুলো-ওড়া মাইল দেড়েক পথ। সেখানে দেউলি গ্রাম। গ্রামপ্রান্তে প্রাচীন পুরাকীর্তির বিশাল ভগ্নস্তূপ! ভূমিকম্পের পর '৭০ সালে গেছি। সেই ভগ্নস্তূপের মাঝে সুপ্রাচীন করম গাছ। অজস্র ভ্রমর গুঞ্জন, শীতের দুপুরে! সেই ভগ্নস্তূপের ওপর উঠে, অন্তত সাত-আট ফুট নিচে গর্ভগৃহ। আলো-আঁধারি ভাব। সেখানে অপূর্বদর্শন এক জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। স্থানীয় নরনারীদের কাছে তিনি 'ইড়গুনাথ'! কাছেই অনেক জৈন তীর্থঙ্করের ছোট ছোট মূর্তি। একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়েছে পরবর্তীকালে।

দেউলি গ্রাম পেরিয়ে দুর্গম বন্যপথে হারুপ্‌ড়ি গেছিলাম '৭০ সালে। সেখানে এক সুপ্রাচীন কুসুম গাছের তলায় ঐরাবতপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্রের অপরূপ প্রস্তরমূর্তি। প্রায় চারফুট লম্বা। চওড়ায় আড়াই ফুট। স্থানীয় গ্রামবাসীর চোখে তিনি 'হাতিয়াসীনী' দেবতা! আদিবাসী 'লায়া'-পুরুত নাকি পুজোও করেন।

পুরুলিয়া শহর থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে, প্রায় মাইল বিশ দূরে গড়জয়পুর গ্রাম। পিচ

রাস্তা থেকে বাঁ-হাতে, মোরাম ছড়ানো রাস্তায় '৭০ সালে গেছি। ভারডি, মিরডি, শ্যামপুর প্রভৃতি গ্রাম পেরিয়ে কাঁসাই নদী। সেই কাঁসাই নদীর তীরে দেউলঘাটের পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসাবে আছে প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন একাধিক মন্দির। তাদের জরাজীর্ণ ভগ্ন দশায় ইতিহাস মৌন নয়, মুখর! করম, অর্জুন, পলাশ, আঁকড় গাছের ছায়া ঘেরা নির্জন পরিবেশে, হাল আমলে নির্মিত খাপরার ঘরে আছেন বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের অষ্টভুজা দেবী দুর্গা। উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট। প্রস্থে তিন ফুট। এই সিংহবাহিনীর দক্ষিণপদ মহিষপৃষ্ঠে। তাঁর পদতলে মহিষাসুর বিমর্দিত। দেবীর আট হাতে নানারকম প্রহরণ। সুঠাম কালো পাথরের গায়ে অপরূপ দেবীমূর্তি। আর চালচিত্রে দশমহাবিদ্যার শাস্ত্রোক্ত রূপ। দেবীমূর্তির পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ কেউই নেই। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, এই দেবীমূর্তি সম্পর্কে বেগলার সাহেব মন্তব্য করেছেন, 'The finest piece of sculpture in the place.' এই দেবীমূর্তির পাশের চালাঘরে সংগৃহীতা-পূজিতা দেবী পার্বতী বা জগদ্ধাত্রী নামে এক দেবী প্রস্তরমূর্তি। অনতিদূরে আছেন রুদ্রভৈরব নামে শিব। বর্তমানে, শারদীয়া সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী তিথিতে যথাবিধি এখানে পূজা ও অন্নকূট উৎসব হয়ে থাকে। লক্ষণীয়, দেউলঘাটের প্রাচীন দুটি ইটের মন্দির বাঁকুড়ার সুপ্রাচীন বহুলাড়া মন্দিরের অনুরূপ—স্থাপত্য-অলংকরণ-শিল্পভাবনায়। অথচ সে মন্দিরগুলি আজ বিপন্ন!

বেগলারের আগে, ১৮৬৪-৬৫ সালে, কর্নেল ডাল্টন কাঁসাই তীরবর্তী মানভূম-পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি দেখে মুগ্ধ হন—'The Cossai is rich in architectural remains', says Lt. Col. Dalton in his 'Notes on a tour in Manbhoom in 1864-65.' (Journal of the Asiatic Society Part I, 1866).

দেউলঘাট বা দেউলঘাটা সম্পর্কে District Census Handbook : Purulia, 1961 থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—'Deulghat (Near Boram in Arsha P.S.)—The ruins of some fifteen or more temples and small shrines are crowed close to each other in no apparent order on slightly high ground above the Kasai river, about four miles south of Jaypur. The most immediately apparent are there tall brick deuls with stucco decoration, the largest of which is on the southern edge of the site. All thus have triangular corbelled entrances, with towers built up by interior corbelling, the corbelled entrance of the southern temple is particularly high and graceful with a delicate curve. All three have richly carved brick work with stucco application......Beglar found a 'linga' installed in the western temple, which is now empty, and 'a four-armed female seated on a lion' in the southern temple which has now a tiny 'linga' in the floor and a broken 'yoni' outside: the middle temple is empty. Each temple has a curved stone 'makark' water outlet on the northern side.

'The other temple of Deulghat, which are mostly of stone, have all fallen down. The largest stands at the head of the flight of the steps leading up from the river a low mound in Beglar's day, on which he found a slab inscribed in characters which 'may belong to the 9th or 10th Century.' The base has now been dug out, revealing a large plinth 27 $^1/_2$ feet wide at the rear (west) with simple vase mouldings : The temple consisted originally of a 'mandapa' or 'Jagamohan' with attached shrive, now disfigured by a modern brick structure housing the linga of Siddhesvara Siva.' (P. 34-35).

পুরুলিয়া শহর থেকে বড়জোর মাইল পঁচিশ দক্ষিণ-পূর্বে পাক্‌বিড়র‍্যা গ্রাম। গ্রামে অনেকগুলি 'টোলা' অর্থাৎ পাড়া আছে। ১৯৭০ সালে গিয়ে দেখেছিলাম—পাক্‌বিড়র‍্যা গ্রামের একপ্রান্তে অনেকগুলি ভগ্নপ্রায় জৈন মন্দির আর তার ধারেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানা জৈন মূর্তি। খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম প্রায় সাত ফুটেরও বড় শিল্পশোভন প্রস্তরমূর্তি— পদ্মপ্রভের দিগম্বর মূর্তি বা ঋষভনাথ মূর্তি। সে-সময় দেখেছিলাম, খোলামেলা জায়গায় গাছতলায় সে সব মূর্তিদের অবস্থান। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম—তারা 'কালভৈরব' নামে সেই দেবতার পূজা করেন। তখন বলিদানও দেওয়া হত দেবতার প্রসন্নতা প্রার্থনায়। সেখানে প্রতিমা-সর্বতোভদ্রিকার প্রস্তরমূর্তিদুটিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পাক্‌বিড়র‍্যা থেকে কয়েক মাইল দূরে, কাঁসাই নদীর তীরে বুধপুর গ্রাম। সাদামাটা গ্রাম্য পরিবেশ থেকে বেশ কিছুটা দূরে, নির্জন কাঁসাই নদীর তীরে ভাঙাচোরা পাথরের মন্দির। বিশাল বিশাল পাথরের খণ্ড, যা মন্দিরের ভাঙা অংশ, তা চতুর্দিকে ছড়ানো। এ সম্পর্কে District Census Handbooks : Purulia—1961 থেকে জানা যায়—

Buddhpur (Manbazer P.S. about 7 miles south of Pakbira, on the other bank of the Kassi river)—There was a large temple of Buddhesvara Siva, held in particular sanctity by the local people, which originally had its full complement of mandapas etc. Which have all fallen down today. Already in Beglar's time the main tower had been replaced by a modern brick and plaster creation, which in 1926 was in its turn replaced by a rough stone tower with a carved entrance....There sculptures remain at the site—calf images to judge by their heavy pedestals—and one standing Vishnu, one standing Ganesa, and one Ganesa seated in 'lalitasana' : their style has orissan affinities, like that of the sculptures at Deulghat, but less richly carved. Beglar dates them to the 12th or 13th centuries.' (P-39)

পুরুলিয়ার আনাই জামবাদ, লৌলাড়া থেকে বড়াম প্রভৃতি গ্রামে সরেজমিন সমীক্ষায় গিয়ে দেখেছি অনেক জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। সে-সব প্রস্তর মূর্তি নির্জন বৃক্ষছায়ায় কিংবা গ্রামের মাঝে কোনো খোলামেলা জায়গায় ভক্তিসহ রেখেছেন গ্রামবাসীরা। তবে জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিশেষত আমলক, বেঁকি কিংবা চৌকা পাথরখণ্ড গ্রামের কেউ কেউ গৃহপ্রাঙ্গণে কিংবা খড়ের পালইয়ে তলার পাটাতন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে চলেছেন! এ জেলার নানা গ্রাম থেকে সংগৃহীত বহু জৈন প্রস্তরমূর্তি, বাংলার পাল-সেন যুগের বেশ কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং পুরাকীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শনাদি মানভূম-পুরুলিয়ার প্রাচীনতম গ্রন্থাগার তথা সংগ্রহশালা হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন। পুরুলিয়ার কৃতবিদ্য দুই ব্যক্তিত্ব অশোক চৌধুরী ও সুবোধ বসুরায় সেই সম্মেলনে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে বৃত হন। পুরাকীর্তি প্রদর্শনী বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এ জেলার কৃতী নরনারী অনিল চৌধুরী এবং রেখা মল্লিক প্রমুখ। বর্তমানে, গবেষক-অবেক্ষক দিলীপ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে এবং নিলয় মুখার্জীর (সম্পাদক, হরিপদ সাহিত্য মন্দির) পরিচালনায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পুরাকীর্তি সংগ্রহশালায় উত্তরোত্তর বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে—যা আশা-ভালোবাসা জাগায়।

সর্বভারতীয় আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সরকারি-নথিভুক্ত সংগ্রহশালায় প্রাচীন পুরাকীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

পুরুলিয়ার বরাকর রোডে আনাড়ার কাছেই পাড়া বিখ্যাত। সেখানে আছে দেউলঘাটের অনুরূপ ইটের মন্দির। নবম-দশম শতাব্দীর নিদর্শন। সেখানে প্রায় দু-ফুট লম্বা এবং দেড়ফুট চওড়া পাথরে উৎকীর্ণ এক অষ্টভুজা দেবীমূর্তি সযত্নে রক্ষিত। ১৯৭০ সালে সরেজমিন সমীক্ষায় জেনেছিলাম—গ্রামবাসীরা সেই দেবীমূর্তিকে উদয়চণ্ডী রূপে পূজা করেন। দেবী বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের। মন্দিরটির অনতিদূরে আছে পাথরের একটি বিগ্রহশূন্য মন্দির। স্থানীয় মানুষ সেই মন্দিরকে লক্ষ্মীর মন্দির বলেন। বিগ্রহটি নাকি কাশীপুর রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সবিশেষ উল্লেখ্য, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় বহু জৈন মন্দির পাল ও সেন যুগে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী কিংবা হিন্দু দেবদেবীরা দখল করেছেন। তাই এইসব প্রাচীন মন্দিরে মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন বর্তমান। পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি পেরিয়ে বাঁকুড়ার শালতোড়া গ্রাম। তার অনতিদূরে, দামোদর নদের কাছেই বিহারীনাথ পাহাড়। এই নির্জন স্থানটি তেলকুপির মতনই পুরাকীর্তির উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। এখানে এক সময় জৈনধর্মসংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। কালক্রমে সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঢেউ জাগে। নাগছত্রচিহ্নিত পার্শ্বনাথের প্রস্তর মূর্তি একাধিক আছে। তার কাছেই আছে দ্বাদশভুজ আরেকটি প্রস্তরমূর্তি। জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি দ্বাদশভুজ বিষ্ণুতে রূপান্তরিত। যেমন বাঁকুড়া জেলায় দ্বারকেশ্বর নদের গতিপথে সোনাতোপল, বহুলাড়া ও ধরাপাটের বিখ্যাত জৈন মন্দিরগুলি। কালপ্রবাহে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে সেখানে হিন্দু দেবদেবীরা পূজিত। তাই দেখা যায়, বহুলাড়ার মন্দিরে একপাশে আসীন পার্শ্বনাথ অপেক্ষা সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ (যা পরবর্তীকালে প্রোথিত) মন্দিরের কেন্দ্রে পূজিত। ধরাপাটের সর্পলাঞ্ছনযুক্ত দ্বিভুজ পার্শ্বনাথের পাশে আরও দুটি হাত প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তিনি বিষ্ণুবিগ্রহরূপ গ্রামবাসীর কাছে পূজা পান। ধরাপাটের মন্দিরে অন্য দিগম্বর জৈনমূর্তি বর্তমানকালে 'ন্যাংটা ঠাকুর', যিনি বন্ধ্যা রমণীদের তথা সন্তান-মানতকারিণীদের কাছে বিশেষ পূজা পান! বাঁকুড়ায় সর্পলাঞ্ছনচিহ্নিত পার্শ্বনাথ আবার দেবী মনসারূপেও পূজা পান; যদিও তিনি পুরুষ চিহ্নধারী! লক্ষণীয়, বহুলাড়ার জৈন মন্দিরে ক্রমে শিব-দুর্গা-গণেশের অধিষ্ঠান হলেও জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিও পূজা পান হিন্দুদের সমন্বয়ী ধর্মচেতনায়।

বাঁকুড়ার শিলাবতী নদীর কাছে হাড়মাসড়া গ্রাম। সেখানের মন্দিরে আছে জৈন তীর্থঙ্করদের নিদর্শন। শিলাবতীর দক্ষিণে কংসাবতী। অম্বিকানগর গ্রামের কাছে কুমারী নদী মিশেছে কংসাবতীর সঙ্গে। এখানের অনতিদূরে পরেশনাথ নামে এক প্রাচীন গ্রাম। বোঝা যায় এই গ্রামের নাম জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নাম থেকেই। এখানেও একটি প্রায় ছয় ফুট পার্শ্বনাথের বড় প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে। তা থেকে স্পষ্ট হয়—এই অঞ্চলেও জৈনধর্ম একদা প্রভাব বিস্তার করেছিল। অথচ এখানে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গ ও সবুজ ক্লোরাইড পাথরে তৈরি উপবেশনরত ষাঁড়টি বৃষবাহন শিবের মহিমা তুলে ধরে। বোঝা যায় জৈন প্রভাব কালের প্রবাহে ক্ষীণ হওয়ায় শৈব তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এখানে মাথা তোলে। এখানে একদা ফুট তিনেক উঁচু একটি সূর্যমূর্তিও পাওয়া গিয়েছিল। তা থেকে এখানে হিন্দু ধর্মের প্রভাব পরবর্তীকালে প্রবলরূপে প্রতীয়মান হয়।

বাঁকুড়ায় জৈন ধর্মের প্রসার প্রসঙ্গ আলোচনার কারণ—মানভূম-পুরুলিয়ার বুকেও, বাঁকুড়ার অনুরূপ, জৈনধর্মের মাঝে বৌদ্ধধর্ম এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাবিত হিন্দুধর্ম মাথা তোলে। তার প্রমাণ দেউলঘাট, পাড়া, কাশীপুর, বুধপুর, আনাইজামবাদ, বড়াম, সুইসা, দেউলি থেকে তেলকুপি, বান্দা-মৌতড় অঞ্চলের মন্দির-পুরাকীর্তির মাঝে দেখা যায়। ফলত, মানভূম-পুরুলিয়ার বুকে একদা যেমন জৈনধর্মের প্লাবন জেগেছিল, তেমনই সেই ধর্মধারার মাঝে নতুন

তরঙ্গ জাগায় প্রথমে বৌদ্ধধর্ম এবং পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম। তাই এসব অঞ্চলের মন্দির-পুরাকীর্তির মাঝে তিন ধারার ধর্মীয় ভাবনার পাথুরে প্রমাণ হিসেবে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মসংস্কৃতির মিলন বা পাশাপাশি সহাবস্থান দেখা যায়।

৩

হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম উপাসনাস্থলকে যথাক্রমে মন্দির, মসজিদ ও গির্জা বলা হয়। সেইসব ধর্মস্থলের গঠন স্থাপত্যশৈলী এক ধরনের নয়, তা সকলের জানা। অথচ ভারতের বুকে জৈনমন্দির, বৌদ্ধমন্দির এবং হিন্দু মন্দিরের নির্মাণরীতির মধ্যে একটি অন্তর্লীন যোগসূত্র আছে। ভারতের দেবালয়-স্থাপত্যে 'নাগর', 'বেসর' এবং 'দ্রাবিড়' নামে যে-স্বতন্ত্র নির্মাণশৈলী আছে, সেগুলি কমবেশি অনুসরণ করেছেন জৈন সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও হিন্দু সম্প্রদায়।

হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্বর্তী মন্দির স্থাপত্যশৈলীকে 'নাগর' রীতি বলা হয়। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে মন্দির স্থাপত্য রীতির নাম 'দ্রাবিড়' শৈলী। আর 'নাগর' শৈলী এবং 'দ্রাবিড় শৈলীর সম্মিলিত অথচ এক অভিনব রীতি হল 'বেসর' শৈলী। লক্ষণীয়, উত্তর ভারতের মন্দির নির্মাণ রীতিতে 'নাগর' শৈলী সমাদৃত। উত্তর ভারতের 'নাগর' শৈলীর পাশে উড়িষ্যার 'রেখ-দেউল'-এর নির্মাণ কৌশলে আছে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা। 'রেখ-দেউল'-এ অতি উচ্চ শিখরযুক্ত, বৃহৎ আমলকশীর্ষ, 'পঞ্চরথ পঞ্চাঙ্গ বাড়' থাকে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির অত্যুচ্চ মহিমায় তুলনারহিত। লক্ষণীয়, ময়ূরভঞ্জের কাছে খিচিং নামক স্থানে, পরবর্তীকালে উড়িষ্যার রেখদেউল-শৈলীর সহজ সংক্ষিপ্ত রূপ মন্দির নির্মাণ রীতির পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ভঞ্জরাজগণ নির্মিত খিচিং-এর মন্দিরগুলি পুরীর জগন্নাথদেব, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিশলায়তন অপেক্ষা অনেক ছোট। তাতে বিশাল জগমোহন, প্রাকারঘেরা বিশাল অঙ্গন, একাধিক উপমন্দির নির্মাণ দেখা যায় না। উড়িষ্যারীতির এই তুলনামূলকভাবে স্বল্পব্যয়নির্মিত মন্দিরশৈলী একদা মানভূম-পুরুলিয়ায় এবং সন্নিহিত বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানে অনুসৃত হয়েছিল। তার কারণ, এইসব অঞ্চলের স্থানীয় জমিদারবর্গ, যাঁরা 'রাজা' উপাধিতে মান্য, তাঁরা সুবিশাল ধন-ঐশ্বর্য-অর্থের অধিকারী ছিলেন না। আর স্থানীয় রাজন্যবর্গের তথা শ্রেষ্ঠীবর্গের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সময় জৈনমন্দির, হিন্দুমন্দির ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল।

আধুনিক নির্মাণকার্যে সিমেন্টের কংক্রিট ঢালাই চালু হওয়ার আগে কড়ি-বরগার প্রচলন ছিল। অথচ প্রাচীনকালের মন্দির-নির্মাণে কড়ি-বরগার বিষয়টি অপরিজ্ঞাত থাকায়, স্থপতিরা গর্ভগৃহের দেয়ালগুলিকে ক্রমশ পরস্পরের কাছে সুকৌশলে এনে, সুউচ্চ নির্মাণ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন। তাই গর্ভগৃহের সুমিত পরিসর আয়তক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত করবার জন্য সুউচ্চ নির্মাণ ও চূড়ার প্রয়োজন হয়েছে। মন্দিরের দেয়াল কিঞ্চিৎ বঙ্কিম ছন্দে এনে, লহড়ার (Corbelling) মাধ্যমে একটি শীর্ষবিন্দুতে মিলিত করার স্থাপত্য কৌশলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বুদ্ধগয়ার মন্দির। উড়িষ্যা তথা মানভূম-পুরুলিয়ায় এবং সন্নিহিত রাঢ় অঞ্চলে শিখর-দেউল বা রেখ-দেউল এই স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। অথচ মন্দির-নির্মাণে উপকরণ বিভিন্নতায় মানভূম-পুরুলিয়া তথা বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং অন্যত্র স্থাপত্যরীতিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট প্রস্তরখণ্ড দিয়ে আগাগোড়া মন্দির নির্মাণ সহজসাধ্য ছিল না। তাই এইসব অঞ্চলে ইট দিয়ে তৈরি হয়েছে

রেখ-দেউল। প্রসঙ্গত নির্মলকুমার বসুর সুচিন্তিত অভিমত স্মরণীয়—'...তেলকুপীর মন্দিরগুলি পাথরের তৈয়ারী হইলেও এই সকল পাথরের সংগ্রহ করা হয়ত কঠিন হইত। তাই কিছুদিনের মধ্যে মানভূমের শিল্পীরা পাথরের বদলে ইটে রেখ-দেউল গড়িতে আরম্ভ করিলেন। ফলে মন্দিরের আকৃতিতেও খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। রেখ-দেউল পাথরে গড়িতে হইলে শিল্পীরা খানিক দূর পর্যন্ত গড়িয়াই পাথরের প্রকাণ্ড কয়েকটি পাটা দিয়া একটি ছাদ তৈয়ারী করিতেন ও দু'দিককার দেওয়ালকে পাকাপোক্তভাবে বাঁধিয়া দিতেন। ইট ব্যবহার করিলে কিন্তু তাহার উপায় থাকে না। তাই দেওয়ালের বাহিরের দিকে খাড়া তুলিয়া যাইতে হয় ও ভিতরে লহড়া (Corbel) রচনা করিয়া শেষে একটি বিন্দুতে মিলাইয়া দিতে হয়। ফলে, গণ্ডির 'কাটেনি' নীচের দিকে কিছুই থাকে না; একেবারে শেষে হঠাৎ অত্যধিক 'কাটেনি' দিয়া গর্ভগৃহকে ঢাকা দিতে হয়। মন্দিরের শীর্ষস্থানটি এজন্য কমজোর হইয়া যায়। তাহার উপরে বড় বেঁকি বা আঁলা (আমলক) ও সোজা গণ্ডি দেখি। যে-সব মন্দির ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক 'গণ্ডির' মাথাতেই ভাঙিয়াছে। শুধু মানভূমে নয়, বীরভূম বা বর্ধমান জেলায় যেখানেই দেউল আছে, তাহা ইটের হইলে, মানভূমের মতো একইভাবে তৈয়ার হইয়াছে ও একইভাবে ভাঙিয়াছে।' ('মানভূম জেলার মন্দির' প্রবন্ধ। 'প্রবাসী' পত্রিকা, ভাদ্র, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।)

আগেই বলা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দশম বা দ্বাদশ শতাব্দী অবধি রাঢ়বঙ্গে জৈনধর্মের প্রভাব ছিল। বাংলার পাল রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মমতের ঢেউ জাগে। আর পাল রাজগণের পরবর্তী বাংলার সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমর্থক। তাই তখন হিন্দুধর্মের প্রাবল্য দেখা যায়। তাই রাঢ় বাংলার জৈন ধর্মাবলম্বী নিজেদের অস্তিত্বরক্ষায় ক্রমশ পিছু হটে সুদূর গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থানে স্বস্তি খুঁজে পান। দিলওয়াড়া, গির্নার, শত্রুঞ্জয়, পালিতানা প্রভৃতি কেন্দ্রে পরবর্তীকালে জৈনধর্মের সংরক্ষণ দেখা যায়।

৪

রাঢ়-বঙ্গের প্রাচীন শিলালিপি বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ। সেই লিপির হরফ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের ব্রাহ্মী, যদিও তার ভাষা সংস্কৃত। তা থেকে জানা যায়—পুষ্করণাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা ছিলেন চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক। ফলত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুর উপাসনা অন্তত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত ছিল।[১১]

আমরা জানি, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনায় নবজাগরণ ঘটায়। তাঁর ভক্ত শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৃন্দাবনের আচার্যগণ রাঢ়-বঙ্গে চৈতন্যদেব-অনুসারী বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আগ্রহী হওয়ায় গোরুর গাড়িতে বহু বৈষ্ণব পুথিসহ শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দকে প্রেরণ করেন। বাঁকুড়ার বন-বিষ্ণুপুরে মল্লরাজ বীর হাম্বিরের অনুচরবর্গ বহুমূল্য রত্নপেটিকা বোঝাই গোরুর গাড়ি ভ্রমে সেই বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অপহরণ করে বীর হাম্বিরের কাছে জমা দেয়। তারপর নাটকীয়ভাবে শ্রী নিবাস আচার্যের কাছে শাক্ত শৈব বীর হাম্বিরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ কাহিনি আমাদের জানা। বিষ্ণুপুর হয়ে ওঠে 'দ্বিতীয় বৃন্দাবন', অন্তত বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী মন্দির নির্মাণে, স্থাপত্য-অলংকরণ ভাবনায় ও বৈষ্ণব ধর্মের আন্তরিক উপাসনায়।

মল্লরাজগণ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ ড. অতুল সুর বলেছেন, 'যদিও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তাঁদের

রাজধানী অবস্থিত ছিল, তথাপি তাঁদের রাজশক্তি উত্তরে সাঁওতাল পরগনার দামিন-ই-কো থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমানের অংশ বিশেষ ও পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অংশ বিশেষ তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' [১২] বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ। উড়িষ্যার আফগান শাসক কতলু খাঁর সঙ্গে মোগল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আক্রান্ত কুমার জগৎসিংহের উদ্ধারের সহযোগিতার জন্য মানসিংহের সুনজরে আসেন বীর হাম্বির। তার ফলেই মল্লরাজের রাজ্যসীমা অপ্রতিহত গতিতে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমরা দেখেছি—পঞ্চকোট গড়ের খড়িবাড়ি তোরণে ও দুয়ারবন্ধে উৎকীর্ণ আছে বীর হাম্বিরের নাম। সময়কাল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ।

ফলত, মল্লরাজদের রাজধানী বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবীয় ভাবনার তরঙ্গ পঞ্চকোটের কাশীপুরে এবং পাশাপাশি অঞ্চলে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাশীপুর সংলগ্ন, দামোদর তীরবর্তী চেলিয়ামা গ্রামের রাধাবিনোদজির মন্দির। টেরাকোটা শিল্প দিয়ে মন্দিরগাত্র সুশোভিত। অনন্তনাগ-শয্যায় বিষ্ণু, তাঁর নাভিপদ্মে উত্থিত চতুর্মুখ ব্রহ্মা। কৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, রাসমণ্ডল, রাম-রাবণের যুদ্ধ, দেবী কালিকার সংহারিণীরূপ পোড়ামাটির ফলকে শিল্পশোভনভাবে উৎকীর্ণ। এই মন্দিরটি ১৬১৯ শকাব্দে (=১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে) তৈরি। এই মন্দিরগাত্রের অলংকরণ-শিল্পভাবনায় বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরগুলির প্রভাব সুস্পষ্ট। পুরুলিয়ার চাকলতোড় গ্রাম সুবিখ্যাত ছাতাপরব, ছাতাটাঁড়ের মেলার জন্য। ওই গ্রামে শ্যামরায়ের একটি জোড়বাংলা মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে। মন্দিরটির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। এ জেলার ছোটো বলরামপুর গ্রামেও আছে ইটের প্রাচীন মন্দির, যা এখন জরাজীর্ণ। পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশে পঞ্চরত্ন মন্দিরও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

বাগমুণ্ডির রাজবাড়ির রাধাগোবিন্দ মন্দির ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। কালপ্রবাহে মন্দিরটি জীর্ণ-পরিত্যক্ত হওয়ায় আরেকটি মন্দিরে গৃহদেবতার বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়। তার কাছেই আছে নবরত্ন মন্দিরযুক্ত রাসমঞ্চ। সেখানে পোড়ামাটির অলংকরণ শিল্পে চিত্রিত গোপিনীসহ কৃষ্ণের রাসলীলা, গিরিগোবর্ধনধারণ, বকাসুরবধ, রাম-সীতার অভিষেক—ইত্যাদি বৈষ্ণবীয় ভাবনা। স্পষ্টত অনুভব করা যায় বাগমুণ্ডির রাজারা বৈষ্ণব ধর্মানুসারী ছিলেন। তাই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের অনুগত প্রজাবৃন্দ ছো-নৃত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা, বকাসুর বধ, মহিষাসুর বধ, অভিমন্যু বধ ইত্যাদি পালা রূপায়িত করতে এগিয়ে এসেছেন। শুধু কি তাই? মানভূম-পুরুলিয়ার ঝুমুরগান, টুসু গানেও বৈষ্ণবীয় চেতনায় সাবলীল প্রকাশ। কৃষিজীবী বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়, আদিবাসী জনগণ, এমনকি এ অঞ্চলের মুসলমান লোককবির মুখেও বৈষ্ণবীয় ভাবনার সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে পুরুলিয়ার কেন্দা গ্রামের শেখ নিজামউদ্দিন আনসারির লেখা একটি লোকগীতি—

> হরিনামের জপ হে মালা
> ও তোর সময় নাই, গেল বেলা।
> এ হরিনাম পারের ভেলা কর না অবহেলা।
> এ হরিনাম সার কর ভাই, যাবে হে দুঃখ জ্বালা।
> হরি হরি বল রসনা সন্ধ্যা সকাল দু'বেলা।।[১৩]

রাঢ় অঞ্চলে শাক্তধারাও সুপ্রাচীন। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে মল্লরাজদের কুলদেবী মৃণ্ময়ী এবং পঞ্চকোট রাজপরিবারের কুলদেবী রাজরাজেশ্বরী ও মঙ্গলচণ্ডী শক্তিরূপা দেবী। তাই দুর্গাপূজার সময় মল্লভূম ও পঞ্চকোটের জনগণের মুখে আজও শোনা যায়—'মল্লে রা, শিখরে পা...'।

পঞ্চকোটরাজ প্রেমশেখর-পুত্র ভবানীশেখর এবং তস্য পুত্র কল্যাণশেখর বংশপরম্পরায় রাজা হন। 'এই মহারাজা কল্যাণশেখর 'সেন কুলদেবী' শ্যামারূপাকে নিজ রাজ্যে আনয়ন করিয়া শ্রী-শ্রী কল্যাণেশ্বরী নামে বরাকর নদের সন্নিহিত চাল্লাদহ নামক একটি ক্ষুদ্র নদীতটে স্থাপন করেন এবং উক্ত দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ রাজধানীতে তাঁহার অষ্ট ধাতুময়ী চতুর্ভুজা ত্রিপুরা দেবীর মূর্তি নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দেবী মূর্তি রাজরাজেশ্বরী দেবী মাতা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই দুই দেবী মূর্তির প্রতিষ্ঠা রূপ অবিনশ্বর কীর্তি চিরদিন পঞ্চকোটের ইতিহাসে মহারাজ কল্যাণশেখরের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।' [১৪] ধ্রুপদী গবেষক বিনয় ঘোষ প্রসঙ্গত বলেছেন, 'বরাকর থেকে মাইল চারেক দূরে কল্যাণেশ্বরী মন্দির। শক্তিপূজার অন্যতম কেন্দ্র বলে বিখ্যাত। মানভূম-পঞ্চকোটের রাজা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন। ...হয়ত এক সময় এখানে তান্ত্রিকদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। মানভূম ও উত্তর রাঢ়ের সীমানা জুড়ে এরকম ঘাঁটি আরও অনেকছিল।' [১৫]

৫

আর্যদের পূর্বভারতে আগমনের সুবাদে রাঢ়-বঙ্গে জৈনধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দুধর্মের তরঙ্গ জাগে। কালের গতিতে কোনো বিশেষ ধর্মভাবনা যেমন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে, তেমনই বিভিন্ন ধর্মভাবনায় সমন্বয়ও (Acculturation) ঘটেছে নানাভাবে। এই দীর্ঘ আলোচনায় তা প্রতীয়মান হয়। লক্ষণীয়, উপাস্য দেবদেবীর মন্দির-নির্মাণে দেশের রাজশক্তি ও শ্রেষ্ঠীসম্প্রদায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন যুগে-যুগে, কালের বিবর্তনে। অথচ সুবিশাল আর্য-সংস্কৃতির আগ্রাসী ভাবনার সমান্তরাল এই পূর্বভারতের তথাকথিত নিম্নবর্গের আদি অধিবাসীরা, যারা কোল, ভিল, মুণ্ডা, শবর, খেড়িয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা অধিভৌতিক, আধিদৈবিক শক্তিকে ভয়ে ভক্তি করেছে, পূজা করেছে নিজেদের ধ্যানধারণা মতন। আর্য-সংস্কৃতি প্রভাবিত বিশাল মন্দির-নির্মাণ ভাবনাকে তারা প্রশ্রয় দেয়নি। তারা গ্রামপ্রান্তে প্রাচীন বৃক্ষমূলে বিশেষ বিশেষ আকৃতির প্রস্তরখণ্ড পূজা করেছে, অদৃশ্য বা কল্পিত শক্তির কাছে বিপন্নচিত্তে নানাভাবে 'মানত' করেছে, পূজা দিয়েছে মাত্র। তাই গবেষণাসূত্রে পরিজ্ঞাত হয়—'আদি অস্ত্রাল (Proto-Austroloid)) গোষ্ঠীর নিষাদজীবনপ্রিয় মানুষ গাছ, পাথর, নদী প্রভৃতিতে 'আত্মা'-র কথা (Spirit) বিশ্বাস করত। তাদের ধারণায়, মানুষ মারা গেলে 'আত্মা' গাছ বা পাথর কিংবা পাহাড়ে 'ভর' করে থাকে। নিসর্গ প্রকৃতির ওপর প্রাণশক্তির আরোপ, বস্তুর মধ্যে সজীবত্ব ভাবনা (Animism) থেকেই প্রকৃতিপূজার উদ্ভব। অরণ্যচারী আদিম জনগোষ্ঠী এক রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। (পণ্ডিতগণ এই বিশেষ ভাবনাকে 'Mana' বলেছেন।) তারা বিশ্বাস করত জন্তু-জানোয়ারের শরীরে মাঝে মাঝে বিশেষ শক্তির প্রকাশ ঘটে। সেই বিশেষ 'মান্য'-ভাবনাকে লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় বলা হয় 'কুলকেতু' (Totem)। তারা সিং বোঙা (সূর্যদেবতা), চাণ্ডীবোঙা (চন্দ্রদেবতা), মারাংবুরু (পাহাড়-পর্বতের দেবতা), বড়াম, কুদ্রাসিনি, কালভৈরব প্রভৃতি দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য জাদুশক্তিতে বিশ্বাস করত এবং পশুপাখি বলি দিত। ছোটনাগপুরের রঙ্কিনীদেবীর পুজোয়, পুরুলিয়ার 'অযোধিয়া বুরু' অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রাতে, অহিংসা-পবিত্রতা কথার বাইরে 'শিকার পরব'-এ, বর্ধমানের কুড়মুনের শিবের গাজনে নরমুণ্ড নিয়ে 'কাল্‌কে-পাতারি' নাচে, মুর্শিদাবাদের জেমোকান্দি গ্রামের (কান্দি মহকুমায়) শিব গাজনে মড়া-খেলায় কিংবা প্রান্তিক বাংলার বহু গ্রামে

'গেরাম দেবতা', ধর্মঠাকুরের পুজোয় এই মানসিকতা নানাভাবে ক্রিয়াশীল। তাই মাটির হাতিঘোড়া দেবতার উপাসনায় 'টোটেম'-ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। মেগালিথিক সংস্কৃতিতে 'শিলাস্তম্ভ-পুজো' ধীরে ধীরে শিব পুজোর প্রতীকে মিশে গেছে। আদিবাসী জীবনে 'বীরস্তম্ভ' (Menhir) মেগালিথিক বা প্রস্তর স্মৃতিস্তম্ভ যুগের পরিচয় দেয়।' [১৬]

উৎস-সূত্র

১। ঐতরেয় আরণ্যক ২/১/৩

২। ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ ১ম পরিচ্ছেদ। ইস্টার্ন পাবলিশার্স কলকাতা- ৯ (১৯৬৩ প্রকাশিত)।

৩। মহাভারত, আদিপর্ব। ১০৪/৫০

৪। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ৪০/২৫

৫। মহাভারত, সভাপর্ব ৩৩/২৪ নীলকণ্ঠ টীকা।

৬। গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো।
যাস্যত্যুচ্চৈঃ ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ। ইত্যাদি—ধোয়ী, পবনদূতম, ২৭ শ্লোক।

৭। ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব। পৃষ্ঠা ৯৯। দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০ ০৭৩ (বৈশাখ, ১৪০০)

৮। ড. সুধীরকুমার করণ, সীমান্ত বাঙলার লোকযান। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং কলকাতা। ১ম সংস্করণ (১৩৭১) ২৪-২৫ পৃষ্ঠা।

৯। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সুহ্মক বাঙ্গালা' প্রবন্ধ। (মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে ১৩/৪/১৯৭৩ প্রদত্ত ভাষণ।) 'বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে' গ্রন্থ। জিজ্ঞাসা প্রকাশিত। ২৮৫ পৃষ্ঠা।

১০। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ৮ম সংস্করণ (১৯৭৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত। ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা।

১১। ড. শান্তি সিংহ, 'টুসু' গ্রন্থ। 'টুসুর ঐতিহাসিক উৎসভূমি বাঁকুড়া' (৬ষ্ঠ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৯৯) প্রকাশিত।

১২। ড. অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৯। জিজ্ঞাসা প্রকাশিত (১৯৭৬)।

১৩। ড. শান্তি সিংহ, তদেব। ১০৭ পৃষ্ঠা।

১৪। দিলীপকুমার গোস্বামী সম্পাদিত পঞ্চকোটের ইতিহাস। বজ্রভূমি প্রকাশনী (২০০২) পুরুলিয়া ৭২৩১০৩। পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮।

১৫। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১৯৫৭, পুস্তক প্রকাশক কলকাতা ১২ পৃষ্ঠা—৩১৫।

১৬। ড. শান্তি সিংহ, লোকসংগীতসংগ্রহ ঝুমুর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমি (১৯৯৭) পৃষ্ঠা—৩।



পুরুলিয়ার মন্দির-স্থাপত্য

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

দীপকরঞ্জন দাশ

১৯৫৬-র ১ নভেম্বর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ আংশিকভাবে অনুসরণ করে ধানবাদ মহকুমা এবং চাস, চন্দনকিয়ারী, পটমদা, চাণ্ডিল ও ইচাগড় থানা ব্যতীত বিহারের মানভূম জেলার বাকি অঞ্চল নিয়ে সৃষ্ট হয় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা। এই প্রক্রিয়ায় ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়। ফলে রাজনৈতিক সীমারেখাভিত্তিক পুরুলিয়া সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্তদেশে অবস্থিত পুরুলিয়া জেলার মূল ধমনী কংসাবতী বা কাঁসাই নদী। বৃষ্টিনির্ভর নদী, ক্ষুদ্রকায় প্রাকৃতিক নালা বা জলাধার, কৃষির অনুপযুক্ত উঁচু প্রস্তরময় জমি এবং আদিম উৎপাদন ব্যবস্থা প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলে বিস্তৃত জনপদ গড়ে ওঠার পক্ষে প্রতিকূল ছিল। প্রাগৈতিহাসিক কালে নদীগুলির তটভূমিতে প্রাকৃতিক খাদ্য আহরক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের জনজীবনের বহু নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধাতুর প্রচলনের পরেও এ অঞ্চলের জনজীবন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, তা এখনও সহজবোধ্য নয়। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বনিয়াদকে স্থানীয় খনিজ সম্পদ কতটা দৃঢ়তা দিয়েছিল, তাও অজ্ঞাত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে উন্নত কৃষি ও ধাতুশিল্পের দৌলতে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল, তখন পুরুলিয়ায় উদ্ভূত তেমন কোনও জনপদের উল্লেখ অথবা নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে পুরুলিয়ায় খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বের কোনও তথাকথিত ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। লিপিচরিত্রের নিরিখে পুরুলিয়া জেলার সীমাবর্তী ইচাগড়ের একটি খণ্ডিত শিলালেখ সপ্তম শতাব্দীর বলে অনুমিত হলেও, তা কোনও প্রতিষ্ঠিত লিপিবিশারদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। পুরুলিয়া জেলাসংলগ্ন চাণ্ডিলের নিকটবর্তী জায়গায় একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত লিপিসম্বলিত কয়েকটি পাথরের টুকরো থেকে জানা যায়, জনৈক দামপ্প এই স্থানে ভগবতী ত্রৈলোক্যবিজয়ার (দুর্গার) একটি মন্দির স্থাপন করেন। লিপিচরিত্র অনুযায়ী অনুমান, এই মন্দিরটি অষ্টম-নবম শতাব্দীতে নির্মিত। এই অনুমান যথার্থ হলে জয়দার ত্রৈলোক্যবিজয়ার মন্দির এ অঞ্চলের দৃষ্ট দেব-দেউলগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এই স্থানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির গড়ন, ডৌল, লাঞ্ছন ও আয়ুধের প্রকৃতি এই অনুমানকে সমর্থন করে।

ত্রিস্তর কামে বিভক্ত পদভাগ বা পাভাগ, চতুষ্কোণ ভূমি-আমলক প্রভৃতিও এই কাল-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

জয়দায় ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রাপ্ত দুর্গা, কার্তিক, গণেশাদি পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি দেখে মনে হয় খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ বা কিছু পূর্ব থেকেই পুরুলিয়া-সহ মানভূম অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার ঘটে। সম্ভবত এই ধর্মীয় প্রভাবে মূলত শিকার এবং আদিম কৃষি ও কারিগরি জ্ঞান-নির্ভর সমাজে কৃত্রিম সেচ-সহ কৃষির আধুনিকীকরণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। প্রাচীন জৈন অধিবাসীদের বংশোদ্ভূত বলে অনুমিত শরাক শ্রেণী কৃষিকার্যে বিশেষ দক্ষ। এ অঞ্চলে উন্নত কৃষিব্যবস্থার প্চলনে শরাকদের পূর্বপুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বলে মনে করা যায়। সেক্ষেত্রে জঙ্গলাকীর্ণ মানভূমে কৃষির উন্নতিতে জৈনধর্ম প্রচারকদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থেকে থাকতে পারে। সেই সমৃদ্ধি মন্দির-সহ বহু শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তৈরি করেছিল। এই অনুমান অবশ্যই পুরাতাত্ত্বিকদের ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সুপরিকল্পিত খননকার্যের অনুমোদনসাপেক্ষ। কিন্তু প্রায় এ সময় থেকেই পুরুলিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গৌণ রাজ্যের উদ্ভব সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রান্ত কৃষি ব্যবস্থার প্রতিফলক। উদাহরণ: বুধপুরে বিলুপ্তপ্রায় শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত এক শিলালেখে বড়ধুগ ও আতন্দীচন্দ্র নামধারী দুই রাজপুত্রের উল্লেখ। লেখচিত্র দশম শতাব্দীর মধ্যে পুরুলিয়ায় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র উদ্ভবের ইঙ্গিত দেয়। এই জেলায় যুদ্ধে নিহতের স্মৃতিতে স্থাপিত বীরস্তম্ভ ভূমির উপর আধিপত্য রক্ষা অথবা বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাক্ষ্য বহন করে। এই অস্থির অবস্থার অন্তত আংশিক অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বুধপুরে প্রাপ্ত আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর একটি শিলালেখে। পঞ্চ অদ্রী অধীশ্বরের রাজ্য-সীমা নির্দেশক এই লিপিতে সীমানা অগ্রাহ্য না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। এভাবে ক্রমশ অঞ্চলভিত্তিক গৌণ রাজ্যগুলি নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ হতে থাকে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত রামচরিত গ্রন্থ ও টীকা থেকে জানা যায় তৈলকম্প (আধুনিক তেলকুপি)-কে কেন্দ্র করে রুদ্রশিখর একটি আঞ্চলিক রাজ্য শাসন করতেন। বোড়ামে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি (আ. ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী)-তে রুদ্রদেব নিজ যুবরাজপুত্র দ্বারা ত্রিভুবন অধীশ্বর চক্রবর্তীরাজরূপে বর্ণিত হয়েছেন। তৈলকম্প-অধিপতি রুদ্রশিখর এবং বোড়াম লিপির রুদ্র অভিন্ন হলে পুরুলিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত টানা যায়। পুরুলিয়া জেলায় যে মন্দির স্থাপত্যচর্চার বিকাশ লক্ষ করা যায় তা এই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা-নিরপেক্ষ ছিল, এ ধারণা করা সম্ভবত ঠিক হবে না। নবম শতাব্দীর শেষ পাদ অথবা দশম শতাব্দী থেকে এ অঞ্চলে মন্দির স্থাপত্যের সূত্রপাত অনুমিত হলেও তার বিকাশ একাদশ শতাব্দীর পূর্বে সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না। প্রায় এ সময় থেকেই প্রাচীন তৈলকম্প মন্দির নগরীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। একই সঙ্গে অন্যত্রও মন্দির নির্মাণের গতি বৃদ্ধি পায়। প্রায় সমসাময়িক কালেই পুরুলিয়াসহ ছোটনাগপুরে জৈন ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। পাকবিড়রার পুরাসম্পদের মধ্যে প্রাপ্ত জৈনমূর্তিসমূহের কোনওটিকেই ভাস্কর্যশৈলীর নিরিখে নবম শতাব্দীর অন্তিম পর্বের পূর্বে স্থাপন করা যায় না। পুরুলিয়া শহরের অনতিদূরে ছড়রার পরিত্যক্ত জৈন মন্দিরটিকেও স্থাপত্যগতভাবে দশম শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করা সম্ভব নয়। অনুমান করা যায় জৈনধর্ম প্রচারকগণ ও তাদের অনুগামী কৃষিনির্ভর শরাক শ্রেণীর পূর্বপুরুষদের উদ্যোগে দশম শতাব্দীর পর থেকে পুরুলিয়ায় নির্মিত মন্দিরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়।

স্থাপত্য পরিকল্পনার মূলসূত্র

একাদশ শতাব্দী থেকে ছোটনাগপুর ও তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মন্দির নির্মাণ চলতে থাকে। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে পুরুলিয়ার মন্দিরসমূহের কোনও নির্দিষ্ট ক্রমপঞ্জি স্থির করা সম্ভব নয়। শৈলীগত বিচারে কালানুক্রম অনুমান ক্ষেত্রবিশেষে সহায়ক হতে পারে। পুরুলিয়া জেলায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত দেবদেউলের অধিকাংশই প্রস্তরনির্মিত, তুলনায় ইটের তৈরি মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম। সমস্ত পাথরের মন্দিরই ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রবর্ণিত নাগর শ্রেণীভুক্ত। ক্রুশাকৃতি ভূমি-নকশা ও অনেকটা ধনুকাকৃতি শিখর এ ধরনের মন্দিরের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত মন্দিরের উলম্ব সীমারেখার বাধাহীন গতির উপর অত্যধিক ঝোঁক থাকায় ওড়িশি শিল্পশাস্ত্রে স্থানীয় নাগর মন্দিরকে রেখমন্দিররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্রুশাকৃতি আসনের উদ্‌গত অংশের সংখ্যা অনুযায়ী মন্দিরের বহির্দেশ তিন কিংবা ততোধিক অংশে বিভক্ত থাকত। রথ নামে আখ্যাত এই অংশগুলির সংখ্যা অনুযায়ী মন্দিরকে ত্রিরথ, পঞ্চরথ ইত্যাদি পঙক্তিভুক্ত করা হয়। সাধারণত পাথরের মন্দিরের দেওয়াল পাথরবিছানো চত্বরের উপর নির্মিত হত। এক্ষেত্রে কোনও বেদি তৈরির প্রথা ছিল না। পরে অধিষ্ঠান নামক পাদপীঠের প্রচলন হয়। উল্লম্ব অক্ষে মূল তিনটি অংশে দেউল বিভক্ত ছিল, যথা: বাড় (খাড়া দেওয়াল), শিখর ও মস্তক (শিখরশীর্ষস্থিত স্থাপত্যাঙ্গসমূহের সমষ্টি)। বাড়ের তিনটি উপবিভাগ ছিল, যথা: পাদভাগ বা পাভাগ, জঙঘা (পাভাগের ঠিক উপরে দেওয়ালের মধ্যাংশ) ও বরণ্ড (জঙঘাশীর্ষে সাধারণত দুটি অনুভূমিক কাম ও তার মধ্যস্থিত কণ্ঠ নামক খাঁজ দ্বারা সৃষ্ট কার্নিশ)। বাড়বাহিত শিখর কয়েকটি ক্রমহ্রাসমান ভূমিতলে বিভক্ত করা হত। একাধিক ভূমি-বরাণ্ডিক (অনুভূমিক কাম) ও তদুপরি প্রতিকোণস্থিত একটি ভূমি-আমলক (খণ্ডিত আমলকী ফলের মতো পলকাটা স্থাপত্যাঙ্গ) দ্বারা গঠিত হত প্রতিটি ভূমি। সর্বোচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত বিসম (এক বা একাধিক পাটা যার উপরিভাগ সমতল কিন্তু বহির্প্রান্তদেশ ঢালু) শিখরের চার দেওয়ালের মধ্যের গহ্বরকে আবৃত করত। বিসমের উপর মস্তক যথাক্রমে বেকী বা কণ্ঠ (বেলনাকৃতি গলদেশ), আমলক, খপুরি (আমলকের উপর খোলা ছাতার মতো অংশ), কলস (পল্লবসহ ঘটাকৃতি অংশ) এবং ধ্বজ (দেউলে অধিষ্ঠিত দেবতার আয়ুধ অথবা অন্যপ্রকার প্রতীক) -এর সমন্বয়ে গঠিত হত।

মন্দির সম্মুখস্থ বাড়ের প্রশস্ত ও গভীরভাবে উদ্‌গত মধ্যরথ (ওড়িশি শিল্পশাস্ত্রে রাহা নামে অখ্যাত) ভেদ করে গর্ভগৃহে প্রবেশের পথ করা হত। লহরা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রবেশপথের দু-পাশের দেওয়ালকে ক্রমশ নিকটবর্তী করে যুক্ত করাই ছিল সাধারণ প্রথা। লহরাংশের পাদমূলে একটি পাথরের পাটা প্রবেশপথের উপর সিলিং-এর কাজ করত। পাটাটির বহির্প্রান্ত প্রবেশদ্বারের সরদলের উপর দিয়ে সামনের দিকে সামান্য কিছুটা প্রসারিত থাকত। পাটার এই প্রসারিত অংশের উপর একটি হালকা দেওয়াল লহরাংশ-সৃষ্ট ভল্টের মধ্যবর্তী ত্রিকোণ গহ্বর (ওড়িশার স্থান বিশেষে 'গমা' নামে পরিচিত)-কে পর্দার মতো বাইরে থেকে আড়াল করের রাখত। পর্দারূপ দেওয়ালটি টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো শিখরের নিম্নভাগসংলগ্ন হয়ে থাকত বলে শিল্পশাস্ত্রে এই অংশটির নাম শুক নাসা।

সাধারণত শিখরের চার দেওয়ালের অন্তরকে লহরা পদ্ধতির দ্বারা নিকটবর্তী করে তার উপর কয়েকটি পাটাকে আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে গর্ভগৃহের সিলিং নির্মাণ করা হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

সিলিং ছিল একাধিক। ফলে সিলিং-এর সংখ্যা অনুযায়ী শিখরের অন্তর চতুর্দিক আবদ্ধ কয়েকটি তলে বিভক্ত হত। ওড়িশি শিল্পশাস্ত্রে সর্বনিম্ন অর্থাৎ ঠিক গর্ভগৃহের উপরিস্থিত সিলিংকে গর্ভমুদ এবং সর্বোচ্চ সিলিংকে অর্থাৎ বিসমের তলদেশকে রত্নমুদ বলা হত (মুদ-এর অর্থ সিলিং)। টাই-বিমের কাজ করে সিলিং-এর পাটাগুলি সুউচ্চ মন্দিরভবনের ভারসাম্য বজায় রাখা ও তীব্র বায়ুর আঘাত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল।

পুরুলিয়া তথা মানভূমের দেউল-পরিকল্পনা, নির্মাণ-প্রক্রিয়া, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতির উপর ওড়িশি প্রভাব সুস্পষ্ট। ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্য দিয়ে উপকূলবর্তী ওড়িশার সঙ্গে গাঙ্গেয় উত্তর ভারতের যোগাযোগের অতি প্রাচীন পথ ধরে যে এই প্রভাব পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছিল তা সন্দেহাতীত। গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থকে দেওয়ালের গভীরতার দ্বিগুণ করা, ত্রিরথ আসনের তিনটি রথেরই সম দৈর্ঘ্য, একটি কণ্ঠ দ্বারা পৃথকীকৃত দুটি অনুভূমিক কাম দ্বারা গঠিত বরণ্ড, প্রায় লম্বভাবে উন্নীত শিখর, উত্তল পলকাটা আমলক ও ভূমি-আমলক, শিখরের রাহা বা মধ্যরথের উপর চৈত্যগবাক্ষ নকশার পরস্পর বিজড়িতভাবে পুনরাবৃত্তি, গর্ভগৃহের প্রবেশপথের দুই পার্শ্বদেওয়াল এবং তাদের সংযোগকারী লহরা ভল্টকে পাথরের মুদ বা সিলিং দ্বারা বিভাজন করা, মন্দিরের অন্তরে শিখরকে একাধিক মুদ দ্বারা কয়েকটি বদ্ধতলে বিভক্ত করা, নবগ্রহ সরদল, মনুষ্য-কৌতুকী নামক ঢেউ খেলানো লতায় আরোহণরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যমূর্তি প্রভৃতি অলঙ্করণের বিষয়বস্তু পুরুলিয়ার মন্দির স্থাপত্যে ওড়িশি প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমানে পার্শ্বদেওয়ালের মধ্যরথের কুলুঙ্গিগুলি সর্বক্ষেত্রেই খালি থাকায় এগুলিতে কী ধরনের মূর্তি থাকত তা অনুমানসাপেক্ষ। বিশেষত উত্তর ভারতে প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী পুরুলিয়ার শৈব মন্দিরের কুলুঙ্গিগুলিতে দুর্গা, কার্তিক ও গণেশের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকত বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জয়দার মন্দিরের ধবংসস্তূপের মধ্যে এই তিন দেবদেবীরর মূর্তি পাওয়া গেছে। অবশ্য পুরুলিয়ায় যে সব জৈন মন্দির রয়েছে তাদের কুলুঙ্গিগুলিতে একদা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু অধুনা অপসৃত পার্শ্বদেবতাদের সম্পর্কে এটুকু অনুমানও সম্ভব নয়।

অধিকাংশ মন্দিরই নিরাভরণ হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমিত অলঙ্করণ দেখা যায়। টুরুহুরু, ক্রোশজুড়ি-সহ কয়েকটি স্থানে উন্নতমানের ভাস্কর্যশোভিত দ্বারদেশের চিহ্ন পাওয়া গেছে। পাড়ার লক্ষ্মীমন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যের প্রাচুর্য এ অঞ্চলের মন্দিরসজ্জার ক্ষেত্রে এক বিরল ব্যতিক্রম। মন্দিরদ্বারের পার্শ্বস্তম্ভের পাদমূলে গঙ্গা, যমুনা ও দুই দ্বারপালের মূর্তি এবং তার উপর পাশাপাশি কিন্তু প্রলম্বিত পদ্মপাপড়ি, পুতির সারি, হীরকাকৃতি ফ্রেমের মধ্যে চার পাপড়ির ফুল, মনুষ্যকৌতুকী প্রভৃতির উপস্থিতি অল্প কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বার সরদলের ঠিক মাঝখানে ললাটবিম্ব (টিপের মতো একটি সামান্য উন্নত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র) অনেক সময়ই গজ-লক্ষ্মী, গণেশ, সূর্য, লকুলীশের ক্ষুদ্র মূর্তি দ্বারা আধিকৃত হয়ে থাকত। জৈন মন্দিরের ললাটবিম্বে তীর্থঙ্কর অথবা তার শাসন দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করার প্রথা ছিল। মূর্তিবিহীন ললাটবিম্বের সংখ্যাও অবশ্য কম নয়।

ছড়রায় কালের কুটিল দৃষ্টির অন্তরালে যে দেউলটি এখনও বর্তমান, তার দেওয়ালে জৈব চুনের পলেস্তারার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও রয়েছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, অন্তত কোনও কোনও পাথরের মন্দিরের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরে চুনের প্রলেপ দেওয়া হত। এই প্রলেপের কাঁচা অবস্থায় মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ অলঙ্গরণকে মার্জিত রূপ দান করা হত।

পুরুলিয়া ও ওড়িশা: তুলনামূলক রেখশৈলী

মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও পুরুলিয়া ও ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়নি। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে ওড়িশায় যখন মন্দির-পরিকল্পনা, অবয়ব ও গঠনে নিয়ত পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও বিবর্তন ঘটছিল, তখন পুরুলিয়ার শিল্পীকুলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল রক্ষণশীলতা। পুরুলিয়ার শিল্পীগোষ্ঠী সম্ভবত ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যের বিবর্তনের পথ অনুসরণে অসমর্থ হয়ে স্থানীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রাথমিক রূপটিকেই যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে গেছেন। ফলে পুরুলিয়াসহ মানভূম ভূভাগে বজায় থাকে এক স্বতন্ত্র স্থাপত্যশৈলী, যা মূলত বৈভব বর্জিত রেখশৈলীর সরলীকৃত প্রকাশমাত্র। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং যথাযথ ভাববিনিময়ের অভাবের ফলে ওড়িশায় উদ্ভাবিত নব্য স্থাপত্যাঙ্গ এবং তাদের সংস্থাপন পুরুলিয়ার শিল্পীকুলের বোধগম্য হয়নি। যেমন ঘট-পল্লবের ধারণা সৃষ্টিকারী দেওয়ালের পাদভাগে অন্যান্য কামের সঙ্গে যুগ্মভাবে কুম্ভ (কুম্ভের উদরদেশের বৃত্তাকার পরিধির প্রায় অর্ধাংশের আকৃতিধারী কাম) এবং পাটা বা পট্ট (তৃতীয় বন্ধনীসদৃশ কাম যা কুম্ভমুখ-প্রান্তের আভাসস্বরূপ)-এর সন্নিবেশের অর্থ এ অঞ্চলের শিল্পীদের অবোধ্যই থেকে যায়। তাই এখানে কুম্ভের উপর পাটার বদলে খুর নামক কাম দেখা যায়। কামের সংখ্যা ও প্রকৃতিতেও পার্থক্য নজরে পড়ে। ওড়িশার পাদভাগে পাঁচটির বেশি কাম নেই। কিন্তু পুরুলিয়ায় কামের সংখ্যা ও সন্নিবেশে শৃঙ্খলার অভাব নজরে পড়ে। বিবর্তনের ফলে ওড়িশায় জঙ্ঘ্যাংশ উল্লম্ব অক্ষে তিনটি উপ-অঙ্গে বিভক্ত হয়ে যায়। পুরুলিয়ায় বিরল ক্ষেত্র ব্যতীত এই অঙ্গের একাধিক বিভাগ হয়নি। জঙঘায় মধ্যস্থলের রাহা নামক উদ্‌গত অংশের দুই পার্শ্ববর্তী রথে সারিবদ্ধ অর্থস্তম্ভের অবস্থান পুরুলিয়ার মন্দির স্থাপত্যকে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া জেলায় এ ধরনের কয়েকটি নিদর্শন আছে। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় খিচিং-এর চন্দ্রশেখর ও বিহারের ধানবাদ জেলায় পানড়ার কপিলেশ্বর মন্দিরে অনুরূপ অর্ধস্তম্ভ দেখা যায়। ওড়িশায় বাড় এবং শিখর বিভাজক বরণ্ডের খাঁজকটা কান্তি বা কণ্ঠের স্থান কালক্রমে কয়েকটি কাম দ্বারা অধিকৃত হয়। পুরুলিয়ায় প্রথাগত শৈলীর শেষ পর্যায়েও রেখ-দেউলের কান্তি স্থানচ্যুত হয়নি। শিখরের ক্ষেত্রে অবশ্য ওড়িশার মতো পুরুলিয়াতেও প্রথমে সমকোণ ভূমি-আমলক দ্বারা তল বিভাজন করা হলেও পরবর্তীকালে তা বর্তুলাকার রূপ ধারণ করে। কিন্তু এ অঞ্চলে ওড়িশার অনুরূপ কণিক (শিখরের প্রান্তভাগের রথ) অনুভূমিক অক্ষে কখনই দুই তল—যার বহির্প্রান্তস্থিত উদ্‌গত তলটি গোলাকার—দেখা যায় না। ফলে কোণগুলি উল্লম্ব অক্ষে বৃত্তাকার হয়ে শিখরকে কমনীয় করতে পারেনি। এজন্য দেউলের ঋজুত্ব প্রাধান্য লাভ করে। একইভাবে রাহা ও তার পার্শ্বরথের মিলনস্থলে ক্রমহ্রাসমান স্তরে উন্নীত অঙ্গশিখরের অনুপস্থিতি পুরুলিয়ার শিখরকে ওড়িশার শিখর থেকে পৃথক করেছে। অপরপক্ষে ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়ে নির্মিত দেউল-শিখরের রাহা অলঙ্করণে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত চৈত্যগবাক্ষ নকশা দ্বারা সৃষ্ট জালিকার ব্যবহারে ওড়িশার প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে (যথা বান্দার পরিত্যক্ত দেউল) এই জালিকার পরিবর্তে কুণ্ডলীকৃত পত্রপুষ্পশোভিত লতার ব্যবহারে ওড়িশার প্রভাবের ক্ষীণতাই প্রকাশ পায়। পুরুলিয়ার কোনও কোনও মন্দিরে (যেমন পারার লক্ষ্মীমন্দির) হরতনাকৃতি চৈত্যগবাক্ষ অলঙ্করণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ওড়িশায় অনুরূপ চৈত্যবগাক্ষ দেখা না গেলেও বিহারের গয়া জেলায় কোচের মন্দিরে এই নকশাটি লক্ষ করা যায়। সাধারণত এই অঞ্চলের দেউল-শিখরে অঙ্গশিখর দেখা যায় না। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে নির্মিত পারার

লক্ষ্মীমন্দিরের শিখরের রাহায় সারিবদ্ধ অঙ্গশিখর এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমস্বরূপ। কিন্তু অঙ্গশিখরগুলির অবয়ব ও শিখরতল অতিক্রম করেনি। তাই অন্যান্য অলঙ্করণের প্রায় অঙ্গীভূত হয়ে নিজস্ব অস্তিত্বকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে অসমর্থ হয়েছে। কিন্তু পাঞ্চেত জলাধার নির্মাণের ফলে বিনষ্ট তেলকুপির দু-একটি মন্দিরের শিখরাংশে রাহার পাদমূলে বিপুলাকৃতি অঙ্গশিখর এবং মূল শিখরের বক্রতা ও ভারী গড়ন ওড়িশার প্রভাবের ফল হতে পারে। তথাপি বিভিন্ন অংশের অনুপাতে ভারসাম্য রক্ষিত না হওয়ায় এধরনের দেউলগুলি এক অবক্ষয়িত শৈলীর প্রতীকে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে এবং ওড়িশাসহ ভারতের বহু অঞ্চলে দেউল-শিখরের মধ্যভাগ থেকে উদ্গত ঝম্পসিংহ অথবা গজসিংহ মূর্তি দেখা গেলেও পুরুলিয়ায় অনুরূপ উদাহরণ অতি বিরল। ক্রোশজুড়ির কাশীনাথ শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঝম্পসিংহ পাওয়া গেছে যা ওড়িশাতেও সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে গজসিংহে পরিণত হয়। ওড়িশার শিখরশীর্ষের পার্শ্বে স্থিত গণ এবং প্রতি কোণে উপবিষ্ট সিংহ মূর্তি পুরুলিয়ায় দৃষ্টিগোচর হয় না। শিখরের চার দেওয়ালের মধ্যস্থিত গহ্বর আবৃতকারী বিসমের উপর স্থাপিত মস্তকের বিশাল পরিধিযুক্ত আমলকের তুলনীয় উদাহরণ আবার ওড়িশায় অনুপস্থিত। বেশ কিছুকাল পরে এই আমলক সামঞ্জস্যহীনভাবে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হয়ে যায়। ওড়িশার ন্যায় আমলকের ওপর খপুরি স্থাপনের প্রথা অনুসৃত হলেও, তা এখানে চিরকালই এক নগণ্য এবং প্রায় দৃষ্টি-অগোচর স্থাপত্যাঙ্গ।

সুতরাং জন্মলগ্নে ওড়িশারীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলেও (যদিও এই অনুপ্রেরণা পরিমাপ করার মতো প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি আজ নিশ্চিহ্ন) পুরুলিয়া অঞ্চলের রেখদেউলের বিবর্তন স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। বিবর্তনের পথে ওড়িশার স্থাপত্যশৈলীর কিছু কিছু প্রভাব এসে পড়লেও, পুরুলিয়ার গ্রহণের পদ্ধতি উভয় অঞ্চলের শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের অভাবকেই প্রতিফলিত করে। কালের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে এই দুই অঞ্চলের বিবর্তনের ধারার দূরত্বও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রথম থেকেই পুরুলিয়ার মন্দির স্থাপত্যকে আচ্ছন্ন করেছিল এক রক্ষণশীল মনোভাব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যখন রেখদেউলের আসনের নকশা, দেহগঠন, অলঙ্করণ, স্থাপত্যাঙ্গে সরলতা থেকে জটিলতার পথে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস, তখন কালের গতি উপেক্ষা করে পুরুলিয়ার দেউল সারল্য-আশ্রিত থেকেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মণ্ডপসহ দেউল (যথা টুইসামা, বান্দা ও পারার পরিত্যক্ত মন্দিরত্রয়) বা পঞ্চায়তন দেউল (যথা বুধপুরের বুধেশ্বর শিব এবং দেউলির জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মন্দিরদ্বয়) নির্মিত হলেও অনুষঙ্গবিহীন একক দেউল নির্মাণই ছিল এ অঞ্চলের সাধারণ প্রথা। কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত দেউলের ত্রিরথ আসনের পরিবর্তন ঘটেনি। ক্রমবিকাশের পথে পাদভাগে কামের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও তাতে কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। উত্তরকালে কোনও কোনও কামের অতিরিক্ত স্টাইলাইজেশনের ফলে তার আদি রূপটি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয় (উদাহরণ: পাকবিড়রার মন্দিরসমূহ)। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যুগ্ম অবস্থানের ফলে কিছু কাম নব কলেবর লাভ করেছে। আনুমানিক দ্বাদশ শতকে নির্মিত কোনও কোনও মন্দিরে প্রবেশপথের দেওয়াল ও তদুপরি খিলানের মধ্যবর্তী প্রস্তর আচ্ছাদনটি অপসারণ করা হয়। ফলে খিলান পরিধির মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার গহ্বরসমেত সম্পূর্ণ প্রবেশপথটি বাইরে থেকে দৃশ্যমান হয়ে যায়। এ ধরনের মন্দিরের নিদর্শনস্বরূপ পাকবিড়রার জৈন মন্দিরগুলির উল্লেখ করা যায়। প্রথাগত রেখদেউলের

বিবর্তনের শেষ পর্বে অধিষ্ঠান নামক পাদপীঠের উপর মন্দির স্থাপনের রীতির সূত্রপাত হলেও তার বহুল প্রচলন ঘটেনি। অধিষ্ঠানের আগমন সম্ভবত ওড়িশা অথবা বিহার থেকে। এ সময়েই জঙ্ঘার অর্ধস্তম্ভগুলি উষ্ণীষসহ শীর্ণনাগস্তম্ভে পরিণত হয়। পূর্বের ন্যায় স্তম্ভশীর্ষ বরণ্ডের তলদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি। জঙ্ঘার রাহায় পার্শ্বদেবতা স্থাপনের কুলুঙ্গিগুলি অনু-রেখদেউলের রূপ পরিগ্রহ করে। শিখরের উল্লম্ব চরিত্রে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু শীর্ষদেশে শিখর দেওয়ালের অন্তর্মুখী ঝোঁকটি অকস্মাৎ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেউলের তীক্ষ্ণ ঊর্ধ্বমুখিতায় এক পীড়াদায়ক ছন্দপতন ঘটে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে এধরনের অবক্ষয়ের চিহ্নগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরুলিয়া সহ পশ্চিমবঙ্গের রেখশৈলীর পরবর্তী বিবর্তনের ইতিহাস উত্তরোত্তর এই অবক্ষয়ের পরিচয়বাহী।

মধ্যযুগ-পূর্ব পুরুলিয়ার স্থাপত্য-নিদর্শনসমূহ রেখশৈলীর মধ্যে থাকলেও পাকবিড়রায় কয়েকটি ভদ্রশৈলী (ক্রমহ্রাসমান স্তরে উন্নীত পরিমিতাকৃতি ছাদযুক্ত দেউল)-র অন্তর্গত প্রস্তরনির্মিত উৎসর্গ দেউল পাওয়া গেছে। এগুলি পুরুলিয়ায় ভদ্রশৈলীর পূর্ণাবয়ব মন্দিরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

ইটের মন্দির

সরল ও প্রায় অলঙ্কার-বিবর্জিত পাথরের মন্দিরের পাশাপাশি পুরুলিয়ার কয়েকটি পতনোন্মুখ অলঙ্কৃত ইটের মন্দির বাংলার মন্দির স্থাপত্যের সম্পদ। সংখ্যায় নগণ্য দেউলগুলির প্রত্যেকটিই ছিল একটি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন পাকবিড়রা ও কাঁটাবেড়ার মন্দিরদ্বয়ে এরূপ বেদী ছিল কিনা তা বলা সম্ভব নয়)। মন্দিরের আসনে একাধিক রথ ও উপরথ লক্ষণীয়। রথ ও উপরথসমূহ দেওয়াল ও শিখরবাহিত হয়ে দেউলশীর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত। ফলে মন্দিরগাত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন তল আলো-ছায়া খেলার সুযোগ এনে দিয়েছে।

মন্দির দেওয়ালের গভীরতা সর্বক্ষেত্রেই গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য/প্রস্থের অর্ধাধিক। বর্গাকার গর্ভগৃহের চাল লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। লহরার সূচনা ও মুদ দ্বারা আবৃত সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যবর্তী অংশে কোনো মুদ বা সিলিং নেই। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের পার্শ্বদেওয়াল অনেকটা নিচু থেকে লহরা স্তর দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে নিকটবর্তী হওয়ায় এই পথ প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। পাথরের মন্দিরে যেমন প্রবেশপথের প্রলম্ব ত্রিকোণাকার অংশ-বিভাজনকারী চাল থেকে এখানে তেমন কিছু নেই। গর্ভগৃহ থেকে জল নিষ্কাশনের জন্য উত্তর দিকের দেওয়ালে মকরমুখী নালী থাকত।

মন্দিরের বহির্ভাগে প্রলম্ব অক্ষে দেওয়ালে পাদভাগ বা পাভাগ, জঙ্ঘা ও বরণ্ড এই তিনটি মূল অঙ্গ দেখা যায়। পাদভাগে অনুভূমিক কামের সংখ্যা প্রথানির্দিষ্ট সংখ্যায় আবদ্ধ থাকত কিনা তা উদাহরণের স্বল্পতা ও মন্দিরের ভগ্নদশার জন্য বলা সম্ভব নয়। আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অবলুপ্তির ফলে সমস্ত কামের চরিত্রও শনাক্ত করা যায় না। যা অবশিষ্ট রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় কালক্রমে রূপান্তরিত হলেও কামগুলি খুর, কুম্ভ, পট্ট, কণি প্রভৃতি নামধারী ওড়িশি কাম থেকে উদ্ভূত। একটি অনুভূমিক কাম মাঝ বরাবর জঙ্ঘাকে বেষ্টন করে এই অঙ্গকে তল এবং উপর জঙ্ঘা নামক দুটি উপাঙ্গে বিভক্ত করত। রথগুলিকে দেউলের অনুকৃতি এবং গৌণ রথগুলিকে অর্ধস্তম্ভের রূপ দেওয়া হত। দেউলের অনুকৃতিগুলিকে মন্দিরে উপাস্য দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত দেবতার মূর্তি স্থাপনের কুলুঙ্গিরূপে ব্যবহার করা হত বলে মনে হয়, কিন্তু সমস্ত কুলুঙ্গি

থেকেই এখন এরূপ মূর্তি অপসৃত। এধরনের মন্দিররূপী কুলুঙ্গি শ্রেণীর মধ্যে রাহা (মধ্যস্থলের রথ)-র কুলুঙ্গিটিই সর্ববৃহৎ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ওড়িশার শিবমন্দিরে তিন দিকের রাহায় দুর্গা, কার্তিক ও গণেশের মূর্তি স্থাপনের প্রথা ছিল। পুরুলিয়াতেও এই প্রথা অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে।

কিছু কিছু পাথরের মন্দিরে পরিলক্ষিত একটি অনুচ্চ ফিতের মতো পাড় দিয়ে জঙঘার শীর্ষদেশ বেষ্টন করার রীতিও ইটের মন্দিরে অনুসৃত হত। একটি গভীর কণ্ঠ বা ফ্রিজের দুই অনুভূমিক প্রান্ত বরাবর ঘনসংবদ্ধ লহরা শ্রেণী-বাহিত দুটি ভারী কাম দ্বারা সৃষ্ট বরণ্ড (কার্নিশ) বাড় ও শিখরকে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করত। শিখরের উচ্চতা সর্বক্ষেত্রেই দেওয়ালের উচ্চতার চেয়ে অধিক ছিল। নিম্নাঙ্গে অনুপস্থিত শিখরের বক্রতা অত্যন্ত নমনীয়ভাবে উর্ধ্বমুখী হওয়ার ফলে শিখরকে প্রায় সরলরেখায় উন্নীত বলে মনে হত। বর্তুলাকার ভূমি-আমলক দ্বারা শিখরকে কয়েকটি ভূমিতলে বিভাজন করা হত। বর্তমানে দৃষ্ট এধরনের কোনও মন্দিরের শীর্ষদেশই অক্ষত না থাকায় শিখরের ভূমিতল কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকত কিনা তা বলা সম্ভব নয়। শিখরগাত্রে অঙ্গশিখর (দেউলের অনুকৃতি) সন্নিবেশ করা হলেও তা কখনওই স্বতন্ত্র সত্তায় উপনীত হতে পারেনি। ফলে মন্দিরের উল্লম্ব চরিত্রটি ছিল বাধাহীনভাবে প্রকাশিত। শিখরের রাহা অংশের পাদদেশে একটি বৃহদাকার হরতনাকৃতি চৈত্যগবাক্ষের নকশা লক্ষণীয়। দেউলগাত্রে প্রদর্শিত দেউলের অনুকৃতি থেকে অনুমান করা যায় বিধ্বস্ত শিখরশীর্ষে স্থাপিত মস্তকের দেহ পর্যাক্রমে বেকী, আমলক, খপুরি, এবং কলস দ্বারা সৃষ্ট হত। দেউলঘাটার একটি মন্দিরে এরূপ মস্তকে দুটি আমলকের উপস্থিতি মূল মস্তকেও অনুরূপ যুগ্ম আমলকের অবস্থান সূচিত করে কিনা তা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না। অবশ্য মধ্যপ্রদেশ ও তার প্রতিবেশী কিছু কিছু অঞ্চলে যুগ্ম আমলক দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় মুখলিঙ্গমে সপ্তম/অষ্টম শতাব্দীর শ্রীমধুকেশ্বর মন্দিরের মস্তকে দৃষ্ট যুগ্ম আমলক সম্ভবত আধুনিক সংরক্ষণের ফল নয়। ওড়িশাতেও কয়েকটি মন্দিরে এরূপ দুটি আমলক রয়েছে। পুরুলিয়ায় সাধারণভাবে দেউলের প্রসারতা অপেক্ষাকৃত কম রাখায় উচ্চতা প্রদর্শনের ঝোঁক স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এককভাবে নির্মিত হলেও দেউলের সামনে মণ্ডপ স্থাপনের প্রথা একেবারে বর্জিত হয়নি। অবশ্য সম্পূর্ণ অবলুপ্তির ফলে এধরনের মণ্ডপের চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ভিত্তিভূমির চিহ্ন থেকে অনুমান করা যায় দেউল অপেক্ষা মণ্ডপের বিস্তার অধিক ছিল।

মন্দির নির্মাণে কম-বেশি ২.৫ ইঞ্চি গভীর কিন্তু বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ইট ব্যবহৃত হত। সর্ববৃহৎ ইটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ৯ ইঞ্চি। গাঁথনির মশলা হিসেবে খুব মিহি জৈব চুন ব্যবহার করা হত। এই চুনের পাতলা স্তরের উপর ইটগুলি সাজানোর ফলে দুটি ইটের জোড় এত সূক্ষ্ম হত যে তার মধ্যে একটি ছুরির ফলা প্রবেশ করানোও কষ্টসাধ্য ছিল। মন্দিরের অন্তর ও বাহির উভয় পার্শ্বেই চুনের প্রলেপ দেওয়া হত। কাঁচা অবস্থায় চুনের প্রলেপের উপর নানারূপ নকশা পরিস্ফুট করে মন্দিরের বহিরঙ্গসজ্জায় যে নৈপুণ্য, অভিনবত্ব ও শিল্পসুষমা প্রকাশ করা হয়েছে তা ভারতীয় স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে তুলনাহীন। প্রকৃতপক্ষে অঙ্গসজ্জার উচ্চ মান ও সমৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি স্থানসহ এ অঞ্চলের প্রাক্-ইসলাম পর্বের ইটের মন্দিরগুলিকে স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছে। প্রাচুর্য সত্ত্বেও অঙ্গসজ্জা দেউল স্থাপত্যের প্রাধান্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় মন্দিরদেহ কখনই অলঙ্করণ দ্বারা ভারাক্রান্ত বলে মনে হয় না। এধরনের মন্দিরশৈলীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় পুরুলিয়ার দেউলঘাটায় পরিত্যক্ত,

অবহেলিত ও পতনোন্মুখ জীর্ণদেহী দেবদেউলে। অক্ষত অবস্থায় মন্দিরদেহের এমন কোনও অংশ ছিল না যা শিল্পীর কুশলী হাতের স্পর্শে দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠেনি। ফুল, লতা, পাতা, মুক্তামালা, জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণী, দেব ও মনুষ্য মূর্তি, জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি অলঙ্করণের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছিল। শিল্পীর দক্ষতায় হরতনাকৃতি চৈত্যগবাক্ষের নকশাটি এক অনবদ্য রূপ লাভ করে। তুলনীয়, পারার ইটের মন্দিরে চৈত্যগবাক্ষ দেখা গেলেও অন্যত্র এরূপ নিদর্শন প্রাণহীন (উদাহরণ: বিহারের গয়া জেলায় কোচের মন্দিরের নকশা)।

গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য/প্রস্থের তুলনায় দেওয়াল অস্বাভাবিকভাবে গভীর। মনে হয় অপ্রশস্ত দেওয়াল সুউচ্চ মন্দিরের ভার বহনে সক্ষম হবে না আশঙ্কা করে স্থপতি গভীরতা বৃদ্ধি করেছিলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেউলের প্রবেশমুখে দ্বারস্তম্ভ ছিল। দ্বারস্তম্ভের নীচে দ্বারপাল মূর্তি খোদিত থাকত। স্তম্ভবাহিত সরদলের মধ্যস্থলে ললাটবিম্বে গণেশ অথবা গজলক্ষ্মীর ক্ষুদ্রমূর্তি উৎকীর্ণ করা হত বলে মনে হয়।

ইটের মন্দিরের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকাংশের মতে এগুলির নির্মাণকাল দশম শতাব্দী হলেও, অনুমান নির্ভর এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য নেই। প্রথমত বাড় অংশের রাহাকে দেউলসদৃশ কুলুঙ্গির রূপ প্রদান, দেওয়ালকে পাদভাগ, তল জঙ্ঘা, বান্ধনা, উপর জঙ্ঘা ও বরণ্ড অংশে বিভাজন, শিখরগাত্রে অঙ্গ-শিখরের সংস্থাপন, বর্তুলাকার ভূমি-আমলকের উপস্থিতি এবং তাদের পাঁচের অধিক সংখ্যা এই মন্দিরগুলির স্থাপনাকালকে একাদশ শতাব্দীর পূর্বে আনয়নের অন্তরায়। উচ্চ বেদীর উপর মন্দির প্রতিষ্ঠা, গর্ভগৃহের অর্ধাংশের অধিক গভীর দেওয়াল, পাঁচটির অধিক রথসমন্বিত আসন, পাদভাগ কামের প্রকৃত বিস্মরণ ও কামের সংখ্যা অন্তত পাঁচটির অধিক করা, উচ্চতর প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এ অঞ্চলের ইটের মন্দিরসমূহকে একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগের স্থাপত্য বলেই ইঙ্গিত দেয়।

চলা ও রত্ন রীতি

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের উচ্চনীচ ভেদহীন মানবপ্রেমী ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের সর্বজনীন আবেদন বঙ্গভূমিকে আপ্লুত করায় বঙ্গীয় মন্দির স্থাপত্যে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। অবক্ষয়িত মার্গরীতিসম্মত রেখশৈলীর গণ্ডি বহির্ভূত এক অভিনব লোকায়ত মন্দির স্থাপত্য এ অঞ্চলে রূপ পরিগ্রহ করে। স্থানীয় গ্রামীণ চালাঘরের আদলে এবং পশ্চিম এশীয় নির্মাণকৌশলে যে শৈলী বিকাশ লাভ করে, তা তৎকালীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী শিল্পক্ষেত্রের মন্দাক্রান্ত পরিবেশে বিস্ময়কর। একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব এই স্থাপত্যশৈলীটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাহিত হয়ে এ অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও প্রবেশ করে। স্বাভাবিকভাবেই পুরুলিয়া জেলাতেও চালামন্দির তৈরি হতে থাকে বৈচিত্রের সঙ্গে। চালামন্দিরের অধিকাংশই ইটের তৈরি, অল্প কয়েকটি পাথরের।

আকৃতিগতভাবে দোচালা কুটিরের অনুকরণে নির্মিত দোচালা বা এক বাংলা এবং দুই দোচালা ভবনের দীর্ঘ প্রান্তকে সমান্তরালভাবে সংলগ্ন করে জোড়বাংলা মন্দির, দুটি ক্রমহ্রাসমান চারচালাকে উপর্যুপরি স্থাপন করে আটচালা মন্দির এবং শিখর-দেউলের রত্ন নামাঙ্কিত অনুকৃতিশীর্ষ রত্নমন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন পুরুলিয়ায় রয়েছে।

দোচালা শ্রেণির একটিমাত্র উদাহরণ গড়পঞ্চকোটে দুর্গের বাইরে অবস্থিত। ছোট মন্দিরটির সম্মুখভাগে খিলানশীর্ষ প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালটি ধসে পড়েছে। কিন্তু প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে পোড়ামাটির অলঙ্করণের একটি শ্রেণি এবং সারিবদ্ধ নকশার উপস্থিতি এখনও দৃশ্যমান। মন্দিরের ঢালু চালদ্বয় শীর্ষদেশে একটি ধনুকাকৃতি রেখায় মিলিত হয়েছে। ফলে চালের .মুদ ধনুকাকৃতি। কার্নিশও বাঁকানো।

এই জেলায় ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা জোড়বাংলা মন্দিরগুলির প্রবেশপথ ত্রি-খিলানযুক্ত। চালের কার্নিশ ও মুদন ধনুকাকৃতি। মুদনের উপর সারিবদ্ধভাবে তিনটি ধ্বজ স্থাপন করা হত। প্রবেশপথের ভিতরে প্রথম বাংলোটি ঢাকা বারান্দা, তার অভ্যন্তরে গর্ভগৃহ। বারান্দা এবং গর্ভগৃহ উভয়েই ক্লয়েস্টার ভল্ট দ্বারা আবৃত।

জোড়বাংলা শ্রেণীভুক্ত দুটি বৃহৎ মন্দির গড় পঞ্চকোটে অবস্থিত। একটি মন্দির গুল্মাদিতে ঢাকা থাকায় তার অলঙ্করণ ও চরিত্রর বিশ্লেষণ অসম্ভব। দ্বিতীয়টির বাহির ও অভ্যন্তর পলেস্তারা দ্বারা আবৃত করার ফলে সাদা-মাটা রূপ লাভ করেছে।

চাকোলতোড়ে শ্যামচাঁদের প্রায় অলঙ্কার-বিবর্জিত বর্গাকার জোড়বাংলা মন্দিরটি আকৃতিগতভাবে গড়পঞ্চকোটের মন্দিরের মতো। এটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে কেউ কেউ বলেছেন।

গদিবেড়োতে ত্রি-খিলান প্রবেশপথযুক্ত অপর একটি জোড়বাংলা মন্দির রয়েছে। মন্দিরটির কার্নিশ ও চালের মুদন ধনুকাকৃতি।

কাশীপুররাজের গুরুবংশের মন্দিরপ্রাঙ্গণের একটি ত্রি-খিলান প্রবেশপথযুক্ত জীর্ণ জোড়বাংলা মন্দির রয়েছে। কারও কারও মতে মন্দিরটির নির্মাণকাল সপ্তদশ কি অষ্টাদশ শতক।

ঝালদার নিকটবর্তী দঙ্গল গ্রামে এক অনামা পীরের ত্রি-খিলান প্রবেশপথসহ একটি জোড়াবাংলা দরগা আছে। আধুনিক অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের ফলে দরগা কারুকার্যবিহীন সরল রূপ লাভ করেছে। দরগার বারান্দা ও গর্ভগৃহ ক্লয়েস্টার ভল্ট দ্বারা আবৃত। দরগাটি সংরক্ষণের ফলে নব কলেবর লাভ করায় এর নির্মাণকাল নির্ধারণ করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাংলার প্রাচীনতম জোড়বাংলা ভবনটি গৌড়ের ফত খাঁর সমাধিসৌধ।

আটচালা শৈলীর মুখ্য নিদর্শন চেলিয়ামায় ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত রাধাবিনোদ মন্দিরটি। শ্রীমণ্ডিত পোড়ামাটির কারুকার্য মন্দিরটিকে উত্তর-মধ্যযুগীয় চালাদেউল স্থাপত্যের এক সমৃদ্ধ দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। প্রবেশপথের উপর রাম-রাবণের যুদ্ধ, নিশুম্ভের সঙ্গে সংগ্রামরত মাতৃকাবৃন্দসহ চণ্ডী, বস্ত্রহরণ, রাসমণ্ডল প্রভৃতি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে। প্রবেশ পথের দুধারে উল্লম্ব অক্ষে সারিবদ্ধ ছোট ছোট অগভীর খোপের ভিতর রয়েছে দশাবতার, বিভিন্ন দেব-দেবী, ভক্ত প্রভৃতি। প্রান্তস্থিত খোপগুলিতে প্রদর্শিত ত্রিসমূহের বৈচিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে একটি রাখালদের আরোহণের দৃশ্যে অনেকে প্রাচীন মন্দিরের দ্বারস্তম্ভে খোদিত ঢেউ খেলানো বৃক্ষতলায় আরোহণরত বালকবৃন্দের ছায়া রয়েছে বলে মনে করেন। একেবারে নীচে অনুভূমিক ফ্রিজ অধিকার করে রয়েছে সামাজিক দৃশ্যাবলী। এর উপর একই রকম ফ্রিজে জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলা চিত্রিত হয়েছে। রামায়ণের কিছু কিছু ঘটনাবলীও এখানে স্থান পেয়েছে। কারুকার্যের বিষয়বস্তু, ধরন ও সংস্থাপন হুগলি জেলায় বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির (১৬৭৯ খ্রিঃ)-কে স্মরণ করায়। তৎকালীন ধারা অনুযায়ী চেলিয়ামার মন্দিরটিতে রয়েছে আর্কুয়েট পদ্ধতি অবলম্বনে নির্মিত পত্রাকার খিলানশীর্ষ দ্বার। এই দ্বার দিয়ে তিনদিক ঘোরা বারান্দার মধ্যস্থিত

গর্ভগৃহে প্রবেশের পথ করা হয়েছে। দক্ষিণদিকে একটি গৌণ দ্বার রয়েছে যার উপস্থিতি সমসাময়িক প্রথা অনুসরণের ফল। গর্ভগৃহের সিলিং তৈরি হয়েছে একটি আর্কুয়েট গম্বুজ দিয়ে। বিধর্মীয় উপাসনালয়ের গম্বুজশীর্ষ বৈশিষ্ট্যকে অপসারণের জন্য সিলিংকে আটচালার আবরণে দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়েছে। আর্কুয়েট পদ্ধতি বারান্দার উপর ভল্ট নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত যে স্বল্পসংখ্যক অন্যান্য মন্দির দেখা যায় তার অধিকাংশই একরত্ন। সেদিক থেকে চেলিয়ামার রাধাবিনোদ মন্দিরটির গুরুত্ব যথেষ্ট।

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গাঙপুরে বেলেপাথরে নির্মিত ও বর্তমানে পরিত্যক্ত রঘুনাথ মন্দির পুরুলিয়া জেলার অপর একটি উল্লেখযোগ্য আটচালা মন্দির। আটচালা ছাদের দুটি স্তর বিভাজন প্রায় অবলুপ্ত করে অতি ঘনিষ্ঠ করার ফলে মন্দিরটি খর্বাকৃতি হলেও বিসদৃশ নয়। বিষ্ণুপুরশৈলী নামে পরিচিত এই বৈশিষ্ট্যের প্রচলন বাঁকুড়া জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর আটচালা মন্দিরে দেখা যায়। রঘুনাথ মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশপথসহ দেওয়াল অলঙ্কারবিহীন। বাঁকানো কার্নিশের খোপগুলিও নিরাভরণ। গর্ভগৃহে গম্বুজের পরিবর্তে রয়েছে ভল্ট-সিলিং।

বাঘমুণ্ডির রাধাগোবিন্দ মন্দির (১৭৩৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত অপর একটি আটচালা মন্দির। সম্মুখভাগ পোড়ামাটির কারুকার্যে ভূষিত হলেও তাতে কোনও মনুষ্যমূর্তি নেই।

পরবর্তীকালে এই জেলায় আটচালা মন্দির নির্মাণের প্রথা অব্যাহত থাকলেও তা ক্রমশ বহিরঙ্গ অলঙ্করণের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা ও সরলতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কাঠামোগত দিকও অবহেলিত হওয়ার ফলে মন্দিরের পরিমাপগত সামঞ্জস্য ও আদলের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়।

কূর্মপৃষ্ঠবৎ ঢালু চতুষ্কোণ চালের উপর ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি এবং চার কোণে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার চারটি রত্ন-মঞ্চ স্থাপন করে পঞ্চরত্ন দেউল নির্মাণের ব্যাপক প্রচলন এ অঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত কয়েকটি নিদর্শন ব্যতীত পরবর্তী যুগের দেউলসমূহ অনুপাতগত সামঞ্জস্যহীনতা ও অতি সারল্যের দোষে পীড়িত। প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে গড়পঞ্চকোট দুর্গের অভ্যন্তরে দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় টিকে অছে। রত্নশিখর ব্যতীত দেউলের উচ্চতা অপেক্ষা অধিক দৈর্ঘ্যের মন্দিরদ্বয়কে উত্তরকালীন বিষ্ণুপুরী পঞ্চরত্নের শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা হয়। গর্ভগৃহবেষ্টিত কিন্তু গুরুভার স্তম্ভবাহিত ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশপথসহ ঢাকা এবং কারুকার্যশোভিত বারান্দা মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত একরত্ন কালাচাঁদ (১৬৫৬) এবং মুরলীমোহন (১৬৬৫) মন্দিরদ্বয়কে স্মরণ করায়। পঞ্চকোটে দুটি মন্দিরের মধ্যে পূর্বেরটির শীর্ষকেন্দ্রে রয়েছে বৃহদায়তন সুউচ্চ এবং ক্রমহ্রাসমান স্তরে সাজানো অনুভূমিক গভীর শিরায় আবৃত রত্নশিখর। সেইজন্য মন্দিরটির সঙ্গে কালাচাঁদ মন্দিরের সাদৃশ্য আরও প্রকট হয়েছে। কিন্তু শিখর ও শিখরশীর্ষে মস্তকের আকৃতিগত কারণে পঞ্চকোটের উদাহরণদ্বয়কে বেশ কিছুটা পরবর্তীকালের বলে মনে হয়। মন্দিরবাটীও গর্ভগৃহবেষ্টিত দেওয়ালের বহির্ভাগে, বিশেষত পূর্বদিকে, পোড়ামাটির অলঙ্করণ লক্ষণীয়। এমনকী রত্নেও পোড়ামাটির কারুকার্য দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে তুলনীয় মন্দিরের সংখ্যা নগণ্য।

পুরুলিয়া জেলার অপর প্রান্তে বাঘমুণ্ডি গ্রামে স্থানীয় রাজাদের দ্বারা নির্মিত একটি নিরাভরণ পঞ্চরত্ন মন্দির আছে যার শিল্পগত মূল্য যৎসামান্য।

রাসমঞ্চ

বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে দেবায়তন প্রাঙ্গণে রাসমঞ্চ নির্মাণের প্রথা অন্যান্য অঞ্চলের মতো পুরুলিয়াতেও প্রবর্তিত হয়েছিল। বাঘমুণ্ডির রাজবাড়ির ভিতর রাসমঞ্চটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আয়তনে ক্ষুদ্র মঞ্চটির আসন অষ্টভুজ এবং মূল শিখর নটি শিখরের অনুকৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত। অত্যন্ত স্থূল পোড়ামাটির অলঙ্করণ-ভূষিত রাসমঞ্চটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে স্থাপন করা যায় না। পারিষদসহ রাম-সীতা, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন ঘটনা যথা রাসমণ্ডল, গোবর্ধনধারণ, বকাসুর বধ এবং সামাজিক দৃশ্যাবলী ও জীবজন্তু, লতাপাতা প্রভৃতি পোড়ামাটি ভাস্কর্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল। অন্যান্য রাসমঞ্চের মধ্যে বড়বাজারেরটি অষ্টভুজ কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন। বেগুনকোদরে আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত রাসমঞ্চটি নবরত্ন। গাঙপুরে পাথরের আটচালা মন্দিরপ্রাঙ্গণেও একটি ইটের রাসমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য

গ্রামসমাজের সমষ্টিগত জীবনযাপনের প্রতীকরূপে পুরুলিয়ায় এক ধরনের সম্পূর্ণ আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্য গড়ে ওঠে। বিশদ ও বিস্তৃত সমীক্ষার অভাব গবেষকগণ দ্বারা উপেক্ষিত এই স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা এখন পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। তবে বর্তমানে দৃষ্টিগোচর কয়েকটি উদাহরণের অবক্ষয়িত রূপ এই স্থাপত্যশৈলীর সূচনাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে হওয়ার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করেছে। অষ্টকোণাকৃতি এবং ঢালু-ছাদযুক্ত বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রায় স্তম্ভসদৃশ দেবায়তন আলোচ্য শৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য। বারান্দার বিস্তৃতি মন্দিরভবনে বহু ভক্ত সমাবেশে উৎসব-অনুষ্ঠানাদি পালনের ইঙ্গিত বহন করে। মূল দেউলের শিখর বারান্দার ছাদ অতিক্রম করে অনেকটা ঊর্ধ্বে প্রসারিত হওয়ায় মন্দিরের বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে অনুপাতগত সামঞ্জস্যের অভাব প্রকট হয়েছে। পুরুলিয়া শহরসহ জেলার বহু স্থানে এই স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

একটি বিশিষ্ট মন্দির

পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ছোট বলরামপুর গ্রামে মধ্যযুগ-অন্তঃকালীন একটি নাগরশৈলীর সুউচ্চ ইটের মন্দির আছে। যুগবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মন্দিরটির গঠনে সরলীকরণ ঘটেছে। পঞ্চরথ আসনে নির্মিত দেউলের শিখর কিন্তু সপ্তরথ। প্রলম্ব দেওয়াল ও বক্র শিখরের প্রায় সমোচ্চতার ফলে দেউলের দীর্ঘাঙ্গ ভাব অপসৃত। অপবদিকে শিখরের ঊর্ধ্বাংশের অকস্মাৎ দ্রুত অন্তর্মুখী গতি ও ছন্দপতনের কারণ হয়েছে। শেষোক্ত প্রবণতা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রেখ-শ্রেণির মন্দিরে লক্ষ করা যায়। অপরিসর ও ঘনসংবদ্ধ লহরা এবং বগাকার কাম দ্বারা দেওয়াল ও শিখরের বিভাজন করা হয়েছে। শিখরের নিম্নাঙ্গে অঙ্গশিখরের উপস্থিতির চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট। শিখরশীর্ষ ভগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে মন্দিরের মস্তক সম্পর্কে কোনওরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়। মন্দিরে প্রবেশের দীর্ঘ পথটি গভীর দেওয়াল ভেদ করে বর্গাকার গর্ভগৃহের

সঙ্গে যুক্ত। প্রবেশপথ ও গর্ভগৃহ উভয় লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত চাল দ্বারা আবৃত। ২:১ এই অনুপাতিক হারে মন্দিরটির দেওয়াল ও গর্ভগৃহের প্রসারতা নির্ধারিত। এই প্রথা একটি অতি প্রাচীন নির্মাণরীতির বহু পরবর্তীকালীন প্রচলনের বিস্ময়কর প্রমাণ দেয়। সমস্ত মন্দির-দেওয়াল একসময় জৈব চুনের মিশ্রণে তৈরি মোটা পলেস্তারায় ঢাকা ছিল। এই পলেস্তারার উপর কোনওরকম কারুকার্য ছিল কিনা তা জানা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পদে রচিত বিবরণ থেকে জানা যায় দেউলটির সম্মুখে একটি মণ্ডপ ছিল। সম্ভবত মণ্ডপের আর্কুয়েট পদ্ধতিতে নির্মিত গম্বুজটির নিম্নাংশে পেন্ডেটিভব্যাকেটের উল্লেখও পাওয়া যায়।

ছোট ছোট ইটের ব্যবহার, দেওয়াল ও শিখর বিভাজনকারী বরণ্ড নির্দেশক কামে পরস্পর মুখোমুখি অর্ধবৃত্তাকার নকশা, শিখরের শীর্ষভাগের অতিরিক্ত অন্তর্মুখী চাল, ধ্বংসপ্রাপ্ত মণ্ডপে গম্বুজ ও পেন্ডেন্টিভের উপস্থিতি, গর্ভগৃহে আর্কুয়েট কুলুঙ্গি ছোট বলরামপুরের মন্দিরটিকে প্রাক-সুলতানি আমলে স্থাপনের অন্তরায়স্বরূপ। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গিগুলিকে দেউলসদৃশ রূপ দেওয়ায় মন্দিরটিকে পারার লক্ষ্মীমন্দিরের ঐতিহ্যবাহী বলে মনে হয়। স্থানীয় লোকশ্রুতি অনুযায়ী মন্দিরে রাধা-শ্যামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার কাহিনি সত্য হলে এটিকে চৈতন্যোত্তর পর্বে স্থান দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সেক্ষেত্রে মন্দিরটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বর্ধমান জেলায় বৈদ্যপুরে প্রায় অনুরূপ কিন্তু কুলুঙ্গি ও চুনের পলেস্তারাবিহীন বাসুদেব মন্দির (১৫৯৮)-কে এই দেউলটির উত্তরসূরী বলে ধরা যাক।

স্বীকৃতি

পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের মাতৃস্বরূপা শ্রদ্ধেয়া লাবণ্যপ্রভা ঘোষের সস্নেহ আতিথ্য, লোকসেবক সঙ্ঘের কর্ণধার শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষের সহৃদয় সহযোগিতা, ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের পথনির্দেশকরূপে সঙ্গদান, বাংলার স্থাপত্য-ঐতিহ্য অনুরাগী অগ্রজপ্রতিম শ্রীবিমলেন্দু কুমারের সাহচর্য, চেলিয়ামের গ্রামসেবক শ্রী জিনদীরাম মাহাতো ও পুঞ্চার শ্রী হেরম্ব ভট্টাচার্যের অকৃপণ সাহায্য পুরুলিয়া জেলায় মন্দির সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানে প্রাথমিক পর্যায়ের এক আনন্দময় স্মৃতি। পরবর্তীকালে দুই কৃতী ছাত্র ড. রমাপ্রসাদ মজুমদার ও ড. গৌতম সেনগুপ্ত কোনও কোনও স্থান পুনঃ দর্শনে সাথী হওয়ায় মন্দির সমীক্ষার পরিশ্রম অনেকাংশে লাঘব হয়। ছাত্রপ্রতিম শ্রী সুবীর সরকার লেখাটি সংশোধনে সাহায্য করায় ভাষাগত ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়েছে। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানিয়ে এঁদের সকলের ঋণ পরিশোধের প্রচেষ্টা ঋণের বোঝা বৃদ্ধিই করবে।



পুরুলিয়ার জাদুঘর পাকবিড়রা

সুভাষ রায়

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' গ্রন্থে বাংলাদেশের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একস্থানে লিখেছেন—"বনে-জঙ্গলে, পুরানো গ্রামে, পুরানো নগরে এখনও গাড়ি গাড়ি মূর্তি পাওয়া যাইতে পারে। যেভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে সে কেবল বাংলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয় যেন উহা নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল। ..... শিল্পের উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙালি এককালে যে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে।" এ কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য আমাদের বাংলা দেশের অন্যত্র যাবার প্রয়োজন নেই। পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় চল্লিশ কি.মি দূরে পুঞ্চার কাছে পাকবিড়রা গ্রাম দেখলেই সে কথার প্রমাণ মিলবে।

পুরুলিয়া যে সমস্ত জৈন তীর্থকেন্দ্র রয়েছে পাকবিড়রা তাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। আনুমানিক নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানভূমে যে সকল জৈন তীর্থকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে মূলকেন্দ্র ছিল দুটি। একটি বন্দর নগরী তেলকুপি। অন্যটি পাকবিড়রা। এটি যেন জেলার যাদুঘর। একইস্থানে এত অজস্র মূর্তি পুরুলিয়ার অন্য কোথাও দেখা যায় না। কত যে মূর্তি নষ্ট হয়ে গেছে, পাচার হয়ে গেছে তার হিসেব নেই। জে.ডি বেগলার মানভূম পরিদর্শনকালে এখানে ২১টি দেউল দেখতে পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১৯টি ছিল পাথরের। তবে বর্তমানে মূল দেউলগুলি সবই নষ্ট হয়ে গেছে। তিনটি দেউলকে হাল আমলে তৈরি করা হয়েছে। যদিও বাড় অংশগুলি পূর্বেরই। তবে দেউলগুলিকে মেরামত করতে গিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। কোনো অদক্ষ কারিগরকে দিয়ে পাথরগুলো সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সিমেন্টের ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে দেউলগুলি পূর্বের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে আর সেগুলির পূর্বের রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার অনুমান এখানে চব্বিশ জৈন তীর্থঙ্করের চব্বিশটি দেউল বর্তমান ছিল। কারণ ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তীর্থঙ্কর মূর্তি ও তাদের শাসনদেবী সে কথাই প্রমাণ করে।

মি.জি. কুপল্যাণ্ড প্রণীত 'Gazetteir of Manbhum District' গ্রন্থে পাকবিড়রার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে পাকবিড়রা সম্পর্কে বলা হয়েছে— "Two miles East of Puncha and some, 25 miles south East of Purulia, in pargana Bagda, contains the remains of numerous statues and sculptures principally Jain ......"

পাকবিড়রা নামটির অর্থ সম্পর্কে নানান সন্দেহ জাগে। স্থানীয় মানুষদের মতে পাক শব্দের অর্থ পাখি। বিড়রা শব্দের অর্থ বাস অর্থাৎ পাখির বাস। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃত অর্থেই মনোরম। চারদিকে গাছ-গাছালি। হয়তো অতীতে পাশাপাশি ছিল নিবিড় অরণ্য এবং সে সব অরণ্যে বাস করত নানান পাখির দল। হয়তো পাখি ধরার দলও ছিল এখানে। যারা পাখি ধরে ধরে বিক্রয় করত বাজারে। রপ্তানি করত নানাস্থানে। স্থানীয় প্রাচীন গ্রাম বুধপুরে এখনও চড়ক পূজায় বিচিত্র ধরনের পাখি বিক্রয় হয়। W.W. Hunter-এর লিখিত 'Statistical Account of thed District of Manbhum' গ্রন্থেও এর উল্লেখ পাই। সেখানে আছে— 'An Annual mela or fair is held at Budhpur during the Charak Puja or swinging festival, to which amongst other things are brought, I understand, numbers of young birds for sale, chiefly the shama (Kittaeinda, Macroura, Gmel) and young parrakeets (Paloorins rosa, Bodd). I imagine that it is from these fairs, which appear to be usual in many places in District at this particular festival, that many of these particular birds are collected eventually find their way for sale to Calcutta, and are said to come from the Rajmahal hills."

পাকবিড়রার পুরাক্ষেত্র দেখলে এটিকে একটি স্থাপত্য শিল্পকেন্দ্র বলে মনে হয়। তাছাড়া এত অজস্র মূর্তি একস্থানে থাকতে পারে একথা ভাবতেও অবাক লাগে। হয়তো অতীতের অরণ্যবেষ্টিত এই নির্জন স্থানটিতে জৈন স্থাপত্য শিল্পীরা গড়ে তুলেছিলেন বিশাল এক শিল্পক্ষেত্র। হয়তো এখান থেকেই পুরুলিয়া ও ভারতের অন্যান্য স্থানে মূর্তি রপ্তানি হত। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় শৈল্পিক নিদর্শন সাড়ে সাত ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি তীর্থঙ্কর মূর্তি। সম্ভবত এটি শীতলনাথের। একটি বৃহৎ কালো প্রস্তরখণ্ডকে খোদাই করে এটি তৈরি করা হয়েছে। এমন বৃহৎ ও অসাধারণ মূর্তি পুরুলিয়ার অন্য কোথাও নেই মূর্তিটির নীচে চামর হাতে পুরুষ মূর্তি ও নীচে লাঞ্ছন চিহ্ন শ্রীবৎস। মূর্তিটি পদ্মের ওপরে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। এই মূর্তিটি সম্পর্কে কৃপল্যাণ্ডের বিবরণে পাই—'The principal object of attention is a colossal figure with the lotus as symbol on the pedestal and worshipped underd the name of Bhiram which is obviously the Jain Tirthankara, vira. The figure is $7\frac{1}{2}$ feet in height standing on a low pedestal. বর্তমানে এই মূর্তিটি পাকবিড়রার মানুষের কাছে শিব রূপেই পূজিত। পাকবিড়রার রায় পরিবারের মানুষেরা নিয়মিত ফুল, বেলপাতা ও সিন্দুর, চন্দন সহযোগে মূর্তিটিকে পূজার্চনা করে থাকেন।

বর্তমানে এখানকার অজস্র মূর্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি মূর্তিকে একটি ঘরে পরপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পুরুলিয়ার প্রাচীন দেউলগুলির মতো ঘরটির অবস্থাও অতীব শোচনীয়, ছাদ একেবারে ফেটে চৌচির। বর্ষায় সমস্ত ছাদে জল ঝরে। মূর্তিগুলি অকাতরে জলে ভিজতে থাকে। ঘরটিতে একটি লোহার গেট বসানো হয়েছে। আগে গেটে তালা লাগানো থাকত। কেবলমাত্র পূজার্চনার সময়ই খোলা হত। এখন সর্বদাই খোলা থাকে। তার ফলে নিরাপত্তা হারিয়ে গেছে। কবে যে বাকি মূর্তিগুলি উধাও হয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। বর্তমানে কক্ষটিতে যেসব মূর্তি পরপর সাজানো রয়েছে তাদের একটা বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

(১) অম্বিকার মূর্তি— আনুমানিক উচ্চতা ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি। চওড়ায় প্রায় ২ ফুট ৩ ইঞ্চি। দেবী অম্বিকা মহাবীরের শাসনদেবী। মূর্তিটির কারুকার্য আজও আমাদের বিমুগ্ধ করে। মূর্তিটির দুপাশে চামরধারী দুটি রমণী মূর্তি ছিল। তবে বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। খোদিত সিংহ মূর্তিটি শিল্পীর শৈল্পিক মহিমাকে আজও উজ্জীবিত করে রেখেছে।

(২) পার্শ্বনাথ — শীতলনাথের বৃহৎ মূর্তিটির পাশেই এটিকে রাখা হয়েছে। মূর্তিটি কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। আনুমানিক উচ্চতা ৩ ফুট ২ ইঞ্চি। চওড়াতে ২ ফুট ২ ইঞ্চি। ও পরে মালা হাতে গন্ধব-গন্ধর্বী। নীচে লাঞ্ছন চিহ্ন সর্প।

(৩) চন্দ্রপ্রভ — মূর্তিটির উচ্চতা ২ ফুট ৯ ইঞ্চি। চওড়ায় ১ ফুট। লাঞ্ছন চিহ্ন অর্ধচন্দ্র মূর্তির পাদদেশে সুস্পষ্ট।

(৪) অম্বিকা — এটি পূর্বের চেয়ে আকারে অনেক ছোট। দেবী সিংহের ওপরে আরূঢ়া।

(৫) আদিনাথ — অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের মূর্তি। লাঞ্ছন চিহ্ন বৃষ স্পষ্ট।

(৬) আদিনাথ — এটি পূর্বের চেয়ে আকারে অনেক বড়। উচ্চতায় ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। চওড়াতে ২ ফুট ৫ ইঞ্চি। মূর্তিটির দুপাশে খোদিত রয়েছে ২৪ তীর্থঙ্করের মূর্তি। দুধারে দুটি পুরুষ মূর্তি। তাদের হাতে চামর। সবার নীচে লাঞ্ছন চিহ্ন বৃষ। এই মূর্তিটিও কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। লাঞ্ছন চিহ্নের দুপাশে খোদিত রয়েছে সিংহ ও রমণীমূর্তি এবং জম্বুদ্বীপ।

(৭) শিশু কোলে নারী — পুরুষ মূর্তি — পাথরের ফলকের উপরে খোদিত কল্পবৃক্ষের নীচে এই ধরনের তিনটি বৃহৎ মূর্তি ঘরটিতে চোখে পড়ে। প্রতিটি মূর্তি দেখতে একই আঙ্গিকের। মূর্তিগুলি উপবিষ্টা প্রত্যেকের কোলে একটি করে ছোটো ছোটো শিশু। হয়তো শিল্পীরা মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের আবেদন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এই সব মূর্তির মধ্য দিয়ে। মূর্তিগুলির নীচে খোদিত রয়েছে কলস। তারও নীচে বাঘের পিঠে চারটি শিশু হাতে চারটি রমণীমূর্তি। ওপরে গন্ধর্ব-গন্ধর্বী। মূর্তিগুলির আনুমানিক উচ্চতা ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। প্রস্থে ২ ফুট ৪ ইঞ্চি। তবে বর্তমানে তিনটির মধ্যে একটি মূর্তি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে বাকি দুটি নষ্ট হয়ে গেছে।

(৮) ঋষভনাথ — এটি আকারে বৃহৎ। উচ্চতা চার ফুট চওড়াতে ২ ফুট এটিরও দুদিকে খোদিত আছে ২৪ তীর্থঙ্করের মূর্তি। দুপাশে দুই চামরধারী সর্বনিম্নে সিংহ ও নারী মূর্তি। লাঞ্ছন চিহ্ন বৃষভ সুস্পষ্ট। মূর্তিটি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপরে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান।

(৯) মহাবীর — আনুমানিক উচ্চতা ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি। প্রস্থ ২ ফুট। মূর্তির চারপাশে খোদিত রয়েছে নানান শাসনদেব-দেবীর মূর্তি। তাছাড়া চোখে পড়ে দুই চামরধারী ও তিনটি সিংহ মূর্তি।

(১০) শীতলনাথ — এই মূর্তিটির উচ্চতা আনুমানিক ৩ ফুট। চওড়াতে প্রায় ২ ফুট ২ ইঞ্চি। লাঞ্ছন চিহ্ন কল্পবৃক্ষ। এটিরও দুপাশে খোদিত আছে ২৪ তীর্থঙ্কর মূর্তি। নীচে রয়েছে দুটি সিংহের মূর্তি।

(১১) পার্শ্বনাথ — এটি একটি ভগ্ন মূর্তি। দুপাশে নাগকন্যা এবং উপাসনারতা নারী। মূর্তিটি একটি পদ্মের ওপরে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান ছিল।

(১২) আদিনাথ — এটির উচ্চতা ৩ $\frac{১}{২}$ ফুট। দুপাশে খোদিত রয়েছে ২টি করে চারটি তীর্থঙ্কর মূর্তি। নীচে বৃষ লাঞ্ছন বর্তমান। উপরের দিকে রয়েছে বাদ্যবাদনরত মূর্তি।

(১৩) চৈত্য — পাকবিড়রার পুরাক্ষেত্রের অন্যতম নিদর্শন এই কক্ষের ভেতরে রক্ষিত চারটি চৈত্য। পাকবিড়রার দেউলগুলির পুরানো রূপ আর নেই। তবে এই চারটি চৈত্যের অবয়ব দেখে তাদের গঠন পদ্ধতি কিছুটা অনুমান করা যায়। হয়তো এই ধরনের আরো অনেক চৈত্য এখানে ছিল। তবে আজ আর নেই। অনেকগুলি চুরি হয়ে গেছে। পুরুলিয়ার আরও বিভিন্ন স্থানে যেমন ছড়রা, বারমাস্যা, বড়রা প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের চৈত্য চোখে পড়ে। এখানে যে চৈত্যগুলি রয়েছে সেগুলির উচ্চতা ২ $\frac{১}{২}$ - ৩ ফুট। Coupland এর বিবরণ থেকে জানতে পারি 'J.D. Beglar এই ধরনের চৈত্য এখানে দেখতে পেয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'........ a votive chaitya on the four sides of which are sculptured a lion, an antelope, a bull and what appears to be a lamb; over each principal human

figure on the chaitya is represented a duck or a goose, holding a garland." জে.ডি. বেগলারের এই বিবরণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তিনি যে চৈত্যটি দেখতে পেয়েছিলেন সেটির চারপাশে খোদিত ছিল মহাবীরের মূর্তি। যাঁর লাঞ্ছন চিহ্ন সিংহ (Lion), ঋষভ নাথের মূর্তি যাঁর লাঞ্ছন চিহ্ন ষাঁড় (bull), বাসুপূজ্য যাঁর লাঞ্ছন চিহ্ন ভেড়া '(Lamb) এবং সুমতিনাথ যাঁর লাঞ্ছন চিহ্ন ক্রোঞ্চপক্ষী। বেগলার ক্রোঞ্চপক্ষী। বেগলার ক্রোঞ্চ পক্ষীকেই হয়তো duck বা goose অনুমান করেছিলেন।

বর্তমানে যে চারটি চৈত্য পরপর কক্ষের মধ্যে সাজানো রয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথমটির ওপরের অংশ ভাঙা। চার পাশে চারটি তীর্থঙ্কর মূর্তি। মূর্তিগুলির লাঞ্ছন চিহ্ন খোদিত আছে। এগুলি হল— পার্শ্বনাথ, কুন্থুনাথ, আদিনাথ এবং মহাবীর। দ্বিতীয়টির চারপাশে, খোদিত রয়েছে— অরনাথ, শান্তিনাথ, চন্দ্রপ্রভ, অজিতনাথের মূর্তি। এটি দেখতে একেবারে একটি সম্পূর্ণ দেউলের মতো। বিভিন্ন অংশে খোদিত রয়েছে পাখি, ফুল প্রভৃতির নক্সা চিত্র। তৃতীয় চৈত্যটির চারপাশে খোদিত রয়েছে চন্দ্রপ্রভ, আদিনাথ, পার্শ্বনাথ এবং শান্তিনাথের মূর্তি। এবং তাদের লাঞ্ছন চিহ্ন ও বর্তমান। চতুর্থ চৈত্যটিতে খোদিত আছে লাঞ্ছন চিহ্ন যুক্ত পার্শ্বনাথ, মহাবীর, চন্দ্রপ্রভ এবং আদিনাথ ভগবানের মূর্তি। চৈত্যগুলি খোদিত তীর্থঙ্কর মূর্তি সমূহ আজও সুস্পষ্ট রয়েছে।

কক্ষটির ভেতরে ডানদিকে দেওয়াল ঘেঁসে রয়েছে একটি উঁচু বেদী। ওই বেদীটিতে পরপর সাজানো আছে আদিনাথ, মহাবীর, নারী-পুরুষের যুগলমূর্তি এবং আরও বেশ কয়েকটি আদিনাথ ও মহাবীরের মূর্তি। এই সব মূর্তি আজও অক্ষত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত।

কক্ষের বাইরে ফাঁকা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শত শত বছরের প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তর মূর্তিগুলি। যা সাক্ষ্য বহন করছে অতীতের শিল্পীদের শৈল্পিক প্রতিভার। আর পৃষ্টপোষকদের ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি অমোঘ আকর্ষণের কথা। আজ এই সব প্রত্ন নিদর্শন প্রমাণ করে আমাদের দেশ অতীতে ও শিল্পে সংস্কৃতিতে কতটা উন্নতিলাভ করেছিল। কিন্তু আমরা তাদের উত্তরসূরীরা সেগুলিকে অবহেলা করে আসছি। একবার ফিরেও দেখিনা তাদের অতীত ইতিহাস। চেষ্টা করিনা সেগুলিকে সংরক্ষণেব। অথচ আমাদের দেশে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে অজস্র দেবদেবীর মন্দির। পুরুলিয়ার পথে প্রান্তরে এরকম শতশত মূর্তি আরও কতদিন অবহেলিত হয়ে থাকবে কে জানে। চোরাচালানকারীদের হাতে হয়তো একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। পাকবিড়রার এই ফাঁকা স্থানটিতে যেসব মূর্তি পড়ে আছে তাদের প্রায় সবগুলিই ভগ্ন। অধিকাংশেরই মস্তক অংশগুলি নেই। এখানে যে সব তীর্থঙ্কর মূর্তি রয়েছে সেগুলির বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

(১) চন্দ্রপ্রভ — এই মূর্তিটি এককালে হয়তো আকারে বৃহৎ ছিল। সৌন্দর্যে ছিল অসামান্য। বর্তমানে কেবলমাত্র দুটি পা এবং লাঞ্ছন চিহ্নটি বর্তমান। এই মূর্তিটি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল। মূর্তিটির নীচে দুপাশে দুটি উপাসনারতা নারীমূর্তি রয়েছে। ভক্তিরসে স্নিগ্ধ তাদের মুখমণ্ডল।

(২) অজিতনাথ — এই মূর্তিটিরও উপরের অংশ নেই। কেবল পদযুগল ও লাঞ্ছন চিহ্ন বর্তমান। অজিতনাথের লাঞ্ছন চিহ্ন হস্তী। এটির গঠনভঙ্গি পূর্বের অনুরূপ।

(৩) ঋষভনাথ — পাকবিড়রা কেন সমগ্র পুরুলিয়াতেই ঋষভনাথের মূর্তির প্রাধান্যই বেশি। পাকবিড়রার ফাঁকা স্থানটিতে ও পড়ে আছে চারটি ঋষভনাথের মূর্তি। প্রতিটি মূতি ভগ্ন এবং পদ্মের ওপরে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। প্রতিটির নীচে লাঞ্ছন চিহ্ন বৃষ স্পষ্ট। এবং মূর্তিগুলির দুপাশে দুই চামর ধারী। মূর্তিগুলির দুপাশে খোদিত ছিল ২৪ তীর্থঙ্করের মূর্তি। তবে উপরের

অংশগুলি নেই, নীচের কিছু কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। এখানকার বৃহৎ ঋষভনাথের মূর্তিটির উচ্চতা ৫ ফুট। মস্তক অংশটি খণ্ডিত। এটির নীচে বৃষের দুপাশে খোদিত রয়েছে সিংহের মূর্তি।

(৪) বিমলনাথ — এটি ও একটি ভগ্ন মূর্তি। নীচের লাঞ্ছন চিহ্ন শূকর দেখে মূতিটিকে শনাক্ত করা হয়। এই মূর্তিটির দুপাশে খোদিত আছে বিভিন্ন দেব-দেবী মূর্তি। একেবারে নীচে দুটি সিংহ এবং উপাসনারতা দুটি নারী মূর্তি। মূর্তিটি শত প্রতিকূলতার মাঝে আজও টিকে আছে।

(৫) শীতলনাথ — এটিও একটি ভগ্ন মূর্তি। বর্তমানে ভগ্ন অংশটির উচ্চতা তিন ফুট। আদিতে যে মূর্তিটি বৃহৎ ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটিরও দুপাশে খোদিত রয়েছে দুটি পুরুষ মূর্তি যাদের হাতে আছে চামর। মূর্তিটি পদ্মের উপরে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। পাকবিড়রায় যে ২৪ তীর্থঙ্করেরই মূর্তি ছিল বা তৈরি হত এই সব ভগ্ন মূর্তি সে কথাই প্রমাণ করে।

(৬) চক্রেশ্বরী — ইনি আসলে কোনো তীর্থঙ্করের শাসনদেবী। মূর্তিটির উপরের অংশে কোনো বৃহৎ শিল্পকর্ম যুক্ত ছিল তবে বর্তমানে অবলুপ্ত। তবে দেবীমূর্তিটি সুস্পষ্ট। মূর্তিটি একটি গরুড়ের উপরে উপবিষ্টা। দেবী অষ্টভুজা। আট হাতে আটটি অস্ত্র। নীচে দুপাশে সিংহ সর্বনিম্নে চক্র। সম্ভবত ধর্মচক্র। তাছাড়াও নীচের অংশে চোখে পড়ে তীর ও ধনুক হাতে দুটি পুরুষের মূর্তি। এই ধরনের আরো একটি মূর্তি এখানে চোখে পড়ে সেটি ও ভগ্ন এবং আকার আয়তনে একই।

এই সব মূর্তি বাদেও আরও অজস্র মূর্তির ভগ্ন অংশ পাকবিড়রার প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আর কত যে মূর্তি এখন মাটির নীচে রয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। চোখে পড়ে চারটি প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ আকারের কলস। কলসগুলির ওপরে চারটি করে পত্রযুক্ত আম্রপল্লব। এই আম্রপল্লবের ওপরে ছিল পতাকাদণ্ড। বর্তমানে অবলুপ্ত। তবে ছিদ্রগুলি দেখে সেটা অনুমান করা যায়। এই সব কলস একদিন দেউলের উপরে মস্তক অংশে শোভা পেত।

পাকবিড়রার দেউল — বর্তমানে পাকবিড়রায় একটিও সম্পূর্ণ দেউল আমাদের চোখে পড়ে না। যে তিনটি দেউল আজ আমরা দেখতে পাই সেগুলির মোটামুটি বাড় অংশ পর্যন্ত পূর্বের। বাকি অংশ বর্তমানের তৈরি। কোনো অদক্ষ শিল্পীকে দিয়ে এগুলি তৈরি করানো হয়েছে। এবং বর্তমানে দেউলগুলি একটি কিম্ভূত কিমাকার রূপ লাভ করেছে। এখানকার দেউলগুলি মেরামত করার সময় কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। এখানকার দেউলগুলির অবয়ব কিছুটা অনুমান করা যায় চৈত্যগুলি দেখে। জে.ডি. বেগলার এখানে যে ২১টি দেউলের ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে ১৯টি ছিল পাথরে। এখানকার দেউল সম্পর্কে মিঃ জি. কূপল্যান্ড লিখেছেন — "one large brick temple still stands and north of it a line of four stone temples, three standing and one broken. Near this is an irregular line of five temples, two of stone of which one is standing and three of brick all ruined, and again north of this another line of four temples, three of stone and one of brick, all in ruins. East of the brick temple are another lines of two and three temples all in ruins." মি: জি. কূপল্যাণ্ডের এই বিবরণ থেকে ও অনেকগুলি দেউলের কথা জানতে পারা যায়।

বর্তমানে পাকবিড়রায় একটিও ইটের তৈরি দেউল আমাদের চোখে পড়ে না। তবে প্রত্নস্থলটির পশ্চিমপ্রান্তে একটি ইটের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে। হয়তো উক্ত স্থানেই ইটের দেউল বর্তমান ছিল। সাম্প্রতিক কালের পুনর্গঠিত প্রথম দেউলটিতে একটি লোহার গেট বসানো হয়েছে। এখানকার দেউলগুলির প্রবেশ-পথ ত্রিভুজাকৃতি এবং প্রবেশ পথের দেওয়ালে কোনো ধরনের কারুকার্য বা নক্‌সা চোখে পড়ে না। এখানকার প্রস্তর নির্মিত প্রথম দেউলটির বেদীতে বসানো রয়েছে শান্তিনাথ ভগবানের মূর্তি। উচ্চতা ৪$\frac{১}{২}$ ফুট। চওড়াতে প্রায় ২ ফুট। দুপাশে খোদিত

রয়েছে ২৪ তীর্থঙ্করের মূর্তি। দুপাশে চামরধারী মূর্তিও চোখে পড়ে। মূর্তিটি কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। লাঞ্ছন চিহ্ন হরিণ সুস্পষ্ট। এই দেউলের ভেতরে একটি পাথরের উপরে খোদিত লিপি চোখে পড়ে। বর্তমানে সেটি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। লিপিটি উদ্ধার হলে আগামীদিনে আরও অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। এছাড়াও এটির প্রবেশ পথের ডানদিকে রয়েছে একটি তীর্থঙ্কর পট। পটটি লম্বা চার ফুট এবং প্রস্থে দুই ফুট। এই রকম একটি হুবহু পট চোখে পড়ে বড়রাতে। যেটি একটি পাকা ঘরের দেওয়ালে সাঁটানো রয়েছে। এখানকার এই পটটিতে আছে ১৬টি সারি। প্রতিটি সারিতেই ২৪ তীর্থঙ্করের মূর্তি খোদিত। বর্তমানে পটটির অনেকাংশে ভেঙে গেছে তবে যেটুকু টিকে আছে সেটিও কারুকার্যে অসাধারণ। পটটির শীর্ষদেশে ধ্যানরত ঋষভনাথের মূর্তি আছে। এই প্রথম দেউলটি উত্তরমুখী। পূর্ব দিকে জল নিষ্কাশন প্রণালী চোখে পড়ে। একটি সুন্দরী রমণীর মুখ দিয়ে মূর্তি প্রক্ষালনের জল বাইরে বের হত। এর ওপরে পূর্বে নাকি ছিল ফণাযুক্ত সর্প। এখন বিনষ্টিত। জল নিষ্কাশনে সুন্দরীর মুখের ব্যবহার এখানেই চোখে পড়ে। অন্যস্থান গুলিতে হস্তীমুখ, কুমীরের মুখ প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়।

দ্বিতীয় দেউলটির ও বাড় অংশের উপরে প্রাচীন দেউলেরই প্রস্তরখণ্ডগুলি বসিয়ে দেউলটিকে নির্মাণ করা হয়েছে। ভেতরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত আছে ঋষভনাথের মূর্তি। মূর্তিটি লম্বা প্রায় চার ফুট। পদ্মের উপরে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। দু পাশে দুই চামরধারী। নীচে খোদিত লতাপাতার নক্‌শা। এটিরও দুপাশে ২৪ তীর্থঙ্কর মূর্তি খোদিত। তীর্থঙ্কর মূর্তির মস্তক অংশে রয়েছে প্রভামণ্ডল। ওপরে গন্ধর্ব-গন্ধর্বী।

তৃতীয় দেউলে কোনো বিগ্রহ চোখে পড়ে না। তৃতীয় দেউলের উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট। এটিরও উপরের অংশ সাম্প্রতিক কালের। এখানকার দেউলগুলি সরাসরি ভূমির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। অতীতে কোনো বেদী ছিল কি-না তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বান্দা বা বুধপুরের মতো এখানকার দেউলের সম্মুখপ্রান্তে প্রস্তর নির্মিত বারান্দা ছিল। ফাঁকা স্থানে পড়ে থাকা বিরাট আকৃতির স্তম্ভগুলি সে কথা প্রমাণ করে।

পাকবিড়রার পুরাক্ষেত্রের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়োই কঠিন। তবে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর। ডেভিড জে. ম্যাককাচ্চন তাঁর 'Late Mediaeval Temples of Bengal, গ্রন্থে সে কথাই লিখেছেন — "In the samed remote Western areas of the old Manbhum district the Jains seem to have gone on building temples up to the 13th century or later, quite a few of them still standing today (e.g.at Bahulara, Harmasara, Deubhira, Ambika nagar, chharra, pakbira, Tuisama or Deoli in Bankura and Purulia districts, and the images remaining of many more.

তথ্যসূত্র

১। Late Mediaeval Temples of Bengal – ডেভিড জে. ম্যাককাচ্চন
২। The Sarak – Ganesh Nahata
৩। পুরুলিয়া — তরুণদেব ভট্টাচার্য
৪। বিজয় পণ্ডা
৫। খগেন্দ্রনাথ মাজী
৬। স্বপন মণ্ডল
৭। মৃণালকান্তি দত্ত
৮। Notes on a Tour in Manbhum in 1864-65 – E.T. Dalton
৯। Report on a Tour Throuth the Bengal provinces- J.D. Beglar

প্রাচীন এক প্রত্নস্থল : ক্রোশজুড়ি গ্রাম

উৎপল মাহাতো

পুরুলিয়ার প্রাচীন এক প্রত্নস্থল ক্রোশজুড়ি গ্রাম। তা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। ইতোমধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই গ্রাম পরিদর্শনে এসেছেন। তাদের প্রত্যেকের অনুসন্ধিৎসু মন গভীর বিস্ময়ে ডুবে গেছে এখানকার শিবমন্দিরে। খোদিত পাথরের প্রাচীন মন্দির, দৃষ্টিনন্দন বিশালকায় শিবলিঙ্গ, পাথরের নিখুঁত সিংহ, কালীমূর্তি, অন্যান্য বিগ্রহ এবং বিচিত্র সব কারুকার্যখোচিত জটিল-সুন্দর চিত্রকলার শৈল্পিক সুষমা অন্যদিকে আর চোখ ফেরাতে দেয়নি। অথচ অদূরেই পুরাকীর্তির ঐশ্বর্য-সম্ভার নিয়ে রাজমহল ও আরেক শিবস্থল মাটির গর্ভ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

দ্বারকেশ্বর নদের বালিয়াড়ির অদূরে ক্রোশজুড়ি সৃষ্টি করেছে এক প্রাচীনপর্বের মায়ালোক। মানবেতিহাসের ঐতিহ্যময় পাথরের প্রাচীন সব শিল্পকলা নিয়ে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এর মন্দির সকলকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ। ইন্দ্রবিল স্টেশন থেকে দক্ষিণে কিংবা কাশীপুর থেকে পূর্বে ১৩ কি.মি., হুড়া থেকে উত্তর-পূর্বে অথবা কমলপুর থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৭ কি.মি. পথ অতিক্রম করলে অতি সহজেই পৌঁছ যাবেন আকাঙক্ষার মানসতীর্থে। মন্দিরের দক্ষিণদিকের সদাজাগ্রত সিংহদুয়ার আপনাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে—'স্বাগতম্'। তবু মধুকবির ভাষায় বলতে হয়—তমালের ঘনছায়ায় 'দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব/এই বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল'। আর পথের শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে অনুগ্রহপূর্বক শ্রবণ করুন ক্রোশজুড়ির ইতিহাস।

সুপ্রাচীন কালে 'বনখণ্ডি' পরগনার ক্রোশজুড়ি গ্রাম-নামের মূলে রয়েছে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির। এই সিদ্ধপীঠের পরিধি একদা একক্রোশ জুড়ে থাকায় ক্রোশজুড়ি নাম। সুদুর অতীতে কোনও রাজা এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন—তা স্থাননাম ও ধ্বংসাবশেষ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। কালের করাল গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্থান-নামগুলোর কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। রাজমহল, রানিসরোবর, গোলামডাঙা, ঘোড়াশালা যথাক্রমে হয়েছে—মহলটাঁড়, রানিদহ, গোলামবাইদ ও ঘোড়াশাল। সমাধিসংলগ্ন আরও কয়েকটি শিবমন্দির থাকায় সেগুলোর ধ্বংসাবশেষের নাম হয়েছে শিবটাঁড়। এতসব থাকা সত্ত্বেও ক্রোশজুড়ির রাজ-ইতিহাস সম্পর্কে তেমনি কিছু জানা যায় না। কিংবদন্তী থেকে জানা যায়—একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে দু'জন মানরাজা যথাক্রমে সিদ্ধিমানদেব ও তাঁর পুত্র শ্রীমানদেব নৃপবর রাজত্ব করেছেন। যবন আক্রমণের সময় নাকি কিছু বন্দি যবনসেনাকে মানরাজা গোলামডাঙায় গোলাম করে রাখেন। পরবর্তীকালের মানরাজারা

মানবাজার অঞ্চলে গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেন। মানরাজাদের অধ্যুষিত ভূমিই যথাক্রমে 'মানভূম' ও 'মানবাজার' নামে পরিচিত।

বর্তমানে এক বুক উঁচু করা প্রায় বৃত্তাকার বিরাট চাতালের উপর শুভ্র-সুন্দর শিবমন্দিরটি শোভা পাচ্ছে—তার অর্ধেক অংশ প্রাচীন আর উপরিভাগ অর্বাচীন। এর আগের ইতিহাস বড়ই করুণ। মধ্যযুগের মানবদস্যুদের হাতে ভগ্নচূড় ও ক্ষতবিক্ষত মন্দির-টিকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতিদেবী তাঁর স্নেহাঞ্চল নিয়ে এগিয়ে আসেন। ঝোপঝাড়, উইটিবি ও বিষধর সর্পে ভরিয়ে তোলেন মন্দির প্রাঙ্গণ। অন্যান্য মূর্তিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ভগ্ন ও আহত অবস্থায় প্রকৃতির সবুজ ও সরস স্নেহে কেবল অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কাশীপুরের মহারাজা মহানুভব নীলমণি সিংদেও যথাসম্ভব কিছু জমি বন্দোবস্ত ও বাৎসরিক ৮ ১.২৫ টাকায় এই বিশাল শিবলিঙ্গ নিত্য পূজার জন্য এক ব্রাহ্মণ পূজারী নিয়োগ করেন। তখন ঝোপঝাড়ের বুক চিরে এক সরু রাস্তা দিয়ে ভক্তজন ভগ্নমন্দিরে যেতেন।

প্রাকৃতিক কারণে আর সংস্কারের অভাবে ভরাট হয়ে যাওয়া রানিসরোবর আবার চাষের জমি হয়ে ওঠে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে গাঁয়ের দেহেরিরা সেখান থেকে আবিষ্কার করেন পাথরের এক কালীমূর্তি। ভগ্নশিবমন্দিরের মুখোমুখি মাটি-ইটের দেওয়াল তুলে খড়ের ছাউনি দিয়ে নির্মিত গৃহে ওই মূর্তি স্থাপন করা হয়। সেই সঙ্গে কয়েকটি হাত ভাঙা অবস্থায় মন্দির প্রাঙ্গণে পড়ে থাকা বৃষবাহন দশাভুজ মূর্তিটিও রাখা হয়। তার আগে থেকে শিবের মাথাতে খড়ের ছাউনি দেওয়া হত। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে বিহার সরকারের 'জমিদারি বিলোপ আইন' কার্যকরী হলে মন্দিরের উপর রাজাদের কর্তৃত্ব চলে যায়। তারপরের ইতিহাস গৌরবজনক।

মানভূমের বঙ্গভুক্তিকাল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৬৪তে নিমাইলাল সেনাপতি মহাশয় ক্রোশজুড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। মানব-ইতিহাসের অমূল্য সম্পদগুলো অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখে তিনি মন্দির সংস্কারে ব্রতী হন এবং তিনিই প্রথম বিষয়টি কাশীপুর ব্লকের মাধ্যমে জেলাপ্রশাসনের নজরে আনেন। তার ফলে ওই বছরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরটি পরিদর্শন করেন ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সরকারের ছত্রিশ মাসে বছর সেই ফাঁকে বিশেষজ্ঞ নিমাইবাবুর উদ্যোগে তাঁর সহকর্মী, গ্রামবাসী এবং এলাকাবাসীর ভিক্ষালব্ধ লক্ষাধিক টাকা ও সহযোগিতায় মন্দিরের চাতাল আর পাকা কালীমন্দির দর্শনীয় হয়ে ওঠে। অন্যান্য পুরাকীর্তিসমূহকে চাতালের উপর সুসমঞ্জস্যভাবে সাজানোর চেষ্টা হয়েছে। আর রাজাদের নিযুক্ত বংশধরেরা বর্তমানেও নিত্যপূজা করে চলেছেন। অবশ্য মানরাজাদের আমলে ও তার পরবর্তীকালে গ্রামের দেবগৃহী অর্থাৎ দেহেরিরা মন্দিরের পূজারী ছিলেন। এখনও চৈত্র সংক্রান্তিতে গাঁজনের সময় সিদ্ধেশ্বর শিবের 'পাট' দেহেরিদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পূজার প্রচলন রয়েছে। উপবাসের আগে তিনদিন এই পুজো হওয়ার পর মন্দিরের পুজো হয়।

তমালের স্নিগ্ধছায়ায় বসে এখন আপনি গর্ববোধ করতে পারেন, কারণ—

১। ১৯৬৪তে পঃ বঃ পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর পি. সি. দাশগুপ্ত এবং সুপারিনটেনডেন্ট ডি. কে. চক্রবর্তী এই মন্দির পরিদর্শন করে তাঁদের লিখিত অভিমত দিয়েছেন।

২। ডি. কে. চক্রবর্তীর রচনাটি U. G. C. এবং C. U.-র উদ্যোগে 'আশুতোষ মিউজিয়ামে' আয়োজিত 'Legacies of Gupta art in India and abroad–1971' সেমিনারে পঠিত হবার পর University of Kerala, Trivandrum থেকে প্রকাশিত 'Journal of Indian History' গ্রন্থনায় স্থান পেয়েছে।

৩। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Comparative literature এর রিডার David Macutchion ১৯৬৫তে এই মন্দির পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দেওয়ার পরও ১৯৬৮তে আরেকবার পরিভ্রমণ করেন।

তাছাড়াও ১৮৭৩-এ মানভূমের মন্দিরগুলোর অন্যতম সমীক্ষক Beglar সাহেবের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এমন এক ঐতিহাসিক ও প্রাচীন মন্দির আপনি পরিদর্শন করতে এসেছেন। দেখুন, সিংহদ্বারের দুই দিকে দুই সিংহের নীচে বামহাতে ঢাল ও ডানহাতে তরোয়াল নিয়ে দুই বীরপুরুষ আপনাকে কেমন অভিনন্দন জানাচ্ছে। পূর্বদিকের দ্বারেও এইরকম দুই বীরপুরুষ নিরলসভাবে দাঁড়িয়ে বছরের পর বছর প্রতিদিনকার নিত্যনতুন পুণ্যার্থীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চলেছে। এদের মাঝখানে ছুটন্ত ঘোড়ার পীঠে চড়ে বামহাতে লাগাম ও ডানহাতে তরবারি তুলে আরেক বীরপুরুষ মন্দির প্রহয়ায় যেন সদাব্যস্ত। এগুলো বীরত্বব্যঞ্জক বীররাজাদের বীরস্তম্ভ। তাই আমার সবিনয় অনুরোধ—মন্দিরটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কারার আগে পুরাকীর্তিগুলোর বিবরণ আরেকটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

সিংহদ্বারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে চাতালের ডানদিকে তাকালে চোখে পড়ে মুক্ত আকাশের নীচে দুটি শিবলিঙ্গ। আর সিঁড়ির প্রথম ধাপে বিছানো সাতফুটের লম্বা ও পাশের বৃত্তাকার আমলকগুলো শিবটাঁড়ের সম্পদ। বাঁদিকের পর পর দুই সিংহ যাত্রীদের স্বাগত জানানোর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। কারুকার্য খচিত ঠিক যেন ধামসার মতো অথচ নিরেট পাথরের উপর স্থাপন করা অপরূপ সিংহটির খণ্ডদেহ বুকের ভিতরে কেমন যেন এক অভাবের ব্যথা জাগায়, আর পূর্ণতার খোঁজে তাই নিমেষেই নিয়ে যায় ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির কিংবা সারনাথের মন্দিরের চূড়ায়। কয়েক পা এগোলে মন-কাড়ানিয়া সব চিত্রকলায় মণ্ডিত দোরস্তম্ভ থেকে ভেসে ওঠে শিল্প ও স্থাপত্যের সঙ্গে জীবনের সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো গুপ্তযুগের গৌরবোজ্জ্বল ছবি। মহাকবি কালিদাসের রচনায় পাওয়া যাবে ওই সব শিল্পকর্মের বিবরণ। স্তম্ভের পাদপীঠে নিজেদের বাহনে সেবাইতের প্রতীক গঙ্গা-যমুনা, পদ্মের উপর ত্রিশূল হাতে দ্বাররক্ষী দার-পলাশ ও মাথায় মঙ্গল কলস দু'হাতে তুলে ধরে উবু হয়ে বসে থাকা ভুঁড়ো পেট বামনের অপূর্বসুন্দর মূর্তিগুলো ফুটিয়ে তোলার পরও উপরিভাগে মুখর হয়ে উঠেছে শিল্পীমানস। সারিসারি পুতির মালায় সাজানো অনিন্দ্যসুন্দর স্তম্ভের ভিতরে স্তম্ভে, অজস্র ফুলবল্লীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যে, আর ঢেউ-খেলানো কল্পলতা ধরে ওঠা ছন্দময় রমনীয় রমনীদের দেহলাবণ্যে, হাতের কাঁকনে, পায়ের নূপুরে, মেঘডম্বুর খোঁপায়, স্থূলনিতম্বে, সিংহজিনি কটিদেশে ও উচ্ছল যৌবনের উদ্ধত উন্নত স্তনের খাঁজে খাঁজে অতৃপ্ত শিল্পীমানস মুক্তির পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। ওই দোরস্তম্ভগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে ডেভিড ম্যাকাচুন বলেছেন—"The style of the doorframe figures is reminiscent of Gupta style and the climbing figures are a motif—I have not seen in curvings from other parts of Bengal"। দোরবাজুগুলোর একখণ্ড এখন কলকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে।

প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি আঁকড়ে থাকা মন্দিরটির নীচের অংশে চোখ পড়লে ছায়াচ্ছন্ন অতীত এক রহস্যময় গুঞ্জন তোলে। চারকোণা প্রতি দুই বড়ো বড়ো পাথরের চাই 'ত্রিরথ' পরিকল্পনায় খাপে খাপে ও ধাপে ধাপে বসিয়ে বাইরের দিক থেকে কুঁদে কাটা ছোটো ছোটো চৌকো রূপ বার করার পরও কিছুটা গোলভাব এনে দেউল রচিত। উভয় পাথরের মাঝখান আবার লোহার পাশি বা অংশটা দিয়ে আটকানো—যা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। মন্দিরের

প্রবেশ পথের বারান্দা ও ছাদ হয়ে গম্বুজে এখন অর্বাচীনের এক নির্লজ্জ অজ্ঞানতা ও অহংকার মাথা তুলেছে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কাশীপুর পঞ্চকোর্টের রাজা কল্যাণীপ্রসাদ সিংদেও ভগ্নচূড় মন্দিরটির মাথায় হীরু ও মহাদেব গরাইয়ের খড়ের ছাউনি দেওয়া বন্ধ করে দেন। আর রাজার নির্দেশে তার ম্যানেজার রাজেন গোসাই অর্ধগোলাকৃতি অক্ষত বারান্দার উপরিভাগও তুলে ফেলে নবরূপ দেন। ডেভিড ম্যাকাচুনের ভাষায় তা—'দুর্ভাগ্যজনক'। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে মন্দিরের দ্বারপথের দুইদিকে দুই স্তম্ভের উপর বারান্দার অর্ধগোলাকৃতির মতো আরেকটি দোরবাজু ছিল। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের চূড়াভাগ কেমন ছিল—তা বিশেষজ্ঞ বা ঐতিহাসিকেরা অনুমান করতে পারেন। তবে ঘনকালো পাথরের নির্মিত বিশাল শিবলিঙ্গটি মাথায় আঘাতের চিহ্ন ও যোনিপট্টে কয়েকটি ফাটলের দাগ নিয়ে এখনও অখণ্ড। তিনফুট উচ্চতার দশটি যোনিপট্টের শীর্ষযোনির সাড়ে তিনফুট ব্যাসের উপর এক ফুট চার ইঞ্চি ব্যাস ও উচ্চতার শিবলিঙ্গটি দেখে সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। এই রকম নয়নজুড়ানো বিশালকায় শিবলিঙ্গের প্রতিরূপ হয়তো চোখে পড়তেও পারে নবদ্বীপ, বাংলাদেশ কিংবা উড়িষ্যা রাধাকুণ্ড—শ্যামকুণ্ডে।

সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটির কাল নির্ণয় করতে গিয়ে ডেভিড ম্যাকাচুন মূলত পি. সি. দাশগুপ্তের মন্তব্য তুলে ধরার পর এর প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত রেখেছেন—"Sri P. C. Dasgupta puts the Temple in the 7th Century on the basis of upto affinities, but the doorjamb figures may not be so far removed from 12th Century art of Khiching in Mayurbanj... The mouldings of what remains of The Old Temple are also very intricate and attractive, evidently earlier than those of Deole and Pakbirra, it is possible that this is the oldest temple in Purulia district of which structure still remains in part and it is certainly of great importance for the History of temple—including in Bengal." ডি. কে. চক্রবর্তী বলেছেন—"Architecturically this temple of SIDDHESWAR SHIVA apperars to have been erected during C.8th Century A.D. and seems to be earlier then the earliest of the Well-Known groups of temples at TELKUPI situated in the same district of Purulia"।

অনাধুনিকের মুখোমুখি মাথাতোলা কালীমন্দিরটি আধুনিক কালের হলেও ভিতরের মূর্তিগুলো প্রাচীন। শায়িতের মাথার উপর বাম-পা ও পায়ের উপর ডান পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা কালী। বাম পা আগে থাকায় নাম—বামাকালী। ত্রিনেত্র, জিভ বার করা মুণ্ডমালাধারিণী দেবীর চারহাতে যথাক্রমে রয়েছে—গদা, কৃপায়ণ, নরমুণ্ড ও খর্পর। মাথায় মুকুট, ত্রিনেত্র ও দশাভুজ নটরাজ শিব রয়েছেন বৃষের উপর নৃত্যরত। আর দরদী শিল্পিসত্তার সমস্তশক্তি ও সৌন্দর্য নিঙড়ে ফুটিয়ে তোলা মূর্তিটি আজ কেবল সুন্দর ও মানবতার চরম লাঞ্ছনার স্বাক্ষী স্বরূপ। অমানুষিক বর্বরতায় ভাঙা হয়েছে মাথার চূড়া, দুই হাত ও দুই পা। চেঁছে ফেলা হয়েছে লাবণ্য ভরা মুখ ও নীচের কিছু অংশ। ওই মূর্তিটি সম্পর্কে এখন নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন বুদ্ধ, কারো মতে ভৈরব, কেউ বা বলেন কণিষ্কের আমলের বিষ্ণুমূর্তি। ডেভিড ম্যাকাচুন Avalokiteswara বলার পরও একটি প্রশ্নচিহ্ন দিয়েছেন।

সোনাথলি স্কুলের সহশিক্ষক মাননীয় সনৎদত্তের দেওয়া লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে 'আনন্দরেখা' পত্রিককার সম্পাদক কীর্তানন্দ অবধূত ওই মূর্তিটিকে কোনও এক জৈন তীর্থঙ্করের বলে ধারণা করারর পর মন্দিরটিকে দু'হাজার বছরের প্রাচীন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে—

ক) মানভূমের শতকরা আশিভাগ হিন্দু একসময় জৈন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রচুর জৈনমন্দির দেখে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে বৌদ্ধমূর্তি প্রায় বিরল।

খ) সপ্তম শতাব্দীতে জৈনধর্মের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কালে হিন্দুরা জৈনমন্দির গুলো দখল করে নেন এবং মূর্তিগুলো নষ্ট ও ধ্বংস করেন। অনেকক্ষেত্রে জৈনরাও নিজেদের মূর্তিগুলো রক্ষার জন্য পুকুরের জলে কিংবা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখেন।

তাছাড়াও জৈনমূর্তি ও মন্দিরগুলো শনাক্ত করার জন্য তিনি কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেছেন—

১। বৌদ্ধ ও জৈনমূর্তি চেনার সহজ উপায় হল—বৌদ্ধমূর্তির মাথায় নেপালি টুপির ন্যায় টুপি থাকে, আর জৈনমূর্তির মাথায় থাকে জটা।

২। তন্ত্রের প্রবক্তা শিব হলেন জৈন, বৌদ্ধ, সকলেরই পূজ্য। নামের সঙ্গে 'ঈশ্বর' যুক্ত হলে জৈন শিব, আর 'নাথ' যুক্ত হলে তা বৌদ্ধ শিব। অবশ্যই প্রাচীন হতে হবে।

৩। জৈন মন্দিরে প্রতি দুই পাথরকে অচল-অনড়ভাবে আটকে রাখার জন্য লোহার আংটা ব্যবহৃত হয়েছে। বাইরের থেকে ওই আংটা দেখা যায় না। উল্লিখিত সূত্রে ক্রোশজুড়ির শিবমন্দিরটি একদা জৈনমন্দির ছিল। এর কারণ জৈনমূর্তি বা মন্দির চেনার অন্যত্র লক্ষণগুলি নষ্ট করা হলেও উপরের তিনটি লক্ষণ আজও স্পষ্ট—

ক) বিতর্কিত মূর্তিটির কানের পাশ দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত জটা নেমেছে।

খ) শিবের নামের সঙ্গে 'ঈশ্বর' শব্দটি যুক্ত আছে। এখানকার শিবের নাম—সিদ্ধেশ্বর শিব।

গ) মন্দিরের প্রতি-দুই পাথরকে সংযুক্ত করার জন্য লোহার পাশি বা আংটা ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ) সম্পাদকের কালের ধারণাও সমর্থনযোগ্য। কেননা ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Coins and currency systems of early Bengal' গ্রন্থে দেখিয়েছেন—প্রাক গুপ্তযুগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে ছিল এবং এক জটিল মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কড়ি ও মুদ্রা দুইই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। ক্রোশজুড়িতে মাটির নীচ থেকে যত্রতত্র কড়ি পাওয়া যায়। এর পাঁচ কিমি দক্ষিণে ইছামাড়ার জঙ্গলের ভগ্নজৈনমন্দিরেও পোড়া মাটির বেশ বড়ো এক পাত্রে প্রচুর 'কড়ি' পাওয়া গেছে।

ইতিহাসের পথে ক্রোশজুড়ি এলাকায় একসময় জৈনধর্মের ছায়া পড়ে তাতে নিশ্চিত। ওই সময় কালের প্রথমদিকে স্থানটি ছিল ভুঁইএঞা অধ্যুষিত। এই প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে—

১। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদী আন্দোলনরূপে জৈনধর্মের উদ্ভব ঘটে এবং তা প্রসার লাভ করে। আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে পর্যন্ত ক্রোশজুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভুঁইএঞা, মোদক, মণ্ডল, তাঁতি, মাল, গঁরাই, বৈষ্ণব, কামায়, কুমোর, ডোম, বাউরি ও সাওতালদের আধিপত্য ছিল। অষ্টম শতাব্দীর আগে সাঁওতাল সম্প্রদায় বাদ দিয়ে অন্যান্যরা ব্যাপক ভাবে জৈন্যধর্ম গ্রহণ করেন।

২। ক্রোশজুড়ির এক কিমি পূর্বে ছয়পুরুষ আগে কুলতোড়াতে জৈন ধর্মালম্বীদের বসবাস ছিল। সাধারণত গ্রামের রাজা-রায়া-লায়া গ্রামদেবতার পুজো করে থাকেন। এখনও প্রতিবছর কৃষি-নববর্ষের প্রথমদিন অর্থাৎ পয়লামাঘ গৌরাঙ্গডির জৈন রঘুনাথ পাত্র (< পাতর) কুলতোড়ার গ্রামদেবতায় পুজো করেন। আশ্চর্যের বিষয় ওই দেবস্থলেই বাউরিরা আবার কুক্কুটী > খুখড়ি পুজো দেন। এতে বোঝা যায় জৈনধর্মীরা একসময় গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, আর বাউরিরা সম্ভবত

জৈনধর্ম ছেড়ে গ্রামেই আছেন। গৌরাঙ্গডির পাশাপাশি ইন্দ্রবিলেও কয়েকঘর শ্রাবক তথা সরাক আছেন।

৩। সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরের ১২ কিমি দক্ষিণে পাবড়া-পাহাড়ীর প্রাচীন এক তেঁতুল গাছের তলায় ভগ্নমন্দিরের উপর জৈনদের আদিগুরু আদিনাথ দেব এখনও দিব্যমূর্তিতে বিরাজ করছেন, অথচ ওই গ্রামে একজনও জৈন ধর্মালম্বী মানুষ নেই। এর পাশাপাশি ধবনী গ্রামেও জৈনদের নিদর্শন আছে। খোলা আকাশের নীচে অবহেলায় পড়ে থাকা সেখানকার স্তম্ভগুলো অমূল্যসম্পদ। কেননা সেগুলোতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা শিলালিপি চোখে পড়ে।

৪। ক্রোশজুড়ির উত্তর-পশ্চিমে পাঁচ কিমির মধ্যে অবস্থিত বোদমা গ্রামেও সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন।

৫। অষ্টম শতাব্দীতে মহানবতার শঙ্করাচার্যের পৌরহিত্যে হিন্দু সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। সে সময় বহু জৈন ধর্মালম্বীমানুষ পুনরায় হিন্দু ধর্মের ছত্রছায়ায় ফিরে আসেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবার যুগাবতার চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিবাদের স্রোতধারায় মানভূমের গ্রামগুলো প্লাবিত হয়। তাতে বহু গ্রাম থেকে জৈনধর্ম মুছে গেলেও জৈনমন্দিরগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এই কারণে এখানকার বহু গ্রামে হরিমন্দির গজিয়ে ওঠা সত্ত্বেও জৈন মন্দিরগুলো নিজস্ব-ধর্মের স্মৃতি নিয়ে আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

—এখন ভাবতেই পারেন জৈনধর্মের প্রসার, গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার, হিন্দু সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান, যবন আক্রমণ, বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এবং বর্গি আক্রমণ ইত্যাদি হল ক্রোশজুড়ি তথা মানভূমের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস।

কালীমন্দির দেখার পর উত্তর-চাতাল থেকে শিবমন্দিরের গায়ে "A state protected Monument declered by Goverment of West Bengal–1971" এবং সামনের দিকে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘরের—"কীর্তিশালা: প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, স্থাপিত-১০.০২.৭৮" লেখা দুটি চোখে ভাসবে। আঠাশ হাজার টাকার সরকারি অনুদানে নির্মিত কীর্তিশালাটির ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার কমলাকান্ত নস্কর মহাশয় এলাকাবাসীকে ধন্য করে গেছেন। এই বছর আবার তার সংস্কারের জন্য সরকার থেকে অনুমোদন পাওয়া কুড়ি হাজার টাকার কাজ পুরোদমে চলছে।

কীর্তিশালার দোর খুললে দেখতে পাওয়া যাবে—গুপ্ত ও প্রাক গুপ্তযুগের কুয়ো বাঁধানোর পোড়া মাটির 'পাট' বা রিং, কালো, কমলা ও ছাই রঙের কলসির কানা, মাটির পাতলা বাসন-কোসনের টুকরো, ছোটো ঘটি, পাথরের পাত্রের টুকরো, নড়া-চাকতি আর জৈন ও মানরাজাদের আমলের অনেক কিছু। প্রত্নতত্ত্বের ওই সব গুরুত্ব পূর্ণ উপাদানগুলো এখানকার প্রায় সর্বত্র লাঙল দেওয়ার সময়, কুয়ো, ডোবা বা পুকুর কাটার সময় মাটির গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। 'প্রত্নতত্ত্বের সহজপাঠ' গ্রন্থে অমল রায় মৃৎপাত্র বা পাত্রাংশকে বলেছেন—'প্রত্নতত্ত্বের A.B.C.D' তাছাড়াও আড়াই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয়ফুট ব্যাসের পোড়ামাটির 'পাট' দিয়ে বাঁধানো অনেকগুলো পাট-কুয়োর কয়েকটির নবতর রূপ দিতে গিয়ে গ্রামবাসীর অনেকেই নানারকম পুরাবস্তু পেলেও আজ আর কেউ স্বীকার করেন না। মাটি ভরাট হয়ে যাওয়া এখনও ওইরকম কয়েকটি কুয়োর সন্ধান আছে—যেগুলো খনন করলে হয়তো পাওয়া যেতেও পারে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ।

ক্রোশজুড়ির এক কিমির মধ্যে এখনও পর্যন্ত ছয়টি ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে খননের অপেক্ষায় অছে মহল টাঁড়, শিবটাঁড় ও কাজলাদিঘির মন্দিরের টিবি। কাজলাদিঘির

পাড়ের মাটি নিতে নিতে তিনি যোনিপট্টের এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে—যার উপরের যোনিপট্ট খুলে আবার পরানো যায়। আর শিবটাঁড় সম্পর্কে সাহিত্যিক বিমলকান্তি ভট্টাচার্যের মন্তব্য—"মাটির নীচের অজস্র পাথরের গাঁথুনি প্রত্নতাত্ত্বিকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে।" সময় হাতে থাকলে বিকেলের নরম রোদ গায়ে মেখে প্রত্নস্থলগুলো ঘুরে আসতে পারেন। সর্বত্র দেখতে পারেন বড়ো বড়ো পোড়া ইটের ধবংসস্তূপ।

দেড়শ বছর আগেও প্রায় পঞ্চাশমিটার বর্গাকার রাজমহলের ভিত্তি মাটির উপর দেখা যেত। রাজপ্রাসাদের ঢ়িবির উপর একা একা নীরবে বসে থাকলে নানারকম প্রশ্ন এসে ঘিরে ধরে। কেন, কখন, কীভাবে ধ্বংস হল— তার কোনও যথাযথ উত্তর মাটি চাপা রাজপ্রাসাদ থেকে উঠে আসে না। প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে 'ঝালদা'র রাজা দামোদর শেখর 'পাড়া'র রাজা মানসিংহকে আক্রমণ করেন। পরাজিত মানসিংহ দক্ষিণ দিকে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যান তা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ক্রোশজুড়ির মানরাজারা কেন, কখন পালিয়ে গেলেন তার কোনও প্রামাণিক তথ্য নেই। মোগল-পাঠান যুগের পথ ধরে উত্তর খুঁজতে খুঁজতে শিবটাঁড়ে গেলে এখনও সেখানে চোখে পড়ে পাথরের আমলক, কুঁদে কাটা খণ্ড খণ্ড পাথর দিয়ে সাজানো বৃত্ত এবং অসংখ্য অর্ধপোতা পাথর। ঘনায়মান সন্ধ্যায় ফিকে জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোয় বসে ওই নির্জন নিস্তব্ধ শ্মশানভূমিতে—'কথা কও কথা কও হে আদি অনন্ত অতীত, নির্বাক রাতে কেন চুপ করে রও' বলে আবৃত্তি করলে ধবংস স্তূপ থেকে হঠাৎ মন্দির জেগে উঠতে পারে: তখন সন্ধ্যারাতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে মন্দিরে মন্দিরে, প্রদীপ হাতে সরাসরি চলেছে দেবদাসীর দল, আর অর্ধপোতা পাথরগুলো দেখবেন এক একটা অদ্ভুত যেন মানুষ হয়ে উঠে আসছে। ওই ধ্বংস স্তূপ সম্পর্কে ডেভিড ম্যাকাচুন বলেছেন—"In a field about a quater of a mile to the south-east are two mounds, one of bricks, Presumably the remains of more temple. The stone architectural frangments include pieces of Amlaka, a semi-circular Torana, column stumps and the like"। গ্রামবাসীর জানা ওখানকার তিনটি শিবলিঙ্গ এখন যথাক্রমে রঞ্জনডি, কুলতোড়া ও কুলগোড়ার আরাধ্য দেবতা। তাছাড়াও বহু শিবলিঙ্গ ও পাথরের মূর্তি চুরি হয়ে গেছে।

কীর্তিশালার পুবদিকে বড়ো ছাতার মতো বটগাছের পাশে যে পাকাঘর গজিয়ে উঠেছে তার নাম—'YATRI-NIVASA'। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে আগত নতুন নতুন ভক্ত, পুণ্যার্থী ও পরিদর্শক মন্দির প্রাঙ্গণে এসে ভীড় করেন। ওই সব যাত্রীদের কথা ভেবে নিমাইবাবু ও এলাকাবাসীর যাত্রীনিবাসের পরিকল্পনা। ১৯৯৬ এর ৭ই মার্চ যাত্রীনিবাসটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার বল মহাশয়। জনগণের কাছ থেকে ভিক্ষালব্ধ একান্ন হাজার টাকায় মেঝে স্তর পর্যন্ত হওয়ার পর সোনাথলি গ্রাম-পঞ্চায়েতের সৌজন্যে দুই লক্ষ টাকার কাজ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে চলছে। যাত্রীনিবাসটি সুসম্পন্ন হতে আরও কমপক্ষে পাঁচলক্ষ টাকা প্রয়োজন। তাছাড়াও মন্দির, যাত্রীনিবাস, প্রাথমিক স্কুল, পশু হাসপাতাল, সাব-হেল্‌থ সেন্টার ও স্কুল সাবইন্সপেক্টর অফিস ঘেরা মাঠটিতে আকর্ষণীয় ভাবে একটি 'শিশুউদ্যান' রচনা করার মহৎ ভাবনা এখন প্রতি দিনরাত্রি এলাকাবাসীর মনে হানা দেয়। সরকারি সহযোগিতায় সেই সঙ্গে ধ্বংসস্তূপগুলো খনন কার্যের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পদসমূহ উদ্ধার ও সংরক্ষণ করে এখানে একটি 'ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র' গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে প্রাচীন এই মন্দিরে এমন কিছু Relics আছে যা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও দেখা যায় না। পি. সি. দাশগুপ্তের মতে—"It appears to

be our obligation to endeavour to protect these relics in the befitting manner which can bring out the genuine dilights of learned visitors. Let the curved stone fragments and the other stone images and decorative panels fascinate tourists to the forgotten treasures of history and Art"।

ক্রোশজুড়ির এই সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরে সিদ্ধিলাভ করেন সোনাথলির মনোহর ক্ষ্যাপাবাবা। সিদ্ধিলাভের পর তাঁর নতুন নামকরণ হয়—শ্রী শ্রী ১০৮ স্বামী বিরজানন্দ ভারতী এবং ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের সম্মানে ভূষিত হন। সেই মহান পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী—'ক্রোশজুড়িতে সাতরাজার ধন আছে'। আর নিমাইবাবুকে আশীর্বাদ করেছেন এই বলে—'তোমার আরব্ধকাজ সফল হবে'। ক্ষ্যাপাবাবার আশ্রমে আর এই মন্দিরে কলকাতা, বাঁকুড়া, বীরভূম, ধানবাদ, হাজারিবাগ, রাঁচি তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু ভক্ত প্রতি-নিয়ত এসে থাকেন। অদূরেই আবার দ্বারকেশ্বর বালিয়াড়ির তীরে ছোটো ছোটো দুই পাহাড়ের উপর কৃষ্ণপুরের আশ্রম ও কালাপাথরের পাহাড়িবাবার আশ্রম, পাহাড়পুরের ব্রিজ, পাহাড়ের উপর ইংরেজ আমলের 'সীমাফোর স্তম্ভ' তথা 'গোলঘর আর নদীপারের সবুজঘেরা পাহাড়গুলোর অকৃত্রিম সৌন্দর্য কতকাল থেকে পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তালজুড়ি গ্রামের বরুণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন বীরস্তম্ভগুলি প্রাচীন প্রত্নস্থলের নিদর্শন হিসেবে ওই স্থানটিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। পুরুলিয়া জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ওই পাহাড়ে একটি 'হরিণ পার্ক' করার ইচ্ছে একবার প্রকাশ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ক্রোশজুড়িতে 'শিশুউদ্যান' ও 'ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র' গড়ে উঠলে এলাকাটি—"পটের ছবির মত সুহাস্য, পটলচেরা চোখের মানুষী" হতে আর কোথাও কোনো বাধা থাকবে না। এলাকার জনগণ আমরা সেই আশায় বুক বেঁধে আছি।



ঐতিহাসিক গজপুরের পুনরুত্থান

শ্যামল কুমার মণ্ডল

পুরুলিয়া ছিল জৈনধর্মের লীলা ভূমি। হাজার বছর ধরে প্রকৃতি ও মানুষের ঘাত-প্রতিঘাত সয়েও তার কিছু নিদর্শন পুরুলিয়া গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে আজও টিকে আছে। পাকবিড়িরা, তেলকুপি, দেউলঘাটা, মহাদেব বেড়া প্রভৃতির সঙ্গে জৈন মন্দির ও বিহারের তালিকায় সদ্য আবিষ্কৃত গজপুর সংযোজিত হল।

রাখাল বালকের স্বপ্নাদেশে গ্রামবাসীদের গজপুরে প্রাচীন মূর্তি পাওয়ার ঘটনা জেলা সমাহর্তা মাননীয় দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়ের কর্ণগোচর হলে, প্রশ্ন বিষয়ে অগ্রহান্বিত হয়ে তিনি বিষয়টির উপর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর তিনি বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টিগোচর করে সাহায্য চান।

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহায়তায় গজপুরে খনন কার্য শুরু হয়। পাওয়া যায় বহু প্রত্নসামগ্রী। ওই প্রত্ন সামগ্রীগুলি জেলা শাসক মাননীয় দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়ের সৌজন্যে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

পুরুলিয়া থেকে 12 K.M. দূরে পুরুলিয়া আদ্রা লাইনে কুস্তাউর স্টেশন। স্টেশনের বাঁ পাশে পুরুলিয়া-বরাকর রোড ও তৎসংলগ্ন গ্রাম-কুশটাঁড়, এখানে লোকেও তাই বলে। স্টেশন 'কুস্তাউর' আসলে আঞ্চলিক ভাষার অজ্ঞতার জন্য কুশটাঁড়ের এই অর্থহীন বিকৃতি অথবা ইংরেজি (KUSTAUR) লেখার জন্য এই সরলীকরণ হতে পারে। স্টেশনের সন্নিকটে (প্রায় 0·3 K.M.) বাসস্টপ। এখান থেকে (প্রায় 2 K.M.-এর মধ্যে) বরাকরের দিকে একটু এগিয়ে বাঁ পাশে রায় পাড়ার ভিতর দিয়ে বা তার পরের রাস্তা দিয়ে ঢিপি ও কয়েকটা ধান জমি পেরিয়ে গজপুরের সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে সদ্য (June/July 2001) প্রাচীন মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ম্যাপ জি. এল. নং 121, হাল দাগ নং 133।

গজপুরের প্রত্নস্থল ধানজমি ঘেরা জনবসতিহীন পাথুরে ঢিপি দেবস্থান ছিল। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে কুশটাঁড়ের শিব পূজার সময় গজপুরের ওই পাথুরে ঢিপিতে আগে পূজা দেওয়া হত, এখনও হয়। গজডপুরের নিকটের জনবসতি কুশটাঁড়, হিড়বহাল, বেলমা প্রভৃতি। আর গজপুরের প্রত্নস্থলের পাশে এখন যা জমি সেগুলির নাম মণিপুর, মেনিবেড়া[২] যা পুরুলিয়ার গ্রাম নামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর কুশটাঁড়, হিড়বহাল-যা বর্তমান জনবসতি সেগুলি জমি বা ডাঙার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়েছে যে এককালে যেখানে তীর্থক্ষেত্র বা জনবসতি ছিল তা পরিত্যক্ত হয়ে শত শত বৎসর পরে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। এবং তৎকালীন চাষের জায়গা বা মাঠ পরিবর্তিত হয়েছে বর্তমান গ্রামে। গজপুরের পুনঃজাগরণের ইতিহাস

কুশটাঁড়ের তারাপদ রায়ের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। কুশটাঁড়ের খড়িরাম রায়ের তিন ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে তারাপদ রায়। ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তারাপদ রায়ের কাকা জগন্নাথ রায় ও রায় পাড়ায় অন্যান্যদের কাছ থেকে যে বিবরণ পেয়েছি তা হল—

তারাপদ রায়ের বয়স এখন সতেরো/আঠারো বছরের মতো হবে। থাকে পিসির বাড়িতে সাওতালডির পাশে নবগ্রামে।[৩] জগন্নাথ রায় বলল, নবগ্রাম আগুইডাঁড়ের কাছে গুয়াই নদীর[৪] ধারে তারাপদর সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর দেখা হয়। সন্ন্যাসী তারাপদকে এক জায়গায় বসতে বলে চলে যান। তারাপদ ওখানে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ফিরে এসে কিছু খাবার দেয়, তারাপদ খায় এবং সন্ন্যাসী তাকে গজপুরে আসার নির্দেশ দেয়।

সন্ন্যাসীর নির্দেশ পেয়ে তারাপদ ১৩ ই জৈষ্ঠ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ রবিবার (ইংরেজি 27th May 2001) কুশটাঁড়ে নিজের বাড়িতে আসে। তার মন ভালো ছিল না। বাড়ির লোক প্রথমে ভেবেছিল বোধ হয় পিসির সঙ্গে বকাবকি হয়েছে তাই মন খারাপ। তার পর তারাপদ ওই দিনই চলে যায় বাড়ি থেকে প্রায় এক কিমি দূরে গজপুরের সেই দেবস্থানের পাথরের ঢিপিতে। তারাপদ সারারাত ওখানেই থাকল। সবাই বলল ঠাকুর ভর করেছে। বাড়ির লোক ছুটল বিলতড়া। বিলতড়ার দেওঘরিয়া ঠাকুর গজপুরের শিবের পূজারী। পূজা দেওয়া হল। তারাপদ ওখানেই থাকতে লাগল। মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসত। ওখানেই তার জন্য একটা টালির বাড়িরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জগন্নাথ রায় বলল তখন শ্রাবণ মাস ওই জায়গাটি পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার নজরে পড়ল একটা ছোট মূর্তি। পরে লোক-জন নিয়ে বড় পাথরগুলো সরাতেই বেরিয়ে পড়ল ঘট ও বিভিন্ন মূর্তি আর চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল গজপুরে ঠাকুর ওঠার কথা।

আগস্ট ২০০১ থেকে গজপুর সম্পর্কে প্রশাসনিক মহলের তৎপরতা শুরু হয়। গজপুরের ঘটনা জেলাশাসক মাননীয় দেবপ্রসাদ, জানা মহাশয়ের কর্ণগোচর হলে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন।

1 Sept 2001 S. D. O. Sadar (East) Purulia মাননীয় সন্তোষ কুমার দে গজপুরের প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পেশ করেন।

জেলা শাসক দেবপ্রসাদ জানা মহাশয় ওই দিনই (1 Sept 2001) রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের জন্য চিঠি পাঠান। Memo No–731/C। সংবাদ মাধ্যম গজপুর সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করলেন। 'বর্তমান' 3rd Sept 2001 লিখেছে—"পুরাতত্ত্বের হদিস দিল এক কিশোরের স্বপ্ন" এই শিরোনামে।

'মানভূম সংবাদ' 6 Sept 2001 লেখা হল—"কুশটাঁড়ের স্বপ্ন পাওয়া খনন করা মন্দিরে ভক্তদের ভীড়।

জেলা শাসক মাননীয় দেবপ্রসাদ জানা মহাশয় প্রত্নসামগ্রির গুরুত্ব উপলব্ধি করে দিবা রাত্র পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেন এবং বিজ্ঞপ্তি দেন।

সংরক্ষিত স্থান

এই প্রত্নস্থলটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই প্রত্নস্থলের কোন রকম খননকার্য বা স্থাপত্য বা মূর্তি স্থানান্তরিত করিলে আইনত দণ্ডনীয় গণ্য করা হইবে। আদেশানুসারে—জেলাশাসক পুরুলিয়া

রাজ্যপ্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে খননকার্য চলল। আশে পাশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল

কত কথা কত গল্প গুজব। পাওয়া গেছে লক্ষ্মীর ঘট, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি শিবের মূর্তি, গুপ্তধনও থাকতে পারে ইত্যাদি। কৌতূহলী মানুষ ও ভক্তরা ভিড় জমাল। বিগ্রহে পূজা করতে লাগল বিলতড়ার ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

গজপুরে পাওয়া গেছে (আমি যা দেখেছি) কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, মন্দিরের নীচের অংশের পাথরের দেওয়াল। পাথরের জৈন তীর্থঙ্করের মস্তক হীন (ভাঙা) দুটি বড় দিগম্বর মূর্তি, একটি ঋষভদেব[৬] ও একটি শান্তিনাথের। মূর্তি দুটি কায়েৎসম মুদ্রায় দণ্ডায়মান লাঞ্ছন চিহ্নিত অংশ ও পার্শ্বস্থ মূর্তি অংশ সহ উচ্চতা যথাক্রমে 91 cm ও 112 cm ও
চওড়া " 65 cm ও 47 cm

একটি জৈনদেবী অম্বিকার মূর্তি পাওয়া যেছে, মোট উচ্চতা-57cm, চওড়া 29cm, শুধু মূর্তির উচ্চতা-39cm। পাওয়া গেছে কারুকার্যকরা পাথরের চার তাম্রপল্লব যুক্ত একটি বড় ঘট ও আটটি বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন পাথরের ছোট ছোট ঘট। পাওয়া গেছে তিনটি লিপি এবং ভাঙামূর্তির টুকরো টুকরো অংশ ইত্যদি।

আসলে জৈন মূর্তির দু-পাশে জোড়ায় জোড়ায় যে চব্বিশ তীর্থঙ্করের মূর্তি থাকে তার ভাঙা অংশের জোড়া তীর্থঙ্করকেই অনেকে রাধাকৃষ্ণ ঠাওরে ছিল। দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিকে শিব, জৈন দেবী অম্বিকাকে লক্ষ্মী ভেবে পূজা করা হয়েছে। অবশ্য জৈন মূর্তি জানলে পূজা করত না এরকম ভাবলে সম্পূর্ণ ভুল হলে। পাথরের আম্র পল্লবযুক্ত ঘট যা লক্ষ্মীর ঘট হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে তা হল মন্দির শীর্ষে স্থাপিত ঘট। পা'কপিড়রার (পাকবিড়রা) তিনটি মন্দিরের চূড়ায় এই রকম তিনটি ঘট আছে। তাই প্রতিটি ঘট এক একটি মন্দিরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। গজপুরে প্রাপ্ত মোট নয়টি ঘট প্রমাণ করে এখানে কমপক্ষে নয়টি মন্দির ছিলই।

এখন গজপুরে মন্দিরের ধবংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই। মাননীয় জেলা সমাহর্তা দেব প্রসাদ জানা মহাশয় মূর্তি ও উৎক্ষণিত প্রত্নবস্তুগুলি পুরুলিয়া শহরে এনে নিজের হেপাজতে রেখেছিলেন। ২০শে জুলাই ২০০২ তিনি হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক কর্মশালায় পুরুলিয়া জেলা সংগ্রহশালাতে দান করেন। মূর্তি ও প্রত্নবস্তুগুলি বর্তমানে হরিপদ সাহিত্য মন্দির সংলগ্ন জেলা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

গজপুরের মন্দির ছিল জৈন মন্দির। এখানে মূল মন্দিরকে ঘিরে অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হয়েছিল—কমপক্ষে নটা মন্দির ছিল।

গজপুরে তিনটি লিপি পাওয়া গেছে।[৭]

১নং লিপি- লিপিটি শান্তিনাথের পাদদেশে খোদিত। লিপিটি এখনও অপঠিত।

২নং লিপি- লিপিটি মূর্তির নীচের ভাঙা অংশে খোদিত। লিপির উপরে বামমুখী সিংহ চিহ্ন আছে। নীচে আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'শ্রীজঈ মাই'[৮] অর্থ হতে 'পারেশ্রীজয় মা'।

উপরে কোনো দেবী মূর্তি ছিল। কারণ ভাঙা অংশে তার পা দুটিতে তোড়া (অলংকার) পরা আছে (খোদিত)। এখানে প্রাপ্ত দেবী অম্বিকা মূর্তির মতোই তোড়া পরা পা ও নীচে সিংহ চিহ্ন আছে। খুব সম্ভবত এটিও দেবী অম্বিকার মূর্তি ছিল। লিপি অনুয়ায়ী এই মূর্তির সময়কাল—দশম/একাদশ শতাব্দি।

৩ নং লিপি- জৈন দেবী অম্বিকার মূর্তির পায়ের নীচে ডান দিকে লেখা—'শ্রী ন প...' বাঁ পাশে লেখা থাকা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু বাঁ পাশের লেখার অংশ ভাঙা আছে। 'শ্রী ন প

...-এর অর্থও পরিষ্কার নয়।

নিম্নলিখিত প্রত্নবস্তুগুলি জেলা প্রশাসনের পক্ষথেকে জেলা সংগ্রহশালা, হরিপদ সাহিত্য মন্দিরকে ১৯/৭/২০০২ তারিখে প্রদান করা হয়।

I, Shri Debaprosad Jana, IAS, District Magistrate & Collector, Purulia do heredy handover the following articles recovered on excavation from the Archaeological site at Kotara (Gajpur) district Purulia, to the President Haripada Sahitya Mondir for preservation its Museum.

The description of the recovered findings from the site are as follows according to date since start of excavation.

Date of recovery	Antiquity No	Object	Material	Trench	Layer	Depth	Measurement
27.9.2001	1	Mangala Kalasa	Sand Stone	A_1	(1)	-95 cms.	47 cms long
28.9.2001	2	Sculpture of flower bud	Stone	A_1	(1)	-112 cms	L-8 cms B-4 cms
-do-	3	Mangala Kalasa	Sand Stone	A_1	(1)	116 cms	52 cms long.
-do-	4	Feet on lotus	Sand Stone	A_1	(1)	-109 cms	L-13 cms B-8.4 cms
30.9.2001	5	Broken animal figurine	Terracotta	B_1	(1)	-95 cms	–
-do-	6	Rod	Iron	B_1	(1)	-90 cms	14.1 cms
-do-	7	Broken hand of sculpture	Black Stone	B_1	(1)	-95 cms	11 cms
do-	8	Broken part of sculpture	Sand Stone	B_1	(1)	-109 cms	14.5 cms
-do-	9	Mangala Kalasa	Sand Stone	B_1	(1)	-118 cms	48 cms long
1.10.2001	10	Fragments of sculpture (13)	Black Stone	B_1	(1)	-125 cms	–
-do-	11	Snake canopy (Fragment)	Stone	Surface	–	–	–
2.10.2001	12	Sculptural fragments	Stone	B_1	(1)	-199 cms	–
-do-	13	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	–
6.10.2001	14	Un-idenfified	Iron	ZA_2	(1)	-73 cms	19.5 cms
-do-	15	Broken hand sculpture	Stone	Surface	–	–	10.5 cms
7.10.2001	16	Un-identified	Stone	ZA_2	Surface	–	16.5 cms
8.10.2001	17	-do-	Iron	Surface	Surface	–	14.5 cms
13.10.2001	18	Decorated sculpture	Sand Stone	B_1	(1)	55 cms	9.8 cms
-do-	19	-do- (Broken)	Stone	YA_2	(1)	30 cms	16×12×5 c.cms
14.10.2001	20	Fragment of sculpture	Stone	YA_2	(1)	50 cms	–
-do-	21	Stone sculpture	Stone	YA_2	(1)	50 cms	16.8×14.5/2 c.cms
-do-	22	Stone sculpture decorated fragment	Stone	B_1	(1)	48 cms	

(D.P. Jana, IAS)
District Magistrate &
Collector, Purulia

I, Shri Haradhan Banerjee, President, Haripada Sahitya Mondir do hereby respectfully acknowledged the receipt of above articles from Shri D.P. Jana, IAS, District Magistrate & Collector, Purulia.

(Haradhan Banerjee)
President,
Haripada Sahitya Mondir

DATE	ANTIQUITY NO.	OBJECT lower Part	MATEERAL	TRENCH	LAYER	DEPTH	SITE
15.10.01	23	part of Mangala Kalasa Half portion is broken	sand stone	B1	(2)	4bcm	H=12cm.
15.10.01	24	Upper part of Mangala	sand stone	B1	(2)	4bc	20x15cm.
15.10.01	25	Scu;pture Fragment	stone	B1	(2)	4bcm	seokal piece
16.10.01	26	Female figure	stone	ZB1	(2)	4bcm	:.ac.m
16.10.01	27	Elephant figure broken	Terra catta	yA2	(1)	57cm.	
17.10.01	28	sculpture (Broken)	stone	zB1	(1)	45cm.	Broken
18.10.01	29	sculpture intact female figure with A broken figure of head Ambica	stone	yB2	(1)	95cm.	58x30 cm.
							53x32x1bca Report-D.M.cm
18.10.01	30	Bracket	Iron	yB2	(1)	20cm.	14cm.
19.10.01	31	sculpture	stone	7B1	(1)	45cm.	broken people
19.10.01	32	Mangala ghat	stone	yB2	(2)	45cm.	intact

Manjit Bhowmick
Directorate of
W.B.

SALIENT INFORMATION

on the archaeological site at Kotara (Gajpur) near Kushtanr in Purulia district, West Bengal.

1. The site and its revenue detail

i) Name of the site :	"Sivasthan-Danga"
ii) Locality :	Gajpur
iii) R.S. Plot No.	133
iv) Mouza :	Kotara
v) J.L. No.	121
vi) Area :	25 decimal
vii) Surrounding villages :	Belma in the North, Kushtanr in the South, Agoya in the East, Golkunda in the West.
viii) Post Office :	Kushtanr
ix) Gram Panchayat :	Agoya-Narrah
x) Block :	Purulia -II
xi) Police Station :	Purulia (Mufassil)
xii) Sub-division :	Purulia Sadar (East)
xiii) District :	Purulia
xiv) Nearest Railway Station :	Kushtanr
xv) Land possession :	About 50% of the land is vested which was under the possession of Shri Dilip Kumar Singh Deo, the rest is under the possession of Shri Chandrakishore Lal Singh Deo and Shri Nil Shankar Lal Singh Deo, son of Shri Madhusudan Lal Singh Deo of Rajnoagarh under the Police Station Puncha.

II. Approach :

The village Kotara is situated at a distance of 14 Km towards north-east from Purulia, the district headquarter. It is approachable through good motorable road via Chharrah and Kushtanr. The actual site "*Sivasthan*' is located at a distane of 1.5 km from Kushtanr and can be approached upto 1 Km through murrham road which leads from the Kushtanr High School building. The rest 1/2 Km should be covered by foot through the paddy field to reach the site.

III. Present Status of the site :

The area of the site is about 35 metre x 25 metre. A big "Bel" tree is existing at the centre of the site as only tree. It is surrounded by paddy-field all around and the height of the mound is 2 metre from the surrounding ground level. A large number of sandstone blocks of different sizes are scattered here

and there at the site. A few architectural pieces with carvings are also available in the stone debris, like, *amlakasila*" Door-jamb, ventilator with floral designs etc. Some of the stone-pieces are having the holes for iron-dowels. Five square cells are of different sizes have been traced. Presently, 6 to 8 courses of stones are available from the floor level. One such cell has the door-jamb without the lintel. The door-jambs are very simple and devoid of much carvings.

IV. The sculpture and the architectural members found :

i) A large image of headless standing figure of a "*Jain-Tirthankara*" is identified with "*Rishabhanath*" as bull is depicted below his feet as '*lanchana*" in a "*Pancharath*" pedestal. The upper part of the image including the head is broken and missing. The figure is standing in "*Kayotasarga*" pose on a double-petalled lotus and flanked by two attendant-deitels. Those figures are also damaged badly. On both sides of the main figure, some other small '*Tirthankara*" are also depicted. The size of the image is 79 cm in height, 61 cm in width and 16 cm in thickness. The sculpture is made out of sandstone of coarse-grained variety.

ii) Another fragment of sculpture is available at the site. The fragment indicates that it is the base-part of a standing figure of "*Mahavira*", the 24th "*Thirthankara*" as the usual *lanchana* of him is depicted. Here only the feet on a double-petalled lotus below his feet is found. A votive inscription with light incision is visible. It consists of 6 letters in 9th century character. This figure is carved out of fine-grained grey sandstone.

iii) Some other architectural fragments are available, of which, two are belonging to the image of "*Rishabhanath*".

iv) Three "*Mangala Kalasas*" with *amrapallava* are also available at the site as the architectural members. Among them, the bigger one is made of black chlorite and the others are made of sandstone. The bigger one is 50 cm in height and the others are 35 cm and 27 cm in height respectively.

After observing all these, it is revealed that during the early mediaeval period, it was a flourishing Jain centre.

V. Action taken so far :

i) A team of archaeologists headed by Shri Amal Roy, Superintendent of Archaeology of the Directorate of Archaeology and Museums, I & CA. Deptt. of Govt. of W.B. inspected the site on 6-9-2001.

ii) A protection Notice Board has been installed at the site.

iii) Police staff has been deployed round the clock to check the vandalism at the site.

iv) An approach was made to the villagers that they should co-operate

with the Govt. to protect the site from vandalism and also to carryout the archaeological digging as well as to develop it as an important archaeological site in Purulia. All the people agreed and assured that all co-operations will be extended.

VI. Proposed Action Plan :

i) The Excavation–Team of the Directorate of Archaeology and Museums will undertake the excavation work at Kotara to expose the structural complex fully on and from 26-9-2001. The work will be started at 9 A.M. and will be continued upto 5 P.M. About 25 labourers including three skilled hands will work daily w.e.f. 26-9-2001.

ii) The site is to be acquired in favour of Govt. of W.B. through Land Acquisition process.

iii) The site is to be declared protected under the purview of the archaeological Act, i.e., the Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites, 1957 (Act No. xxxl of 1957)

iv) A berbed wire fencing with an Iron gate will be provided all around the site for protection and preservation.

v) A meeting with all concerned officials and the senior villagers will be held to chalk out a comprehensive programme and active involvement for the preservation and development of the site.

VII Result :

It is expected that through the process of digging operation an unique structural complex in the form of a "*Jain Temple*" or "*Vihara*" will be exposed which may add a new chapter to the Jain Art and architecture of Purulia as well as of West Bengal.

গজপুরের প্রথমপর্বের খননের জন্য ৬০,০০০ (ষাট হাজার টাকা) জেলা প্রশাসন ব্যয় করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্বের খননের জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিকট জেলা প্রশাসন ৭০,০০০ (সত্তর হাজার টাকা) অনুমোদন চেয়েছিলেন (পত্রাঙ্ক 1083(1)/C dt. 4.9.2002.

লিপির ক্রমবিকাশ অনুযায়ী দশম শতাব্দির লিপি শ্রীজঈ মাই'। বাংলায় তখন পাল রাজাদের রাজত্বকাল। পুরুলিয়া তখন তেলকুপীর (তৈলকূপ) অধীন, যে তেলকুপি এখন পাঞ্চেৎ জলাধারের জলে দামোদর গর্ভে নিমজ্জিত।

কীভাবে, কখন গজপুরের উত্থান ঘটেছিল, কী কারণে গজপুরের পতন ঘটল এখনও সঠিক জানা যায় নি। তবে পতনের সম্ভাব্য কারণ বলতে গেলে বলা যায় বহিরাগত আক্রমণে পতন ঘটতে পারে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হতে পারে বা পৃষ্ঠপোষকদের অবক্ষয় হতে পারে।

গজপুরের খননকার্য এখনও অসম্পূর্ণ, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গজপুরে আবার খনন করবে। তখন হয়তো গজপুরে আবিষ্কৃত আরো প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গজপুরের ইতিহাস রচনার সহায়ক হবে।

পুরুলিয়া প্রত্ন সম্পদের আকরভূমি। কিন্তু পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এই এলাকার প্রত্নবস্তু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও খননকার্য গুরুত্ব দিয়ে করা হয়নি।

মূলত জেলাশাসক দেবপ্রসাদ জানা ও মহকুমা শাসক সন্তোষকুমার দে-এর আন্তরিক আগ্রহে ও অর্থসাহায্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই খননকার্য করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই খননের কাজ অসম্পূর্ণ আছে।

টীকা—

(১) গজপুর : গ অ জ অ প উ র, এটাই শটাঁড় তথা রায় পাড়ার লোকের উচ্চারণ। গজ (অ) পুর।

(২) বেড়া, রালিবেড়া, বেড়া, ঘাটবেড়া, খুনিবেড়া, জেড়বেড়া প্রভৃতি পুরুলিয়ার অপরিচিত গ্রাম নাম। মহাদেব বেড়া (আনাই) ও রালিবেড়াতে প্রাচীনমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুর - গৃহ, শহর, গ্রাম (হস্তিনাপুর)। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান পৃঃ ৪৩১।

(৩) পিসি - চম্পা রায়, পিসা- শিবুরাম, নবগ্রাম (আগুইটাঁড়) সাঁওতালডি, পুরুলিয়া।

(৪) এখানে গুয়াহঁ এবং আগুই-এর সহাবস্থান এখানে ভাবাবে।

$$\text{আগুই} = \frac{\text{আ}}{1} + \frac{\text{গ + উ}}{2} + \frac{\text{ই}}{3} \text{ এবং গুয়াই } = \frac{\text{গ + উ}}{2} + \frac{\text{য় + আ}}{1} + \frac{\text{ই}}{3}$$

আগুই এবং গুয়াই এধরনের নামের উল্লেখ আছে ‘পুরাকীর্তি সমীক্ষা: মেদিনীপুর শ্রীতারাপদ সাঁতরা’ পৃষ্ঠা 19 (আগুইবনি) এবং পৃষ্ঠা 59 গুয়াবেড়িয়া।

(৫) মস্তক বিহীন ঋষভদেবের মূর্তিখোদিত পাথরটি আবার দ্বিখণ্ডিত। কাঁধ থেকে গোড়ালী পর্যন্ত ও তার নীচের অংশ। দুভাগের উচ্চতা যথাক্রমে 53 cm ও 28 cm নীচ থেকে কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা 91 cm. চওড়া 65 cm ।

তথ্যসূত্র :

১। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) — ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, চিত্র নং ১ এবং ২ লিপি পাঠ ও কাল নির্ণয়ে সহায়ক।

২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য মহাশয় অভিমত ব্যক্ত করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

এই প্রবন্ধ রচনায় আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন জেলা শাসক মাননীয় দেবপ্রসাদ জানা মহাশয়—তাঁর সৌজন্যে এই প্রবন্ধে প্রশাসনিক তথ্য ও পত্রের মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে। তিনি যে দরদি মন নিয়ে গজপুরের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাগজপত্রের ফাইল আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



ভাষা ও সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যে পুরুলিয়া

ডঃ সুধীরকুমার করন

এমন একটি শিরোনামের চেয়ে 'বাঙলা সাহিত্যে মানভূম' বলাই হয়তো সংগত হত, কারণ আমাদের মনের গভীরে একসময় 'মানভূম' শব্দটি প্রতিষ্ঠিত ছিল মুখ্যরূপে, যার সঙ্গে মিল দিয়ে বলা চলত গানভূম। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের দুজন পুরোধা লেখক মানভূমকেই চিনতেন— পুরুলিয়াকে নয়। খণ্ডিত মানভূম আমাদের কাছে — 'পুরুলিয়া' নামে চিহ্নিত হয়েছে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে, — যখন মানভূমের একাংশকে পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হল, ভাষা কমিশনের নির্দেশে। তারপর থেকেই বাঙলা সাহিত্যে 'মানভূমের' বিলোপ— পুরুলিয়ার আগমন।

এই প্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক, কিছু ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের দিকে স্মরণ করা যেতে পারে, ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত মানভূম ছিল বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুরের পাঁচটি জেলা অন্যতম। পাঁচটি জেলার নাম সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ ও রাঁচি — যার সবটাই এখন নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমানায়। কেবলমাত্র মানভূমের একাংশ পুরুলিয়া নামে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলারূপে চিহ্নিত।

বস্তুত, রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটলেও ভৌগোলিক বিস্তারে, পুরুলিয়া এখনও ছোটনাগপুর মালভূমির-ই অন্তর্গত। তাই, ছোটনাগপুরের অরণ্য-পর্বতসংকুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পুরুলিয়ার মধ্যেও কিছু পরিমাণে বর্তমান। পুরুলিয়া থেকে হারিয়ে যায়নি পুরোনো দিনের মানভূমি ভাষা-সংস্কৃতি ও গানের জগৎ। 'মানভূম' না থাকলেও গানে গানে মুখরিত 'গানভূমে" হারিয়ে যায়নি টুসু-ভাদু-করম ও ঝুমুর গান। পুরোনো দিনের মতোই পুরুলিয়া জেলায় এখনও বাস করেন সাঁওতাল-ভূমিজ-শবর প্রভৃতি জনজাতি ; মাহাতো পদবিধারী কূর্মক্ষত্রিয় সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতাভুক্ত আরো অনেক সম্প্রদায়। ঝাড়খণ্ডের বাঙলাভাষী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সহ পুরুলিয়া জেলা ও পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার অন্তর্গত যার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি বর্তমান।

।। ২ ।।

একদা পুরুলিয়াতে জৈনধর্ম ও সংস্কৃতির যে প্রসার ঘটেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় ভগ্ন মন্দিরে ও ভগ্ন মূর্তির মধ্যে। অনেক জৈনমন্দিরই পরে হিন্দু দেবতার মন্দিরে রূপান্তরিত এবং জৈন মহাবীর মূর্তি কোথাও কোথাও ভৈরব নামে পূজাপ্রাপ্ত। অনুমান করা হয় পুরুলিয়া জেলার সরাক সম্প্রদায় জৈন শ্রাবকদের অভিজ্ঞানই বহন করে চলেছেন। এও অনুমান করা হয় যে জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসুত্তে' মহাবীরের ধর্মপ্রচার প্রসঙ্গে যে বজজভূমির কথা বলা হয়েছে, সে

বজ্‌জভূমি বা বজ্রভূমি ছিল— পুরুলিয়াসহ ঝাড়খণ্ডের বনাঞ্চল। বলা হয়েছে— মহাবীর যখন বজ্‌জভূমির ভিতর দিয়ে চলেছেন, তখন তাঁকে স্থানীয় অধিবাসীরা আক্রমণ করেছে আঘাত করেছে, এমন কি ছু ছু করে হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, মহাবীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন— তাদের নখরাঘাতে।

বলা বাহুল্য, রাজগৃহনালন্দা থেকে মহাবীর যদি দক্ষিণাভিমুখী হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়েছিল সীমান্ত বাঙ্‌লার মানভূম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল। তাই এই অঞ্চলের দুর্গম পথঘাট কংকরময় রুক্ষ ভূমিকে বজ্‌জভূমি বলা অসংগত নয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই সীমান্তভূমি যে রাঢ়দেশ বা রাঢ় দেশের অন্তর্গত ছিল তেমন কথাও আবারঙ্গ-সূত্র বর্ণিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে—, রাঢ় এবং রূঢ় সমার্থক। কর্কশভাষী রূঢ় স্বভাবের মানুষদের যে রাঢ় নামে অভিহিত করা হত, তেমন কথা—খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও বলেছেন। ব্যাধ কালকেতু প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি আমরা মনে করতে পারি — ব্যাধ নো হিংসক রাঢ় / চৌদিকে পশুর হাড়— । বস্তুত, এ হচ্ছে প্রদীপ জ্বালানোর আগে সল্‌তে পাকানোর অধ্যায়।

॥ ৩ ॥

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে পুরুলিয়ার প্রসঙ্গ আনতে গেলেই— বাঙলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ডের প্রথম উল্লেখ সম্পর্কিত বিষয় বর্জন করা চলে না। লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে ঝাড়খণ্ড বা ঝারিখণ্ডের প্রথম উল্লেখ বর্তমান। শ্রীচৈতন্য পুরী থেকে মথুরা যাবার পথে ঝাড়িখণ্ডের অপ্রসিদ্ধ পথ ধরেই যাত্রা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণদাস কথিত ঝারিখণ্ড এবং ছোটনাগপুর-ওড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের অরণ্যসংকুল বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কেবলমাত্র বনাঞ্চল বা ঝারিখণ্ড নামেই অভিহিত করা হত। চৈতন্যদেব সে সময় বর্তমান ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে মথুরা যাত্রা করেন নি। চৈতন্য চরিতকারের মতে তিনি কটক নগরকে যাত্রা পথের ডান দিকে রেখে বনাঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন 'উপপথ' দিয়ে। বলা হয়— ওড়িষার আটগড়, অঙ্গুল প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়েই তিনি যাত্রা করেছিলেন। সেই সব স্থানের অধিবাসীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন — ভিল্ল প্রায় লোক সব পরম পাষণ্ড।' মহাপ্রভু তাদের মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

পুরুলিয়া সে সময় বনাঞ্চল ঝারিখণ্ডের মধ্যবর্তী ছিল অবশ্যই। তাই বাঙলা সাহিত্যে পুরুলিয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে আসার জন্যই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম ঝারিখণ্ডের উল্লেখ ব্যাপারটি জানার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি।

॥ ৪ ॥

একেবারে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে প্রথম মানভূম বা পুরুলিয়া না থাকলেও সেই গ্রন্থেই প্রথম মানভূমের অন্তর্গত শিখর ভূমের নাম পাওয়া যায়। বস্তুত, বলা চলে, বাঙলা সাহিত্যে এই প্রথম ঝারিখণ্ডের উল্লেখ। মনে রাখা যেতে পারে যে কয়েকটি ভূমিরাজ্যের অন্তর্গত মানভূম, সিংভূম (ধলভূম

সহ), বরাহভূম, মল্লভূম, সামন্ত ভূম, তুঙ্গভূম সহ শিখর ভূম বা শেখর ভূম এবং আরো কয়েকটি ভূমিরাজ্যের উল্লেখই রসিক মঙ্গল গ্রন্থে বর্তমান। রচয়িতার নাম শ্রী গোপীজন বল্লভ দাস। গোপীজনবল্লভ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক রসিকমুরিরা শিক্ষক এবং রসিক মুরারি ছিলেন প্রখ্যাত তিন বৈষ্ণব গুরুর অন্যতম; নাম ছিল শ্যামানন্দ, অন্য দু জনের নাম নরোত্তম ও নরহরি। পশ্চিমবাংলা ও ওড়িষ্যার সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত প্রখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থ স্থান গোপীবল্লভপুর বৈষ্ণবদের অন্যতম শ্রী পাট রূপে পরিচিত। গোপীবল্লভপুর রসিকানন্দর স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম। রাজসভায় ভাগবত পাঠ করার জন্য রসিকানন্দ ধলভূমের রাজধানী ঘাটশিলায় যখন অবস্থান করছিলেন, সেই সময় শ্যামানন্দ তাঁর সন্ধানে ঘাটশিলায় এসে উপস্থিত হন এবং রসিকানন্দকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাদান করেন।

ঘাটশিলার রাজার কোনো আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে রসিকানন্দ ধলভূম ছেড়ে চলে যান— "ধলরাজ্যে জল আর না কৈল গ্রহণ।" গুরুর আদেশে রসিক এবার বনাঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য নাগপুরের বনভূমিতে প্রবেশ করেন। বলা বাহুল্য, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর থেকে পৃথক অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য পরবর্তীকালে এই নাগপুর 'ছোটনাগপুর' নামে চিহ্নিত হয়। এই নাগপুর, কিংবদন্তী অনুসারে নাগবংশী রাজাদের রাজ্য। ছোটনাগপুরের বনভূমিতে প্রবেশ করে রসিকানন্দ তাঁর ধর্মপ্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হন। গোপীজন বল্লভদাস লিখেছেন—

কোল অধিপতি বড় দুষ্ট দুরাচার।
দ্বিজন্যাসী রাজা প্রজা করেন সংহার।
বিংশতি কাহন কোল চলে তার সঙ্গে।
তথা যেই পায়, হত্যা করে মহারঙ্গে।
তার নামে বনভূমি হয় কম্পমান।
তাহার সম্মুখে কারো নাহি পরিত্রাণ।

সেই দুর্গম বনভূমিতেও রসিকানন্দ বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেন। সেই অঞ্চলে থেকেই তাঁর পুরুলিয়া প্রবেশ। প্রকৃতপক্ষে, পুরুলিয়া তখন হয়তো বা ক্ষুদ্র একটি গ্রাম এবং সীমান্তবাংলার সপ্ত ভূমিরাজ্যের কোনো একটি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রসিক মুরারি শিখরভূম নামে ভূমিরাজ্যে ধর্মপ্রচার করার জন্য উক্ত রাজ্যে প্রবেশ করেন। শিখরভূম বা শেখর ভূমের রাজধানী তখন পঞ্চকোট। রসিকানন্দ সেখানে রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। গোপীজনবল্লভ দাস লিখেছেন—

'তথা হৈতে প্রভু গেলা শেখর ভূমিতে।
উতরিলা গিয়া প্রভু রাজার বাড়ীতে।
সগোষ্ঠী সহিতে রাজা আনন্দিত হৈলা।
দ্বিতীয় নারায়ণ সম প্রভুরে পূজিলা।।

সে সময় ঘোর অনাবৃষ্টির সময়। তিন বৎসর করে অনাবৃষ্টিতে শস্যবিহীন রাজ্য। রাজার প্রার্থনা শুনে রসিকানন্দ সেখানে মহোৎসব শুরু করেন। সেই মহোৎসবে যোগদানের জন্য বহু সাধুর আগমন ঘটে। গোপীজন বল্লভ দাস লিখেছেন:

সংকীর্তন আরম্ভ করিলা নিশিদিনে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু দ্বিজ পূজিলা যতনে।।
ষড়রস ভোজন করিয়া সাধুগণ।

চতুর্দিকে করে সবে কৃষ্ণ সংকীর্তন।।
রসিকেন্দ্র আজ্ঞা কৈল ইন্দ্র রাজা প্রতি।
বহু বৃষ্টি করহ গ্রামের চারিভিতি।।
আশা পরমাণে আচম্বিতে মেঘগণ।
শেখরের সীমা বেড়ে আহ্লাদে গগন।।
মহাঘোর বৃষ্টি কৈলা চতুর্থ প্রহর।
পুকুর, তড়াগ বান্দ ভরিল সত্বর।

প্রকৃতপক্ষে মানভূম তথা শিখরভূম সম্পর্কে রসিক মঙ্গল কাব্যেই প্রথম উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তাই গোপীজনবল্লভ দাস-ই প্রথম বাঙালি কবি, যিনি বাঙলা সাহিত্যে প্রথম পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত এই ভূমিরাজ্যকে উপস্থাপিত করে তাকে ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ করেন।

।। ৫ ।।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এলেন পঞ্চকোট রাজ্যের দেওয়ান রূপে। মধুসূদন তখন এম. এস ডাট - বারএ্যাট-ল, ইংল্যাণ্ড প্রত্যাগত ব্যারিস্টার সাহেব। কাশীপুর তখন পঞ্চকোটের রাজগৃহ ;আর ভগ্নদশাগ্রস্থ পরিত্যক্ত পঞ্চকোট। কাশীপুর তখন মানভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম আর মানভূমের সদর শহর পুরুলিয়া। পঞ্চকোট রাজার দেওয়ান পদে যোগ দেবার আগেই মধুসূদন এসেছিলেন পুরুলিয়া শহরে— কবি শ্রী মধুসূদন রূপে নয়, এসেছিলেন পুরুলিয়া কোর্টের এম. এস. ডাট্ বার এ্যাটল রূপে।

একসময় এই মধুসূদনকে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে লিখেছিলুম— "গির্জার কাছে দাঁড়িয়ে মধুসূদন প্রকৃতির সেই সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন। পথ চলতি কয়েকজন গ্রাম্য লোক একজন কৃষ্ণকায় সাহেবকে দেখতে দেখতে রাঁচি রোড ধরে চলে গেল। মাত্র দশ বছর হলো, জার্মান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধুসূদন ধর্মে খ্রীষ্টান হলেও সেই গির্জার দিকে বেড়াতে বেড়াতেই এসে পড়েছিলেন, প্রার্থনার জন্য নয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের একটি শীতের সকাল, মধুসূদনকে অরণ্য প্রকৃতির উদারতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও মধুসূদনের চেহারাতে প্রবীন যৌবনের রঙ তখন সূর্যাস্তের অস্তরাগের মত। কালো রঙের চেহারাতে একটি অ্যালকোহলিক স্থূলতা।" (দেশ ১৩৭০— পঞ্চকোটে শ্রীমধুসূদন)

মধুসূদন খ্রিস্টমণ্ডলীতে তখন অপরিচিত নন। মেঘনাদ বধ কাব্যের রচয়িতার নামও অনেকের জানা। পুরুলিয়ার প্রীতিমণ্ডলী মধুসূদনকে সংবর্ধযনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁকে আহ্বান করলেন সেই গির্জায়। পুরুলিয়াতে অবশ্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুযমনের সংখ্যা খুব বেশি নয়। মধুসূদন তাঁদের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তখন মানভূমবাসী যে বাঙালী খ্রিস্ট ভক্ত মধুসূদনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁর নাম কাঙালীচরণ। কাঙালীচরণ মধুসূদনকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন তাঁর পুত্রকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাদানের সময় তার গডফাদার বা ধর্ম পিতা হয়ে তাকে খ্রিস্ট ধর্মে অভিযক্ত করেন। বলা বাহুল্য মধুসূদন সানন্দেই রাজী হয়েছিলেন এবং কাঙালী চরণের পুত্রকে খ্রিস্ট ধর্মে অভিষিক্ত করে তার নাম দিয়েছিলেন খ্রিস্ট দাস।

পুরুলিয়ার জার্মান মিশনের গির্জায় রক্ষিত অভিমত লেখার বড় একটি খাতায় মধুসূদনের স্বাক্ষর রক্ষিত আছে।

কাঙালী চরণের পুত্রের ধর্ম পিতা রূপে সেইদিনই পুরুলিয়াতে তাঁর প্রথম কবিতাটি লেখেন:

হে পুত্র পবিত্রতর জনল গৃহিলা
আজি তুমি স্নান করি জর্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্মিলা।

পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পুরুলিয়ার খ্রিস্ট ভক্তদের সৌজন্য— সব কিছুই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই পুরুলিয়াকে সম্বোধন করেই তাঁর 'পুরুলিয়ার প্রতি' কবিতাটির উদ্ভব ঘটেছিল কবিতাটি লেখার আগে নিশ্চিত ভাবে পুরুলিয়ার কংকরময় রুক্ষ ভূ প্রাকৃতিক কথাও তাঁর মনে পড়তে পারে এবং তাঁর মনে বাইবেলের সেণ্টলিউক গ্রন্থের একটি ছত্রও হয়তো বা তাঁর মনে পড়েছিল:

A man went out to sow his seed...
And some fell upon a rock and as
Soon as it was sprung up, it
withered away. Because it
lacked moisture."

মধুসূদন লিখলেন:

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকতমণ্ডলে
শ্রী ভ্রষ্ট সরস সম, হয়ে, তুমি ছিলে
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে
পরিমল ধনে ধনী করিয়া অনিলে।
প্রভুর কি অনুগ্রহ!
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি
ভাসুক সততা স্রোতে নিত্য তব তরী।"

আধুনিককালে এই কবিতাটিই প্রত্যক্ষভাবে পুরুলিয়া সম্পর্কে রচিত প্রথম কবিতা। এই কবিতার মাধ্যমে মধুসূদনের হাত ধরেই বাঙলা সাহিত্য জগতে পুরুলিয়ার প্রবেশ।

এই কারণে কবি মধুসূদন আমাদের নমস্য পুরুষ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, দীর্ঘকাল বঙ্গভূমির বহির্ভূত হয়ে থাকার ফলে, মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি সমতল বাঙলার ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না, তাই মধুসূদনের খেদোক্তি — শ্রী ভ্রষ্ট সরস সম হায় তুমি ছিলে, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে।' বস্তুত, বাঙলাভাষীদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঠিক এইভাবেই এখনও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে বর্তমান।

মধুসূদনের পুরুলিয়া আগমনের সংবাদ পেয়ে, পঞ্চকোটের মহারাজা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পঞ্চকোটে নিয়ে যাবার জন্য একটি সুসজ্জিত পালকি পাঠিয়েছিলেন। মধুসূদনের কবিত্ব সম্পর্কে মহারাজাও অবগত ছিলেন। মহারাজারদূত পালকি সহ পুরুলিয়া আসার আগেই মধুসূদন অবশ্য পুরুলিয়াতে তাঁর কাজ শেষ করে ফিরে গিয়েছিলেন। পঞ্চকোটের অধিপতি এতেও হতাশ না হয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন কলকাতার ৬নং লাউডন স্ট্রীটে— মধুসূদনের বাসগৃহে। দূতের মুখে, মধুসূদন শুনেছিলেন, পঞ্চকোটের বৈভব, তার প্রাচীন ইতিহাস ও কিংবদন্তী; শুনেছিলেন— পঞ্চকোট পর্বতের সৌন্দর্যের কথা। আমার কল্পনা দৃষ্টিতে মধুসূদন সে সময় অভিভূত হয়েছিলেন লংকাপুরীর ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করে। তাই একদা পঞ্চকোটে শ্রী মধুসূদন রচনায় লিখেছিলুম (দেশ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ), "মধুসূদন খুশি হয়ে সেই দূতকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন মেঘনাদ বধ কাব্যে বর্ণিত লংকাপুরীর ঐশ্বর্যের কথা—। মধুসূদন ভেবেছিলেন পঞ্চকোটের রাজা হয়তো তাঁকে রাজকবি রূপে তাঁর সভায় দেখতে চান, কিন্তু, তাঁকে দেওয়ান সাহেবের পদে নিযুক্ত করা হবে শুনে তাতেই তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। হয়তো বা রাজকবি হতে পারলেই বেশি খুশি হতেন তিনি। তাই পত্নী হেনরিয়েটাকে বলেছিলেন— ভারতচন্দ্রই বাঙলা দেশের শেষ রাজকবি। বাংলা দেশের রাজারা এখন বড় জোর কবিয়াল পোষেন, কবির লড়াই দেখার জন্য। What a fall my dear! However for the time being I shall very much like to be called Michael M.S.Dutt- Bar-at-Law, Diwan of His Highness the Maharaja of Panchakot. How do you like it?

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দেই মধুসূদন কাশীপুরে এলেন পঞ্চকোটরাজ্যের দেওয়ান রূপে। চলনে বলনে আচারে আচরণে পাকা সাহেব, গায়ের রঙ ছাড়া পরিপূর্ণ রূপেই সাহেব,— পঞ্চকোটের দেওয়ান সাহেব।

কয়েকদিন ধরে তিনি ঘুরে বেড়াতে গেলেন পঞ্চকোটের প্রাচীন রাজধানী। একদিনে পঞ্চকোট পাহাড়, নীচে পুরনো মন্দির, পরিখা ভেঙে পড়া পাঁচিল। পঞ্চকোট পাহাড়কে দেখেই লিখলেন—

"কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্য বজ্র প্রহরণে
পর্বতকুলের পাখা। কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আজি মনে
পঞ্চকোট।..."

বাঙলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করলো পঞ্চকোট পাহাড়।

মধুসূদন নিজে ছিলেন বৈভব বিলাসী। তাই পঞ্চকোটের প্রাচীন বৈভবের অস্তমিত দশা দেখে ব্যথাতুর হয়ে লিখলেন

"কোথায় সে রাজলক্ষ্মী যাঁর স্বর্ণ জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি! তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থানে
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার, কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানলে ও হৃদয় জ্বলে।
মণিহারা ফণী বুঝি রয়েছে আঁধারে।"

বস্তুত, বিগতলক্ষ্মী পঞ্চকোটের ভগ্নদশা মধুসূদনকে খুবই বিচলিত করেছিল। তাই, তাঁর

আক্ষেপাক্তি যেন মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের মতো। মধুসূদনই লিখেছিলেন—

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্য শালা সম যে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী। কিন্তু একে একে
সুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি
নীরব রবাব বীণা মুরদ মুরলী
তবে কেন আর আমি বাকিরে এখানে
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে।"

বিচলিত মধুসূদন রাতে স্বপ্ন দেখলেন— লক্ষ্মী বসে আছেন পদ্মাসনে, দুদিকে দুটি হাতি জড়িয়া তুলে ধরেছে তাঁর কনক আসন। মধুসূদন আর একটি কবিতা লিখলেন 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী। পঞ্চকোট পঞ্চকোট ওই গিরিপতি।

স্বপ্নে দেখেছিলেন—

শত শত হেম হর্ম্য দেউল বিপণি
উদ্যান সরসী উৎস, অশ্ব অশ্বালয়ে
গজালয়ে গজবৃন্দ, সন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ, অস্ত্রশালা, চারু নাট্য শালা
মণ্ডিত রতনে, মরি। যথা সুরে সুরে।

মধুসূদন মাত্র আটমাস কাশীপুরে ছিলেন। তারপর, যে কোনো কারণে হোক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন কিন্তু পঞ্চকোট তাঁকে এতই অভিভূত করেছিল যে তাকে ভুলতে পারেননি বলে বিদায় বেলার প্রাক্কালেও লিখেছিলেন— পঞ্চকোট গিরি বিদায় সংগীত।

ভেবেছিনু, গিরিরাজ রমার প্রসাদে
তাঁর দয়া বলে ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়, ধনুর্বাণ ধরি দ্বারগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতুহলে।

পঞ্চকোট এবং পুরুলিয়ার প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে কত গভীর ছিল তার নিদর্শন রক্ষিত আছে এই সব কবিতায়। প্রকৃতপক্ষে, পুরুলিয়া পঞ্চকোটকে তিনি বাঙলাসাহিত্যের মধ্যে অমরত্ব দান করেছেন।

।। ৬ ।।

অনেকদিন পর, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আর একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দিনলিপিতে এবং কোনো কোনো গল্পে মানভূম সহ ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন এবং দিনলিপির সূত্রেই কোনো কোনো গল্পেরও উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। বিভূতিভূষণ যখন মানভূমের বনপাহাড়ি অঞ্চলের সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তৎকালীন কনজারভেটর অব ফরেস্টস শ্রী যোগেন্দ্র নাথ সিনহার সান্নিধ্য

লাভ করছিলেন তখন মানভূম ছিল বিহার রাজ্যের অন্তর্গত, যদিও পুরুলিয়া শহরই ছিল জেলার সদর শহর। মিঃ সিনহা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন অযোধ্যাপাহাড়ের নিকটবর্তী মাঠা-র বনবাংলোতে। তার দিনলিপি বিভূতিভূষণের রচনায় বর্তমান।

বলা বাহুল্য, বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে ধলভূম-সিংভূমের বনপাহাড়ী অঞ্চলের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি যে ভাবে ধরা পড়েছে, মানভূমের বনাঞ্চল সম্পর্কে তাঁর তেমন গভীর অনুভব পরিলক্ষিত হয় না। এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমত্ব মুখ্য, সাধারণ মানুষের চিত্র একেবারেই গৌণ। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা যায় যে, বিভূতিভূষণ ঘাটশিলাতে বাস করলেও এমনকি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও ঘাটশিলা কিংবা ধলভূম ও তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে বাঁধা পড়েনি। নইলে, পথের পাঁচালির মতো আর এক বনপথের পাঁচালি রচিত হত ধলভূম মানভূমের আরণ্যক পরিমণ্ডলে।

প্রকৃতপক্ষে আরণ্যক রচনার পর তিনি ধলভূম সিংভূমের অরণ্যমায়ায় এতই আচ্ছন্ন ছিলেন যে নিরাসক্ত ভাবে উক্ত অঞ্চলকে তাঁর গল্প উপন্যাসের পটভূমি বলেও ভাবতে পারেননি। নইলে দ্বিতীয় আরণ্যকের সৃষ্টি হতো ধলভূম মানভূমের অরণ্যভূমিকে কেন্দ্র করে। ধলভূম সিংভূমকে যদিও বা তাঁর দিনলিপির মধ্যে বিস্তারিত স্থান দিয়েছেন, মানভূম অঞ্চলকে সে পরিমাণ থেকেও বঞ্চিত রেখেছেন। কিছু কিছু শোনা কথাকে অবলম্বন করে মানভূমের ভূমি স্পর্শ করে তিনি মাত্র কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন— তার মধ্যে এটি অবশ্যই কিশোর পাঠ্য অন্যটি দিনলিপির ভিত্তিগ্রাহ্য রচনা। রংকিনীর খড়্গা নামে গল্পটি অবশ্য তাঁর কল্পনাপ্রসূত। রংকিনী সম্পর্কিন নানা কাহিনি তিনি ঘাটশিলাতেই শুনে থাকবেন। রাজার কুলদেবী রংকিনীর মন্দির ঘাটশিলাতেও বর্তমান। মহুলিয়া পাহাড়ের যে গুহাটি রংকিনীর আদি বাসস্থান বলে কথিত, সেখানে নরবলি দানের কিংবদন্তীও বিভূতিভূষণ শুনে থাকবেন। এমনকি রংকিনী সম্পর্কিত "মল্লে রা, শিখরে পা, সাক্ষাৎ দেখবি ধলভূমে যা' প্রবাদবাক্যও তিনি শুনে থাকতে পারেন— যার অর্থ মল্লভূমের দেবী রংকিঁনী শিখরভূম হয়ে অবশেষে ধলভূমে এসে পৌচেছিলেন। কিশোর পাঠকদের জন্য অলৌকিক গল্প রচনার জন্য তিনি রংকিনীর কিংবদন্তীকেই গ্রহণ করেছিলেন— তবে কি কারণে মানভূমের বেড়ো নামক গ্রামটিকে তার পটভূমি রূপে গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না। তাঁর দিনলিপির কোথাও একথা বলা নেই যে কোনো সময় তিনি শিক্ষকতা করার সূত্রে ওই গ্রামে অবস্থান করেছিলেন। তবে, বেড়ো গ্রামের বহুশ্রুত দক্ষিণভারত থেকে আগত আচার্য বা আচারিয়া পরিবারের কথা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন এবং ওই ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁর কৌতূহলের উদ্রেক করে থাকবে। তিনি অবশ্য এ কথা জানতেন বলে মনে হয় না—ওই পরিবারটি কীভাবে মানভূমজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁদের বসতি স্থাপন করে, দক্ষিণভারতের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রেখেও ভাষা ও সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণরূপে মানভৌমিক হয়ে গিয়েছিলেন।

গল্পের খাতিরেই তিনি বেড়ো গ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'চেরো'-তে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই চেরো গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সূত্রে এসে তিনি পাথরের তৈরি পুরোনো একটি বাসা বাড়িতে সাময়িক ভাবে অবস্থান করেছিলেন। স্কুলের সেক্রেটারী রঘুনাথন তাঁর বসবাসের জন্য ঐ বাড়িটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে লিখেছেন— "পুরোনো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকের একটা সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্তগড়, যেন খিলজিজের আমলের দুর্গ কি জেলখানা— হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ীর একটু চুনবালি খসাইতে পারিবে না।"

চন্দ্রপাণ্ডার কাছে তিনি ওই বাড়ির পুরোনো কাহিনি শুনেছিলেন। ওই বাড়িরই এক চোরাকুঠরীর ভিতর থেকে তিনি একদিন রক্তের ধারা গড়িয়ে আসতে দেখেছিলেন— ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেছিলেন একটা রাম দা যার ধারালো ফলায় টাটকা রক্ত। "এক আধটু রক্ত নয়। ফলাতে আগাগোনা রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়া খানা হইতে এখনি টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে।"

এই হচ্ছে রংকিনীর খড়্গ 'গল্পের মূল কথা। প্রকৃতপক্ষে গল্পটি যে সম্পূর্ণরূপে কিংবদন্তীমূলক কাল্পনিক সৃষ্টি তা অনায়াসে বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে ধলভূম মানভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকার ফলে তিনি যেমন সে দেশের মানুষ জনের দিকে আত্মিক দৃষ্টিপাত করতে পারেননি, তেমনি স্বল্পপরিচিত মানভূমও ছিল তাঁর সাহিত্যকৃতির দূরান্তে।

বিভূতিভূষণের চাউল' নামে গল্পটি অবশ্য মানভূমের পটভূমিতে রচিত। সূত্রপাতেই লিখেছেন— "মানভূমের টাঁড়ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড় পাহাড় শ্রেণী অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুল বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, নাকটি টাঁড়ের উঁচু ডাঙা জমি থেকে যতদূর দেখা যায় শুধু রক্ত পলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েছে।" বিভূতিভূষণের এই গল্পের উপাদান ও তাঁর দিনলিপির মধ্যে বর্তমান। বস্তুত এ ক্ষেত্রে ১৩৫০-এর মন্বন্তরই তাঁর গল্পের পটভূমি সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত মাঠার-র ডাক বাংলোতে থাকার সময় 'চাউল' গল্পটি প্লট ভেবে থাকতে পারেন। গল্পটি লেখার সময়ও তিনি তাঁর দিনলিপির কথা মনে রেখেই লিখেছিলেন—

"জঙ্গল দেখতে এসেছি এ দিকে, কাজেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তের ডাকবাংলোতে থাকি", জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তাই দেখে বেড়াই।" এই লাইনটি গল্পের কাঠামো তৈরি করার জন্যই, নইলে মানভূমের বনাঞ্চলে তিনি কাঠে কত আয় হবে, তা জানার দায় তাঁর ছিল না। এরপরই গল্পের আগমন ; 'একদিন সন্ধ্যের আগে নাকটি ষাঁড়ের বন দেখে ফিরছি, পথের ধারে একটি হরিতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোট মেয়ে বসে পুঁটুলি খুলে কি খাচ্ছে।" সামনে বাঘমুড়ীর বনময় পথ এমন সময়ে লোকটা কি করছে জানবার আগ্রহে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু পাকা কিছু কাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খান দুই ছেঁড়া নেকড়া, একখানা কাঁথা আর কিছু মকাই— সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুলের টিন। সঙ্গের মেয়েটির বয়স চার কি পাঁচ। পরনে ছোট একটু নেকড়া মেয়েটার, কোমরে ঘুনসী।"

লোকটিকে প্রশ্ন করলেন— "কোথায় যাবে হে, বাড়ী কোথায় তোমার?

লোকটি বললো— তোড়াং। আসছে সেই পুরুলিয়া থিকে। বলেছিল— শোরিল এক্কেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার মা মরে গেল ওর দু বছর বয়সে, ওকে রেখে জঙ্গলে কাটের নাম করতে যাইতে পারি নাই— তাই পুরুলিয়া গেইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দু বছর রইয়ে ছিলি।

বিভূতিভূষণ আরও শুনেছিলেন, মেয়েটির নাম থুপী ; আর পুরুলিয়া অনেক বড় জায়গা। ওঃ বাবু, ইধার থেকে ওধার যাওয়ার কুল কিনারা দু বছরে-ও নাই পাইলেক। ভারি শহর বাবু।"

বিভূতিভূষণ যখন এই গল্প লিখছেন, তখন সারা বাংলায় মন্বন্তর শুরু, যদিও একমাস আগে তিনি দেখেছেন চালের মন ছিল ষোলো টাকা- আঠারো টাকা, ক্রমে তাই দাঁড়ালো বত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা। দিনলিপিতে সেই সময় লিখেছেন— "বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই, বহড়াগোড়া ইস্কুলের বোর্ডিং-এর ড্রেন দিয়ে যে ভাতের ফেন গড়িয়ে পড়ে তাই ধরে খাবার জন্যে একপাল

বুভুক্ষু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতে দুবেলা বসে থাকে— তারই জন্য কি কাড়াকাড়ি।" এই অংশটিও তিনি গল্পের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

বাস্তবের থুপী মেয়েটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাই এই মেয়েটিকে তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন, নিয়েও এসেছিলেন এক করুণরসের গল্প সৃষ্টিকরে। লিখেও ছিলেন "সুতরাং খুকীর বাপের ইতিহাস আমি জানি না, অনুমান করে নিলাম।' গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ী ভেঙে চুরে গিয়েছে। চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থ্যের বাইরে জিনিস তা কেনা। মকাই ও বিরি কলাই, বুনো কচু ও ভুঁইসুমতোর মূল খেয়ে কতদিন চলবার চললো। এরপর বিভূতিভূষণের সৃষ্ট থুপী ও থুপীর বাবা এসে পৌছুলো এক পাথর খাদানে যেখানে ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানো হয়। সেখানে সে কুলির কাজ পেয়েছিল কিন্তু একদিন বারুদের ব্লাস্টিং এর জন্য পাথর ছুটে গিয়ে থুপীর বাবার মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন— ভিড় একটু সরিয়ে দেখি একটা পাঁচ ছ বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরে বসে — কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না— নির্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

বিভূতিভূষণ এইখানেই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি আরও একটু এগিয়ে দেন শুধু এই কথাটুকু বলার জন্য যে খুশীর বাবাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। পুনরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অত সাধের অনাথা থুপীকে কার কাছে রেখে চললো সে হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।

বস্তুত 'চাউল' নামে গল্পটি একটি অসাধারণ গল্প হয়েই বেঁচে থাকতে পারতো, যদি বিভূতিভূষণ তাঁর এই প্লটকে একটু যত্ন নিয়ে গল্পের বইতে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতেন।

এও সম্ভব হয়নি, সেই একই কারণে, যে কারণে ধলভূম সিংভূমের প্রকৃতি প্রীতির মধ্যেই তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন, এক্ষেত্রেও তাঁর গল্পে মানভূম বা পুরুলিয়ার ছাপ তেমন আন্তরিক ভাবে স্পষ্ট হতে পারলো না। বস্তুত তার কোন গল্প উপন্যাসকে তিনি এক্ষেত্রেও তাঁর সন্ধানের বিষয়বস্তু করে তুলতে পারেননি।

তবু, প্রকৃতিকে ভালোবাসার সূত্রে তিনি ধলভূমের সঙ্গে মানভূমকেও সংযুক্ত করেছেন তার সাহিত্যে। তাঁর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ছোটনাগপুরের অরণ্য প্রকৃতি।— এবং সবই তাঁর দিনলিপির অন্তর্গত।

বিভূতিভূষণ লক্ষ করেছিলেন, শৈলসানুতে গোলগোলি ফুল, ধাতুয়া, রক্তপলাশ আর লতাপলাশ ; লক্ষ্য করেছিলেন মাঠাবুরু পাহাড়ের অনাবৃত কালো শিখরদেশ দুটি। কালো পাথরের গম্বুজ যেন দৈত্যের রাজপুরীর মতো।" সেখানেই এক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের সঙ্গেও বিভূতিভূষণের আলাপ হয়েছিল — দেখতে সাঁওতালের মতো। ওঁর কাছে অনেক গল্প শুনেছিলেন, মাঠা বুরুর শিখরে মাঠা দেবীর কাছে নরবলি দেওয়ার কাহিনি। বাঁড়ুয্যের কাছেই তিনি শুনেছিলেন গ্রামের লোক পাহাড় থেকে, কেঁদ পিয়াল, বেল বৈঁচি, মাকড়াকেঁদ, জংলি আম, আলু নিয়ে যায়। মাঠাবুরুর অদূরে সাঁখা নদীর ছোট ছোট শাখা বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে — এও তাঁর নজরে পড়েছিল। লিখেছেন— "কোথাও ছায়া তরুতলায় কৃষ্ণবর্ণ শিলাসন। কোথাও পুষ্পিত তরু, লোহাজাঙ্গি ও পেটারি, আর দেখেছিলেন সুমিষ্ট ভুড়রু ফলের কথা। লিখেছেন— মানভূমের তিনটি শৈলারণ্যের নাম, ডালমা, বাঘমুণ্ডী ও টুণ্ডি হিল্‌সের কথা। কয়েকটি গ্রামের নামও পাই — যথা কুদল,

বোন্দামারি, দক্ষিণবহাল, তোড়াং, চন্দন কিয়ারি, সোনাভুড়ি, সোনাইজুড়ি চন্দ্রকলা, ইঁদুর টাঁড়, মহুলবনা বাড়েদা, টেঙ্গাডি, তেলুংগা, দুবরাজপুর ও পলাশকলা।

বস্তুত বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে কেবল প্রাকৃতিক শোভাই বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চের দিনলিপিতে লিখছেন— "বহুদূরে ছোট্ট একটা পাহাড় তাও নাকি বাঁকুড়ায়। বিকেলে এমনি একটা টাঁড়ে কালো পাথরের টিলায় বসলুম। চা খেলুম মিঃ সিনহা, অমিয়বাবু সাবডেপুটি ও আমি। Space-এর মহাসমুদ্রে ডুবে আছি যেন। ক্ষীণ জ্যোৎস্না উঠলো — সেই Mesa of Artzona সেই বিরাট space আমাকে ঘিরে রয়েছে। ফিরবার পথে দূরে বাগমুণ্ডী আড়শা পাহাড়ে আগুনের মালা দেখতে দেখতে ও জ্যোৎস্নাস্নাত মানভূমি, টাঁড়, দেখতে দেখতে কাঁসাই নদীর সেতু পার হলুম।"

তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, তাঁর পক্ষে মানুষ জনের দিকে আন্তরিক দৃষ্টিপাত করে কোনো গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়ে ওঠে না। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছিল। পথের পাঁচালি উপন্যাসের প্রাচীন সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি জন্মেছিলেন, প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সেই সব গ্রামের মানুষজনকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবেই চিনতেন। তাই গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে গ্রাম প্রকৃতি তার বাধার হয়ে দাঁড়ালো। আর, আরণ্যক উপন্যাসের লোকজনের দিকে তাঁর দৃষ্টি যেন প্রথম বিস্ময়ের দৃষ্টি— কিছুটা বা রোম্যাণ্টিক। তাই আরণ্যক মুখ্যত উপন্যাস কিংবা কোন শ্রেণীর রচনা, তা ভাবনার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

।। ৭ ।।

ছোটনাগপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে তার জনজীবন যাঁকে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাঁর নাম সুবোধ ঘোষ। উক্ত ভূমিখণ্ডের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ'তা ছিলই. তাঁর সমাজ সচেতন দৃষ্টিও ছিল স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, সুবোধ ঘোষ 'মাঝে মাঝে ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে' যাননি বলে তাঁর গল্পের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই, কেবলমাত্র পটভূমিই তাঁকে গ্রাস করেনি। তাঁর অযান্ত্রিক, গরল অমিয় ভেল, ভাট তিলক রায়, উচলে চড়িনু, মা হিংসী, চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ, নির্বন্ধ, তমসাবৃতা, রিতা, গ্রামামুনা প্রভৃতি অসাধারণ গল্প ছোটনাগপুরের — মুখ্যত হাজারিবাগ ধানবাদ অঞ্চলের জনজীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত, যত মহাযুদ্ধের প্রাক্ কালে বাঙলা ছোট গল্পে সমাজ সচেতন বাস্তবতার যে উদ্ভব ঘটেছিল তার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন সুবোধ ঘোষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশব্যাপী অন্নবস্ত্রের অভাব জনজীবনকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। তমসাবৃতা গল্পে ধূলাগড়া গ্রামের বাউরি চাষি ও তাঁতিদের জীবনেও সেই অন্ধকার নেমে এসেছিল। মানুষজনের পরনে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র। প্রায় উলঙ্গ পুরুষরা তবু মাঠে ঘাটে কাজে বেরোয়। দিনের বেলায় মেয়েরা আবদ্ধ থাকে ঘরের মধ্যেই। ক্ষেতের কাজের জন্য মেয়েরা বেরোয় রাতে, কারণ রাত্রির অন্ধকারই কেবলমাত্র ওদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন —রাত্রির অন্ধকারের আড়াল হতে রোপাই সেরে ফিরছিল বাউরী মেয়েরা। আজ রাত্রির মত কাজ শেষ। আর সময় নেই। ওরা আসছিল— বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল। টুকরো টুকরো কাঁথা, মধ্যদিনের যত রুচি পরমাদ, আজ রাত্রের মতো পরম অবহেলায় ওরা ঘরেই ফেলে রেখে এসেছে। ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালো সুতোর জালে তৈরী এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ।"

সুবোধ ঘোষ লক্ষ করেছিলেন, কেমন করে মধ্যবিত্ত মানুষ লোকের পায়ে আত্মসমর্পণ করে। নির্বন্ধ গল্পের বিভূতি দারোগার চরিত্রের অবক্ষয় তারই একটি নিদর্শন। একটি টিলার মতো উঁচু জায়গায় চিত্রকূট থানা, অনেক নীচে দামোদর নদী, দুপাশে গেরুয়া পলিমাটি ছড়িয়ে দামোদরের পাথুরে শিরদাঁড়া এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে পাহাড়ের ভিড়ে। বিভূতি দারোগা চেয়েছিল আততায়ীকে দমন-করাতে, অপরাধীকে শাস্তি দিতে। এ কাজে সহায়তা দিল কড়ে খাঁ-রোহিলা পাঠান। সেই বিভূতি দারোগাও খুনের অপরাধে অপরাধী অর্থশালী ও পরাক্রমশালী টিকায়েৎ ধনঞ্জয় গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করার পরে প্রভূত অর্থ লোভে ছেড়ে দিয়েছিল। বিভূতি দারোগা বুঝেছিল যে, সে না ছাড়লেও ধনঞ্জয় গোঁসাই ছাড়া পেয়ে যাবেই। সুবোধ ঘোষ এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ততার ট্রাজেডিকে তুলে ধরেছেন।

সুবোধ ঘোষের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনাই তাঁকে জনজীবনের দিকে আকৃষ্ট করেছে। বৃটিশ বিরোধী জনসংগ্রাম ও তাঁর গল্পে চিহ্নিত। জনজাতি সমাজের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। রিতা নামক গল্পে এক জংলা আদিবাসী মেয়ে রিতার মধ্যে নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট। আট বছর বয়সে বিয়ে হওয়া স্বামী মুনা মাঝি আসবে ফিজি থেকে, তার জন্য অনেকদিন ধরেই সে অপেক্ষা করছিল। মুসা মাঝি একদিন ফিরে এসেছিল, কিন্তু সাঁওতালের জংলী বেশে নয়, পুরো সাহেবী পোষাকে। রিতা ওকে চিনতে পারেনি। যখন পরিচয় পেলো তখন এক বিজাতীয়কে স্পর্শ করার আশঙ্কায় ঘরের মধ্যে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো সে। এ তো তার স্বপ্নের মুনা নয়, এ যে সাহেব! তার চোখের জলের মধ্যে — একটি ছবি ভেসে উঠেছিল, সে ছবি তারই প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের — যে সড়কের ধারে বসে প্রচণ্ড রোদে পিঠ পুড়িয়ে পাথর ভাঙছে।

চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ গল্পের পরিসমাপ্তিও তাই। শিরিল টিগ্গা, ইমানুয়েল খালগো, জন বেসরা, রিচার্ড টুডু, স্টিফান হোরোকের সঙ্গে বাঙালি বিহারি অনেক দেখে মিশন স্কুলের ছাত্র বাঙালি ছেলেরা ওদের বলতো কোল বা কোলা ব্যাঙ। স্টিফান হোরো এই সব কিছু ছেলেদের আবছা, উন্নাসিকতা সবই বুঝতো। অন্যদিকে হোরোকেও ঈর্ষার চোখে দেখতো শিশু ছেলেরা। কারণ, হোরো ইংরাজী কবিতার আবৃত্তিতে প্রথম, খেলাধূলায় অদ্বিতীয়, এমনকি জেদের বশে ইংরাজী ছেড়ে সংস্কৃত পড়েও সবচেয়ে বেশি নম্বর পেল সেই হোরো-ই। আবার সেই খ্রিস্টান মুণ্ডা ছেলেকে এক সময় দেখা গেল, লেখাপড়া ছেড়ে বনবাদাড় ঘুরে কাঠ বিড়ালী শিকার করতে। শোনা গেল কোরুলি পাহাড়ের কাছে মুর্মুদের মেয়ে চিরকির প্রেমে পড়েছে সে। অবশেষে মুনডা জাতিকে নিপীড়ন আর অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সে বিরসাইট হয়ে যায়, বিরসাকে সে যদিও দেখে নি। তার জন্মের চল্লিশ বছর আগে বিরসার মৃত্যু হয়েছিল।

এই ভাবে সুবোধ ঘোষ ছোটনাগপুরের বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতা এবং তরুণ আদিবাসীদের বেদনা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহকে বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপিত করে একটি প্রবল জিজ্ঞাসার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমি অবশ্যই তৎকালীন মানভূম সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, তবু মানভূমের পটভূমিতে তাঁর রচনার সংখ্যা স্বল্পই। কেবলমাত্র শতকিয়া উপন্যাসে মানভূমের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়।

॥ ৮ ॥

এবার মানভূম ছেড়ে সরাসরি তার পরিবর্তিত নাম পুরুলিয়াতে আমাদের প্রবেশ। ভাষা আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মানভূমের খণ্ডিত একটি অংশ পুরুলিয়া নামেই পশ্চিমবঙ্গে

র অন্যতম জেলা রূপে পরিগণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হওয়ার পূর্বে সাধারণ বাঙালি জনমানসে পুরুলিয়ার তেমন প্রতিষ্ঠাও ছিল না, পরিচিতি ও ছিল না। এ বিষয়ে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর পত্রিকার পরপর দুটি রবিবারের সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধলভূম মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি' উক্ত বিস্তীর্ণ বঙ্গ ভাষা অঞ্চলের পরিচিতি প্রসারিত করে, উক্ত প্রবন্ধেই এই দুটি অঞ্চলের-ই পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির পক্ষে যুক্তিপূর্ণ অভিমত ছিল। ততদিনে পুরুলিয়ার লোকসেবকসংঘের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে গেছে। পরিশেষে এই আন্দোলনের ফলেই পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তি ঘটে যায় এবং মানভূমের যে অংশটি বিহার রাজ্যে থেকে যায় সেখানেও মানভূম নামের বিলুপ্তি ঘটানো হয় — এবং পশ্চিমবঙ্গে আগত খণ্ডিত অংশের নাম রাখা হয় পুরুলিয়া। এ ভাবে মানভূম নামটিকে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত করার কারণ, কি জানি না ; কি কারণে উভয় রাজ্যের ক্ষেত্রে উক্ত দীর্ঘদিনের প্রচলিত নাম ভীতিজনক হয়ে উঠেছিল, তাও অজ্ঞাত। ভারতভাগের সময় দিনাজপুর জেলার যে অংশটি পাকিস্তানের মধ্যে থেকে গেল, তার নাম পূর্ব দিনাজপুর রূপেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত অংশটির নাম হলো পশ্চিমদিনাজপুর। বর্তমান সময়ে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা এই দুটি জেলার নামকরণের ক্ষেত্রেও বহাল রাখা হয়েছে যথাক্রমে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর, আর ২৪ পরগণার ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা। এছাড়া, পশ্চিম দিনাজপুরকে আবার দুটি জেলায় পরিণত করার সময় উত্তর ও দক্ষিণ দু ভাগে ভাগ করা হলেও দিনাজপুর নামের বিলুপ্তি ঘটানো হয়নি। অতএব বিহার রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে — উভয় ক্ষেত্রে মানভূমকে ধানবাদ এবং পুরুলিয়া নামে অভিহিত না করে উত্তর ও দক্ষিণাংশের বিভাজনে অনায়াসে উত্তর মানভূম ও দক্ষিণ মানভূম রাখাই সংগত ছিল।

সুখের বিষয় মানভূম নামের সঙ্গে সঙ্গে গানভূমও বিলুপ্ত হয়নি।

এরপর মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। যদি ও স্বাভাবিক কারণেই 'পুরুলিয়া' নামটিই সামনে এসে দাঁড়ায়।

অপ্রাসঙ্গিক মনে না করলে, এ কথা বলতেই হয়,— পুরুলিয়াকে কেন্দ্র বিন্দু করে— পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বিহারভুক্ত (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত) বাংলাভাষী অঞ্চলকে সীমান্ত বাঙ্লা নামে অভিহিত করে, সুধীর করণ তাঁর গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় উক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পর্কে আলোকপাত করার কাজে নিজেকে প্রায় নিবিষ্ট করেই রেখেছিলেন। যার পরিণামে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্লার লোকযান্-এর জন্ম। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—এই গবেষণাকে স্বীকৃতি দিয়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বস্তুত, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত অন্য কোনো গ্রন্থই এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেনি। এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে পুরুলিয়া ও সীমান্ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলকে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের মধ্যে আলোকিত করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পুরুলিয়া জে. কে. কলেজে যোগদান এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান তাঁকে গভীরভাবে পুরুলিয়াকে দেখার ও জানার যে সুযোগ দিয়েছিল—তার ফলেই তাঁর অসংখ্য গল্প এবং প্রবন্ধ, দেশ, আনন্দবাজার, পরিচয়, নতুন সাহিত্য, অমৃত, প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং তাঁর সমস্ত রচনাই মূলত পুরলিয়াকেন্দ্রিক এবং সীমান্ত বাংলার সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ।

পুরুলিয়াতে বাস কালেই তাঁর গল্প সংকলন রুকমিনি বিবি, অরণ্য পুরুষ প্রকাশিত হয়। এছাড়া ও অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ— যেগুলি পুরুলিয়া বাসকালেই লিখিত,—লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ,

লোকসাহিত্যে ঈশপ এবং সীমান্ত বাঙ্‌লার নামে গবেষণা গ্রন্থটিও পুরুলিয়াতেই লিখিত হয়ে ছিল যদিও প্রকাশ ঘটেছে—পুরুলিয়া থেকে কর্মসূত্রে অন্যত্র বালুরঘাটে বসবাসের সময়—। কিন্তু গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অংশে পুরুলিয়ার নামই উল্লেখিত।

পরবর্তীসময়ে প্রকাশিত গল্পসংকলন বনঝুরি পায়রা বাসা, বনপাহাড় ডাহিডুরির গল্প এবং ঝাড়খণ্ডের গল্প মুখ্যত পুরুলিয়া কেন্দ্রিক এবং সমগ্র সীমান্তবাঙ্‌লায় বিস্তৃত।

কেবলমাত্র পুরুলিয়ার ইতিহাস এবং সমসাময়িক জনজীবন বিধৃত যে সব গল্প পুরুলিয়াতে লেখা হয়েছিল তাদের মধ্যে গঙ্গানারায়ণী সেনা অবসাদ, ভাটাই জোড়ের বন্যা, শ্মশান বন্ধু, নাটিকা, কাপুরুষ এবং আর এক মত্যু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ গল্পই রুকমিনি বিবি এবং ধনঝুরি পাহাড়ের পায়রাবাসার মধ্যে সংকলিত। শ্মশান বন্ধু গল্পের শিষ্টভাগ চরিত্র এবং আর এক মৃত্যুর আমজাদ আলি পুরুলিয়া শহর থেকেই প্রাপ্ত। অবসাদ গল্পের নাচনীর সঙ্গে ঝালদা মেলার নাম যুক্ত। বস্তুত, এ ছাড়াও পুরুলিয়া সংলগ্ন নানা অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গল্প খবরন্সিণ্টের দেশ ভূদান, শপথ প্রভৃতি গল্পগুলি সীমান্তবাংলার পটভূমিতেই রচিত।

বলাবাহুল্য বাঙ্‌লাসাহিত্য পুরুলিয়া প্রসঙ্গকে যদি ইতিহাসের দলিল রূপে গ্রহণ করা যায়, তা হলে যতদূর সম্ভব তাকে প্রাসঙ্গিক করাই বাঞ্চনীয়, তাই নিঃসন্দেহে সুধীর করণই ঝাড়খণ্ড সীমান্ত বাংলা ও মানভূম পুরুলিয়া পরিমণ্ডল সম্পর্কে তাঁর লেখনীকে প্রায় পঞ্চাশবছর ধরে অব্যাহত রেখেছেন। পুরুলিয়া পরিমণ্ডলকে আলোকিত করার জন্য পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার লোকযান গ্রন্থে যার সূত্রপাত, তারই পরিণতি লক্ষ করা যায়— এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ইদানীং প্রকাশিত তাঁর শব্দকোষ প্রণয়ণের মধ্যে যার নাম সীমান্ত রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙ্‌লার গ্রামীণ শব্দকোষ।

সুধীরকরণ সমপর্কে ১৪০৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় সপ্তাহ পত্রিকায় তরুণ সান্যালের বক্তব্যটি এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

২ গঙ্গানারায়ণী সেনা অরণ্য পুরুষ নাম গ্রন্থের অন্যতম ঐতিহাসিক কাহিনি যার পটভূমি

'বাঙলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ড' প্রবন্ধের সংযোজন অংশে তিনি লিখেছেন— "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখকরূপে খ্যাতির উচ্চ চূড়ায়, সুবোধ ঘোষ যখন বিভূতিভূষণের সমকালের আর এক খ্যাতিমান লেখক, সেই সময় এক তরুণ লেখক বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে প্রবেশপথের সন্ধান করছিলেন, তাঁরই নাম সুধীর করণ। বিভূতিভূষণ যখন ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় তাঁর বাসস্থানে দেহত্যাগ করেন, তখন সুধীর করণ, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর দু বছর পরেই ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিম বাংলা সীমান্তের পটভূমিতে লেখা তাঁর প্রথম গল্প 'গভরমিণ্টের দেশ' পরিচয় পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হল। তারপর ওই পত্রিকাতেই তাঁর লেখা ভূটান, শপথ এবং আরো কিছু গল্প প্রকাশিত হয়। সব গল্পেরই পটভূমি ঝাড়খণ্ড। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র ঝাড়খণ্ডের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ। সম্ভবত ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর গল্প 'মুরগীলড়াই' প্রকাশিত হবার পর তিনি বাংলাসাহিত্য জগতের আলোকবৃত্তে চলে আসেন। দেশ পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল। দেশ পত্রিকা ছাড়াও তাঁর লেখা গল্প, নতুন সাহিত্য, সাহিত্যপত্র, কথাশিল্প, অমৃত অগ্রনী এবং আরো অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং গল্পকার রূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটে, যদিও কবিতা এবং

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিচরণ ছিল। তাঁর বহু প্রবন্ধও ঝাড়খণ্ডের জনজীবন ও সংস্কৃতিবিষয়ক। বস্তুত, তৎকালীন ছোটনাগপুরের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় সূত্রে তিনি আদিবাসী জনজীবন সম্পর্কেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ রুকমিনি বিবি, ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথম সংঘাতের ঐতিহাসিক কাহিনি অরণ্যপুরুষ এবং সীমান্ত বাংলার লোকযান, লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্যে প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরে ধনঝুরি পাহাড়ের পায়রাবাসা নামে তাঁর দ্বিতীয় গল্পসংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়—যার সব গল্পই ঝাড়খণ্ডের পটভূমিতে লেখা। পরবর্তীসময়ে দুটি গল্প সংকলন গ্রন্থ একত্রে বনপাহাড় ডাহিডুরির গল্প নামে প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিরসা মুণ্ডার বিদ্রোহের শতবর্ষ স্মরণে তাঁর উপন্যাস উলগুলান প্রকাশিত হল বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। মুণ্ডা জনজাতির ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমির রূপায়ণ ছাড়া উপন্যাসটি যথাযথরূপে একটি বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এ ছাড়াও শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর অনেক গল্পই 'পাহাড়ী বাবার দাঁতাল হাতি' নামক কিশোরপাঠ্য গ্রন্থে সংকলিত। পরিশেষে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার গ্রামীণ শব্দকোষ প্রণয়ন। ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য একটি অপরিহার্য অভিধান। ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে এই উক্তিও করা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ড সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গল্প সুধীর করনই লিখেছেন এবং ঝাড়খণ্ডী জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির জীবনধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন।"[৪]

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পর সম্ভবত পুরুলিয়া জেলার অধিবাসী চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্তই জেলাকেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসের নাম 'শবরীর তিয়াস'। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পুরুলিয়াকেন্দ্রিক তাঁর গল্প ও প্রকাশিত। শ্রী সেনগুপ্ত আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ। তাঁর সমাজ সচেতন দৃষ্টি সম্পর্কে প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ শ্রী বিনয় ঘোষ 'শবরীর তিয়াস' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

"কাহিনীমুখ্য হলেও তাঁর দৃষ্টি স্থানীয় জনসংস্কৃতির প্রতি নিবন্ধ।

স্থানীয় উৎসব, পার্বন, যেমন গাজন, মনসাপূজা, করম ইত্যাদি এবং আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন— নাচনীনাচ, ঝুমুরগান, ছৌ-নাচ প্রভৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনার ভিতর দিয়ে তাঁর কাহিনী পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন কাহিনীকে আজও বেশি জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করেছে। ....মানভূম পুরুলিয়ার জনসংস্কৃতির বিশেষ করে ভূমিসংস্কৃতির এ রকম তত্ত্বকথা বর্জিত সহজ সরল অথচ নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমার চোখে পড়েনি।"

বস্তুত, 'শবরীর তিয়াস' উপন্যাসের মধ্যে পুরুলিয়ার গ্রামীন সমাজের চিত্ত যে ভাবে পরিস্ফুট তাতে বোঝা যায় লেখক নিজে পুরুলিয়ার মাটির সঙ্গে নিবিড় ভাবেই সংশ্লিষ্ট।

পরবর্তীকালে দেশপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস 'রসিক' ও পুরুলিয়ার পটভূমিতে নাচনীদের জীবনধারার উপর ভিত্তি করে লিখিত। লেখক-শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটির

প্রাক্তন মানভূমের বরাহভূম। অরণ্যপুরুষের অন্য সব ঐতিহাসিক কাহিনি মূলত সাঁওতাল-ভূমিজ-মুণ্ডা-হো প্রভৃতি জনজাতিরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের কাহিনি।

মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কল্পনার দিকটিই বিশেষভাবে স্পষ্ট। তবু, যতদূর সম্ভব, তাঁর লেখনীতে নাচনীদের জীবনধারাকে তিনি চিত্রিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে সুবোধ বসু রায়ের ভ্রমণকথা 'বলে যদি যেতেই হয়'—গ্রন্থটিও পুরুলিয়া জেলার বনপাহাড়ের নানা অভিজ্ঞানে চিহ্নিত গ্রন্থটির সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। এই প্রকাশনার মধ্যেও গল্প উপন্যাসের নানা চরিত্র উপস্থাপিত।

বাংলা কবিতার মাধ্যমে যাঁরা পুরুলিয়াকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছেন—তাঁদের মধ্যে শ্রী মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ও ড. শান্তিসিংহ-র নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। মোহিনীমোহন পুরুলিয়াকে আলোকবৃত্তের আনার জন্য আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন। তার ফলে, পুরুলিয়া গ্রামজীবন এবং গ্রামের খেটে খাওয়া মানুকেই তিনি উজ্জ্বল করে তুলতে পেরেছেন। তাঁর 'মাড় ভাতের লড়াই' ও অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ বাঙ্লা সাহিত্য জগতে অপরিচিত নয়।

পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে বসে মোহিনী মোহনের কাব্যরচনা এখন ও অব্যাহত।

ড. শান্তি সিংহ কবি এবং লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত' তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের মধ্যে লালমাটি নীল অরণ্য, নিরন্তর আলোকিত আশা, ম্রিয়মান দিন: প্রিয় বর্ণমালা, মানুষ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর কাব্যপ্রতিকার স্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। এইসব কাব্য গ্রন্থে স্বাভাবিক ভাবেই পুরুলিয়া এবং সীমান্তবাংলার প্রকৃতি ও মানুষজন বিশেষভাবেই চিহ্নিত। পুরুলিয়ার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার শব্দগুলি কখনও সাজিয়ে দিয়েছে— তার ভূ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যখন দেখি 'পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় সন্ধ্যা'য় লাল কাঁকুরে, মাটির ছোঁয়া, দুপাশে পুটুশের , হলদে-সাদা-লাল গুচ্ছ গুচ্ছ ছোট ফুল মহার্ঘ শিল্প সৌন্দর্যে বন আলো করে আছে। যখন তাঁরই কবিতায় দেখি নিঃসঙ্গ টিট্টিকের কাতরতা, ফিঙের ধূর্ত ওড়াওড়ি আর ধান বা ভুট্টার যোজনব্যাপ্ত মাঠের আলপথে সিরুয়াল মগমলি ঘাস মাড়িয়ে বর্ষার লাবণ্যঘাস দেহাতী যুবতীর ঝুমুর কিংবা টুসুগানের মোহময়ী সুর—তারই মাঝে সোনালী কমলা রঙের সন্ধ্যা আমাদের বেগনী রঙ্ মাখিয়ে দ্রুত অতি দ্রুত তরল অন্ধকারে গ্রাস করে নিল।" তারপর দারুণ দিনে দেখেছেন—অযোধ্যা পাহাড়ে নেই এক ফোঁটা যেন এই মেঘ দহনে/শাপেনাস্ত; গমিতমহিনা নিরবধি কাল। " পুরুলিয়াতে বসেই তাঁকে দেখতে হয়েছে—"জ্বলে যায় পুরুলিয়া হাওয়ায় ভাসে ছেঁড়া মেঘ/বাদামী বিষাদ নিয়ে আশা বা ভাবনা পুরুলিয়াতে প্রকাশিত মধুপর্ণীর প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদকের স্থানান্তর গমনের ফলে যে পত্রিকাটি বালুরঘাট (তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর) শহর থেকে প্রকাশিত হয় এবং যার প্রকাশ এখনও অব্যাহত সম্পাদক—অজিতেশ ভট্টাচার্য। অনেকের ধারণা মধুপর্ণী বালুরঘাট থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আসলে মধুপর্ণীর জন্মস্থান পুরুলিয়া এবং এই পত্রিকাটিই পুরুলিয়ায় বাংলাসাহিত্যের সূচনা কালের প্রথম পত্রিকা।

৪. দ্রষ্টব্য : শারদীয় সপ্তাহ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

শিরোনামটি অনেকের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে, তাই বিশ্লেষণসূত্রে জানাই যে, যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, অর্ধ-প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়-প্রতিষ্ঠিত কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক পুরুলিয়া তথা মানভূমকে তাঁদের রচনায় মুখ্যস্থান দিয়েছেন, কেবলমাত্র তাঁদের সম্পর্কেই, এই আলোচনা। পুরুলিয়াকে অবলম্বন করে যাঁরা বাঙলা সাহিত্যের চর্চা করে চলেছেন তাঁদের সম্পর্কে কোনো আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হয়নি।

পুরুলিয়া জেলার সাহিত্য চর্চা ঃ অতীত ও বর্তমান

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

রক্তাক্ত মানভূম : সংগ্রাম ও সাহিত্য

স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্তাক্ত মানভূম। জঙ্গল মহল জুড়ে লেলিহান আগুন বিপ্লবের শিখা। 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি' কাড়াকাড়ি— চতুর্দিকে আত্মাহুতির দিন। রাজা গঙ্গ নারায়ণকে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার অপরাধে প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে শাসক ইংরেজ। তার বিশ্বস্ত সহচর সেনাপতি জিলপা লায়াকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারী নির্ভিক সৈনিকদের।

ব্রিটিশের হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত হয়েছেন বীর গোবিন্দ চুনারাম মাহাত, সত্য মাহাত সহ আরও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী। পুরুলিয়াকে আয়ত্তে আনার জন্যে ছড়রায় এরোড্রাম করে হাজার হাজার গোরা পল্টনের সমাবেশ ঘটিয়েছে। সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্যে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেও বার বার ব্যর্থ হয় ব্রিটিশ সরকার। দমন-পীড়ন-অত্যাচারকে পরোয়া না করে অগ্নিহোত্রী বিপ্লবীর দল পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে প্রান্তরে নদী উপত্যকায় ঘাঁটি গড়ে মুখোমুখি লড়াই করেছে। খেড়িয়া শবর, তুর্কী তীরন্দাজ সাঁওতাল বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত। প্রত্যেকের হাতে হাতে কাঁড়-বাঁশ টাঙি। কোথাও কোথাও গোপন আস্তানায় মালমশলা জোগাড় করে তৈরি করতে থাকে শক্তিশালী বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র।

কাশীপুর পঞ্চকোট সাঁতুড়ি মানবাজার বরাবাজার বলরামপুর ঝালদা বাঘমুণ্ডি সর্বত্রই সশস্ত্র বিপ্লবীদের আনাগোনায় থমথমে অবস্থা। প্রমাদ গুনতে থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ বিদেশি শাসক।

যে মানভূমের টুসু ভাদু ঝুমুর গানে পুরুলিয়া মাতাল, ছৌ নৃত্যের ধামসা মাদলের বোলে মুখরিত সেই পুরুলিয়ার বুকে শুরু হয়ে গেছে সংগ্রামের মহড়া—মহাবিদ্রোহ। কোথাও থানা দখল হচ্ছে— উপড়ে ফেলা হচ্ছে টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের খুঁটি— রেললাইন। বোমা মেরে সেতু উড়িয়ে—মদভাটি পুড়িয়ে ট্রেজারি লুট করে শান্ত্রী সেপাই বিশ্বাসঘাতক বেইমান দালালদের খুন করে বিপ্লবীরা বেপরোয়া ঘুরে বেড়াতে লাগল। একদিকে বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রাম অন্যদিকে শিক্ষা

সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলন। 'জ্যোতিরিঙ্গন' পত্রিকায় অনেকের লেখা প্রকাশিত হতে থাকল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের পঞ্চকোট রাজদরবারে আগমন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে কিছুদিন থাকাকালীন তিনি ছয়টি উল্লেখ যোগ্য সনেট রচনা করেছিলেন। তাঁর কোনো কবিতায় রাজার স্তাবকতা বা গুণকীর্তন নেই। তিনি পঞ্চকোট রাজার সভাকবি ছিলেন না— ছিলেন সেক্রেটারি বা দেওয়ান। ডক্টর সুধীর করণ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন "মধুসূদন গভীর ভাবে ভালবেসেছিলেন পঞ্চকোটের ভূপ্রকৃতিকে, ভালবেসেছিলেন রাজ্যের বঞ্চিত শোষিত অসহায় গ্রামীণ মানুষগুলিকে। সাঁওতাল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত এবং উৎসবের সঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের একটি সহজ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন।" তাই 'পুরুলিয়া' নাম সনেটে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মনের অভিব্যক্তি এবং আন্তরিক সহানুভূতির বিদ্যুন্ময় দ্যুতি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঋষি নিবারণ দাসগুপ্তের 'মুক্তি' অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'সংগঠন' সর্বদা প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল। এই দুটি পত্রিকায় মানভূম জেলার শুধু সংবাদই প্রকাশিত হত না পরন্তু কাব্য-সাহিত্যও প্রকাশিত হত। এগুলি ছাড়াও ছিল 'সংকল্প', 'তরুণশক্তি' 'পল্লী' প্রভৃতি পত্র পত্রিকা। বিপ্লবী অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের লেখা গণমানসে জোয়ার এনেছিল। অন্নদাপ্রসাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল মহাজাগরণী গান— "বর্ষার মাঝে বজ্রের মাঝে ঝঞ্ঝার মাঝে জাগো/জাগো বুকে বুকে প্রলয়ঙ্কর প্রলয় করহ আজি/নব সৃষ্টির নব আয়োজনে হে রুদ্র এসো সাজি।" কিংবা সেই তেজদৃপ্ত কবিতা যা তরুণ রক্তে হিন্দোল তুলেছিল— "মৃত্যু সে তো ক্রীড়নক মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সদনে/সে মৃত্যু নাচিছে আজ ক্রীড়কের সূত্র আকর্ষণে/ তরুণের তাজা রক্তে স্নাত হয়ে জেগেছে তরুণ/ভয়হীন বাধা হীন অচঞ্চল প্রদীপ্ত অরুণ।" ঋষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের সেই কবিতার বজ্রঘোষণা ছড়িয়ে পড়েছে দিগদিগন্তে— "আমরাও চাই আমাদের দেশে তেমনি করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠুক / সে আগুনে হয়তো সমস্তই পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। যাউক কিন্তু তাহাই আমাদের এখন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।" তাঁর 'সব সমানের দেশ' কিরণচাঁদ দরবেশজির "আয় ঘুম আয় ভারতের যাট কোটি আঁখির পাতায়" সবাইকে জাগিয়ে তুলেছিল।

অশোক চৌধুরীর "কর্মবীর মানবেন্দ্র রায়" পুস্তকটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। 'মুক্তি' সম্পাদক নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত ও 'সংগঠন' সম্পাদক অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীকে আন্দোলন করার জন্য, লেখার জন্য বার বার কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। অন্নদাপ্রসাদ জেলে বসে বহু কবিতা-প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেগুলো তৎকালীন 'মাতৃমন্দির', 'শক্তি' 'সংকল্প' ইত্যাদি পত্রিকা ছাড়াও বহু ভালো ভালো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর 'বিপ্লবের শিখা' উপন্যাস রচিত হয়। তাঁর 'গ্রাম সংগঠন' গ্রন্থে পল্লী ও গ্রাম উন্নয়নের কথা আছে। আছে গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভরশীল করে তোলার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত।

তাঁর নাটকগুলিতেও তাঁর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়সীমার মধ্যে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় জীমুতবাহন সেন, জহরলাল বসু, গিরীশ চন্দ্র মাহাত, বীর রাঘব আচারিয়া, ভজহরি মাহাত ও জগবন্ধু ভট্টাচার্যও লিখেছিলেন। তাঁদের সাহিত ভাবনা মানুষকে আগুনের বিষুবরেখায় দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল।

পুরুলিয়ার রুক্ষ-লাল কাঁকুরে মাটিতে রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, ভবপ্রীতানন্দও ঝা, পীতাম্বর দাস, জগৎ কবিরাজ, দীনু তাঁতি, চামু কামার, দুর্যোধন দাস, লগন সাঁই, দাস ক্ষেপচাঁদ বাউল ঝুমুর গান রচনা করে গেয়ে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পালাপার্বণে গাজনের মেলায়।

ধামসা-মাদল খোল-করতাল লাগড়ার বোলে আড় বাঁশি মদন ভেড়ী. কেঁদরী বিষম ঢাকির বোলে মনসামঙ্গল সাপনাচানো ঝাপানের সুরে প্রাণে প্রাণে বইত খুশির জোয়ার। চাঁচর চড়কে লাচনি লাচের অপূর্ব ভঙ্গিমায় ছৌ নাচের বিক্রমে টুসু ভাদু ইতু ইত্যাদি লোকউৎসবে ব্যস্তসমস্ত মানুষ ভুলে যেত জীবনের ক্ষত-যন্ত্রণা। এইসব বিষয়গুলি নিয়েই সেদিনকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনা। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই সেদিন জমিদারি শাসন ছিল, মহাজনী শোষণ ছিল, জোতদারদের জুলুম ও হুমকির সাথে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর আক্রমণ। তবু টুসু ভাদু ঝুমুর গানে সে সবের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই। নেই কোনো বিদ্রোহ ঘোষণা। কিন্তু কেন? এই সব গানে কি সেদিন কোনো ক্ষোভ জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের পরোয়ানা জারি ছিল? কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সেদিনের সেইসব জীবনধর্মী কবিতা-গানকে বিনষ্ট করে দিয়ে তার পরিবর্তে লোকসঙ্গীতগুলিতে ধর্মীয় চেতনা-রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ভালোবাসা কিংবা আদি রসাত্মক বিষয়বস্তুকেই বেশি করে তুলে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ব্রিটিশ শাসন ছিল—ছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষণ তাই মানুষকে সংগ্রামবিমুখ জীবনবিরোধী মনুষ্যত্ববিরোধী করে তোলার এ এক গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি হতে পারে? আমরা এ জেলার সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাই অবাক না হয়ে থাকতে পারি না।

স্বাধীনতা-উত্তর মানভূমে টুসুগান ও সাহিত্যে তার প্রভাব

স্বাধীনতা-উত্তর মানভূমে ১৯৪৭ সালের পর থেকেই দেখা দেয় ভাষাদ্বন্দ্ব। হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের অত্যাচারে বাংলা ভাষাভাষি মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাটনা রাজধানী থেকে বিহার সরকার হিন্দি ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা ও বাঙালিদের উপর বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করায় জনজীবনে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। বাংলা ভাষা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবিতে জনজীবন উত্তাল হয়ে ওঠে। আর অমনি শুরু হয় বিহার প্রশাসনের দমন-পীড়ন অত্যাচার। সে দিনের সেই রক্তলাঞ্ছিত দিনগুলি আজও ভুলতে পারি না। লোকসেবক সংঘ এই অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে শুরু করে অহিংস সত্যাগ্রহ অভিযান। টুসু-গানের ভিতর দিয়ে শুরু হয় ঐতিহাসিক পদযাত্রা। কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে—

"শুন বিহারি ভাই
তরা রাইখতে লারবি ডাং দেখাই?"

কিংবা

"বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
তরা রুখবি আজি কে তারে?"

লোকসাহিত্যের গবেষক ও সাহিত্যিক রামশঙ্কর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন "সরাসরি গণ আন্দোলনে এই গানগুলির গণসংযোগ সাধিত হয়েছিল এবং পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের জন্য যে বাংলা ভাষাভাষী মানভূমকে উদ্বেলিত করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে মানভূমের অর্ধাংশকে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—"তখনকার পুরুলিয়া অঞ্চলের মাহাত ভূমিজ ইত্যাদি জনগোষ্ঠী ঝাড়খণ্ডের দাবিও তোলেনি—কেউ আলাদা হতে চায় নি। এ সকল বিষয়ে গানগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।"

কাননবিহারী ঠাকুর, মধুসূদন মাহাতো, বৈদ্যনাথ মাহাতো, ভজহরি মাহাতো, জগবন্ধু ভট্টাচার্য, ধ্রুবপদ মাহাতো বহু গান লিখেছিলেন। সেই টুসু গানের দিগন্ত প্লাবিত সুরমূর্ছনা মানুষকে ভাষা আন্দোলনে ও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনে সামিল করেছিল। গণ আন্দোলনের চাপে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর মানভূম বিভক্ত হয়ে যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয় তাহাই পুরুলিয়া জেলা। পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির জন্য বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, অরুণচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ; ভজহরি মাহাতো, শ্রীশ ব্যানার্জী, জগবন্ধু ভট্টাচার্য এবং মানভূমের গণআন্দোলনের নেতা মহাদেব মুখার্জীর অবদান স্মরণীয়। লোকসেবক সঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গভুক্তির জন্য সারা মানভূমের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সেদিনের টুসুগান ছিল—"মন মানে না হিন্দি সহিতে/ ভাষা মোদের হরে নিলো হিন্দিতে। মাতৃভাষা হরে যদি আর কি মোদের থাকেরে। মধু বলে মাতৃভাষায় ধ্বজা হবে বহিতে।" ভজহরি মাহাতো তৎকালীন সাংসদ। তিনিও লিখেছিলেন— "সবাই মোরা চাইবো যেন বাংলা ভাষায় কাজ চলে। কত সুখে দিন কাটবেক মাতৃভাষায় গান বলে" কিংবা "হিন্দী আমার রাষ্ট্রভাষা তাতেও কি ভাই দালালি/ সব ডাকাতের আড্ডা গড়ে লুট তরাজে মাতালি/ মুখে রাম নাম খদ্দরধারী আত্মঘাতী সাজলি/ ইতিহাসের পাতায় পাতায় কলঙ্কের নাম লেখালি।"

মাতৃভাষা বাংলা ভাষার প্রতি সেদিন দরদ ফুটে উঠেছিল / টুসুগানের ছত্রে ছত্রে—"এই ভাষাতেই কাজ চলেছে সাত পুরুষের আমলে/ এই ভাষাতেই মায়ের কোলে মুখ ফুটেছে মা বলে। এই ভাষাতেই পড়চা রেকর্ড এই ভাষাতেই চেক কাটা/ এই ভাষাতেই দলিল নথি সাত পুরুষের হক পাটা/ দেশের মানুষ ছাড়িস যদি ভাষার চির অধিকার/ দেশের শাসন অচল হবে ঘটবে দেশে অনাচার।"

বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করে কাঁধে হিন্দি ভাষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন—কবি কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য, অতুলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, সুনীতিকুমার পাঠক, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-লেখরাও। বহু লেখক-কবি সৃজনশীল প্রতিভা নিয়ে সেদিনের সেইসব ঘটনাকে নিয়ে কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের শুরু অহঙ্কার মানুষ ভুলতে পারে না। আজও যেন টুসুগান মনের ভেতরে বাজতে থাকে—" আমার মনের মাধুরী/ সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি/ আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে মেঠো সুরে কোন্ চুয়া/ বাংলা গানের ছড়া কেটে আষাঢ় মাসে ধান রুয়া/ মনসা গীতি বাংলা গানে শ্রাবণে জাত জঙ্গলে/ চাঁদ বেহুলার কাহিনী গাই চোখের জলে গান বলে/ বাংলা গানে করিলো সই ভাদু পূজা ভাদরে। গরবিনীর দোলা সাজাই ফুলে পাতায় আদরে/ বাংলা গানে টুসু আমার মকর দিনে সাঁকরাতে/ টুসু ভাসান পরব ট্যাড়ে টুসু গানে মন মাতে।"

পশ্চিমবঙ্গে আসার পর পুরুলিয়া জেলার সাহিত্যের রূপ রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন গল্পে-কবিতায় ও বিভিন্ন রচনায়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'তরঙ্গ' কাব্যগ্রন্থ ও 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাস প্রকাশ পেল। পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন হিমাদ্রী চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ সরকার, অপূর্ব সান্যাল, বিমলকান্তি মহান্তা, ধ্রুবানন্দ মাহাত, লাল মোহন কুম্ভকার, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণুদেবী হাজরা, নর নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, অনাদী চক্রবর্তী প্রমুখ।

সাহিত্যের আন্দোলনে পুরুলিয়া জেলার আদি পীঠস্থান রেলশহর আদরা। তাঁদের লেখায় আধুনিকতার ছোঁয়া। শঙ্খ, উষসী, বিচিত্রা, সাহিত্য বিচিত্রা, কৃষ্ণচূড়া পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শক্ত কব্জায় লিখতে শুরু করলেন জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত, হীরেন দত্ত, কামাখ্যা সরকার,

বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা সরকার, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল দত্ত, কালীপদ কোঙার, কমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রবন্ধে যুধিষ্ঠির মাজি, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় ডঃ ব্রজদুলাল চক্রবর্তী, গল্পে সিরাজুল হক, রণজিত মুখোপাধ্যায়, বগড়ীলাল দে, সুভাষ নাগ সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন। এখন আর টুসু ভাদু ঝুমুর গানের মধ্যে পুরুলিয়ার সাহিত্য সীমাবদ্ধ থাকলো না।

ভয়ঙ্কর ষাটের দশক : প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব

ষাটের দশক এক ভয়ঙ্কর দশক। এই দশকে কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে শুরু হয় বিভিন্ন আন্দোলন। প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতা, নিয়ন্ত্রণহীন রাজনীতি অর্থনীতি এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখকশিল্পীরা মাথা তুলে দাঁড়ান। একদিকে যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য বল্গাহীন পদসঞ্চারণ অন্যদিকে তেমনি চলছিল শ্রমিক বিক্ষোভ-কৃষক বিদ্রোহ খাদ্যের দাবিতে রণগর্ভ আন্দোলন। এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্তি, চীন-ভারত যুদ্ধ, পাকিস্থানের উদ্যত আস্ফালন, দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রামূল্য হ্রাস ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সর্বোপরি নকশাল পার্টির হটকারী আক্রমণ, খুন-জখম, হত্যার তাণ্ডব দেশময় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। অস্থির পরিবেশে ঝড়ো হাওয়ার দাপট। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে দেখা দিল হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন। তাদের সদম্ভ ঘোষণা "সম্পূর্ণভাবে কবিতাকে পাল্টে দিয়ে জৈবিক ও মানসিক বিতৃষ্ণাকে কবিতার শরীরে জায়গা দিতে হবে। কোনো রকম নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যতটা পারা যায় কবিতা হবে আক্রমণাত্মক।"

সামাজিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে, জীবনবোধকে মোটেই তোয়াক্কা না করে হাংরি জেনারেশনের প্রবক্তারা অর্থাৎ কবি মলয় রায়চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়, সুবো আচার্য, দেবী রায় শৈলেশ্বর নতুন সাহিত্যসৃষ্টির উল্লাসে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এ্যালান্স গিনসবাগের আগমনে তাঁরা আরও উৎসাহী হলেন। গীনসবাগের 'হাউল' কাব্যগ্রন্থ আমেরিকায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর লেখার প্রভাব এদেশেও কবিদের প্রভাবিত করতে লাগল। কবি মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাকে নিয়ে চারদিকে হৈচৈ। অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে লাগল। পুলিশ-কোর্ট-কাছারি কিছুই বাকি রইল না। মামলায় কবির অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড পর্যন্ত হল।

হাংরি জেনারেশনের পাশাপাশি শ্রুতি অব্যয় ঈগল গোষ্ঠীর আন্দোলন, প্রথাবিরোধী আন্দোলন, না সাহিত্য না কবিতা, স্বতোঃৎসার সাহিত্য এবং ধ্বংসকালীন কবিতার আন্দোলনও চলতে থাকল। গতানুগতিক শিল্প-সাহিত্যের বিরুদ্ধে জলন্ত যুদ্ধ ঘোষণা মানব সভ্যতার ক্রান্তি মুহূর্তে প্রজ্ঞাময় উপলব্ধির যেন এক বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ। কেউ আর শিল্পশর্ত, কবিতার ব্যাকরণ মেনে চলতে রাজি নয়। নিম সাহিত্য, ও থার্ড লিটারেচার আন্দোলন জানিয়ে দিল। "বুদ্ধিবৃত্তির ঔরসেই কবিতা ও সাহিত্যের জন্ম। ইন্টেলেকচুয়াল কবি-লেখকরা কোনো না কোনো গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। শুধু শহর কলকাতার মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকল না গ্রামে গঞ্জে মফস্বল শহরেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চারদিকে বইতে লাগল' যৌনগন্ধী হাওয়া— ভাঙার ভিতর দিয়ে নতুন সৃষ্টির জোয়ার।

পুরুলিয়া জেলাতেও কোনো কোনো কবি ও লেখক হাংরি জেনারেশনকে অনুসরণ করে লিখতে শুরু করলেও বেশির ভাগ কবির বা লেখকদের লেখায় নান্দনিক সত্য বাঙ্ময় হয়ে

উঠল। বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, কামাখ্যা সরকার, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি সিংহ, সুবোধ বসুরায়, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, অমরশংকর দত্ত, মহাবীর নন্দী, সত্যেন্দু গুপ্ত প্রমুখ কবিদের কবিতা ও কারো কারো গল্প নতুন করে মোড় নিল। রণজিত মুখোপাধ্যায়, কমল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ গঙ্গে াপাধ্যায়, সিরাজুল ইসলাম গল্পে সময়কে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। ষাটের শেষদিকে পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস 'ডাঙ্গা ডহরের পদাবলী' সবাইকে চমকে দিল। রবি মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটালেন। প্রবন্ধে দেবকুমার চক্রবর্তী, ব্রজদুলাল চক্রবর্তী, যুধিষ্ঠির মাজি তাঁদের সাহিত্য চিন্তাকে তুলে ধরলেন। কালীপদ কোঙার ও কমল চট্টোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় 'বিচিত্রা পত্রিকার' প্রকাশ ঘটল পরে তা 'সাহিত্য বিচিত্রায়' রূপান্তরিত হয়। এই সময় কবিতা পত্রিকা 'কেতকী' সুবোধ বসুরায় সম্পাদিত 'ছত্রাক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই ছত্রাক 'মানভূম সংস্কৃতির মুখপত্র হিসেবে জেলার লোক সংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বহু মূল্যবান রচনা প্রকাশ করে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদিক দিয়ে সুবোধ বসুরায় যা করেছেন তাব .জন্য তার প্রশংসা করতেই হয়।

ষাটের দশকেই ধ্রুবানন্দ মাহাতো, লালমোহন কুম্ভকার, পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো, বিমলকান্ত মহান্তি, কিরীটি সিংহ সর্দার, রবি রতন ভৌমিক সহ আরও অনেকেই লিখতে শুরু করেন। বিমলকান্তি মহান্ত লিখলেন—"মাতাল শিবের গাজনেতে তুমি থাকো চিৎ হয়ে শুয়ে।" সুবোধ বসুরায়ের কলম দিয়ে বেরিয়ে এল "মহাবীর্য লোকটার আজ কোন ছিরিছাঁদ নেই/ আছে শুধু প্রতীক্ষা আর মৃত্যুহীন প্রাণ/পাথরের বুক দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার ঝিরি ঝিরি গান।" জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন তাঁর মনের অভিব্যক্তি—'খুব যেন ভারি ভারি হাত/ নিঃশ্বাসের আওয়াজে অস্বাভাবিক দ্রুততা।' প্রকাশ পেল কালিপদ কোঙারের কবিতায় এই সময়ের নির্মম স্বীকারোক্তি—"কোথাও প্রচণ্ড তেজ পুরানো পৃথিবী ভেঙে। গুঁড়িয়ে দেবার কোন বিস্ফোরণ নেই।" এখনো কিছু কিছু স্মরণীয় কবিতার পংক্তি মনের ভেতর বেজে ওঠে--

১. কাল স্রোতে দুঃসাহসী নৌকো ভাসিয়েছি (বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়)।

২. তুমি কি আমাকে চেনো/শুধালাম সেলুনের আয়নায় আমারই ছায়াকে। (অমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

৩. জানলার পাল্লাটা ফাঁক করে উদাসী যৌবনার মনে মেঘ হাসছে মেঘ কাঁদছে। (কামাখ্যা সরকার)

৪. চলুন আমরা হাত ধরে একবার সেই অস্পৃশ্য পৃথিবীতে ঘুরে আসি। (বিমলকান্তি ভট্টাচার্য)

৫. ধর্মান্ধ ভক্তের দল বাঁশের ফলকে জিভ ফোঁড়ে। (পিনাকী রঞ্জন রক্ষিত)

৬. যে পালকে লেখা থাকে জ্বলন্ত সূর্যের প্রতিবাদ (নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়)

৭. এক পাত্র পেটে পড়লে সে সর্বত্যাগী সম্রাট/কৌপিন মাত্রসার (সত্যেন্দু গুপ্ত)

৮. এক রত্তি কাগুজে গল্পকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে/পথের দাবির দুগুনো ফানুষ উড়ছে/ কলেজ স্ট্রীটের পাড়ায় পাড়ায়। (অপূর্ব সান্যাল)

৯. আত্মজের প্রচণ্ড আক্রোশে উড়িয়ে দেবেই দেবে স্মৃতি যাদুঘর। (শান্তি সিংহ)

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত একজন সার্থক গল্পলেখক হিসেবে সবার নিকটে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখা বাজারি পত্রিকাগুলিও সাগ্রহে প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর উপন্যাসে আদিবাসীদের জীবন যাত্রা অন্য এক মাত্রা পেয়েছে। তাঁর সম্পাদনায় 'অনবরত' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হত।

ষাটের দশকের শেষদিকে বেশ কিছু উজ্জ্বল মুখ সাহিত্যের মানচিত্রে দেখা গেল। জেলা ছাড়াও জেলার বাইরের বহু পত্রিকায় তাঁদের লেখা প্রকাশ পেতে থাকল। এক ভয়ঙ্কর বাঁক পার হয়ে পুরুলিয়ার কবিদের এগিয়ে যেতে হয়েছে উত্তরণের দিকে।

সাতের দশক মুক্তির দশক এবং পুরুলিয়ার সাহিত্য আন্দোলন

সাতের দশকে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম ভাঙল পুরুলিয়া শহরের। একদিকে 'ছত্রাককে কেন্দ্র করে মানভূম সংস্কৃতি অন্যদিকে 'আমরা সত্তরের যিশু' আধুনিক সাহিত্যের আন্দোলন শুরু করল। কবিতা পাঠ, সাহিত্য আড্ডা, কবি সম্মেলন সারা জেলাকে সবুজ সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলল। সেই সঙ্গে মানভূমি কবিতাও লেখা শুরু হল দল বেঁধে। সুবোধ বসুরায় গৌরীশঙ্কর দাস, সৃষ্টি মাহাতো, অনিল মাহাতো, গৌতম দত্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করলেন আঞ্চলিক উপভাষায় লেখা কবিতা। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে লিখলেন অজিত মিত্র, নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকেই। অন্যদিকে যিশু গোষ্ঠী কবিতায় নিয়ে এলেন নতুনত্ব। নির্মল হালদার, সৈকত রক্ষিত, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, অশোক দত্ত, কল্লোল মজুমদার, মবিনুল হক কবিতায় নতুন ইমেজ সৃষ্টি করে চমক দিলেন। প্রতীক চিত্রকল্পের ব্যবহারে, ভাষার অসামান্য ব্যঞ্জনায়, ধ্রুপদী আবহমণ্ডলে এক বিচিত্র রূপলোক সৃষ্টি হল। কবিতা হয়ে উঠল অলঙ্কৃত তার।

মুকুল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা মনকে রীতিমতো আলোড়িত করে তোলে—'একটা পাখি মানে একটা আকাশ / দুটো পাখি মানে আর একটু আকাশ/পাখি ওয়ালা তুমি কতো আকাশ ধরেছো।" কিংবা 'সূর্যাস্তের আগে ঠিক পৌঁছাতে পারবে তো গ্রামে/সময় যথার্থ কম/দ্যাখ কারা যেন পশ্চিমে আগুন জ্বেলেছে।' সৈকত রক্ষিতের কবিতার নিজস্ব ভাষা আছে। তাঁর কবিতার পংক্তি মনে দাগ কাটে—"কবে আমি তোমার মুখের হাসি টিপ করে / আটকে দেবো আমার দুখিনী বোনের কপালে।" নির্মল হালদার শক্তিমান কবি। বহু কাব্যগ্রন্থের জনক। তাঁরও নিজস্ব স্টাইল ও কবিতার ভাষা আছে। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে গেঁথে যায়— সহজে ফুরিয়ে যায় না— "এই স্রোতে একটা পাতা পড়ে গেলে পাতা/পিদিম হয়ে ডাকে/মানুষকে ডাকতে পিদিমই আছে।" কিংবা "তরুলতাই আলোক লতা হয়ে আলোর কাছে নিয়ে যাবে/ আলোর কাছে কোন কাপড় লাগে না।" জ্যোৎস্না কর্মকার তাঁর কবিতায় লিখলেন "আমি একজন পুরুষ খুঁজতে বেরিয়েছে/ যে আমার সঙ্গে খাবে শোবে এবং....।" আলোক ভাদুড়ি সহজ সত্য প্রকাশ করলেন "পথের মানুষেরা সব লজ্জা ভুলে গেছে।"

সাতের দশকের বেশ কিছু কবির পংক্তি তুলে দিলে তাঁদের কবিতাভাবনা জানা যাবে—

১. ইচ্ছে করলেই ছুঁতে পারি না মানুষের হাত /শিবির বিভক্ত সব....(জগন্নাথ দত্ত)

২. সমাধির বুক চিরে রজনীগন্ধার মতো/ ফুটে থাকা বন্দুকের নল। (মবিনুল হক)

৩. নাইবা পেলাম শতদল/দেখেছি শশিকলা মাথার উপরে (অশোক দত্ত)

৪. আগুন বল্লবী হয়ে নিজেই দাঁড়াবে। (দেবাশিস সরখেল)

সজল দাসশর্মা গল্প নিয়ে শুরু করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রকাশিত "চো মাথা সরিসৃপ জাতীয়" গল্পের পত্রিকা। নতুন আঙ্গিকের গল্প লিখতে শুরু করলেন অলোক ভাদুড়ি সহ বেশ কিছু শক্তিমান গল্প লেখক। যে ধরনের প্রচলিত নিয়ম মেনে প্রথা সিদ্ধ গল্প লেখা হচ্ছিল তার পরিবর্তন ঘটল। গল্পের ভিতর আর গল্প রইল না। নতুন ধরনের গল্প পাঠকদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করল।

শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও অনেকে এগিয়ে এলেন। টুকলু পত্রিকা তো আগের থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলই। সেই টুকলুকে কেন্দ্র করে হারাধন কর, অমল ত্রিবেদী, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখতে শুরু করলেন। অমল ত্রিবেদী ছোটদের ছড়া-কবিতাই না—খেলাধূলা নিয়েও লিখতে শুরু করলেন। সংবাদ ও ফিচার রচনাতেও দক্ষতার পরিচয় দিলেন। তাঁর লেখা অনেক ভালো পত্রিকায় ও পরবর্তী সময়ে কিছু দৈনিক কাগজেও প্রকাশ পেতে থাকল।

বড়দের লেখা ছাড়াও আর যাঁরা ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করলেন তাঁরা হলেন কামাখ্যা সরকার, শীলা সরকার, জগদীশ সরখেল, গোপাল কুম্ভকার প্রমুখ।

সত্তর দশকে কবিতার মানচিত্রে দেখা গেল দেবাশিস সরখেল, গোপাল কুম্ভকার, অচিন্ত্য গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতাপ দাসগুপ্ত, বিমলেন্দু ত্রিপাঠী, অনিল মাহাত, সমীর দত্ত, গৌতম দত্ত, সুকুমার চৌধুরী সহ আরও অনেককে।

রেলশহর আদরায় অলোক ভাদুড়ি, মঞ্জু ভাদুড়ি, তাপস পাঁজা, মানস কুণ্ডু, কাশীপুরের জগন্নাথ দত্ত নিজের মনের মতো করে লিখতে শুরু করলেন। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত হতে থাকল লিটল ম্যাগাজিন।

এই সময় পুরুলিয়াতে কবি শান্তি সিংহ গঙ্গোত্রী পরিষদ গঠন করে একটি বড় মাপের কবি সম্মেলনে কলকাতার খ্যাতিমান কবিদের নিয়ে এসেছিলেন। জেলার সমস্ত কবিদের উপস্থিতি এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিলো। অমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যবাসর' গঠন করে সাহিত্যের প্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। প্রতি বৎসর বোশেখ মাসে ও শরৎকালে বৈশাখী ও শারদ নামে পত্রিকাও প্রকাশিত হত। নতুন লেখকগোষ্ঠী গঠনের পথে তাঁর সেই সংগ্রামী ভূমিকা জেলার সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে অম্লান। সত্যিকথা বলতে কি তিনিই সুধীরকুমার দাস, জ্যোৎস্না কর্মকার, গৌরীশঙ্কর দাস, বিপ্লব ব্রহ্ম প্রভৃতি লেখকদের সাহিত্যের আসরে নিয়ে এসেছিলেন। নিয়মিত কবিতা পাঠ, সাহিত্যের আড্ডা, সাহিত্যে নিয়ে আলোচনা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এ জেলায় সবাইকে উৎসাহী ও উদ্দীপিত করে তোলা ছিল তাঁর অনান্য কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম।

'সত্তর দশক মুক্তির দশক' এই শ্লোগানে আকাশ-বাতাস সোচ্চার হলেও পুরুলিয়া জেলার কবি-লেখকরা বা প্রাবন্ধিকেরা তেমন কোনো যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেননি। এই সময় ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট, কালা আইন জারি, বিনা বিচারে জেলে আটক এবং হিংসাশ্রয়ী নাশকতা মূলক আক্রমণ চলতে থাকে। রাতারাতি ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা জারি করে শাসকশ্রেণী তার স্বৈরতান্ত্রিক নগ্নতাকে প্রকাশ করে। সংবাদপত্র থেকে আরম্ভ করে মায় সাহিত্য পত্রিকার উপর শুরু হয় সেন্সরশিপের নির্মম বলাৎকার। এই রকম একটি ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটানো তো দূরের কথা গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধেও তেমন ভাবে কারো কলম প্রতিবাদে গর্জে ওঠেনি।

দীর্ঘদিন লিখে এলেও সাতের দশকে সত্য গুপ্ত, অরুণপ্রকাশ সিংহ প্রভৃতি লেখকদের লেখা পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর লেখা লিখতে শুরু করেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বসু। তিনি পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশের চেয়ে গ্রন্থ প্রকাশের দিকে বেশি যত্নশীল। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং সুধী মহলে তিনি অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছেন। লোক

সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুধিষ্ঠীর মাজি, কাব্য-সাহিত্য নিয়ে দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, মানভূমি শব্দকোষ ইত্যাদি নিয়ে সুবোধ বসুরায় সাতের দশকে সর্বজনপরিচিত হয়ে ওঠেন।

চিত্ত দাস, অমিয় পাল, আবু হেনা, কুশল বাগচী, পূর্ণেন্দু পাল, দিল্লেসার মাহাত, হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত ভট্টাচার্য, প্রমুখ কবি-লেখকরা লেখা লেখি ও পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা থেকে সরে এসে প্রবন্ধ লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রবন্ধ প্রতিক্ষণ, চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

সাতের দশকের কবি নির্মল হালদার কবিতার জন্য এবং সৈকত রক্ষিত গল্পের জন্য সরকারি ভাবে সম্প্রতি পুরস্কৃত হয়েছেন। সৈকত রক্ষিত গল্প-উপন্যাস লেখার জগতে আজকে বহু উচ্চারিত নাম। পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষকে নিয়ে তাঁর অসাধারণ গল্পগুলি সাহিত্যে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

জ্যোৎস্না কর্মকারও কবিতার পাশাপাশি সুন্দর সার্থক গল্প লিখে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও গল্পের বই পাঠকসমাজে আজ সমাদৃত।

গল্প-প্রবন্ধ-নাটিকা ইত্যাদি লেখার চাইতে কবিতা লেখার প্রবণতাই সবার বেশি। অথচ অফুরন্ত সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর পুরুলিয়া অবস্থান করছে। যে কোনো বিষয়কে নিয়ে প্রবন্ধ ও নাটক লেখা যেতে পারে। কিন্তু সে ব্যাপারে লেখকেরা তত আগ্রহী বা উৎসাহী নন।

এই সময় গোষ্ঠী-তৎপরতা জেলায় প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। সেই গোষ্ঠী-তৎপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা জেলার সাহিত্য আন্দোলনকে শ্লথ-মন্থর করতে না পারলেও কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছিল এ সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না।

কাব্য-সাহিত্যের মানচিত্রে সাঁওতাল ও অন্যান্য ভাষার কবি সাহিত্যিকেরা

বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের পাশাপাশি হিন্দি ও সাঁওতাল লেখকদের সাহিত্য চর্চা এ জেলার গর্বের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ জেলার যখন লেখক ডাইরেক্টরি বা লেখক পঞ্জিকা প্রকাশ করা হয় তখন এঁদের নাম তালিকা ভুক্ত হয় না। সাঁওতাল লেখকদের তো পরিসংখ্যানের মধ্যে আনাই হয় না। পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজ সেবী নকুল মাহাতো। তিনি আদিবাসী ও লোক সংস্কৃতির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

হিন্দি কবিদের মধ্যে প্রমোদ বেড়িয়া, শ্যাম অবিনাশ ইন্দ্রবিকল, কেদার নাথ, রাওয়াল পুষ্প প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ। সত্যেন্দু গুপ্ত পুরুলিয়ার কবি ও কবিতা সংকলনে (অব্যয়) এঁদের কবিতা বাংলা অনুবাদ করে সঙ্কলিত করেছিলেন। এঁদের লেখায় সমাজভাবনা ও কালচেতনা দ্যুতিময় উজ্জ্বল।

পুরুলিয়ার বন্দোয়ান থানা সাঁওতাল কবি-লেখকদের পীঠস্থান। ডজনখানেকেরও বেশি সাঁওতাল লেখক দুর্দান্ত প্রতাপে চুটিয়ে সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছেন। 'তেঁতরে' ও 'সুসার ডাহার' নামে এঁদের দুটি সাঁওতালি ভাষার পত্রিকা ছিল। তাঁরা যেমন নিজেদের লেখা সেই পত্রিকায় প্রকাশ করতেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত; নজরুল ও অন্যান্য আধুনিক কবিদের বাংলা কবিতা সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আনন্দের কথা এঁদের অনেকের গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

সাঁওতাল লেখক-কবিদের মধ্যে প্রয়াত সারদাপ্রসাদ কিস্‌কু বিখ্যাত কবি ব্যক্তিত্ব। তিনি সরকারি ও বেসরকারি ভাবে সাহিত্যকৃতির জন্য পুরস্কৃত, সম্মানিত ও সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। শুধু তাই না তাঁর কবিতা বিহারের প্রবোধ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত পর্যন্ত হয়েছিল। মহাদেব হাঁসদা, গোমস্তাপ্রসাদ সরেণ গল্প-কবিতা প্রবন্ধ লেখায় সমান সিদ্ধহস্ত। এঁদের লেখাগুলি সমাজসচেতনমূলক।

মুরমু নুকুল, বাবুরাম সরেন, রূপনারায়ণ হেমরম, চুনারাম হাঁসদা, ফাল্গুনী মুর্মু উল্লেখযোগ্য কবি। কাশীপুর থানার রবিলাল মাঝি, সাঁতুড়ি থানার শ্রবণ টুডু এবং আদরার সিলি সম্পাদক কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি প্রতিষ্ঠিত লেখক।

বাংলা সাহিত্যের একেবারেই কাছাকাছি সাঁওতাল সাহিত্যের প্রবহমান ধারা এ জেলায় সংস্কৃতিতে এনেছে আমূল পরিবর্তন।

শবর-খেড়িয়া-হো-দের মধ্যেও কিছু কিছু কবি-লেখক আছেন তাঁরা তাঁদের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে এ জেলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন।

এক সময় কবি মহাবীর নন্দী হো ও মুণ্ডা ভাষার কবি বাংলায় অনুবাদ করে কেতকী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। অনুদিত কবিতা পড়ে বুঝতে পারা গেছে হো ও মুণ্ডাদের কবিতা বিষয়-ভাবনার দিক দিয়ে কত উন্নত।

ব্রিটিশ পিরিয়ডের অনেক সাঁওতালি লোকগীতি আমার সংগ্রহে আছে যার তর্জমা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না তাঁরা বোঙা বা অনুন্নত ছিলেন না—বরং অত্যন্ত সমাজ-সচেতন ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম ও বিদ্রোহ স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এতো বড় একটা বিদ্রোহকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য শাসকশ্রেণী তাকে আখ্যা দিয়েছিল 'চুয়াড় বিদ্রোহ'। অথচ সেদিনের সেই সাঁওতাল বিদ্রোহই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহাবিদ্রোহের সূচনা করেছিল।

তাঁদের লোকসঙ্গীতে তাঁদের সুস্পষ্ট ঘোষণা—

"অকা জারি কতে আব বার সুকাদ্ আ
অনাজারিরেদ আব বাব তা হেঁনা
বাব তা হেঁনা বয়হা হার্কেতঃ লাগিৎ।"

অর্থাৎ

যে শাসনের ছায়ার তলে সুখ সুবিধা নাই
সেই শাসনের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাই
মুক্তি পথে এগিয়ে যাব এগিয়ে যাব
সাহস বুকে তাই।

সাম্প্রতিক কাব্য-সাহিত্য: আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতা

জীবন ও সময়কে শনাক্ত করা কবি ও লেখকদের একটি বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। ইতিহাসের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় এক সামাজিক নিয়মেই সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও

পরিবর্তন ঘটে। আশি-নব্বই দশক থেকে সেই পরিবর্তনের ধারা আমরা লক্ষ করছি। দশকওয়ারি বিভাজনকে বাদ দিলেও পুরুলিয়ার কবিতা ও সাহিত্যে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নতুন নতুন মেজাজের পত্রিকা যেমন দেখছি তেমনি অনেক নতুন মুখও ঝলক দিয়ে উঠেছে। 'অন্নজল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রুদ্রপতি, চঞ্চল দুবে, বিদ্যুৎ পরামানিক কবিতায় নতুনত্ব আনার প্রয়াস চালিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে এসেছেন বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত পাল, সন্দীপ সরকার, সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরথ মণ্ডল, সুনীতি গাঁতাইত, অভিমহ মাহাতো প্রভৃতি কবি-লেখকগণ। 'অনুভাব' পত্রিকার অশোক ঘোষ একসময় 'ছাতিমতলা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'ছাতিমতলা' বেশ কিছু কবিকে এক জায়গায় সম্মিলিত করতে পেরেছিল।

প্রদীপ সিংহ, সুভাষ রায়, গোপাল নন্দী, তপন পাত্র, কানাইলাল পাত্র, হারাধন ব্যানার্জী, অশ্রুমুকুল রক্ষিত, নয়নতারা তন্তুবায়, স্বরাজ মিত্র, অতুনু মিশ্র নিজস্ব ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে কবিতা লিখছেন।

'নাটমন্দির' নব্বই দশকের কবিদের প্লাটফরম। অংশুমান কর, আশিস গাঙ্গুলী, রঞ্জন আচার্য নিজেরা যেমন নতুন ধরনের কবিতা লিখছেন তেমনি নতুন লেখকদের অনুপ্রাণীত করেছেন ওই ধরনের কবিতা লেখায়। সুকুমার চৌধুরী পুরুলিয়' জেলার শক্তিমান কবি কিন্তু বর্তমানে মহারাষ্ট্রে কর্মসূত্রে অবস্থান করেছেন। তিনি লিখেছেন—"অই দিকে মেঘ যোনি/আপামর আকাশের অন্ধ আয়োজন/তিন লক্ষ গিরিগিটি মেঘ মাড়িয়ে যায়/বর্ণাঢ্য বিভায়/ মানুষের স্থির চোখে তার হিম ছায়া/শুধু এক হাবা চাষা রক্ত দিয়ে সেঁচে যায় আমন অশোক।"

রবি মুখোপাধ্যায় 'মনের ঠিকানা' ও 'রক্তগোধূলি' দুটি উপন্যাস প্রকাশ করে বাজার মাত করে দিয়েছেন। নিত্যানন্দ গোস্বামীরও দুখানা উপন্যাস বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। তিনিও নিয়মিত লিখছেন পত্র- পত্রিকায়। দিলীপ গোস্বামী, গবেষণামূলক খেলায় তৎপর। পঞ্চকোটের ইতিহাসকে তুলে ধরছেন—তাঁর লেখায় উঠে আসছে বহু হারিয়ে যাওয়া ঘটনা ও পুরাতত্ত্বও।

সোমনাথ হাজরা, কবিতা পাল, শীলা মুখোপাধ্যায়, নির্মল পট্টনায়ক, অপর্ণা দেওঘরিয়া, ধ্রুব কর্মকার, শান্তিপ্রিয় গুরু, বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে, খোকন নাথ, তরুণকুমার সরখেল কবিতার জগতে শুরু করেছেন স্বচ্ছ পদসঞ্চারণ। এঁদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করার সময় আসেনি।

লোকসংস্কৃতিমূলক লেখায় অনৃজু সম্পাদক সুভাষ রায় ও বংশীকুমার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। ইতিমধ্যে 'অড়' পত্রিকা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তার সম্পাদক রমানাথ দাস নিজেও একজন ভালো লেখক। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখায় সমান সিদ্ধহস্ত। তাঁর আঞ্চলিক ভাষার কবিতাগুলিও সাহিত্যের সম্পদ। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বম্ভরনারায়ণ দেব, প্রদীপ বাউরি কবিতায় নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে কিরীটি মহাত, সৃষ্টিধর মাহাত প্রবন্ধে পুরুলিয়া সংস্কৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন।

অত্যন্ত আনন্দের কথা কর্মসূত্রে কবি অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ও গল্পলেখক অনিল পাত্র এখন পুরুলিয়া জেলায়। অনিল পাত্র ছোটগল্পের জগতে এখন বহু পরিচিত নাম। তিনি মানভূম সংস্কৃতির মুখপত্র 'ছত্রাক' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ও মানভূম সংস্কৃতি নিয়ে ভাবছেন এবং মানভূমি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছেন। অমিয়কুমার সেনগুপ্ত পুরুলিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখছেন এবং নানান গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছেন।

অতি সম্প্রতি যে সব কবিতা লেখা হচ্ছে তার কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলে কবিতার গতি ও প্রকৃতি সঠিক জানা যাবে।

১। চিঠি ছিঁড়ে পড়ে আছে পাখি দেখে আহত পালক।

(অংশুমান কর)

২। ধ্বংস্তূপের ভেতর সবুজ জাগে/অজস্র হয়ে আমরা যে জন্মাই

(বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়)।

৩। আপাতত দীর্ঘ সমর্থন শুধু তোমাকেই/বিছানায় শুয়ে থাকো বিষণ্ণ হারমনিয়ম।

(বিদ্যুৎ পরামাণিক)

৪। পাতা ও পদ্মের বদলে মেয়েটি তুলে আনল/ঝাঁক ঝাঁক অ্যান্টেনা সিরিয়াল।

(সঞ্জয় চক্রবর্তী)

৫। মানুষের সাজানো হাসিকে নান্দনিক মনে হয় খুব।

(বিশ্বম্ভরনারায়ণ দেব)

৬। ঘড়ির সময়ের কাঠ আর সুমনার আগমন বার্তা/আমাকে যান্ত্রিক করে দেয়।

(অশোক ঘোষ)

৭। ফড়িংয়ের চোখে অসংখ্য কিশোরী খেলনা পাতি খেলছে

(সোমেন মুখোপাধ্যায়)।

৮। মানুষের কথা হোক নির্জনতার সঙ্গে

(হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৯। তার মানে এ বছরও স্কুল সার্ভিস কমিশন/তার মানে এবছরও শীত হয় তীব্র পাতার বাকল ছাড়িয়ে/কোন কোম্পানি অথবা লেদে ফাগুন এবারেও অতিবাহিত হবে।

(রুদ্র পতি)

পোস্ট মর্ডানিজম যুগে পুরুলিয়ার কবিতা-সাহিত্য শিল্পও আজ প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়। পুরানো শব্দসম্ভার আটপৌরে ভাষা উপমা অলঙ্কারকে বর্জন করে অভিনবত্ব আনার প্রয়াসী অনেকেই। সে রকম চেষ্টা করছেন অংশুমান কর রঞ্জন আচার্য স্বরাজ মিত্র, নয়ন তারা তন্তুবায় অঞ্চল দুবে আশিষ গাঙ্গুলী প্রমুখ তরুণ কবিরা।

গল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আলাদা চরিত্র নিয়ে জেগে উঠছে। ক্রমশ: পরিবর্তিত হচ্ছে আদল। লেখায় দ্বন্দ্বমুখর জীবনের অভিঘাত স্পষ্ট। কেনো কোনো লেখায় শ্লেষ-বিদ্রূপ তির্যক করে ক্ষেপণও দেখা যাচ্ছে। আধুনিকতাকে অতিক্রম করে উত্তর আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। একরৈখিক থেকে বহুরৈখিক ভাবনায় কবিতা নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অতীতের কালখণ্ডকে অতিক্রম করে এই অধুনান্তিকতা যুগের প্রয়োজনেই হয়তো বিজ্ঞান প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। আগামী দিনে সেই কাব্য-সাহিত্য নতুন কি ফসল উপহার দেবে তারই জন্যে অপেক্ষা করবে উত্তরপুরুষ।



নামমানভূম লোকসাহিত্য

ঁজগবন্ধু ভট্টাচার্য

ভূমিকা : সাহিত্য মানব জীবনের চির অনুসঙ্গী। সমাজ জীবনে ইহার স্থান অনেক উচ্চে। যাঁহারা সমাজের ভালো-মন্দ উভয়ের মধ্য হইতে কুরস-সুরস সংগ্রহ করিয়া রসমালার সৃষ্টি করেন তাঁহারাই সাহিত্যিক। সুনিপুণ শিল্পী যেমন খারাপ কাঁচামাল থেকেও উত্তম বস্তু নির্মাণ করিতে পারেন, পাকশাস্ত্রে সুনিপুণা গৃহিণী যেমন সাধারণ খাদ্যদ্রব্যকে যৎসামান্য উপকরণের সাহায্যেই রসনাপরিতৃপ্তকর বস্তুতে পরিণত করিতে পারেন, সেইরূপ সুসাহিত্যিকগণও সমাজের যৎসামান্য সুরস-কুরস চয়ন করিয়া রসের উপভোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সুসাহিত্য চিন্তনশীল সুসাহিত্যিকদের বিস্তার বা রচনার অভিব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করি.তে পারা যায়। অবশ্য ইহাতে সমাজের আসল চিত্র চিত্রিত হওয়া চাই। উত্তম সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বস্তু, উপমান ও উপমেয়, আবেগ ও আগ্রহ, ভাব ও ভাষা, ছন্দ ও যমক, রস ও মাত্রা সকল দিক সুনির্দিষ্টভাবে সুসন্নিবেশিত হয়। লোকসাহিত্য ইহারই একটি অংশ। ইহাকে অকৃত্রিম রূপও বলা চলিতে পারে। লোকসাহিত্যের গতি উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আগে, পিছে বা পাশাপাশি। এক ভাষাভাষী হইলেও অঞ্চলভেদে লোকসাহিত্যের রূপ, ভাষা, ভঙ্গি ও ধরন বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। বিশ্বে সমাদৃত ও সুযশ অর্জিত বঙ্গসাহিত্যের স্বর্ণ সিংহাসনের নীচে মানভূম লোকসাহিত্যেরও একটি ক্ষুদ্র কুশনির্মিত আসনে বসিবার অধিকার অবশ্যই আছে। লোকসাহিত্যের স্রষ্টা মানভূমের লোককবিগণ। এই লোকসাহিত্যের মাধ্যম মানভূম লোকগীতি। এবং আধার হইল মানভূম লোকনৃত্য। মানভূম লোকগীতি, লোকনৃত্য এবং লোককাব্যই হইল মানভূম লোক সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং বিকাশ।

ক্ষেত্র : মানভূমের লোকসাহিত্যের বিষয় জানিতে হইলে বর্তমান, খণ্ডিত মানভূমের সীমাকে ধরিলে ভুল হইবে। লোকসাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর অখণ্ডিত মানভূমের সীমায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। আজ রাজনীতির কূটচালে আদি মানভূম ত্রিখণ্ডিত হইয়াছে। আদি মানভূম দুটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল। দামোদর নদ ইহার প্রাকৃতিক সীমা ছিল। দামোদর নদের উত্তরাংশ ধানবাদ মহকুমা এবং দক্ষিণাংশ পুরুলিয়া সদর মহকুমা। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ধানবাদ শিল্পাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় সরকারের বহু বিভাগের হেড কোয়ার্টার হওয়ার জন্য এখানে SDO-র বদলে ১ জন ADC থাকিতেন। এনার পদমর্যাদা ও অধিকার DC-র সমতুল্য ছিল। এই ধানবাদ খনিপ্রধান অঞ্চল। ইহার সহিত বর্তমানে সদর মহকুমার চাষ-চন্দনকিয়ারি অঞ্চল ও বোকারো স্টিল সিটিসহ

জরিডি অঞ্চলের ২৮টি গ্রাম জুড়িয়া ধানবাদ জেলা করা হইয়াছে। বর্তমান ধানবাদে ১০টি অঞ্চলের মধ্যে ৫টি অঞ্চল সম্পূর্ণ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল। বাকি ৫টির মধ্যে বহিরাগতগণকে বাদ দিলে আদি গ্রামবাসী বা শহরবাসীরা সকলেই বাংলা ভাষাভাষী। ইহাদের অনুপাত শতকরা ৫০ ভাগ। এই হইল আদি মানভূমের উত্তর খণ্ড। সদর মানভূমের দক্ষিণ খণ্ডের ৩টি অঞ্চল চাণ্ডিল (ক) চাণ্ডিল (খ), পটমদা ও ইচাগড়কে সিংভূম জেলার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। চাণ্ডিলকে সরাইকেলা মহকুমার সহিত ও পটমদা ইচাগড়কে ধলভূম মহকুমার সহিত সামিল করা হইয়াছে। ইহা আদি মানভূমের সর্বদক্ষিণ খণ্ড।

সদর মানভূমের অবশিষ্ট যাহা নিতুরিয়া থানার কয়েকটি খনিক্ষেত্রকে বাদ দিলে ইহাকে সম্পূর্ণ শিল্পবিহীন অঞ্চল বলা যাইতে পারে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিয়া পুরুলিয়া জেলা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার আয়তন স্বল্প, আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি, উৎপাদন অত্যন্ত কম। আর্থিক পরিস্থিতি দয়নীয়। এখানের শ্রমিক দ্বিবিধ। মাটির মজুর বা ক্ষেতমজুর, দ্বিতীয় খনি-কারখানা অঞ্চলের শিল্পশ্রমিক। স্থানীয় ক্ষেতমজুরদের কাজ মাত্র ২ মাসের বাকি সময় তাহারা পশ্চিমবঙ্গের জোতদার-জমিদারদের কাজ জোগাইয়া আসিতেছে, রাজনীতির জটিল আবর্তে তাহাও আজ রুদ্ধ হতে চলেছে। কলকারখানা ও খনি-শ্রমিক নিয়োগও আজ আইনানুগ বিধি অসুবিধায় প্রায় বন্ধের মুখে। স্থায়ী শ্রমিক ছাড়া নতুন নিয়োগ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ উঠে গেছে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয় মানভূমকে এক অবিচ্ছিন্ন পৃথক সত্তা রূপে চিহ্নিত করা যায়। আদি মানভূমের কথা বাদ দিয়াও মানভূম লোকসংস্কৃতির একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে। তাহা আদি অখণ্ড মানভূম অপেক্ষাও বৃহত্তর। ইহার কথাও স্মরণ করিতে হইবে ভৌগোলিক দৃষ্টিতে নহে— লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রীয় দৃষ্টিতে। রাঁচি জেলার পূর্বাংশ সিল্লী, সোনাহাথু, বুণ্ডু, রাহে খুঁটি ও তামাড় অঞ্চল। হাজারিবাগের পূর্বাংশ পেটরবাদ, গোলা, রামগড়, নোওয়াডি বেরমো অঞ্চল। সিংভূমের পশ্চিমাঞ্চল ধলভূম, ঘাটশিলা, নৃসিংহগড়, গালুডি, চাকুলিয়া, বহেড়াগোড়া, মানুষ-খুড়িয়া অঞ্চল। সাওতাল পরগনার জামতড়া, মধুপুর, কর্ম্যাট্যাড়, দেবঘর, গোড্ডা, দালা দুমকার কিয়দংশ, সাহেবগঞ্জের কিয়দংশ, পাকুড় প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। এইগুলি হইতেছে মানভূম লোকসংস্কৃতির আদিম বৃহত্তর ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলকে বলা চলে Richest part of the country occupied by the poorest people' এই লোকসংস্কৃতি ক্ষেত্রের সব অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা কঙ্করময়, শুষ্ক ও অনুর্বর। বর্ষাকাল ব্যতিত সারা বছর জলাভাবগ্রস্ত। সাধারণত লোক বলিতে যাহারা বোঝায় তাহারা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, অর্ধাশনে-অনশনে দিনাতিপাত করে। কিন্তু প্রকৃতির উদ্ভূত বিকাশ গীতিকার বলেছেন প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি। জীবগণ স্ব স্ব প্রকৃতিবশে চালিত হন। এমন নির্জলা-নিষ্ফলা ভূমিতে লোক-কবিদের জন্ম হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আজ সেই প্রথিতযশা লোককবিদের ও তাহাদের রচনাশৈলীর কিছু উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র।

মানভূম লোকসাহিত্যের পুষ্টিবর্ধন করিয়া যে সব লোকগীতি রচিত হইয়াছে তাহার রচয়িতা হইতেছেন—(১) ভবপ্রীতানন্দ ঝা (২) চামু কামার (৩) দাস পীতাম্বর (৪) গৌরাঙিয়া (৫) নরসিংহা (৬) গঙ্গাধর ঘোষ (৭) রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি (৮) দুর্যোধন দাস (৯) বাজু রাম (১০) জগৎ কবিরাজ সাঁই (লগন দাস) (১১) টিমা কথক (১২) দুর্গাচরণ চৌবে (১৩) মনমোহন সিংহ টিকাইৎ (১৪) রাধেশ্যাম দাশ। মানভূম লোক সাহিত্যের মধুর রস ইহারাই পরিবেশন করিয়াছেন।

ইতিহাসে যে বারো ভূএঞাঁর কথা আছে তার মধ্যে (ক) মানভূমি (খ) শিখরভূমি (গ) বরাহভূমির

সম্পূর্ণ এবং সেনভূমির কিয়দংশ মানভূমে অবস্থিত। তাছাড়া ধলভূম, সিংহভূম, মল্লভূমও লোকসংগীতের ক্ষেত্র। ইচাগড়, পাতকুম, বরাবাজার, গোবরঘুসি

পূর্বেই বলা হইয়াছে লোকসাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে লোকগীতির মাধ্যমে এবং লোকগীতি সৃষ্টি এবং লোকগীতি সৃষ্টি হইয়াছে লোকনৃত্যকে অবলম্বন বা আধার করিয়া।

ঝুমুর নাচ, বাউল নাচ, ছৌনাচ, করম নাচ, কাঠি নাচ, বুলবুলি নাচ প্রভৃতি নাচগুলিকে আধার করিয়া লোকগীতি রচিত হয়েছে। মানভূমের বৃহত্তর অংশে এই নাচ প্রচলিত ছিল ও আছে। সুতরাং লোকগীতিগুলিকেও সেই আধারে শ্রেণিবিভাগ করিতে পারা যায়। মানভূম সংস্কৃতির প্রতীক বিভিন্ন লোকগীতি বিভিন্ন লোকপর্বকে কেন্দ্র করিয়া মানভূমের লোককবিগণ তাঁদের কাব্য বা গীতি রচনা করিয়াছেন। 'ঝুমুর' তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। বহু প্রকারের ঝুমুরকে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়।—

(১) বৈঠকি ঝুমুর (২) নাচশালার ঝুমুর (৩) ডাঁড়শালের ঝুমুর।

বৈঠকি ঝুমুরে নাচ চলে না, চলিলেও তাহা বিরল। নাচশালার ঝুমুরে সাধারণত নাচনি-নাচের সময় এবং ছৌনাচের সময় প্রয়োগ হয়। ইহাতে ঢাকঢোল মাদল সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। আজ ইহাকেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমপর্যায়ে আনিবার জন্য আধুনিক উন্নত বাদ্যযন্ত্র—যেমন হারমোনিয়াম, বেহালা, বাঁশি, বাঁয়া-তবলা ঢোল প্রভৃতির সংযোগ হইয়াছে। 'মাদল' ঝুমুর গানের ও নাচনি-নাচের একটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র। বৈঠকি ঝুমুরে অবশ্য সুরযন্ত্র ও পাখোয়াজ পূর্ব হইতেই ব্যবহৃত হইত।

ডাঁড়শালের ঝুমুরের সময় ভাদ্র মাস। এজন্য তাকে অনেক সময় ভাদুরিয়া ঝুমুরও বলা হয়ে থাকে। ডাঁড় শব্দের অর্থ কটিদেশ বা কোমর। এই নৃত্য আদিতে কুমারী কন্যারা পর্ববিশেষে সারিবদ্ধভাবে নাচিত। ইহাতে কোমরের হেলন-দুলন বেশি আছে। এক সারিতে এক দলের একই সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমার নৃত্য দ্বারা কটিদেশের যে সঞ্চালন হইত ইহা হইতেই ডাঁড় শব্দের উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন—

ছোট, মোঠ ঠিলিয়া—পানীয়া ভরে যায়।
ডুবে ঠিলিয়া লহকে উঠে ডাঁড়।।

ঝুমুর সংগীতের রচয়িতাগণ একেকজন একেক ধরনের ঝুমুর গীতি রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সবধরনের ঝুমুর রচনায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

ভবপ্রীতানন্দ ঝা :

ঝুমুর রচয়িতাগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি বৈদ্যনাথ ধামের পাণ্ডা ছিলেন। পঞ্চকোটের মহারাজা জ্যোতিপ্রসাদ মহারাজ ইঁহার রচনাসম্ভারকে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত করাইয়া মানভূম লোকগীতির এক উল্লেখযোগ্য স্মৃতি রক্ষা করিয়া গেছেন। এই পুস্তকটির নাম 'ঝুমুর রসমঞ্জরী'। রামায়ণ-মহাভারত সহ বিভিন্ন পৌরাণিক শাস্ত্রের বিবিধ ঘটনাবলিকে আশ্রয় করিয়া অধিকাংশ ঝুমুর রচিত হয়েছে। এছাড়াও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, মিলনকে কেন্দ্র করে একাধিক সর্বোৎকৃষ্ট ঝুমুর গীতি রচিত হয়েছে যাহা আজও অবিসংবাদী ও শ্রেষ্ঠতম। পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরের লক্ষ্মীদ্বারে ইহার পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন এবং পঞ্চকোট মহারাজের (তদানীন্তন) উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গেয়েছেন। আজ উভয়েই অমৃতলোকে কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি মানভূমের লোকসংস্কৃতি তথা সাহিত্যে এক বিরাট অবদান রাখিয়া গিয়াছে। ভবপ্রীতার রচনায় সবশ্রেণির গীতি দেখা যায়। এই ভাবুকের ভক্তিমার্গের ১টি রচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা

হইল। ইহা বৈঠকী ঝুমুরের সমগোত্রীয়— যথা—

জয় রমাকান্ত, নীলাম্বুদ শ্যাম কমললোচনমুখ মোক্ষধাম
চারু চতুর্ভুজধারী
ধৃত পীতাম্বর, ভুবনসুন্দর, ভৃগুপদচিহ্ন ধরি হে
জয় হরিহর বান্ধব মধুহারী।
জয় রামরূপ ভবার্ণবতরী রাবণ মদান্ধ মতিঙ্গ কেশরী
শিব ধনুর্ভঙ্গকারী
ভার্গব খোদ্যত রবি সমুদ্যত জানকী চিতবিহারী হে
জয় হরিহর বান্ধব মধুহারী।।
জয় কৃষ্ণরূপ কংসদলন বৃন্দাবনকারীধৃত গোবর্ধন
শ্রীরাধিকা মনোহারী
নীলরতন বংশীবদন, ভক্তজন ভয়হারী হে
জয় হরিহর বান্ধব মধুহারী।
যে পদকমলে অহল্যা তারিলে বলি দর্পনাশ কালিয়া দলিলে
বহাইলে গঙ্গা বারি—
ভবপ্রীতা ভনে ও রাঙা চরণে
শমন এড়াতে পারি হে
জয় হরিহর বান্ধব মধুহারী।।

এই পদটি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। ভাষা, ভাব, ছন্দ, মাত্রা ও বর্ণনায় অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে। ইহা গ্রন্থকার পাণ্ডাজির সশ্রদ্ধ ভক্তিপ্রবণ চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। ইহা ছাড়া এঁর রচিত কুন্তীর শিবপূজা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল শীর্ষক বিবিধ গীতিগুলি বহুল পরিমাণে চিত্তাকর্ষক ও বৈঠকি পর্যায়ের। পঞ্চকোটরাজের রাজবাড়ির শারদীয় দুর্গোৎসবের দেবীপ্রতিমা দেখিয়া তিনি নিম্নোক্ত পদটি রচনা করিয়াছিলেন—

আজ মর্ত্যবন নন্দনকানন, কৈলাসে কে রক্ষা যায় রে
কৈলাস রমণী জগৎজননী দেখনা আজি ধরায় রে।।
ডাক ডাক ভাই মনের সুখে জয় মা বলে সবাই রে
গুহগণপতি লক্ষ্মী সরস্বতী, অসুর পদ লোটাই রে
দশ কর করে দশ অস্ত্র ধরে—বিনাশিছে অরিকুল রে
ডাক ডাক ভাই মনের সুখে জয় মা বলে সবাই রে
এই তিন দিন কেবা মাতৃহীন ভবপ্রীতা প্রেমে গায় রে।।

এই ঝুমুরটি বৈঠক বা নাচশালেও গাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু ইহা সর্বসাধারণের উপভোগ্য নাও হইতে পারে ভাবিয়া তিনি জগন্মাতা অসুরদলনী মূর্তি দেখিয়া সেইখানেই বসিয়া একটি ভাদুরিয়া রঙের সুর দিয়া ঝুমুর প্রস্তুত করিলেন। যথা—

১ হেমাঙ্গিনী কে সুন্দরী দশ করে অস্ত্র ধরি
বিনাশিছে দেব অরিকুল গো
শ্রীচরণে সাজে জবা ফুল।।

২ কে রামা কেশরী পরে—দশ করে অস্ত্র ধরে
নাচিছে ঘোর সমরে—
রূপে যিনি চপলা মহেশ প্রেমে পাগলা।।
গণেশ কার্তিক সঙ্গে নাচিছে সমর রঙ্গে
সহ সরস্বতী কমলা
মহেশ প্রেমে পাগলা।।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনাতে ভবপ্রীতাজির স্থান অনেক উচ্চে। অভিসার রজনীর ব্যর্থ প্রভাতে শ্রীমতী রাধা কর্তৃক সন্দেহান্বিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে ভাবুক কবি বর্ণনা করিয়াছেন ভাদুরিয়া সুরের গীতি—

চিনিলে না সহচরী আমি শ্রীরাধার প্রহরী
দ্বারে থাকি ধরি অসি ঢাল গো।
মোরে চৌর বল কি জঞ্জাল।। রং
অভিসারে নীল বাস আঁধারে নহে প্রকাশ
পথ ভূলি এমত বেহাল গো।।
মোরে চৌর বল কি জঞ্জাল।।
সিন্দ কাঠি নয় ও রূপসী করেতে মোহন বাঁশি
রাধা নামে সাধি সদা কাল গো।।
দ্বিজ ভবপ্রীতা বলে খেলে হৃদি বৃন্দাবনে
রাধাসনে ত্রিভঙ্গ রাখাল গো।।

পাণ্ডাজির এই ঝুমুরটি জনপ্রিয় হইলেও দ্বিভাষী অঞ্চলের লোকদের জন্য হিন্দি-বাংলা ও দেহাতি শব্দ মিশ্রণে শ্রীরাধার উক্তি নাম দিয়া এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পদটি রচনা করিয়া সমাজে জনপ্রিয় হইয়াছেন। তিনি নিজেও দ্বিভাষী ছিলেন। পদটি হইতেছে—

হাটে যাও জী বংশীওয়ালে ইধরা কাঁহা
সমাতে হৌ
দ্বার সমানা চৌর সমানা অন্দর কাঁহাকো
আতে হৌ।।
বরন ভি কালা পহিরণ কালা সিন্দকারী
মলকাতে হৌ।
নিশি জাগরণ পর নারী সঙ ভোর এহা কৌ
আতে হৌ।।

ইহাকে 'মানভূম ঝুমকা' বলে গাওয়া হয়। ভবপ্রীতার রচনা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে বলে এ বিষয়ে বাহুল্য আলোচনা করিলাম না। ভবপ্রীতার ঝুমুর গান করিতেন মানভূমের বড়াম নিবাসী শিরোমণি হাজরা ও মৃদঙ্গ বাজাতেন শিরোমণি পাণ্ডা। ভবপ্রীতার গান, শিরোমণি হাজরার গলার সুর ও পাণ্ডার মৃদঙ্গ একত্র হইলে অপূর্ব রসের সৃষ্টি হইত। যাঁহারা সে সঙ্গত উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুলেন নাই। পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ভবপ্রীতার ঝুমুর শিরোমণি হাজরা বহুবার শুনাইয়াছেন কিন্তু শিরোমণি পাণ্ডার মৃদঙ্গ সঙ্গত হয় নাই। আজ এই তিন মহাশিল্পীই তাঁদের সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।

ভবপ্রীতার পরই লোকগীতির আর একজন অগ্রণী রচয়িতা 'দাস পীতাম্বর।' ইনি সেনভূমের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার 'ফুলকুসমা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীরাধার বিরহ বর্ণনায় পীতাম্বরের ঝুমুর আদর্শ বলে বিবেচিত হইয়াছে। পীতাম্বর দাসের 'বারমাস্যা' ঝুমুর সমাজে অতি জনপ্রিয় হয়েছে। ঝুমুরটি নিম্নরূপ—

আইল বসন্ত ঋতু মাঘ মাসের দিনে।
গুমরী[২] উঠে হিয়া প্রিয়াকে পড়ে মনে।।
ফাল্গুনে ফুটিল পুষ্প বাহরে সুগন্ধ
আমারে ভুলিয়া কোথা রইলে প্রাণকান্ত।
হে নিঠুর কালিয়া, অবলায় কাঁদালে হে
দাগা দিলে হে __ গুণের বঁধুয়া।।
চৈতে চাতক পক্ষী নিকুঞ্জ কাননে।
গুমরী[২] উঠে হিয়া পিয়া পড়ে মনে হে।।
বৈশাখে রবির তাপ পড়ে চন্দ্রমুখে।
তুমি পরবাসে বন্ধু আমি মরি দুখে।।
জ্যৈষ্ঠে যমুনার জলে গেলে বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি হে গুণের বঁধুয়া
আষারে নবীন মেঘ করে গরজন।
নাথে বিনে বিরহীর প্রাণ বাঁচে গো কেমন।।
শ্রাবণের বারিধারা অবিরল ঝরে।
বিজুলি চমকে হিয়া কাঁপে ডরে।।
ভাদ্রে ভরিল নদী দুকুল পাথার।
খেয়াঘাটে নাইয়া নাই শ্যাম কে করিবে পার হে।।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এ ভব ভারতে।
কার্তিকে হিমের জন্ম তৃণ কাঁপে শীতে।।
অঘ্রানে নতুন ধান্য নবান্নের দিনে।
তোমা বিনে নবান্ন মোর না রুচে বদনে।।
পৌষে পরমানন্দ সবাই করে পিঠা।
নাথ বিনে গুড় পিঠা নাহি লাগে মিঠা।।
এত কষ্টে বারো মাস রহিব কেমনে।
দাস পীতাম্বর রচে গীতি শ্রীগুরু চরণে।।
রে নিঠুর কালিয়া অবলা'য় কাঁদালি
দাগা দিলিরে গুণের বঁধুয়া কালিয়া।।

পীতাম্বর দাসের সমগ্র পদটি উদ্ধৃত করা হইল। ইহা খুব উচ্চাঙ্গের বিরহ বর্ণনা। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র যক্ষের বিরহের সঙ্গে ইহা তুলনা করলেও দোষ হইতে পারে না। কবি পীতাম্বর দাস নিজ মনে রাধার মন স্থাপন করিয়া বারো মাসের তেরো দুঃখের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে অবলম্বন করিয়া 'দীনাপণ্ডিত' ১টি অনুরূপ পদ রচনা করিয়াছেন।

এরপর অন্যতম রচয়িতা হলেন 'চামু কামার'। ইনি সাঁওতাল পরগনার গ্রাম্য কবি। কর্মশালাতে

বৃত্তিমুখী দৈনন্দিন জীবনে তাঁর কবিতা রচিত হইত। তাঁর রচিত ১টি প্রভাতি গীতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

গা তুলি কানহাইয়ালাল মম জীবন প্রাণ দুলাল।।
ওঠরে বাপ নীলমণি—খাও ক্ষীর, সর, ননী তাথে
মিশাইয়া, চিনি—
খাঁয় লাওরে প্রাণগোপাল অধম চামুয়া'য় বলে
পড়ে থাক্ গা চরণ তলে—দেখা দিও অন্তকালে
আমার যশোদা নন্দদুলাল—[২]

এরপরই বরাভূমের কবি রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির কথা আসে। ইনি বরাভূমের পাতকুম রাজ্যের রাজসভায় থাকিতেন। কোনো একসময় সভাপণ্ডিতের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে 'বীরডি' গ্রাম ছিল তাঁর পৈতৃক বাসস্থান। ইনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ছিলেন এবং মৃদঙ্গ বাজাইয়া নৃত্যসহযোগে গীত পরিবেশন করিতেন। রূপ বর্ণনায় রামকৃষ্ণর সমকক্ষ কবি সেকালে বিরল। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় তিনি ১টি পদ গাহিয়াছিলেন—

কাচ মরকত, নবীন জড়িত সুকোমলে তনু শ্যামল
তাঁর ভুরু দুটি আঁকা, ঈষৎ বাঁকা, বাঁকা আঁখি দুটি ঢল ঢল।
দেখে যা সখী ভরিয়া আঁখি—রূপে বন কত করে আলো।।
কুঞ্চিত কেশে শিরে বনাইয়ে—কৈ মোহন চূড়া বাঁধিল
কত যতনে জড়িত, রতন মণ্ডিত
তদুপরি শিখি পাখা দিল,
দেখে যা সখি ভরিয়া আঁখি।
ছিঃ ছিঃ কি কুলের গৌরব সখী বিনামুল্যে বিকাইব চল—
সে যদি আশ্রয় দেয় তবে হয়
রামকৃষ্ণের জীবন সফল।।

তিনি মাঝে মাঝে নর্তকীদের সাথে নৃত্যও করিতেন বলিয়া পাতকুম রাজাবাহাদুর রাজসভা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা করেছিলেন তাঁর পার্শ্বচর তথা স্তাবকদের কুযুক্তিতে। রাজসভার পণ্ডিতের নর্তকী বর্জনের আন্দোলন শুরু হইলে তিনি নিম্নলিখিত পদটি রচনা করিয়া স্বয়ং রাজার সমীপে গানটি নৃত্যসহযোগে শুনান ও দেখান এবং অব্যবহিত পরেই কিছুদিনের জন্য নর্তকী ও রাজসভা উভয়েই কিছুদিনের জন্য বর্জন করেন। রাজাবাহাদুর পরে তাঁহার রচনার ও প্রেমপ্রবণতায় অন্তর্দৃষ্টি বিচার ও অনুভব করিয়া কবি রামকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় পুনরায় সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নলিখিত পদটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—

রসের সায়রমাঝে প্রেমকমল বিরাজে—
পরিমল দিগন্ত যাহার।
আছে মধু শান্তি তায়— অন্যে কি জানিবে হায়—
সাধু অলি মর্ম জানে তার।।
ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী তাইতো তাহারে চায় গো
সে রসে বিরস মণ্ডুকী তায় নিকটে রহি না পায় গো
সখি ঐছন প্রেম, কি গূঢ় মরম
সকলে জানে কি তায় গো।।

বিধু অগ্নি ক্ষণপ্রভা পাইয়া তাহার আভা।
কমলিনী কত কি বিকাশে—
যত্ন না করিতে হয়, হইলে রবির উদয়
কমলিনী আপনি বিকাশে
ভেদ ভ্রম অন্ধকার, শুদ্ধ চিত হয় যাহার
বিরাজে বিকাশে প্রেম গো তার মনে
ও প্রেম না হয় সাধারণে।।
নাহি জাতি কুল মান, উচ্চ নীচ অভিমান
দীন দুঃখী কিম্বা ধনবান
প্রেমের নাহি বিচার, অন্য কি কহিব আর।।
চণ্ডালেরে কোল দিলেন রাম।।
ত্যজি অমূল্য রতন, কত উপহারগণ
যদুপতি প্রেমেরই কারণ
বিদুর ঘরে রম্ভাখোশা করিলেন ভক্ষণ
শন্তশীলা তাঁর মন।।
এহেন প্রেমে না জন্মিল রতি ধিক[২] রামকৃষ্ণের মতি
দুর্গতি তায় না হইল হায় পরম তত্ত্ব
মত্ত বিষয়ে মজিয়ে
দুর্লভ জনম অকারণে যার
ও তাই ডাকি হে প্রেমময় তোমায়।
কিঞ্চিত করুণা কর আমায়।।

ইহা রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম রচনা। এই পদবি মানভূমে সর্বস্তরে সমাদৃত। ইহা ছাড়া আরো ছোট ছোট বহুপদ ইনি রচনা করিয়াছেন। যেমন—

“পিরীতির রীতি বুঝা দায়—
বরং জাতি ছাড়া যায় গো—পীরীতি ছাড়া দায়
যে জন ভুলিতে কহে—সে কভু সুহৃদ নহে।
সে জনে না রামকৃষ্ণ চায়
পিরীতির ....
বরং .... দায়।।

রামকৃষ্ণের পাশাপাশি আরো একজন কবি দুর্যোধন দাস। সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর সীমায় পলাশডিতে বাড়ি। ইনিও অনেক পদের রচয়িতা।

পাতকুম অঞ্চলের আরো একজন পল্লীকবি গঙ্গাধর ঘোষ। ইনিও রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সমসাময়িক লোক। চাণ্ডিল থানার ‘দুলমী’ তে ইহার বাড়ি ছিল। রাধাকৃষ্ণপ্রেম বর্ণনায় রাধার বিরহের ১টি পদ উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—

ধরি ধরি মোর নাম, বাঁজে বাঁশি অভিরাম।
প্রাণসখি বল বল রা দিব কি না দিব
উ স্বরেতে সরে জল—নিভিল জ্বালা অনল

বল কাঁদিব কি বাঁধিব
প্রাণসখি—
ভনে দীন গঙ্গাধরে পিরীতি পাগল করে
বল বল রা দিব কি সাধিব।
প্রাণসখি—

ইহা ছাড়াও বরজুরাম, নরসিংহা, দীনা তাঁতি প্রভৃতি অনেক গ্রাম্য কবির ঝুমুর আছে, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে আসছে কিন্তু কোনো লিখিত রূপ পায় নাই। ইহাকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অলিখিত সাহিত্যের মতো বলা চলিতে পারে। একবার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক উৎসবে ডাঃ কালীদাস নাগ এইসব পদাবলী শুনিয়া অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। উপরিউক্ত কবিগানের রচনা অধিকাংশ ডাঁড় ঝুমুরের আসরে গীত হইয়া থাকে। যেমন—

সখি হে যমুনায় ঝাঁপ দিব
শ্যামপ্রেমে ডুবিয়া মরিব,
যে করিবে নদী পার তারে দিব গলার হার
আধাপ্রাণ তাহারে সঁপিব।।

মানভূমের অপ্রথিতযশা গ্রাম্য কবিদের রচনা সুন্দর হইলেও তাহার মর্যাদা সমাজে তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। উত্তম চিনি পাতা দই যদি তামা / পিতলের বাসনে থাকে তো তাহা অখাদ্যে পরিণত হয়। তেমনই রচনা এই ঝুমুরগুলি নাচনি-নাচের আসরে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া তেমন মান্যতা পায় নাই। ইহার আমুল পরিবর্তন করিয়া লোকগীতিতে এক যুগান্তর আলোড়ন আনিয়াছেন তিনি হইলেন জগৎ কবিরাজ। ইনি মানবাজার থানার পল্‌মী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। কর্মপোলক্ষে তিনি চিকিৎসকরূপে বাগমুণ্ডি, বেগুনকোদর প্রভৃতি জমিদারগণের বাড়িতে থাকাকালীন লোকগীতি রচনা করিতেন। মানভূমে যে সব লোকগীতি রচয়িতার আর্বিভাব ঘটেছে জগৎ কবিরাজ তাহাদের শ্রেষ্ঠতম। এনার রচনাশৈলীও অপূর্ব। তিনি নিজে সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। ইনি স্বয়ং নিজ রচিত গান গাহিলে সুরযন্ত্রের সহিত পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিত। তিনি নিজে বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। সুতরাং তাঁর রচনাবলিতেও সেই ভাবপ্রবণতা ছিল। তাঁহার রচিত অধিকাংশ পদগুলি শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেম-বিরহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন

বাঁকা লম্পট, শঠ, কপট কুটিল কঠোর কালিয়া হে
অবলা মানস পতঙ্গে পোড়ালি বিরহ অনল জ্বালিয়া হে।।
ঢুলু ঢুল দুটি বঙ্কিম নয়ন, এসেছ কি পথ ভুলিয়া হে—
তোমার অঙ্গের পরশ না লাগে যেমন কুঞ্জের দ্বার হতে
যাও চলিয়া হে।
জগতে জগৎ না আসে যেমন পতিত পাবনে স্মরিয়া হে।

এই পদটি আক্ষরিক সমাবেশ ও শব্দঝঙ্কার অনুধাবনযোগ্য। ক্রমান্বয়ে ট, ক প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগ তুলসীদাসকৃত 'রুদ্রাষ্টকে'র মতো। দ্ব্যর্থকদ্যোতক বহু পদও তিনি রচনা করিয়াছেন। যেমন—

একি নীল জলধর সখি একি নীল জলধর[২]।
যমুনা সলিল, দেখ সব নীল। কি নীল কিনিল
কেমনে যাই ঘর সখি

চিত নিল চিত চৌর সখি—মন নিল সে নাগর।
দেখ দেখ কে উরে, বল বল কে উরে
শুন শুন কেয়ূরে কেয়ূরে
দিতেছে সুস্বর সখি
একি নীল জলধর
চিত নিল চিত চৌর সখি মন নিল নাগর।
কেমন যাবো বল ঘর সখি।
নাচিছে চপলা এখনও চ পলা
জগতের জ্বালা ঘুচাও সত্বর সখি
এ কি নীল জলধর সখি।।

এক জায়গায় কি নীল অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য গাঢ় নীল রং-এর বর্ণনা অন্য জায়গায় কিনিল অর্থাৎ ক্রয় করিল—আমার মন-প্রাণকে কিনিয়া লইল। একটি উর শব্দের অর্থ খাওয়া, অন্য এক জায়গায় উ কে অর্থাৎ উনি কে অন্যত্র কেয়ূর পুচ্ছধারী ঠাকুর যেমন সুস্বর দিতেছে। শিখিচূড়া অলংকৃত শ্যাম রূপকে নব নীল জলধরের সহিত তুলনা করিয়াছেন—

কাচ মরকত উজ্জ্বল নীলকান্ত মণি-মাণিক্য ভূষিত পীতবাস যেন চপলা ও আরেক অর্থে চ পালিয়ে চ।

শেষে আবার বলেছেন—

নপরন দিলে রে মেঘের উলটা বরিষণ।

অর্থাৎ শ্যামরূপ মেঘে জল নাই। সেই মূর্তিকে দর্শনকারীর চক্ষেই জল আসে।

ভক্ত কবি কবিরাজ মহাশয় গাহিয়াছেন—

ওই নাম ফিরে ফিরে বল
অন্তরে প্রবেশি গো নাম প্রাণ করে শীতল,
কেন এ নাম বলিতে বিধি কোটি বদনাম দিল।
নাম ফিরে ফিরে বল।।
মনরে তুমি কোথা হইতে, এসেছ ভব মাঝেতে
সেদিন কর না স্মরণ।
উত্তপ্ত গারদ মাঝে, সদা নরক ভোজন, মনপামরা!
তাই বলি তোরে কেন না হল চেতন।
জনম লভিলি হায় পড়িলে ঘোর মায়ায় মায়া ঘেরিল তখন
সেখানে পুরুষ কেবা সেদিন ছিল অন্যজন।
মন পামরা তাই...
কে বা দিল এহেন জ্ঞান, স্তন ধরি পয়ঃপান
ভেদ কে দিল তখন
অক্ষয় অব্যয় ধারা সেথা কে করে পূরণ
মন পামরা...
এহেন যৌবন দশা ধন ধারা সূত ভালো ধামা
সদা না রবে এমন

চক্রধর ভাবে সদা হেরি শিয়রে শমন
মনপামরা তাই বলি তোরে
না হল চেতন।।

কবি চক্রধর সিংহ পিতা গিরিশ সিংহ পূর্বনিবাস হাজারিবাগ জেলার মোদকরপুরে। সহন সিংহ গিরিশ সিংহদেব পিতা সহ এসেছিলেন। তখন সরকারি বিদ্যালয় ছিল না, যোগডিতে প্রাইভেট পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন।

হরিনাম কীর্তন তিন রাত্রি দিন
বিশাল বৈষ্ণবগণ।
ব্রাহ্মণ ভোজন বৈষ্ণব ভোজন
দরিদ্র ভোজন অগন।
হিম কুমারী সতী—সদা ধর্মে মতি
ঝরিয়ার ছোট রানী।।
ছোট রানী মা'র পরগা খামার
দেবী দেবালয় পাঁচখানি,
চক্রধর গায় বসি পরঘায়
কর মা বিদায় আসি আমি।।

(সরস্বতী বন্দনা)

যুগ ঋতু মনে শীত ঋতু শূন্যে
সারদা জ্ঞান প্রদায়িনী
পঞ্চমী তিথিতে পুষ্পাঞ্জলি নিতে
অবতীর্ন সহ সঙ্গিনী
মাঘের তিরিশে বেলা একাদশে
সভক্তি মতে মা তারিণী
দ্বিজ মন্ত্র মতে সবধান সহিতে
অঞ্জুলি ধরি পুষ্পপ্রাণ
পঞ্চম দেব মান গণেশ চরণে সবাণী
উৎসাহ পরেতে মাতাজির মতে
দিবানিশী ঘোল নাচনি
সঙ্গিত অহরহঃ শুনি অদ্বিতীয়
থিয়েটার নব রজনী
রাধামণিদাসী সহ পঞ্চনিশি
সঙ্গত করি নাম আমি।

(রাজপ্রশস্তি)

শ্রীল শ্রীযুক্ত—শ্রীমান প্রতাপচন্দ্র রাজন
তামাড় রাজ্যের নররায় হে
ধন বিদ্যাহীন, মূঢ় অভাজন পদে প্রণাম জানাই হে
তুলহ অবোধজনে, নিজগুণে করুণায় হে

গণেশাদি পঞ্চসনে বন্দী লক্ষ্মী জনার্দনে
শ্রীরাধামাধব অম্বিকায় হে।
মঞ্চে শ্রীরাধা রমণী সিন্ধু সুতা সারদায় হে
তুলহ অবোধ মনে
বন্দী মা দেওরীবাসিনী মন্দির বহু পুরানী
শিলারূপী শিব মহিলায়।
রাজ্য দেব দেবী শ্রীতুলসী দেবী জানি না জানির পায়ে হে
নলরাজনের মতো রাজ্য পর হস্তগত
গড় মলিন তো তাই হে
শেষে কর্কট দংশনে যেন মহারাজা ত্রাণ পায় হে
যেমন শ্রীরাম দেবী আইল শুনি প্রজা সিন্ধু উথলিল
প্রেমানন্দে ভেসে যায় হে
দরশন করি ধরে চক্রধারী
প্রভু চরণ নৌকায় হে
তুল নিজগুণে।।

রাঁচি জেলার তামাড়বুণ্ডু অঞ্চলের লোককবি গৌরাঙ্গাইয়ার ঝুমুর ও নাচশালে বহুল প্রচলিত ও হৃদয় গ্রাহী যেমন—

সাঁঝের বেলা জলকে যাঁয়ে হল জানাশুনা
পিরীত প্রেমের ফাঁদ পরলাম দুজনা
ধনীরে ধনী আমায় ভুলো না। রং
কত সাধের ভালোবাসা আশা ভাঙ না
ধনীরে .... রং
ধন যৌবন দুটি দিন তার গুমান কর না
ফুটা ফুল বাসি হলে তাই ভ্রমর বসে না।
ধনীরে ধনী আমায় ভুলো না।।
পরের মন নিতে জান দিতে জান না
গৌরাঙ্গইয়া পাপীর প্রাণে দাগা মারো না
ধনীরে ....
কত সাধের ....।।

পিরীতের উৎপত্তি, পরিণাম-বাহ্যিক পিরীতি যে ক্ষণস্থায়ী তাহা কবি সহজ কথায় সংক্ষেপে বলিয়াছেন। ছোট ছোট গীতিমধ্যে স্বভাবকবিগণ নিজের অন্তরের আবেগ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তার ২ / ১ টি নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

একটি মরীচ গাছ কত যতন করব
রাজার ছাগল খায়ে দিলে কাকে নালিশ করব
১টি পুঁটি মাছ কি দিয়ে রাঁধ্যব গো
বাগাল বঁধু মরে গেলে কি বলে কাঁদব গো।।
ভাঙা খাটে ছেঁড়া কাঁথায় কত না কাল কাটবো

খুলাখুলি জবাব পালে ঘুরে মানুষ ধরব।।
বাড়ি হেটে যাতে যাতে টুরী বেঙে ঠেকলো
ভাগ্য ছিল বলে আমার জীটুকু বাঁচলো।।
সাঁঝের বেলায় কদম তলায় কে বাজালে বাঁশি হে
আমি বটি নন্দলাল ভাঙব কলসি হে।।
বাগাল কে বাঁধেছে দুধি লতে তাই বাগাল ঘর নাই আসে
লোকার ছেল্যা জন্যার খায়—আমার ছেল্যা কাছাড় খায়
কবে রে জনারের লাগাল পাব খলা বসাই পঠপটা করাব।।

ঠিক-দুপহর বেলা কে মারিল চালে ঢেলা
ঢেলা লয় শ্যাম পানের পুঁটুল্যা
বুঝা গেল মনের ভাবের খেলা
ঢেলা .... পুঁটুল্যা।
রাধা ভাবে মনে কেমনে নাচিবে করম শ্যাম বিনে।।
সীতায় অশোক বনে—শুনলো রামের কথা
হনুমানে।।

ঝুমুরের পরই বাউল গীতির স্থান। বাউল গীতিতে নির্গুণ দেহতত্ত্ব, গৌরাঙ্গ লীলা রাধাকৃষ্ণ প্রেম-মিলন বিরহের বর্ণনা আছে। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, জগৎ কবিরাজ ঝুমুরিয়াগণও বাউলগান রচনা করেছেন।

কি ভাবেতে হল রে কানাই নবীন গৌর সন্ন্যাসী—রং তোমার কালো রূপ রস কৃষ্ণে আমি ওই রূপ ভালোবাসি কইরে শিরে মোহনচূড়া—ছড়ার উপর শিখিদাঁড়া
কই পীত ধড়া—
মা যশোদার জীবন চূড়া কই মুখে মৃদু হাসি
কই রে গলে বনমালা
সে রূপে যেন চপলা করিত আলা
সে রূপেতে এজবালা মন ইহ চায়ে উদাসী
কই রে করে মোহন বেণু যার স্বরেতে আপনি ধেনু
ফিরত কাননে
মৃত তরু গাঞ্চরিত পাষাণ গলে হতো জলরাশি।।

যে যুগল চরণ কমলে
সরস কমল বিরাজে
গোরা শুধু কি সাজে
রামকৃষ্ণে কয় ঐ চরণের
আমি ধ্যান করি দিবানিশী।।

এ সংসার কে তোর আপন বল দেখি মন

আপনার বলে পরকে কত কররে যতন।।
অনেক পক্ষী থাকে ডালে প্রভাত হলে যায় সকলে
পাথর পথিক সঙ্গে যেমন হয় রে মিলন।
এ কটা দিন বয়ে গেল বদন ভরে হরি বল
জগতার হল ডাঙাতে ডিগরে মরণ।।

পঞ্চকোট মহারাজের রাজপণ্ডিত রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তীও অনেক বাউলগীতি রচনা করিয়াছিলেন। ইনার রচিত গানগুলি মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল—২/১টি গান যেমন—

দেখা দিও পারের ঠাকুর পারের বেলা। রং
বাজার করে ভবের হাটে আসব যখন খেয়া ঘাটে
ফিরে যাবার বেলা সিন্ধুতটে সন্ধ্যাবেলা
সাধুমুখে করেছি শ্রবণ —তুমি হরি পতিত পাবন
দীনদয়াল আমি তারণ হে চিকন কালা
পারের বেলা
রাখালের এই নিবেদন অন্তিমে দিও দরশন
হরি বলে ছাড়ব যখন এ সংসারের ধুলোখেলা।।

মানভূমে বাউল গীতির একজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতা শ্রী লগন সাঁইদাস। ইনি দক্ষিণ মানভূমের স্বভাবকবি। মানভূমে নিজস্ব ঢংয়ে যত বাউল গীতি আছে তার আদি গুরু বন্দনা গানটি লগন সাঁই মহাশয়ের রচনা—

নমো নমো. গুরুদেবায় স্মরণ বন্দন ও রাঙা পায়
শেষে বলেছেন
ধরগা চরণে ডর বা কায়।।
দেহতত্ত্বের তার ১টি গান—নিম্নরূপ—
কর ক্ষেতি এ কীন মনে দেহ জমিন হয় কিনা জানে।।
আহা কি নয়াচাঁদ উপারে দিয়াছে বাঁধ
তবু চাষ হাল জতনে কর ক্ষেতি একীন মনে।।
ছয়টা বলদ ঘরে বাঁধ তারে প্রেমডোরে
ছয়টা বলদে চালাও একীনে।।
চৌদ্দ ভুবনে জল—জলে করে ছলছল
দেখ জল ছাড়া না হয় যেমন, জমিনে—
কোটিতে একজন চাষা, লগন সাঁই এর মিছে আশা
লয়াকুড়া ধিক্ ধিক্ জীবনে।
কর ক্ষেতি একীন মনে।।

ইহা ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে বহু বাউলগীতি মানভূমে প্রচলিত আছে।
যেমন—হরে কৃষ্ণ বলে ডাক দেখি ওরে মনপাখি
মুদিলে নয়ন দেখ দেখি আসলে সকল ফাঁকি—
ওরে মনপাখি।

বাঁধা আছ কলের পিজরে একল বিকল হয়ে
যখন মন
করবি কি ওরে
যদি দিন বোল হারাবে কেনো ফুরাবে সেদিনের
উপায় ভাব দেখি।
তোর বিষয় আশয় স্ত্রী পরিজন সব পড়ে রবে
আশালতার ফুটবে না ফুল শুকিয়ে যাবে।
যেদিন দিন ফুরাবে নিদান হবে—সেদিনের উপায় ভাব দেখি
ওরে মনপাখি।
দাস হরিদাসে কয় এ ভবের রীতি দেখেশুনে মনে লাগে ভয়
তাই অভয় স্মরণ গুরুর চরণরেণু মাখ দেখি
ওরে মনপাখি।

বাউল গীতির পর—বিভিন্ন লোকপর্বের গান যেমন—করম, ভাদু, টুসু প্রভৃতি সমাজের প্রতিটি কোণে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে।

করম ঃ করম বৃহত্তর মানভুমের লোকপর্ব। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীতে এই উৎসব হয়। পার্শ্ব একাদশীতে এবং তারপর দিন দ্বাদশীতে ইন্দ পূজা হয়। ইহা কন্যাগণের ভ্রাতৃমঙ্গল উৎসব। যুবতী অনূঢ়া কন্যাগণ সারি বেঁধে করমগান সহযোগে নাচে।

নতুন বৌ শ্বশুরঘরে আসিয়াছে তাহার খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস বা ধরন-ধারণ কেমন তাহা ননদ, ঠাকুরঝিরা গানের সুরে বলিতেছে—

একটি ঝিঙালত বাড়ি বাড়ি যায়
লৌতন বহু নেসনি ঝিঙ্গা নাহি খায়।।

নতুন বৌ সাজিয়া কন্যা যখন পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরঘরে যাইবে তখন তার সেখানে শ্বশুরবাড়ির নিত্য সহচর হইবে দেবর ও ননদি, ইহাদিগকে খুশি করিতে পারিলেই সে শ্বশুরবাড়িতে মহাসুখে থাকিতে পারিবে। তাই—

লাল লাল টুপা লিব ননদি ভুলাতে
তাল ভেড়কা হুকা লিব দেবরা ভুলাতে।।

সমাজে স্বামী অপেক্ষা দেবরের সম্মান যেন বেশি হয সেজন্য করম গোঁসাঞের কাছে প্রার্থনা করিয়া গায়—

ভৈয়া লাগি দিও গোঁসাঞ রাজদরবার হে
সেঁয়া লাগি দিও গোঁসাঞ শ্বশুরা দুয়ার হে।।

সমাজের অভাব / দৈন্যতার প্রতিচ্ছবি পরিবারের উপর প্রতিফলিত। শ্বশুরবাড়ির দৈন্যতার কথা কন্যা মা-বাপের নিকট সই / বাল্য বান্ধবীর মা, বলিয়া পাঠাচ্ছে পরোক্ষ উক্তিতে অভিমানের সুরে—

একদিনকার হলুদ বাঁটা তিনদিনকার বাসি লো
মা-বাপকে বলে দিও বড় সুখে আছি লো।

করম গোঁসাঞের বিদায়ের গান—

আজরে করম গুঁসাঞ ঘরে ঘরে দুয়ারে
কালরে করম গুঁসাঞ কাঁস নদী পারে।।

করম পূজা জিতাষ্টমীর ন্যায় আঁখ, মহুল, ধান ইত্যাদি ডাল-পাতা সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

করমের পর 'ভাদু' পরব। ইহাও কন্যাদের উৎসব। ভাদ্রমাসের প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়া ভাদ্রের শেষে সমাপ্ত হয়। ভাদুর ভাসানের দিন ছাতাপরব হয়। কথিত আছে যে পঞ্চকোট মহারাজের রাজবাড়ি হইতেই ভাদুপূজার আরম্ভ। এখনও ধূমধামের সহিত রাজধানীতে ভাদুপুজা হইয়া থাকে। ভাদুর দ্বিভুজা মূর্তি হয়। রাজধানী যে ভাদুপূজার উৎসস্থল তাহা নিম্নেয় গানটিতে প্রমাণিত হয়—

'কাশিপুরের মহারাজা সেও করে ভাদুপূজা
ভাদুর শীতল, চূড়ান মিঠাই রসকরা জিলিপি খাজা।।

মানভূমের পূজিতা ভাদু কখনও কন্যাসমা আদরণীয়া আবার কখনও গ্রাম্য বালিকার সই-সঙ্গী বা সহচরী তাই প্রতিটি গানে ভাদুকে উপলক্ষ করে কখনও তাকে কন্যারন্যায় বা বাল্যসঙ্গীর ন্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এ যেন একেবারে আপনজনের মনের কথা—অন্তত ভাদু গানগুলোতে তাই পরিস্ফুটিত হয়েছে, যেমন—

চল ভাদু চল খেলতে যাব রানীগঞ্জের বড়তলা
ফিরার পথে দেখায় আনব কয়লা খাদের জল তুলা
কয়লা খাদের জল তোলাতে গা ঝিম ঝিম মাথা দুখা
ডাক্তার আনে হাত দেখা কাকড় খায়ে কহবি...
ওহে ওহে ডাক্তারবাবু আর খাব না জল সাবু
পিত্তিতে ধরেছে মাথা আনে দাও কমলা লেবু।।
আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গা জালি ধরে না।
বিটি ছেলার মিছা জনম, হয়ে কেনে মরে না।।
কেনে মরব কেনে মরবে মা বাপকে দুঃখু দিয়ে।
পরের বেটা নিয়ে যাবেক ঢং ঢংগীটা বাজায়ে।।
রোদ উঠেছে ক্ষিনি ক্ষিনি ভাদু কেন উঠে না।
উঠ ভাদু চেতন কর জনম জ্বালা দিও না।।
রাম নাকি রে বনে যাবে মাকে কেন বলো না।
মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য ধরে হে রাম বনে যেও না।।
চল সরদা, ল বরদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব।
কুলহীর জলে সিনান করে, ছাতা ট্যাড়ের হাট যাব।।
কলঙ্গার কুলুপ কাটি হলুদ বলে ছেঁচেছি।
হে শাশুড়ি গাল দিও না পাষাণ হয়ে বসেছি।।
ওমা, মাতা শুধহা পাঠাস না শ্বশুরবাড়ি।
শাশুড়ি ননদি বলে কই আনলি হাঁড়ি-কুঁড়ি।।
বাপের ঘরে বড় মজা গাগরা কাঁখে চাল ভাজা।
শ্বশুর ঘরের বড় জ্বালা লোক বুঝাতে যায় বেলা।।
এ বছর তো যেমন তেমন আর বছরকে মেড় দিব।
বড় বৌ-এর বেটা হলে ঘর ভাঙে দালান দিব।।
ওহে কাকা লিলি টাকা দিলি হে বুঢ়া বরে।
বুঢার সংগে চলতে লারি রঘনাথপুরের বাজারে।।

রঘনাথপুরের লকে বলে ইটি তোমার কে বটে?
লোকের লাজে বলতি লারি ঠাকুরদাদার ভাই বটে।।

কন্যাগণ নিজেদের মনের ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, মান-অভিমান, সুবিধা-অসুবিধা, প্রেম-ভালোবাসা-বিরহের ভাদুকে উপলক্ষ করে গীতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

ভাদুর ন্যায় 'টুসু' ও লোকগীতির আসরে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে।

পৌষ মাসের নবান্নর দিন টুসুর জন্ম। সারা মাস টুসুর গান হয় ও সংক্রান্তির দিনে টুসুর বিসর্জন হয়। সাধারণত নতুন লাল টুপাতে টুসু সাজানো হয়। ভাসানের দিনে চৌঢল করা হয়। কোনও কোনও স্থানে বিশেষত দক্ষিণ মানভূম ও ধলভূমে টুসুর প্রতিমা করা হয়।

টুসু ও কন্যাগণ কর্তৃক পালিত ও উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ইহার আদিগান নিম্নরূপ—

ছোবড়ি লো লবড়ি আরো তিল ছাঁই
বাটিতে করে ঘি গুড় দিব খাও টুসালে মাই।
টুসু সিনাছেন, গা দুলাছেন হাতে তেলের বাটি
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন, গলায় সোনার কাঁটি।।

'বারমাস্যা'র গান টুসু সংগীতে

মাঘ মাসে মধু মিঠা কচি কচি শিম।
ফাগুনে দ্বিগুণ মিঠা বেগুনেতে নিম।।
চৈত্রে শ্রীফল পাকা খেয়েছিলেন রাম।
বৈশাখতে শশা মিঠা ষোল মাছে আম।।
জৈষ্ঠ মাসে পাকা আম আষাঢ়ে কাঁঠাল।
শরাবনে খৈ দৈ ভাদরে পাকা তাল।।
আশ্বিনেতে ইখু মিঠা কার্তিকেতে ওল।
অগ্রহায়ণে নতুন অন্ন চেঙ্গ মাঝের ঝোল।।
পৌষ মাসে মুলা মুড়ি খেতে লাগে মিঠা।
আঁধা দুগ্ধ পাকা রম্ভা আর বাসি পিঠা।
বারো মাসে তেরো মিষ্টি আর মিষ্টি কি।
বাসি ভাতে বেগুন পোড়া খিঁচুড়িতে ঘি।।

"পৌষ পরবে মকর পরবে টুসুর পা পড়ে না গরবে। বাড়িনাম'য় তমালের বন কোকিল ডাকে ঘন ঘন। আর ডেকো না বনের কোকিল, টুসু আমার অচেতন।।

টুসুর গীতিকে অবলম্বন করে মানভূমে অসাধ্য সাধন হয়েছে। বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার প্রতিরোধে রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরুদ্ধে আদি টুসুর সুরকে আশ্রয় করিয়া মানভূমে যে সব টুসু গান প্রস্তুত ও গীত হইয়াছে এবং মালভুমের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে যাহা টুসু সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত তাহার অবদানও কম নহে। সুখের কথা বিহার রাজ্য সরকার টুসু সত্যাগ্রহের যাবতীয় টুসু গানের রেকর্ড সংগ্রহ ও প্রস্তুত করেছেন। সংসদে তাহার প্রশ্ন উঠেছিল।. এইসব টুসু গানের রচয়িতা শ্রী ভজহরি মাহাত, অরুণচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি সংগ্রামীরা। সত্যাগ্রহের সময় নিম্নোক্ত ২টি গান খুব চালু হয়েছিল—

(১) শুন বিহারি ভাই

তোরা রাখতে লারকি ডাং দেখাই—(ভজহরি)

(২) বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
ও ভাই মারবি তোরা কে তারে।। (অরুণ)

আজও মানভূম ও ধলভূমে দলে দলে টুসু গান গীত হয়। নতুন নতুন গান প্রস্তুত হয়।

ইহা ছাড়া মানভূমে ছাতপিটা, ধানরুয়া, বিবাহ গীতি ইত্যাদি আজিও মহানন্দে ঐকতানে গীত হয়।

ছাতপিটার গান ঃ

ধান শুখালে ভাত হবেক হেই লো ভাত হবেক।
সেই ভাত খায়ে শ্যাম পুরুল্যা যাবেক।।
মরি মরি পুরল্যা যাবেক।
কলকাতার কালো কুঠি হেস্ট কালো কুঠি
কালো বেগুন পয়সাতে দুটি
মরি মরি পয়সাতে দুটি।।
রাম দুই তিন হিসাবে একসঙ্গে থাপি চলে ও গান হয়।

ধানরুয়ার গীতি ঃ-

তোর মনে আমার মনে হে
গাঁথে দিব কালী কলমে।।
কাঁসা ভাঙলে কাঁসা জড়ে মন ভাঙিলে জড়ে না হে।।
রাই কাঁদিস না কালা হবি লো আর কাঁদলে
কি শ্যাম চাইলে পাবি লো।।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহের গীতি :—

বাউরি সমাজের কোথাও কোথাও আজও প্রচলিত আছে বিবাহ উপলক্ষে এক শ্রেণীর গান গাওয়া হয়ে থাকে—যেমন—

বামহুনদের বাড়িতে জড়া বেললো বামুনদের ... লো
ঐ বামনের ছেল্যা হলে মাখতে যাব হলদ তেল।।
বামুনদের বাড়িতে তেতুঁল গাছ লো বামুনদের ... লো।
হায় চামনি তেঁতুল দেয়ে লিতই খুঁজে বড় মাছ।।
বেহাই আল্যে মারবি খুঁকড়িলো—জামাই আলে
রাধিব বেশাতি।
ঐ বেহাইকে খাওয়াই দাওয়াই পাঠাই দিব বরাতী।।

এছাড়া কতকগুলি ছড়া আছে যাহাকে এখানে 'পটকা ফলই' বলে—
যেমন—

'যেমন আখন তেমন চাখন
ভাঙা হাঁড়ির বুচা ডাকন।'

যেমন

"যেমন কন্যা গুণবতী তেমন পাত্র রসিক তাঁতি'
এত যদি তোর সুখ কপালে তরে ছেড়া কাঁথা কেনে কাঁক বগলে

"ওল কুটিতে আদার রস
গেঁড়া ভাতার মাগের বস।"
"গুঁড়ি কুটতে হল সাঁঝ
থাকুক পিঠা ভাতেই রাঁধ।।
"ঢেকির ধুমুসে পরান ফাটিছে
বদনে না সরে রা।"

মানভূমের লোক-কথাসাহিত্য ঃ—লোকসাহিত্যের অন্যতম ধারক ও বাহক হল লোককথা লোকগাঁথা। মানভূমে ইহাকে রাত কহনি বা 'রাত কথা' বলা হয়ে থাকে।

লোককথার কথক রূপে যাঁরা বিখ্যাত, তাঁরা হলেন—

(১) শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (চন্দনকিয়ারী থানা যোগিডি গ্রাম)

(২) বৈকুণ্ঠ অধিকারী (চাষ থানার ঘেটালি গ্রামের)

(৩) চক্রধর সিংহ (চন্দনকিয়ারী থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে)



অগ্নিভূমে এক অগ্নিবিহঙ্গ

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

রুক্ষ রক্তমৃত্তিকার দেশ। গ্রীষ্মে আগুন জ্বলে—জলে স্থলে আকাশে। মাটির বুক চিরে তৃষিত আকাশ শেষ জলকণিকা পর্যন্ত শুষে নেয়। পলাশে পলাশে বৃক্ষশীর্ষ রক্তাক্ত। গাছের পাতায় সবুজের ছোঁয়া নেই, নদীর ধারায় নেই ফেনিলোচ্ছ্বাসে ভরা জীবন। তৃণ লতা গুল্ম কুসুমে আগুনের আঁচ। আগুন হাওয়ায়। পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবর্ষী, প্রস্তর প্রসারিত মরুময় এই ভূখণ্ডের নাম পুরুলিয়া। একদা এই অগ্নিভূমে এক অগ্নিবিহঙ্গ ডানা মেলে উড়েছিল। সে ওড়ার ইতিহাসে আনন্দ আছে বেদনাও আছে। এখানকার তরু শীর্ষে তৃণমূলে বসে সে বিহঙ্গ বিশ্রাম নিয়েছে, গেয়েছে গান। ক্ষণকালের দীপ্তি ছড়িয়ে দাহভরা বুক নিয়ে আবার উড়ে গেছে সে তার পুরনো নীড়ে। সে অগ্নিবিহঙ্গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে কোনও এক সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরুলিয়া গিয়েছিলেন। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের অভিমত অনুসারে মধুসূদনের প্রথম পুরুলিয়া গমন ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। তিনি প্রায় একটানা ন' মাস ছিলেন। কোনো মামলা-মকদ্দমা পরিচালনা করতেই তাঁকে পুরুলিয়ায় আসতে হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিষ্টারি পাশ করে দেশে ফিরে মাইকেল আশা করেছিলেন আইন ব্যবসায় পশার হবে। ঋণজাল থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন, সংসারের দুঃখকষ্টও কিছুটা কমবে। কিন্তু সবই দুরাশা। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর নামডাক হল না। মাদ্রাজে থাকার সময়েই তাঁর গলার স্বর ভেঙে গেছে। আদালতে বক্তৃতা আর তেমন জমে না। তাছাড়া অন্যান্য আইনজীবীদের মত সওয়ালের সময় নির্বিচারে বিচারপতিদের তিনি খোশামোদ করতে পারেন না। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট, বাদ প্রতিবাদ তীব্র। এমনকী জ্যাকসনের মত বিচারপতিকেও অযথা সমীহ করার মানসিকতা মাইকেলের ছিল না। কলকাতায় পশার জমল না বলেই মামলা-মকদ্দমা নিয়ে তাঁকে বাইরে আসতেই হত। এইরকম একটি মামলা উপলক্ষেই মাইকেলের প্রথম পুরুলিয়া দর্শন।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পুরুলিয়া মানভূম জেলার সদর শহর। বিহারের প্রান্তবর্তী এই শহরটি ধীরে ধীরে প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠেছিল—প্রকৃতির বিরুদ্ধতা ও কর্কশ আচরণের মধ্যেও বাণিজ্য, প্রশাসনে ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে নিজের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। মধুসূদন যখন পুরুলিয়ায় এলেন তখন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও। পঞ্চকোটকে স্থানীয় মানুষজনেরা পাঁচেট বলতেন। পাঁচেটের কাশীপুরে ছিল নীলমণির আবাসস্থল। নীলমণি স্বজাতি এবং স্বদেশপ্রিয় অসাধারণ মনের এক মানুষ ছিলেন। পরে বিস্তৃতভাবে সে বিবরণ দেওয়ার অবকাশ ঘটবে।

।। দুই ।।

পুরুলিয়ার মনোহর প্রাকৃতিক শোভা মধুসূদনকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। সারা জীবন নানা বিরুদ্ধতার সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয়েছে—ব্যক্তিগত জীবনে, কাব্যসাধনায়, কর্মক্ষেত্রে। এই লড়াইয়ে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু সমস্ত রিক্ততার বুক চিরে স্নিগ্ধ কাব্যের সুষমা তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পুরুলিয়ার প্রকৃতিতে কবি নিজের সংগ্রাম ক্ষুব্ধ জীবনের প্রতিবিম্ব দেখলেন। মৃত্তিকার মমতাহীন আচরণকে অস্বীকার করে সারি সারি পাহাড়ের দল ঊর্ধ্ব আকাশে মাথা ছুঁয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই স্তব্ধ কৌতূহলী পর্বত শ্রেণীর মায়াজড়ানো ছায়া ছড়িয়ে আছে রুক্ষ আতপ্ত মাটিরই বুকে। খুব ভোরে বেড়াতে বেড়াতে এ দৃশ্য দেখে মাইকেল মুগ্ধ হয়ে যান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রচনা করেন একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতা। কবিতাটি সেসময়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিচালিত 'জ্যোতিরিঙ্গন' পত্রিকার ১৮৭২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য:

"হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরা তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি?
এ হেন ভীষণ কারা কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম কুসুম-রতনে
তোমার? যে হর শিরে শশীকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেম পাশে।
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনীরে
সেবিকা বীরেশ যবে পাশুপাত আশে
ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জটিরে।"

পুরুলিয়ায় যে সময় খ্রিস্টান জনমণ্ডলীর পরিচালনায় ক'টি মিশন হাউস ছিল। ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করা এবং খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষাদান ছিল এই মিশন হাউসের অন্যতম প্রধান কাজ। ক্লডিয়াস বুকাননের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় অনগ্রসর এবং অজ্ঞ মানুষগুলোর জীবনে অনুপ্রবেশের জন্যে পাদ্রীদের নানা অছিলা এবং কর্মোদ্যোগের কথা। যাই হোক, এঁরাই মাইকেলকে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন করেন। মাইকেল মহাকবি ছিলেন বা তাঁর বিরল কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি জানানোর জন্যে এরকম একটি বর্ণাঢ্য সভার ব্যবস্থা হয়েছিল ভাবলে ভুল করা হবে। বরং তিনি খ্রিস্টান বলেই তাঁর প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ দেখানো হয়েছিল। উষ্ণ অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে কবি একটি স্বরচিত কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। এ কবিতাটিও চতুর্দশপদী এবং 'জ্যোতিরিঙ্গন' পত্রিকায় ১৮৭২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'অবকাশ-রঞ্জনে' রেভারেন্ড সূর্যকুমার ঘোষ কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সম্পর্কিত বিশদ

বিবরণ নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি'তে বিশদভাবে দিয়েছেন। এ কবিতায় তিনি পুরুলিয়াকে বঙ্গের মুখ উজ্জ্বলকারী বলে বর্ণনা করেছেন। তবে শ্রীহীন 'অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন' পুরুলিয়া খ্রিস্ট ভক্তমন্ডলীর চেষ্টায় 'সভ্যতা-স্রোতে' ভেসেছিল এমন ধারণা তাঁর কবিতাটি পড়লে মনে হতে পারে। কবিতাটি পড়া যাক।

পুরুলিয়া মন্ডলীর প্রতি।

"পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস-সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহরে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাজুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সখ্যতা স্রোতে নিত্য তব তরি।"

গভীরভাবে আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর মাদ্রাজের নির্বান্ধব প্রবাস জীবনে পাদ্রীদের সহায়তা ছাড়া তাঁর পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা প্রায় অসম্ভব ছিল। পাদ্রীদেরই একটি অনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি ইংরাজি শিক্ষকের চাকরি পান। এখানেই রেবেকার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও পরিণয়। তাই তাঁর স্পর্শকাতর নরম মনে এঁদের প্রতি অনুরাগ সঞ্চিত ছিল। পুরুলিয়ায় এসেও জার্মান মিশনারিদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সখ্যতা সৃষ্টি হয়। কাঙ্গালীচরণ সিংহ এই আশ্রমের সঙ্গেই যুক্ত। কাঙ্গালীচরণ ও মধুসূদনের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্যের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাঙ্গালীচরণের পুত্র খ্রিস্টদাসের দীক্ষাগ্রহণের সময় তিনি ধর্মপিতার বা 'God father'-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি অমর হয়ে আছে মাইকেলের একটি কবিতায়। কবিতাটি তিনি শ্রীমান খ্রিস্টদাস সিংহের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। এটিও প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রিকায় ১৮৭২-এর নভেম্বর সংখ্যায়। কবিতায় খ্রিস্টদাসকে 'হে পুত্র' বলে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন—

"... । কি ধন পাইলা—
কি অমূল্যধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈব বলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব।"

কবিতার ছেদ টানলেন এই বলে:

"... লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে।"

এই কবিতাগুচ্ছের বিবরণ থেকে দুটি বিষয় খুব পরিষ্কার—এক, পুরুলিয়ায় স্বল্প সময়ের প্রবাস কালে আইন আদালত ছাড়াও কাব্যচর্চায় তাঁর আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে নি। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার কারণে মাইকেলের নাম বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে থাকবে চিরকাল তার দু একটি উজ্জ্বল মণি মুক্তো রুক্ষতায় ধুসর এই পুরুলিয়ার নির্জন শহর প্রান্তে বসেই তিনি রচনা করেন। আরও একটি বিষয় হ'ল জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত হয়েও খ্রিস্টধর্মের প্রতি মাইকেলের ঐকান্তিক অনুরাগ কখনও ক্ষীণ হয় নি।

"... ধর্ম্ম-বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন স্থলে ;
বিজয় পতাকা তোলি রথের উপরি ;"

খ্রিস্টদাসকে উদ্দেশ্য করে যে 'ধর্ম-বর্ম'র কথা তিনি বলেছেন, তা অবশ্যই খ্রিস্টধর্ম।

।। তিন ।।

আগেই বলেছি মধুসূদন দত্তের পুরুলিয়া প্রবাসের সময় পঞ্চকোট বা পাঁচেটের রাজা ছিলেন নীলমণি সিংহদেও। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে গূঢ়নারায়ণের মৃত্যুর পর রঘুনাথ নারায়ণ উপাধি নিয়ে পঞ্চকোটের রাজা হন। তার আগে ১৮৪১ সাল থেকেই তিনি জমিদারি দেখাশোনা করতেন। মায়ের সূত্রে নীলমণি অত্যন্ত স্পষ্টবাক্, স্বাধীনতাপ্রিয়, আপসহীন এবং দয়ালু ও পরহিতব্রতী চরিত্রের অধিকারী হন। সিপাহি বিদ্রোহের অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হন নি। ক্যাপ্টেন ওকসের ডেসপ্যাচ থেকে জানা যায় তিনি অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাঁওতালদের চরম সংগ্রামের জন্যে সাজিয়ে তুলেছিলেন। এই বিদ্রোহী রাজাকে ব্রিটিশ রাজশক্তি বরদাস্ত করবে না এটাই স্বাভাবিক। তাঁকে বন্দি করে প্রথমে শান্তিপুরে ও পরে কলকাতায় রাখা হয়। একই সঙ্গে নীলমণি সিংহ বিদ্যার অনুরাগী ও সংস্কৃতির সেবক ছিলেন। তাঁর আমলে কাশীপুরকে কেন্দ্র করে একটি সংস্কৃতি চর্চা ও বিদ্যাশিক্ষার বলয় গড়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থ যেমন তাঁর আমলে সম্পাদিত হচ্ছে ; নবদ্বীপ, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পাণ্ডিতেরাও পাঁচেটে এসে তখন বসবাস শুরু করেছেন। এঁরা সকলেই নীলমণির আশ্রয় ও আনুকূল্য ধন্য। মহারাজা বাহাদুর নীলমণি সিংহ স্বাভাবিকভাবেই মাইকেলের 'প্রতিভা, বিদ্যাবুদ্ধির' কথা আগে থেকেই জানতেন। পুরুলিয়াতে মধুসূদনের আসার খবর পেয়ে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে তিনি তাঁর রাজ্যে আসার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানান। ততদিনে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে গেছেন। 'কিন্তু মধুসূদনকে দেখিবার নিমিত্ত মহারাজের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি তাঁহাকে কলিকাতা হইতে পঞ্চকোটে আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।'

মহারাজের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে মধুসূদন পঞ্চকোটে এলেন। কিন্তু তখন তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং জরাজীর্ণ শরীর। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে একটি চিঠিতে মাইকেল তাঁর নিজের শরীরের কথা লিখেছিলেন: 'প্রায় চারি বৎসর হইল আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমনকী, ৩/৪ মাস স্বকর্মে হস্ত-নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম...।' খালি যে শরীর ভেঙে পড়েছে তাই নয়, চরম আর্থিক দুরবস্থায়

তিনি তখন বিপর্যস্ত। বিলাসবহুল জীবনের প্রবল আর্থিক দাবি মেটানোর মতো প্রচুর উপার্জন তিনি কখনও করেন নি। ফলে দেনার দায়ে তিনি তখন আকণ্ঠ ডুবে আছেন। প্রবল দাহের জ্বালায় মহৎ এই কবিপ্রতিভা নিজের চিন্তায় এবং কর্মের কেন্দ্র ভূমি থেকে বারে বারে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন। এবারেও তিনি তাই পঞ্চকোটে এলেন। পঞ্চকোটের অবস্থাও তখন খুব ভালো নয়। 'পঞ্চকোটের প্রাসাদ, গড় তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, অবলুপ্ত রাজ্যশ্রী।' ঠিক কী কাজের জন্যে মহারাজা মাইকেলকে নিয়োগ করেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে পঞ্চকোট রাজ্যের ম্যানেজার পদে মধুসূদন যোগ দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভগ্নদশা, বিশৃঙ্খল রাজ্যের বাস্তব উন্নয়ন। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য অবশ্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে তিনি নীলমণির আইন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনও তাঁর স্মৃতিকথায় এ কথা স্বীকার করেছেন, 'The one that I at present recollect was in connection with his appointment as legal adviser of the raja of Purulia.' পঞ্চকোট থেকে অসুস্থ শরীর ও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া মন নিয়ে মাইকেল কলকাতায় ফিরে এই উত্তরপাড়ার জমিদারদের গ্রন্থভবনেই সাময়িক আশ্রয় পেয়েছিলেন। সুতরাং রাজা প্যারীমোহনের মতটাই গ্রহণীয় যে ম্যানেজারি নয়, মাইকেল আইন উপদেষ্টার পদই নিয়েছিলেন।

।। চার ।।

কাশীপুরের রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি মাইকেলের কর্মস্থল। পাষাণময় সে দেশ, ছোটনাগপুর বনাঞ্চলের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা মনকে সব সময়ে ভরিয়ে রাখার কথা। বিশেষ করে কবির মন এই নিঃসর্গ দৃশ্যে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করতেই চায়। কিন্তু সংসারের ক্ষমাহীন আক্রমণে মাইকেল ততদিনে নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। পরিবারের কেউ সঙ্গে আসে নি। 'মধুসূদন একাকীই সেই মৌলমধুদ্রুমদল সমাচ্ছন্ন বিহঙ্গ-কূজিত অরণ্য- প্রদেশে, তাঁহার বিরহ-বিধুর প্রবাস যাপন করিতেন।' যথাসম্ভব দুঃখ বেদনা ভুলে থাকতেই তিনি চাইতেন। পড়াশোনা, কাব্যচর্চা, হাস্য-পরিহাসে সদা প্রফুল্ল নির্মল জীবন তিনি চেয়েছিলেন। আশেপাশের আদিবাসী মানুষজনকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। তাদের সাথে পালপার্বণে মেলামেশা, নাচগান ও হৈ চৈ করে নিজের জীবনকে ভরিয়ে রাখতে চেয়েছেন আনন্দে, ভুলে থাকতে চেয়েছেন অসফল আর্থিক জীবনের অনটন ক্লিষ্টতার করুণস্মৃতি। এ সময়ে রচিত এক কবিতায় পঞ্চকোটের জন্য তাঁর মন হাহাকার করে উঠল:

"কোথায়ে সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণজ্যোতি,
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী..."

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে অবহেলায় কাতর পঞ্চকোটের মনের দুঃখকে বুঝতে চেয়েছিলেন তিনি;

"... কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?"

ওই পঞ্চকোট একদিন ধনধান্যে পুষ্পে সৌরভে উজ্জ্বল ও ঈর্ষণীয় ছিল। যৌবনের সেই আনন্দিত রাজ্যকে কবি স্বপ্নে দেখেছেন: 'হেরেছিনু গিরিবর! নিশার স্বপনে' দেখেছিলেন:

"পদ্মাসন উজলিত শত রত্ন করে,

দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন।"

হৃত যৌবনা পঞ্চকোটকে মধুসূদন আবার সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রাজপ্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে, রাজকোষকে অর্থপূর্ণ করে, সাধারণ মানুষের জীবনকে আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুলে ভাঙা গড়, পরিখা ও অট্টালিকায় নূতনত্বের প্রলেপ দিয়ে কীভাবে আবার তাকে 'দ্বিতীয় তপন' করে তুলবেন তার কোনও বিশদ পরিচয় কোথাও পাওয়া না গেলেও তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছার কথা তিনি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন:

"ভেবেছিনু গিরিবর! রমার প্রাসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়, ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।"

।। পাঁচ ।।

এক জীবনে সব আশা পূর্ণ হওয়ার নয়। বিশেষত মধুসূদনের মতো কবির, যিনি সারা জীবন জুড়ে অসহ বেদনার দান বয়ে বেড়িয়েছেন। পঞ্চকোটকে তাই রূপের মাধুরীতে আর ভরিয়ে তোলা হল না। বিদায়ের বেলা এগিয়ে এল। মাত্র কয়েকটা মাস। তারপর আবার কলকাতা, আবার সেই পুরনো জীবন। মহারাজার সঙ্গে মাইকেলের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার সম্পর্ক কেন এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল সে সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। নগেন্দ্রনাথ সোম এই বলে আমাদের তৃষ্ণা বাড়িয়েছেন যে "সেই প্রবাস কাহিনী বিবিধ কৌতুকাবহ ঘটনাসমূহে পরিপূর্ণ।" কিন্তু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে সেসব ঘটনার তিনি বিবরণ দেন নি। তিনি বলেছেন "১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে তত্রত্য জনৈক উকিলের নিকট মধুসূদনের পঞ্চকোট পরিত্যাগ সম্বন্ধে...... এক বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছিলাম, যাহা বিবৃত হইলে সকলে আরব দেশের উপন্যাস মনে করিতেন।" যাই হোক, সেই 'আরব্য উপন্যাসের' কোনো লিখিত বিবরণ আমরা পাই নি। পক্ষান্তরে তাঁর গ্রন্থে এক রজকের কাহিনি আছে যে রাজার বোধবুদ্ধি এবং চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার ষড়যন্ত্রপ্রবণ চাতুরিতে। একথা কারোর অজানা নয় যে মধুসূদন অতিশয় পানাসক্ত ছিলেন। তাঁর মুখের মদের গন্ধে রাজা যাতে বিচলিত না হন সেজন্য মধুসূদন নাকি সবসময় মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলতেন। ধূর্ত ধোপা এটাই কাজে লাগাল। রাজাকে নালিশ করল 'মহারাজ আপনার যে রাজগাত্রে আমরা স্বর্গের পারিজাতের সৌরভ পাইয়া থাকি,—ইনি বলেন কিনা সেই সুরভিত রাজগাত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত।' পরে একদিন মহারাজের সঙ্গে রুমালে মুখ ঢেকে মাইকেল যখন কথা বলছেন সেই ক্ষৌরকার রাজাকে মনে করিয়ে দিল 'মহারাজ, ঐ দেখুন আপনার পারিজাতবাসিত গাত্র দুর্গন্ধময় ভাবিয়া ম্যানেজার সাহেব খসবুদার রুমালে মুখ ঢাকিয়া কথা কহিতেছেন।' ব্যস মহারাজার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। এই ঘটনা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। নগেন্দ্রনাথ সোম নিজেই একে 'কিম্বদন্তী' বলেছেন। কবির সঙ্গে রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর গোপন গভীর রোমান্টিক সম্পর্কের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। এ সম্পর্কের কারণেই নাকি তাঁকে পুরুলিয়া ছাড়তে হয়েছিল। এ কাহিনিরও কোনো ঐতিহাসিকতা আছে বলে

মনে হয় না। রাজা প্যারীমোহন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে মধুসূদনের কাছে তিনি শুনেছিলেন যে পঞ্চকোটের মহারাজার ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু ছিল না। তিনি হীন চক্রান্তকারী, কূটকৌশলী রাজভৃত্যদের হাতের পুতুল মাত্র ছিলেন, " ... he could be happily compared to a street hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who chose had only to pull it by the ear and then drink his fill!" যে যা খুশি রাজাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে এমন রাজার অধীনে কাজ করা দুঃসহ বিবেচনায় মাইকেল স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে পুরুলিয়ায় প্রবাস সমাপ্ত করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

হতাশ হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে আসতে হলেও পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা পুরুলিয়া সম্পর্কে তাঁর মনে কোন বিরূপতা বা অভিমান ছিল না। বরং তিনি যে জীবনের কিছুটা সময় এখানকার কর্কশ অথচ স্নিগ্ধ, শান্ত এবং মধুর পরিবেশে কাটিয়ে যেতে পেরেছেন, তাঁর মর্মে যে প্রবেশ করেছে এখানকার প্রকৃতির এবং প্রিয়জনের ঐশ্বর্যময় স্মৃতি, তাঁর কাব্যে যে অনুরণিত হয়েছে প্রস্তরময় বনভূমির মর্মরিত ব্যাকুলতা সেইজন্যে তাঁর ধূসর বিষণ্ণ জীবনের গোধূলিবেলায় নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করেছেন ;

"কহিলা বাগ্‌দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে)
বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে
তেঁই দেখা দিল তোরে আজি হৈমবতী"

পঞ্চকোটই কবি কল্পিত এই 'হৈমবতী'। পুরুলিয়া ছেড়ে চিরকালের মতো চলে আসার সময় মাসের মাইনেটুকু তিনি পান নি। লোক লস্কর, পালকি বেয়ারা সবই নাকি রাজনির্দেশে বন্ধ হয়েছিল। তবু পুরুলিয়া-পঞ্চকোটের স্মৃতি তাঁর কাব্যে ও মনে অমল মহিমায় বিরাজমান।



সংস্কৃতি

পুরুলিয়ায় দ্রাবিড় সংযোগ

বিজয় পাণ্ডা

অনেক লড়াই আন্দোলন অনেক গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া জেলার জন্ম এবং বঙ্গভুক্তি ঘটে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর; স্বাধীনতার নয় বছর পরে। পুরুলিয়া শহরের উদ্ভব ঘটেছিল দেড় শতাধিক বছর আগে। ১৮৩৮ সালে প্রাক্তন মানভূম জেলার সদর শহর মানবাজার থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল পুরুলিয়া, আনুষ্ঠানিকভাবে সূত্রপাত হয় পুরুলিয়া শহরের। অঞ্চলটি জঙ্গলাকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান শহরাঞ্চলে ছাড়া ছাড়া কয়েকটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা ছিল। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল চকবাজার, নামো পুরুলিয়া, নডিহা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিল কেতিকা ও দুলমী মহল্লা। পূর্বে পুরুলিয়া ছিল মানভূমের সদর মহকুমা। অপর মহকুমাটি ছিল গোবিন্দপুর।

পুরুলিয়ায় দ্রাবিড় সংযোগের কথা বলতে গেলে, সর্বাগ্রে পুরুলিয়া নামকরণটির মধ্যেই যে সংগুপ্ত দ্রাবিড় প্রভাব রয়েছে তার উল্লেখ করতে হয়। পুরুলিয়া যে একটি দ্রাবিড় শব্দজাত নাম সে ব্যাপারে বহু বিশেষজ্ঞই একমত। তাদের বক্তব্য অনুসারে পুরুলিয়া নামটি সম্ভবত আদিতে পেরুল্লা বা পারুলা ছিল। দ্রাবিড় ভাষায় পেরুল শব্দটির অর্থ নদী বা জল, পারু শব্দের অর্থ নুড়ি বা পাথরের চাঁই। লা বা ওলা শব্দের অর্থ মধ্যে। অর্থাৎ পাথুরে ডাঙার মধ্যে অবস্থিত গ্রাম বা শহর। কেউ কেউ পুরুলিয়া নামকরণের পিছনে পারুল গাছকে জড়িয়ে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আমার জানা বাঁকুড়া জেলা ইন্দপুর থানায় পুরুলিয়া, সিমলাপাল থানায় পারুল্যা এবং মেদিনীপুর জেলা পারুল্যা নামে গ্রাম আছে। ভূপ্রকৃতি গত সাদৃশ্যের কারণেই একই ধরনের গ্রাম বা শহরের নামের উদ্ভব ঘটেছে বলে মনে হয়। একই ধরনের দ্রাবিড় শব্দজাত গ্রাম নামগুলি অঞ্চলটিতে দ্রাবিড় সংযোগকে সুস্পষ্ট করে। পুরুলিয়ার গ্রাম নাম নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি, হলে পরে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও অবশিষ্ট প্রাচীন গ্রাম নামগুলো থেকে অনেক ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান মিলবে।

শুধু জেলা শহর পুরুলিয়া নয়, পুরুলিয়া জেলার আঠারোটি থানার মধ্যে সাতটি থানার নামে দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট বলে পণ্ডিতদের অভিমত। পুরুলিয়া মফস্বল ও শহর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট থানাগুলি হল আড়শা, বান্দোয়ান, পুঞ্চা, মানবাজার ও বরাবাজার। বান্দোয়ান সম্ভবত ছিল বিন্দ + আন বিন্দ দ্রাবিড় শব্দ অর্থ পাহাড় আন দ্রাবিড় শব্দ অর্থ নিকটে। দ্রাবিড়ে মান অর্থাৎ বৃহৎ মানবাজার বড় শহর। দ্রাবিড় ভাষায় পুন বা পুনিন শব্দের অর্থ জল। পুনিনের সঙ্গে পুঞ্চার

সংযাগ আছে বল মনে হয়। মুণ্ডাদের পঞ্চ বা পঞ্চায়েৎ প্রথা থেকেও পুঞ্চা নামটি এসে থাকতে পারে। তামিল আর শব্দের অর্থ খনন করা, আরু চাষ, কন্নড়ে আর লাঙল। আরশা বা আড়শা নামটি এইভাবে উদ্ভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। অর্থাৎ পাথর বা পাহাড় ভেঙে যেখানে লাঙল পড়েছিল বা চাষ শুরু হয়েছিল। অনুরূপ দ্রাবিড়ীয় প্রভাব দেখা যায় বরাভূম নামের মধ্যে। তামিলে বর মানে বন্ধ্যাভূমি, বরা-অনুর্বর স্থান মারাঠী ভুঁই অন্ত্যপদযুক্ত হয়ে নাম হয়েছিল বরাভুঁই বা বরাভূম।

পুরুলিয়া জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ২৬৮৭। তাদের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার গ্রাম নাম দ্রাবিড়ও অস্ট্রীক শব্দজাত। গ্রাম নামে দ্রাবিড় ভাষার অন্ত্যপদ অজস্র-অন, আন, আই, অর, আর আল, ইন, ইনা, ইর, ইরা হইল, উর উরি, উলি, ওনা, ওলি, কর, কা, কি, কোট, কুটি গা, গি, টি, ডুরা, তা, তোর, না, বা, মা, লা, সা, সরা, সল, সাল, সা, আস, সির, হার ইত্যাদি। শুধু গ্রাম নাম নয়, গ্রামাঞ্চলের অনেক প্রাচীন দিঘি বা পুষ্করিণীর নামকরণের মধ্যে, জোড় বা ডুংরীর নাম করণের মধ্যে দ্রাবিড় শব্দের সূত্র মিলতে পারে।

পুরুলিয়ার পূর্ব নাম মানভূম। মানভূম নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মত দ্বৈধতা রয়েছে। তবু মানভূম যে একটি দ্রাবিড় আগত নাম এ ব্যাপারে প্রবক্তার সংখ্যাও কম নয়। কেউ কেউ বলেন, মান ও মানভূম নাম ছয়-সাত শতকের, মহাবীরের নাম থেকে। মানভূম শব্দটির মধ্যেই জৈন ধর্মগুরু মহাবীরের (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) অন্ততম নাম বর্ধমান এই শব্দটির ভগ্নাংশ লুকিয়ে আছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের অভিমত মান নামটি প্রাচীন মান রাজবংশের নাম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। রাজবংশটি এক সময় মানভূম, সিংভূম ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন (The Manas appear to have been ruling over the present Manbhum, Singbhum reign together with the adjacent arreas of Orissa – Studiesd Etc. p.1761) তাদের নাম অনুসারেই উক্ত অঞ্চলের নাম হয়েছিল মানভূম। অর্থাৎ মান ও মানভূম নাম ছয়-সাত শতকেই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ওড্র জাতির একটা শাখা হিসেবে মানবংশ অনুমিত হয়েছিল। তাদের আদি বাসভূমি ছিল মানভূম সিংভূম ও তৎ সংলগ্ন অঞ্চলে। এ অনুমান সত্য বলে মেনে নিলে ছয়-সাত শতকে উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চলে ওড্র জাতির জনপ্রিয়তার বিষয়টিও যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মানজাতি ও তাদের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতের মধ্যে প্রচুর দ্বৈধতা রয়েছে। মিরাশির অনুমান মান পদবীযুক্ত রাজারা ছিলেন রাজকূট বংশের একটা শাখা। তারা চার থেকে ছয় শতকে মহারাষ্ট্রের সাঁতারা জেলার কিছু অংশ শাসন করতেন। মানদের রাজত্বকাল আনুমানিক ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ। ড: ডি.সি. সরকার অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের তিনটে তাম্র পট আবিষ্কৃত হয়েছে (১) Undik Valika grant J.B.R. A.S. VolXVI (২) Pandwrang palli plate-Mysored A.R. 1929 ও (৩) Gokak plate E-1 Vol XXIX- মানাঙ্কদের রাজত্বকাল কিছু চার শতকের শেষ দিকে। মানাঙ্ক ছিলেন মানদের আদিপুরুষ। প্রায় এক শতাব্দী পরে তার প্রপৌত্র অভিমন্যু সেখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রাজধানীর নাম ছিল মনপুর বা মানপুর। অভিমন্যু প্রপিতামহের নাম অনুসারে রাজধানী নামকরণ করেছিলেন। মানপুর সাতারা জেলার মান মহকুমায় অবস্থিত। অঞ্চলটির উপর দিয়ে প্রবাহিত ভীমা নদীর একটি শাখা নাম মানগঙ্গা। ড: সরকার মানাঙ্কের সময় অনুমান করেছেন পাঁচ শতকের শেষ দিকে। মানপুরকে কেন্দ্র করে মানাঙ্ক যে নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরবর্তীকালে সেটি মানদেশ

বলে পরিচিতি লাভ করে। মানদের আধিপত্য সম্ভবত মানভূম ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ময়ূরভঞ্জের উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের শাসনকেন্দ্র।

মানভূম, সিংভূম ও উড়িষ্যার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতকে মান রাজাদের শাসন যে সুবিস্তৃত ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ছয় শতকের শেষ ও সাত শতকের প্রথম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ তোষলিতে অধীশ্বর ছিলেন মহারাজ শম্ভু যশ। তিনি ছিলেন মান বংশের সন্তান, গোত্র মুদগল বা মৌদগল্য। উত্তর তোষলিতে তার সামন্তরাজা ছিলেন সোম দত্ত। দক্ষিণ তোষলিতে শিবরাজা [Four coppier plates from SORO-N.G. Mazumdar–E.I. VolXXII] । ড: ডি.সি. সরকারের মতে শম্ভুযশের পট্টটির সময়কাল ৫৭৯ খ্রি: ড: এন.জি. মজুমদারের অভিমত ৫০৮-৯ খ্রী: [Epigraphic India Vol.-IX]

পুরুলিয়া জেলায় মান আধিপত্যের অনেক নিদর্শন আজও বর্তমান। জেলা মধ্যে মানপুর নামে সাতটি গ্রাম আছে,—নেতুড়িয়া, সাঁতুড়ি, কাশীপুর , হুড়া, মানবাজার ও বরাবাজার মিলিয়ে। এছাড়া আছে মানটাঁড়, মানজুড়ি,. মানগ্রাম (মনগ্রাম), মানঝোপড়া, মানকিয়ারী, মানএড়া ইত্যাদি। নামগুলি পুরুলিয়ায় একদা প্রভাব বিস্তারকারী মান রাজাদের অতীত স্মৃতি বহন করে। পাড়ায় প্রচলিত কিংবদন্তীতে মানরাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, দেউলভিড়ার মন্দির মূর্তিগুলি মানরাজাদের নির্মিত। রাজবাড়ি থেকে দেউল ভিড়া পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। যে পথ দিয়ে অন্তঃপুর বাসিনীরা পুজো দেওয়ার জন্য দেউল ভিড়ার মন্দিরে যেতেন। মানবাজার থেকে সরাকদের উচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হিসেবে তাঁদের এক সুন্দরী মেয়েকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তীটি গড়ে উঠেছে তাতে যে মানরাজার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁকে মানসিংহ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মানসিংহ ছিলেন না বলেই মনে হয়। সম্ভবত তিনি ছিলেন মানবংশীয় কোনো রাজা। উনিশ শতকের শেষ দিকেও মানবাজারের রাজারা নিজেদের মানাবণিনাথ বলে পরিচয় দিতেন। পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ও পুঞ্চা থানা এবং বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার বহু গ্রামে মানা বাউরী নামে এক প্রাচীন জনজাতির বসবাসের কথা জানা যায়। বুধপুর টুস্যামাকে ঘিরে তাদের ঘন সন্নিবেশ ঘটে ছিল। বাঁকুড়া জেলার রাইপুর অঞ্চলে মানছত্রী নামক জনগোষ্ঠী আজও বসবাস করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মান নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অঙ্গ বঙ্গা মুদগরকা অন্তর্গিরি-বহির্গিরি।
তথা প্রবঙ্গবঙ্গেয়া মানদা মান বর্তিকা।।

উপরোক্ত মান-নামাঙ্কিত একাধিক স্থান ও জনগোষ্ঠী নির্দেশ করে পুরুলিয়া জেলা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একদা উক্ত প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এই মানজাতি কোথা থেকে এসে এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন তার কোনো সুস্পষ্ট চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

উত্তরে বীরভূম থেকে দক্ষিণে ভঞ্জভূম পর্যন্ত ১। বীরভূম ২। মল্লভূম ৩। সিংভূম ৪। নাগভূম ৫। সেনভূম ৬। শিখরভূম ৭। গোপভূম ৮। সামন্তভূম ৯। বরাহভূম ১০। ব্রাহ্মণভূম ১১। শূরভূম ১২। ভাওয়ালভূম/বালভূম ১৩। মানভূম ১৪। ধলভূম/ধবলভূম ১৫। তুঙ্গভূম ১৬। বাঘভূমি (ব্যাঘ্রভূম) ১৭। আদিত্যভূম ১৮। ভঞ্জভূম ইত্যাদি যে আঠারোটি ভূমযুক্ত অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশের নামকরণই জাতিবাচক বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। মানভূম নামকরণজনিত বিতর্ককে এড়িয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, মানভূম নামটিও জাতিবাচক এবং মানরাজবংশ থেকে উদ্ভূত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রজাবৎসল মানরাজার

উল্লেখ এতদঅঞ্চলের প্রাচীন লোকগানেও পাওয়া যায় 'আইসে ছিলেন মান-রাজা, খাঁয়ে গেলেন মণ্ডল ভাজা' ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রান্তসীমায় অবস্থিত এই নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে একদা ভূমযুক্ত অঞ্চলগুলি উদ্ভূত হওয়ার কারণ তথা ভূমযুক্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলির উদ্ভব ও সন্নিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এরা কি কোন বৃহৎ ও সমৃদ্ধ একাধিক জনগোষ্ঠীর শাখা? কোনো আত্মগোপনকারী রাজবংশধর শত্রু কর্তৃক রাজভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন? দীর্ঘকাল ধরে অরণ্য জীবনযাপন করে অধঃপতিত? প্রাচীন ও বৃহৎ আদিমতম অধিবাসীদের বংশধর ; যাঁরা ছিলেন সচেতনও জাত্যাভিমানী? নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনধারাকে বজায় রাখার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন? অস্বচ্ছতা দূর করে ব্যাপারগুলোকে আলোকে আনার উদ্দেশ্যে তেমন কোনো ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান আজ অবধি হয় নি। ভূমযুক্ত অঞ্চলগুলো ছিল আদিবাসী ও উপজাতি কৌমগুলির আবাসস্থল। তাদের মধ্যে পলাতক রাজবংশের বংশধররাও থাকতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নকুড়তুঙ্গ যিনি তুঙ্গভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ একটি কিংবদন্তী আছে। তিনি নাকি যে কোনো কারণবশত পুরী থেকে পালিয়ে এসে এতদঞ্চলের উপজাতি নেতাদের পরাজিত ও দমন করে রাজ্যটির পত্তন করেছিলেন। বিনীত তুঙ্গকে অষ্টাদশ গোণ্ডাধিপতি বা আঠারোটা গোণ্ড বা উপজাতির অধীশ্বর বলা হয় (Two copper plates from thes state of Bonai Mm Hara Prasad Shastri J.B. R.S. vol. VIPP236-246)। তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখরকে বলা হয়েছে অরণ্য গিরি কন্দর সমন্বিত উপান্তভূমির অধিশ্বর। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতমে লক্ষ্মী শূরকে অটবী বা অরণ্য প্রদেশের সামন্তচক্রের চূড়ামণি বলা হয়েছে।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলি বিশেষত বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমাংশের অধিবাসীদের বসতি ইতিহাস সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা যথাযথভাবে বুঝতে হলে ভূমযুক্ত অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের স্বরূপ অনুধাবন করা দরকার, কারণ এদের মিলন মিশ্রণ এবং সাংস্কৃতিক লেনদেন ও সমন্বয়ের মধ্যেই বর্তমান অধিবাসীদের আচার আচরণ, ধর্ম ও সংস্কার, আহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের মূলসূত্রগুলো নিহিত রয়েছে এবং যেহেতু পুরুলিয়া জেলা সীমান্তের সবচেয়ে নিকটবর্তী জেলা শহর ছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপ্রবেশ দীর্ঘদিন ঘটেনি ফলে এখানে এই সূত্রগুলো আজও অনেক অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাসের অনেকখানি উড়িষ্যা রাজ্যের উদ্ভবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৬৩-১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কলিঙ্গের অভ্যুত্থান। সম্রাট খারবেল বা ভিখু রাজা। দামোদরের দক্ষিণ তীরস্থ ভূভাগ খারবেলের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ত্রিকলিঙ্গের জন্ম। দ্রাবিড় ভাষায় Mudu Kalinga- ১। দক্ষিণ ২। মধ্য ৩। উত্তর। মানভূম জেলার পুরুলিয়া সদর মহকুমার সমগ্রাংশে একদা কলিঙ্গের উত্তরভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৫০-১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে উত্তর তোষলীর মধ্যে ওড্র বা উড্র দেশের উদ্ভব ঘটে। পুরুলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ উড় দেশের অন্তর্গত হয়। খারবেল ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী। এতদঞ্চলে ব্যাপক জৈন প্রভাবের পশ্চাতে তাঁর পৃষ্টপোষকতা এবং সক্রিয় ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক। মানভূম অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে উড়িষ্যা রীতির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয়। এ থেকেই অঞ্চলটিতে জৈন ধর্ম প্রচার এবং প্রসারে খারবেলের ভূমিকা অনেকাংশে সুস্পষ্ট হয়। উড়িষ্যা শিল্পরীতির সাথে এতদঞ্চলের জৈন স্থাপত্য ভাস্কর্যের মিল কতখানি তা নিম্নোধৃত ঘটনাটি থেকে বেশ পরিষ্কার

বোঝা যায়। একবার জনৈক ভদ্র মহিলা আমাদের সাথে গিয়েছিলেন পাকবিড়রার প্রত্নস্থল দেখতে। তিনি দেখেই অভিভূত হলেন এবং বললেন ও এ তো আমি উড়িষ্যায় দেখেছি।

পৌরাণিককালে মানভূম, সিংভূম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আর্য-মিশ্রিত জনবসতির যে সন্নিবেশ ঘটেছিল সাত-আট শতাব্দীর মধ্যে আদিম অধিবাসীদের উপর তারা তাদের কর্তৃত্ব হারিয়েছিল। দ্রাবিড় গোষ্ঠীগুলি তখন ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। একটু একটু করে উত্তর এবং উত্তর পূর্বদিক থেকে তাঁরা ক্রমশ প্রসারিত করে চলেছিলেন তাঁদের রাজ্যসীমা। এই শক্তি সংগঠনের পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছিল দামোদরের তীরে তৈলকম্প বা তেলকূপি এবং ইচাগড়কে কেন্দ্র করে পাতকুম রাজ্যটি.। সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতের পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে শিখরের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিখর তৈলকম্পের রাজা রুদ্র শিখর।

'তৈলকম্প' দ্রাবিড় শব্দজাত নাম। কম্পশব্দটির অর্থ—বৃত্তিকর, কম্পন কথাটির অর্থ পরগনা। কম্প বা কম্বভূমি মাপের একক। তামিল, তেলেগু ও কানাড়ি ভাষায়—'কম্প' শব্দটির অর্থ বৃত্তিকর। প্রাচীন কাশ্মীরে 'কম্পন' শব্দটির দ্বারা বোঝাত সেনাবাহিনী, আঞ্চলিক বিভাগ বা পরগনা, সেনাপতি বা অধিপতি। [Indian Epigraphic Glossary by D.C. Sarkar, 1966] উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় একসময় তৈলকম্প ছিল শুল্ক প্রদানকারী একটি সামন্তরাজ্য। শুল্ক কাদের দেওয়া হতো সে ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার ছবি পাওয়া না গেলেও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত নির্দেশ করে শুল্ক দেওয়া হত ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গদের। তৈলঙ্গ কম্পন থেকেও তৈলকম্প রাজ্যটির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। তৈলকম্প যে দ্রাবিড় রাজ্য সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রাজ্যটি বিন্যাসের কাল ছয়-সাত খ্রিস্টাব্দ।

তৈলকম্প রাজ্যটি দামোদরের দক্ষিণ তীর থেকে কাঁসাইয়ের উত্তর তীর, পশ্চিমে ঝালদা থেকে পূর্ব দক্ষিণে বুধপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বুধপুরে পাওয়া সীমানা নির্দেশক পাথুরে লিপি এ অনুমানকে সমর্থন করে। লিপি, 'রাঢ়ের বেষ্টনী ঘেরা পঞ্চাদ্রিশ্বরের সীমা কেউ যেন খর্ব না করে', সময়-এগারো শতক। রাজপুত্র শ্রীবড়ধুগ (চড়ধুগ)। বীরস্তম্ভে প্রাপ্ত লিপি, 'রাজপুত্র শ্রী অতন্দ্রীচন্দ্র, বুধপুরের সঙ্গে তৈলকম্পের রাজনৈতিক যোগযোগ ছিল। একই অধীশ্বরের শাসনাধীনও হতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই শাসিত হোক, কোনো রাজা বা রাজপুত্র দ্বারা, এই অঞ্চলে দশ থেকে চৌদ্দ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে এক বা একাধিক রাজ্য ছিল উৎকীর্ণ শিলালিপি ইত্যাদি থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়।

মানভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ইচাগড়। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। ১৯১৭ সালে স্বর্গত হরিনাথ ঘোষ সেখানে একটিক স্তূপ খুঁড়িয়েছিলেন। ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে দুটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছিল। লিপি দুটিতে কোনো সময় দেওয়া ছিল না। অক্ষরের ছাঁদ দেখে সাত শতকের শেষদিকে (৬৬৯-৭০০ খ্রী:) উৎকীর্ণ বলে অনুমান করা হয়েছিল। অর্থাৎ শশাঙ্কের লিপির পঞ্চাশ বছর পরে। প্রথম লিপিটির দুটি ছত্র। তাতে দুটি নাম পাওয়া গেছে, 'বৃহৎ পদ্ম বনে বলবান বরাহ।' দ্বিতীয় লিপিটি সুস্পষ্ট নয়। লিপিগুলির অনুমান সঠিক হলে সাত শতকে পাতকুমে যে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার হদিশ পাওয়া যায়। তাঁরা জৈনধর্মী ছিলেন না। দীর্ঘদিন ধরে পাতকুম পরগনার জমিদারদের বসবাস ছিল ইচাগড়ে। তাঁরা নিজেদের বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলে পরিচয় দেন। তাঁদের পারিবারিক উপাধি আদিত্যদেব। বরাহ পরগনার জমিদার পরিবারের সঙ্গে বরাহ নামটি সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদমতে রূপসান সন্নিকট দলদ বরা নামক ডুংরী পার্শ্বে সদ্য প্রসূত অবস্থায় পরিত্যক্ত এবং সূর্যরশ্মির তাপ থেকে বিষধর

সর্পফনার আচ্ছাদন দ্বারা রক্ষিত, দক্ষিণেশ্বরী বারাহী দেবীর বন্য বরাহী রূপে স্তন দুগ্ধ ধারাদানে ক্ষুধা নিবারণ কারণে তাঁদের পদবী হয়েছিল 'বরাহ' এবং নাথবরাহ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্যের নাম হয়েছিল বরাহভুম। বরাহভূম রাজপরিবারের জনৈক সদস্য শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেবের অভিমত, 'এ প্রবাদ সত্য হওয়া সম্ভব কারণ শ্বেত বরাহা, নাথ বরাহার নামে এ ডুংরীতে আজও পূজা প্রচলিত আছে। প্রায় অনুরূপ একটি কিংবদন্তী পঞ্চকোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে প্রচলিত আছে।

যাইহোক, শশাঙ্কের বেশ কিছুকাল পরে। পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ, বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মেনহির জনশ্রুতির প্রবাহ ইচাগড়, দুলমী, দেউলী, সুইসা, চাণ্ডিল, জৈদা ইত্যাদি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্যের যৌক্তিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে। চাণ্ডিল ও ইচাগড়ে প্রাপ্ত পাথুরে লিপি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় খ্রিস্টিয় আট নয় শতকে ঐ অঞ্চলে দক্ষিণ ভারত থেকে সমৃদ্ধ পরিবারের আগমণের। পরবর্তীকালে তৈলকম্প ও পাতকুম দুটি রাজ্যই এক শাসকের কর্তৃত্বাধীনে এসেছিল এবং উৎকলে শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলে পর পরিণত হয়েছিল উৎকলের সামন্ত রাজ্যে।

তৈলকম্পের শিখর বংশধরদের রাজত্বকালের সময় সীমা সঠিকভাবে জানা যায় না। প্রথমে পালদের পরে সেনদের আমলে তৈলকম্প ছিল পাল ও সেনদের সামন্ত রাজ্য। লক্ষণ সেনের আমলেও রাজ্যটি ছিল সেনদের সামন্ত রাজ্য। মুসলমান আক্রমণের পর রাজ্যটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিন্যস্ত হয়েছিল পঞ্চকোট রাজ্য।

এ পর্যন্ত পাওয়া ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় পরেশনাথ পাহাড় বা সমেত শিখরকে কেন্দ্র করে যে জৈন রাজ্যটির উদ্ভব ঘটেছিল উত্তর ভারত থেকে আগত বার বার বিদেশি আক্রমণের ধাক্কায় তা ক্রমাগত দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আট নয় খ্রিস্টাব্দে নূতন করে রাজধানীর পত্তন হয়েছিল দামোদরের দক্ষিণ তীরভূমিতে প্রধান জৈন বণিকদের বাণিজ্যের পথটিকে অবিঘ্নিত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। দশ এগারো খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারত থেকে পরিচালিত সামরিক অভিযানের সঙ্গে আসা কোনো সেনাপতি অধিকার করে নিয়েছিলেন রাজ্যটি। সম্ভবত তিনি রাষ্ট্রকূট চালুক্য অভিযানকারীর সেনাপতি ছিলেন। পাল আমলে পালদের সামন্ত শাসক হিসেবে শাসন করতেন রাজ্যটি। পরবর্তীকালে যে সেনবংশ বাংলায় স্থায়ী ও বৃহৎ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরাও এসেছিলেন কর্ণাট প্রদেশ থেকে, দ্বিতীয় তৈল কর্তৃক কর্ণাটদেশ থেকে উচ্ছিন্ন হবার পর। চোল-চালুক্য সম্মিলিত করে তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল প্রথম কুলতুঙ্গ নামে দুটি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ১০৭০-১১১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

ছয়-সাত শতক থেকেই এতদঞ্চলের সঙ্গে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব স্বীকৃত তথা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। সম্ভবত এর আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল মিলন মিশ্রণের ধারা। কোল এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণের ফলেই খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতক থেকেই মানভূম ও বিহার অঞ্চলে একটি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। দক্ষিণাঞ্চলে এই মিলিত জনগোষ্ঠী পাশাপাশি বসবাস করার ফলে ভূমিজ দেশোয়ালি মাঝি, মানা বাউরি, বাগদি ইত্যাদি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। পুরুলিয়ায় বসবাসকারী বর্তমান জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত যে ভাষা, আচার-আচরণ, দৈনন্দিন জীবন-যাপন আমরা দেখছি তা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দ্রাবিড় ও কোল উভয় গোষ্ঠীর ভাষা, আচার-আচরণ, দৈনন্দিন জীবন-যাপন পদ্ধতির রূপান্তরিত রূপ। উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে এই মিলন-মিশ্রণের ধারা অব্যাহত ছিল এই মিলন মিশ্রণের ধারা ফলে জন জীবনের ধারাটি নিজস্ব আকার নিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। কারণ আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অঞ্চলটিতে দ্রাবিড়ীয় অভিযান অব্যাহত ছিল। এ প্রসঙ্গে বর্গী আক্রমণ স্মরণীয়। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে রাজোয়াড়রা দ্রাবিড়ীয়দের

থেকে উদ্ভূত। বিহারে ভুঁইঞাদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। পুরুলিয়ায় উদ্ভব কুর্মী এবং কোলদের সংমিশ্রণে। মানভূম বা পুরুলিয়ায় এসেছিলেন নাগপুর থেকে। কুর্মীদের সম্পর্কে ডাল্টনের অভিমত, উচ্চতায় খর্বাকৃতি, শক্ত-সমর্থ শরীর, রঙ কালো, চেহারায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। সাঁওতালদের সাথে খাওয়া দাওয়া চলে। জনশ্রুতি একই পিতার প্রথম স্ত্রীর সন্তান সাঁওতাল, দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান কুর্মী। ডাল্টনের সমীক্ষায় দক্ষিণ ভারতে এই উপজাতি কুনবী বা কুমনি নামে পরিচিত। সিন্ধিয়ার সাতারার কুর্মী প্যাটেল ; ভোঁসলা পরিবারও দেওবীর প্যাটেল এবং সম্ভবত কুর্মী। পঞ্চকোটের রাজাদেরও কুর্মী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বলে ডাল্টন মনে করেছিলেন। কুর্মীদের দুটো ভাগে ভাগ করা হয়— ১। ঝারি কুনবী ২। মারাট্টা কুনবী। প্রথমোক্তরা জঙ্গল কেটে প্রথমে বসতি স্থাপন ও আবাদ পত্তন করেছিলেন। মারাট্টা কুনবিরা এসেছিলেন বর্গী অভিযানের সময়। তৈলকম্প রাজ্যের সময় বা তারো আগে পুরুলিয়ায় যারা এসেছিলেন তাঁরা প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে অধিকাংশ কুর্মী মাহাত দ্বিতীয় ভাগের। পুরুলিয়া জেলার কুর্মীরা একই বিভাগ এবং মায়ের দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত বিবাহ বন্ধন এড়িয়ে চলে। সাঁওতালদের বিবাহ প্রথার সাথে তাঁদের বিবাহ প্রথার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

পুরুলিয়া জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল। ডাল্টন ও রিসলে সাঁওতাল উপজাতিটিকে দ্রামিল জাতি উদ্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন। চেহারার মধ্যে দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট, ভাষায় কোল বলে উল্লেখ করেছেন। গায়ের রঙ কালচে, ঘন বাদামী থেকে কয়লা কালো। হাঁ মুখ বড়, ওল্টানো ঠোঁট নাক-ভুরুর গোড়া থেকে ভেঙে নেমেছে। চুল মোটা, কালো—কারো কারো কোঁচকানো, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস করার ফলে দেহাবয়ব ও চেহারায় পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে। বিবর্তন এসেছে দৈনন্দিন জীবন-যাপন ও রীতি নীতিতে।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে একথা স্পষ্ট হয় যে, অঞ্চলটিতে দ্রাবিড় সংযোগ অনেক প্রাচীন। অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল দ্রাবিড় বা দ্রাবিড় উদ্ভূত জনগোষ্ঠী। কোল, দ্রাবিড় মিলন মিশ্রণের ফলে অঞ্চলটিতে একটা স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা নির্মিত হয়েছিল ; একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ধর্মভাবনা এবং জীবনচর্যার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। ব্রাত্যরাও এই ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি বিমিশ্র জাতি, সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও ধর্মচেতনা এতদঞ্চলকে কেন্দ্র করে যা গড়ে উঠেছে বা আজও যা নির্মিয়মান তাতে ব্রাত্যদের অংশগ্রহণ তথ্যগতভাবে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক সূত্রের ভিত্তিতে জানা যায় দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজ্যগ্রহণের আগে রাষ্ট্রকূট, চালুক্য চান্দেল্ল ও কলচুরিরা এতদঞ্চলে সামরিক অভিযান চালায়, সেনাপতিরা সৈন্যসহ এক একটি অঞ্চলে বসে যায়। এই অরণ্য ভূমিতে জনবসতির সমৃদ্ধিতে এদের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মধ্যভারতের ওরাঁও, মুণ্ডা, খারিয়া, ভুঁইয়া, মালের প্রভৃতি কোলভাষী উপজাতি এবং পূর্বঘাট ও উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের খন্দ, ভুঁইয়া ও ভূমিজরা এতদঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল। তাদের উত্তরসূরীদের আজও অঞ্চলটিতে বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত দক্ষিণাগত অভিযানকারীদের সেনাকর্মী হিসেবে এসে বসতি গড়ে তুলেছিলেন।

তৈলকম্পকে কেন্দ্র করে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর বসবাস যে সন্নিবেশিত হয়েছিল তার নিদর্শন উক্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, জাতিবাচক এবং দ্রাবিড় শব্দজাত গ্রাম নাম থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাঁওতালডি, কোলডি, ভাল পাহাড়ি, ভাল খুরা অসুরবাঁধ ইত্যাদি গ্রাম নাম তথা ভুঁইয়া, ওরাঁও, কেওট, বাগদি, কুর্মী রাজোয়াড়, বেদিয়া, মানা বাউরি ইত্যাদি দ্রাবিড় এবং দ্রাবিড় উদ্ভূত গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমীভবন প্রাচীন দ্রাবিড় রাজ্যটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অঞ্চলটির কিছু

কিছু গ্রাম নাম পরিষ্কার দ্রাবিড় শব্দজাত বলে অনুমিত হয়— যেমন, করগালি-দ্রাবিড়-করই অর্থে নদীতীর বা নদীতীরবর্তী স্থান। করগালি চেলিয়ামার সন্নিকটে দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। চেলিয়ামা নামের মধ্যে চোল শব্দের কোন সংযোগ আছে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। বড়রা, ইছর, বেলকুঁড়ি, গহ্‌রা দুবড়া, পিড়মা, হরকতোড়, কামারগড়া ইত্যাদি এমন অনেক গ্রাম নাম অঞ্চলটিতে আছে যাদের মধ্যে দ্রাবিড় শব্দের সন্ধান মিলতে পারে। বাঙ্গালোরে কামগের নামে গ্রাম আছে। কামার গোড়ার মধ্যে তার অনুসন্ধান ভ্রান্তিমূলক নয় বলেই মনে হয়। পাতকুম অঞ্চলে খেড়িয়া, সর্দার, কুর্মী, দেশোয়ালী মাঝি ইত্যাদি উপজাতির অবস্থান, চেলিয়ামা, বরা, ইত্যাদি গ্রাম-নাম গত মিল, ঐতিহাসিক সহাবস্থানের সূত্রই বহন করে।

এ অঞ্চলে জীবনচর্যা, লোকাচার, ধর্মাচার এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত। লোকসঙ্গীতের যে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র ধারাটি ঝুমুর নাম নিয়ে অঞ্চলটির উপরে প্রবাহিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে তা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গান। কুর্মী, ভূমিজ, কামার, কুমার, বাগাল আদিদের মধ্যেই ঝুমুরের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। পুরুলিয়ার পালা পার্বনগুলির বেশির ভাগ দ্রাবিড়াগত বলে অনুমান। করম পূজা, চণ্ডী, মনসা ইত্যাদি তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। আজও দক্ষিণ ভারতে ওঁরাও, বাইগা, রিনঝর ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান উৎসব করমা। বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতে চণ্ডী শব্দটি অনার্য দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক চাণ্ডী থেকে এসেছে। মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো আদিম অধিবাসী নাগপুরের ওরাঁও উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীবোঙ্গার এবং পালামৌ জেলার করোয়া উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। শব্দটি সংস্কৃতে এসেছে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খ্রিস্ট্রীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী জনাগোষ্ঠী আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল।

যে মনসা পূজা পুরুলিয়ায় সার্বজনীন ব্যাপকতা লাভ করেছে সেটিও দ্রাবিড়াগত বলে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অভিমত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জে. ফার্গুসন তাঁর 'True and Serpent' গ্রন্থে লিখেছেন। সর্পপূজা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বাইরে তুরানী জাতির মধ্যে উদ্ভুত হয়। পরে তুরানীরা উত্তরপশ্চিম পথে এদেশে প্রবেশ করে সর্পপূজা প্রচলন করে। সর্পপূজার সঙ্গে আর্যজাতির মৌলিক কোনো সম্পর্ক ছিল না। মনসা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্যসহ বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন দক্ষিণ ভারতে সর্বপ্রথম মনসা পূজা বা সর্পপূজার প্রচলন হয়। উল্লেখ্য সাঁওতাল-মুণ্ডা, ওঁরাও, শবর ইত্যাদি প্রোটো অস্ট্রোলয়েড আদিবাসীর মধ্যে সর্পপূজার বিশেষ কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। এরা সাপকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এমনকি ভয়ানক বিষধর সাপের মাথাটুকু বাদ দিয়ে চামড়া তুলে রান্না করে। ঋকবেদে সাপের উল্লেখ থাকলেও সর্পপূজার উল্লেখ নেই। অথর্ববেদের কালে রচিত হয় কিছু সাপের মন্ত্র। দক্ষিণ ভারতে মনসাকে 'মনচাম্মা বলে।

এব্যাপারে ভিন্নমতটি হল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সংকলিত আচারাঙ্গ সূত্রে বিধৃত দেশবাচক 'লাঢ়' শব্দটি প্রাচীনতর অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। তির্যক নাগলোক লাঢ় দেশের বজ্রভূমি ও সুঙ্গভূমিতে শ্রমণভগবান মহাবীর বিচরণ করে ছিলেন! লাঢ় বা লাড় অর্থে সাপ হলে নাগভূমিতে বা সর্পবেষ্টিত ভূমিতে তাঁর বিচরণ ভবিষ্যতে এদেশে মনসা তত্ত্বের উৎপত্তির হেতু হতে পারে। অনেকে বলেন পদ্মপুরানের বেহুলার কথা জৈনদের কাছ থেকেই পাওয়া। কেতকা, সনকা কেতক শ্রেণীক মহাবীরের আত্মীয় গোষ্ঠী। মত দুটির মধ্যে প্রথমোক্তটিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

পরেশনাথ পাহাড়কে ঘিরে জৈন ধর্মের যে পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছিল তাকে কেন্দ্র করে একটি জৈন রাজ্যও বিন্যস্ত হয়েছিল সেখানে। রাজ্যটির নাম ছিল শিখরভূম। সাত শতকের শেষ থেকে আটশতকের মাঝামাঝি জৈন রাজ্যটি বিধ্বস্ত হতে শুরু করেছিল। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক এবং পাটলীপুত্রের গয়া রাজগীর ও বারানসীর মধ্যে সুরক্ষিত সংযোগ পথ ছিল। এদের মধ্যে একটি ছিল তমলুক থেকে ঘাটাল বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকুপি, ঝরিয়া , গয়া, রাজগীর হয়ে পাটলীপুত্র। দ্বিতীয় পথটি তমলুক হতে সোজা বের হয়ে এই জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অম্বিকানগর এবং ইহার অদূরবর্তী পরেশনাথ পর্যন্ত। উক্ত পথ দুটি ধরে জৈন বণিক এবং যাত্রীরা যাতায়াত করতেন। কাঁসাই, কুমারী, শিলাবতী ও দামোদরের প্রবাহ পথ ধরে চলত পণ্য আদান প্রদানের ধারা। শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, ভাস্কর বর্মার অভিযানে দক্ষিণপূর্ব বিহার-দক্ষিণ পশ্চিমে বাংলা ও উত্তর পূর্ব উড়িষ্যার রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল। এরা কেউ জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। তাম্রলিপ্ত উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম বন্দরের গুরুত্ব হারিয়েছিল। গুরুত্ব হ্রাসের কারণ ভাগিরথি, যমুনা, সরস্বতী; গঙ্গার সঙ্গমে ত্রিধারা। ভাগিরথির চেয়ে সরস্বতী বড়। রূপনারায়ণ, সাঁওতাল পরগনার ছোট ছোট নদীর জলধারা মিলিত হয়ে স্রোত বৃদ্ধি করত। সরস্বতী নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবনতি ঘটে। রাজনৈতিক নির্যাতন, বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস, জৈন বণিকদের বাণিজ্যের বিঘ্ন ইত্যাদি কারণে জৈন রাজ্যটি বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং স্থানান্তরিত হতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক নাগাদ অঞ্চলটিতে জৈনধর্মের লোপ ঘটে।

সাত-শতকের শেষ থেকে আট শতকের মাঝামাঝির শিখরভূম রাজ্যের অবক্ষয়ের কাল থেকেই এতদঞ্চলে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের উদ্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে ধারণা। জৈন ধর্মের দৃঢ়ভূমিতে এই উদ্যোগে দ্রাবিড়াগত অভিযানকারীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনুমান। রাষ্ট্রকূট, চান্দেল্ল, পল্লব, কলচুরী, চোল চালুক্য অভিযানকারীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত, বিশেষ করে শিব ও বিষ্ণুর উপাসক। শিবোপাসনা এতদঞ্চলে অত্যন্ত প্রাচীন এবং সারা জেলা জুড়ে এর ব্যাপকতা দেখা যায়। এমন গ্রাম খুব কমই পাওয়া যাবে যেখানে শিবকে কেন্দ্র করে গাজন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত না হয়। ব্রাত্যরাও শিবের উপাসক ছিলেন অনেকে মন্তব্য করেছেন। চোল ও পল্লব রাজারা ছিলেন শিব ও বিষ্ণুর উপাসক। চালুক্যরা হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়। জৈন মূর্তি এবং স্থাপত্যের পাশাপাশি সন্নিবেশিত হয়ে যে হিন্দু স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য বিশেষ করে যোনিপট্টসহ শিবলিঙ্গ, মহিষাসুর মর্দিনী, গায়ত্রী গজলক্ষ্মী, বিষ্ণু, পার্বতী ইত্যাদি যে মূর্তিগুলি বিশেষ করে বোড়াম, ছোট বলরামপুর, পাড়া, কোশজুড়ি, বুধপুর, বান্দা, দুলমী, বরাকর, দেউলভিড়া, তেলকুপি ইত্যাদি অঞ্চলে দেখা যায় সেগুলি রাষ্ট্রকূট চোলদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। অনেকে মূর্তিগুলোর মধ্যে জৈনদের শাসনদেবীর খোঁজ করেন যদিও তা ভ্রান্তিমূলক। পরিত্যক্ত জৈন পুরাকীর্তির পাশাপাশি লোকবসতি এলাকায় এগুলি নির্মিত হয়েছিল বলেই সম্ভবত এই বিভ্রান্তি। তাঁরা অঞ্চলটিতে হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবনের বিশেষ করে শৈব ও বৈষ্ণব ভাবধারা প্রসারে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করলে চোল স্থাপত্য রীতি যাকে দ্রাবিড় শিল্পরীতি বলা হয় তার সন্ধান মিলতে পারে। বিষ্ণু উপাসনাও বহু প্রাচীন কাল থেকেই অঞ্চলটিতে বর্তমান। চন্দ্রবর্মার শিলালিপির নজিরে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই এ এলাকায় বিষ্ণু (বাসুদেব) পূজা প্রচলিত ছিল। জৈনধর্মের প্রতাপ কালেও এই ধারা ছিল। পরবর্তী কালে দ্রাবিড় প্রভাবে তা প্রসার লাভ করে।

পুরুলিয়ায় ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও দ্রাবিড়,অস্টিক, আর্য, ব্রাত্য চতুর্মুখী স্রোতধারা সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে দেখা যায়। একদিকে শাল, অশ্বত্থ, বটগাছের গোড়ায় অধিষ্ঠানকারী দেবদেবী অন্যদিকে মন্দিরবাসী দেবদেবীদের অবস্থান একটি সমন্বিত ভাবনার জন্ম দিয়েছে। অধিষ্ঠান জনিত বাহ্যিক এবং অনুষ্ঠান জনিত আভ্যন্তরীণ রূপের অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে পাশাপাশি অবস্থানের ফলে। এই পরিবর্তন তথা বিবর্তন acculturation জনিত কারণে। এই বিবর্তনে অনুঘটকের মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে পূজিত ভোলানাথ। ধান ভানতে শিবের গীত প্রবাদটি সম্ভবত এতদঞ্চলেই সর্বাধিক প্রযোজ্য। শিবের যাতায়াত সর্বত্র তাকে কখনও গাছ তলাতেও দেখা যায়, কখনও মন্দিরাভ্যন্তরেও দেখা যায়।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের যে ধারাটি পুরুলিয়ার অভ্যন্তরে আজও প্রবহমান তার মধ্যে দ্রাবিড় সংস্কৃতির ভূমিকা এবং সর্বাধিক এবং সর্বজন স্বীকৃত ; যার রেশটুকু আজও গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্মাচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক আশাক, বাসগৃহ নির্মাণ ইত্যাদির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। রাঢ়ভূমির সর্বত্র এই প্রভাব পড়লেও ভারতের পূর্ব প্রান্তের ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় মেদিনীপুরে বিশেষভাবে প্রকটিত দেখা যায়। তাই দ্রাবিড়বাসিনী জ্যোতিষী খনার বচন, যা লোকবিশ্বাসের অনেক গভীরে শিকড় গেড়েছে, যার প্রচলন আজও প্রাচীন-প্রাচীনাদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায়। যাত্রা অযাত্রা, বৃষ্টি বাদল, চাষবাস, হাঁচি টিকটিকি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডাক পুরুষের কথা হিসেবে প্রবাদগুলি চলে আসছে, যার ভূমিকা গ্রামে গঞ্জে আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি।

বাংলার আলপনার সাথে দক্ষিণ ভারতীয় দেওয়াল চিত্রের বিষয় বস্তুগত অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এছাড়া আলপনাও দেওয়াল চিত্রের অঙ্কন-রীতি অনেকটা একরকমের এবং বাংলার শিল্পী যেমন প্রধানত বাঙালি মেয়েরা দক্ষিণ ভারতীয় দেওয়াল চিত্রের শিল্পীও তেমনি মেয়েরা। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যেও তাই এই চিত্র শিল্পী সাধারণত মেয়েরা। এই সাদৃশ্যের মধ্যে সুপ্রাচীন সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য ও যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে অনুসন্ধান করলে এই দিক দিয়েও আমাদের পূর্ব ভারতের এবং তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের একটা সাংস্কৃতিক লেনদেনের ইতিহাস জানা যাবে।

অনেকে আবার এতদঞ্চলে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও দ্রাবিড়ীয় প্রভাব খুঁজে পান। তারা ছিলকা এবং আশকা পিঠেকে ইডলী ধোসার বিবর্তিত রূপ বলে মনে করেন। খাদ্য হিসেবে নারকেলের ব্যবহার সম্ভবত দক্ষিণ ভারত থেকেই এসেছে। অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। এখানকার গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা তিনবেলা ভাত খাওয়ায় অভ্যস্ত। এই খাদ্য প্রীতির মধ্যেও দ্রাবিড় অস্ট্রিক প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। গ্রাম-গঞ্জের শ্রমজীবী মানুষেরা সকালবেলার আহারকে 'বাস্যাম' বলে। 'বাস্যাম' বাসি আম অর্থ বাসিভাত, আম অর্থে ভাত অস্ট্রিক শব্দ। গ্রামাঞ্চলে প্রচুর তেঁতুল গাছের অবস্থান, দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্যাভাসে টকের বহুল ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপ নিবিড় ভাবে অনুসন্ধান করলে অঞ্চলটির পোশাক আশাক বাসগৃহ নির্মাণ ইত্যাদির মধ্যেও দক্ষিণ ভারতীয় রীতির রেশটুকু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ছোটনাগপুর হল প্রাচীন ঝাড়খণ্ড বা বনভূমি। এই ঝাড়খণ্ডের একাংশ মানভূম ও সিংভূম বাংলার পশ্চিমপ্রান্ত রাঢ়ভূমির সাথে মিশেছে। বাঁকুড়া সদর ও মেদিনীপুরের উত্তর পশ্চিমাংশ প্রাচীন ঝাড়খণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। বিহার ও বাংলাদেশের এই অঞ্চলটিকে কেউ কেউ 'The heart of India' বলেন। এটি একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এই অঞ্চলের মধ্যে

যে, জৈন, বৌদ্ধ ও পরবর্তী হিন্দু সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়েছে তা নয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানাবিধ জনগোষ্ঠী ও বৃত্তিজীবীর চলাচল হয়েছে। ভারত সংস্কৃতির সকল তীর্থের সেরা তীর্থ দ্রাবিড় উৎকলবঙ্গ, যার বিমিশ্র রূপারেখাটি খুঁজে পাওয়া যায় পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে।

তথ্যসূত্রঃ

১। বাঁকুড়া-তরুন দেব ভট্টাচার্য।
২। পুরুলিয়া-তরুন দেব ভট্টাচার্য।
৩। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—ড. অমলেন্দু মিত্র।
৪। ছত্তিশগড়ের লোক জীবন ও সংস্কৃতি— কানাই কুণ্ডু।
৫। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা—শ্রীসনৎকুমার মিত্র।
৬। পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের লোক সাহিত্য—সুভাষ বন্দোপাধ্যায়।
৭। ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য— বঙ্কিম মাহাত।
৮। মহাভারতীয় যুগে বিরাট রাজ্য ও তার পরিণতি— শ্রী রামকৃষ্ণ সিংহ দেব।
৯। শ্রী মলয় চৌধুরী— কেতিকা, পুরুলিয়া।



পুরুলিয়ার লোকনৃত্য

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা

জাহের থান। লোকে লোকারণ্য। একটা বিশাল বৃত্ত করে দাঁড়িয়েছেন জনতা। মাঝে গুটিকয়েক আদিবাসী নারী। মাথায় পাতা, হাতে ফুল, পায়ে বালা, হলুদ ছোপা লালপেড়ে শাড়ি। ওরা যেন কিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অমনি 'দিদির দাং দিদির দাং দিদির দাং'—বাজনা বাজিয়ে লাফিয়ে উঠলেন মূল বায়েন। গান ধরলেন মূল গায়েন: 'দাড়া হাড়া অড়া দুয়ার তালা রে। লিগির লিগির গেঞ হারাঞ'...। অমনি প্রস্তুত হওয়া মেয়েগুলির সম্মিলিত অঙ্গভঙ্গি—হাত নেড়ে, পা নেড়ে, কোমর দুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে—এগোতে এগোতে, পেছতে পেছতে, খাড়া হতে হতে, নুয়ে পড়তে পড়তে—কিন্তু সবই চলছে বাজনার তালে তালে, গানের সুরে সুরে।

—এই হল লোকনৃত্য। এ নৃত্য চলছে অনাদিকাল থেকে। চলছে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, সমাজে সমাজে, প্রজন্মে প্রজন্মে। চলছে উৎসবে, অনুষ্ঠানে, পালাপার্বণে। চলছে লক্ষ উপলক্ষ ছাড়াও একান্ত খেয়ালে, নিতান্ত খুশিতে কোনো চাঁদনী রাতে, কোনো সদর রাস্তায় কিংবা ডহরে। গ্রাম-মানুষের আনন্দ বিনোদনের এ হল একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই মন যখন জাগে, তখন আপনিই জেগে ওঠে নাচের ছন্দ:

ও কুথথি রে কুথথি
ও কাঁকড়লতে কাঁকড়জালি ভত্‌তি রে ভত্‌তি॥

অমনি দুমদুম, দুমদুম, দুমদুম...

সারা বিশ্বেই আছে লোকনৃত্য। বাংলাতেও আছে। অখণ্ড বাংলার প্রতিটি জেলাতেই আছে। প্রায় গ্রামেও আছে। তবে স্থানভেদে, মানুষভেদে, সমাজ ও সম্প্রদায় ভেদে তার নানা রূপ, নানা নাম এবং সে নৃত্য বড় বিচিত্র এবং অগণিত। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বীরভূমের স্থানে স্থানে সেই বিবিধ লোকনৃত্যের বৈভব লক্ষ করি। তন্মধ্যে সবচেয়ে উপেক্ষিত যে জেলা পুরুলিয়া,—তা কিন্তু লোকসংস্কৃতি লোকনৃত্যের বিচারে নিশ্চিত অখণ্ড বাংলার শীর্ষনাম। বলাবাহুল্য পুরুলিয়া নাচের দেশ, পুরুলিয়া গানের রাজ্য; পুরুলিয়া এই উপেক্ষিত লোকসংস্কৃতির মহাসাম্রাজ্য। নাচে-গানে-বাজনায় পুরুলিয়া এ দেশের এক তুলনাহীন পীঠস্থান। বিশ্বজুড়ে তার নাম। জগৎজুড়ে তার গৌরব।

লোকে জানে, পুরুলিয়ার ছো-নাচ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু আর যে সব নাচ যেকোনো মানুষকে চুম্বকের মতো টানে, সেগুলি হল: নাচনি নাচ, ভুয়াং নাচ, পাতা নাচ, করম নাচ, জাওয়া নাচ,

খেমটী-নাচ, ধুমড়ি নাচ, ঝুমুর নাচ, নাটুয়া নাচ, ঢাকি নাচ, ঢালি নাচ, কাঠি নাচ, খাঁটি নাচ, বেহা নাচ, ভাদু নাচ, টুসু নাচ, ইঁদ নাচ, বাঁধনা নাচ, ঘেঁটু নাচ—এমনি কত কি! সাঁওতালী সমাজে আরো কিছু নাচ আছে—সে হল, বাহা নাচ, ডুংগার নাচ, ডাঁশায়ে নাচ, লবয় নাচ, মাতোয়ারা বা গুজর নাচ। আবার যারা 'ওরাঁও' বলে পরিচিত, তাঁদের সমাজে বিশেষ বিশেষ লোকনৃত্য হল—ব্যঞ্জা, জ্যাঠাখেরে, কারাম প্রভৃতি। এছাড়া সারা জেলার মধ্যে ছড়িয়ে আছে বিষহরা-মনসার নাচ—শিবঠাকুরের গাজনের নাচ, কিংবা ধর্মঠাকুরের গাজন ভক্ত্যার বিশেষ বিশেষ নৃত্য। এবং সারাদেশের সঙ্গে পুরুলিয়াতেও হরিভক্তরা কীর্তন-নাচ করে থাকেন।

লোকনৃত্যের প্রধান স্থান গ্রাম্য দেবদেবী বা বঙ্গার থান। প্রধানত তাঁর পুজো উৎসবকে কেন্দ্র করে এই নাচ; তাঁর মেলাকে অবলম্বন করেই এসেছে এই নাচ-গান-বাজনার বিবিধ সব আসর। কিন্তু এই লোকনৃত্য কোনো গ্রামধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। একান্ত আনন্দ বা স্ফূর্তিই তার লক্ষ। যদিও অনেক নাচের গান গুলির মধ্যে আছে নানা দেবদেবীর উল্লেখ—কিন্তু সেই 'উল্লেখ', উল্লেখ মাত্রই। তারপর সে-গান প্রকাশ করেছে মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, জীবন-জীবিকার সংবাদ।

সাধারণত লোকনৃত্য একক নৃত্য নয়। দলবেঁধে সম্মিলিতভাবেই এ নাচ। হয় পুরুষেরাই নাচছেন, না হয় নারীরাই নাচছেন; না হয় নারী-পুরুষ নাচছেন সমবেতভাবে। একমাত্র আদিবাসী নৃত্যে নারী-পুরুষ নাচছেন একত্রে। অন্যান্য নিম্ন-হিন্দু সমাজে নারীরা যোগ দেন না কখনো। সেখানে পুরুষেরাই নাচেন নারীর বেশ ধারণ করে। কিন্তু এদেশের শাস্ত্রীয় নৃত্যে নারীরই প্রাধান্য। মণিপুরী নৃত্যে তাই তো দেখি। তবে আসাম বা হিমাচল প্রদেশে কিরাত নৃত্যে প্রাধান্য দেখি পুরুষদেরই অবশ্য ভারতীয় হিন্দু ভাবনায় নৃত্যের যিনি আদি দেবতা, তিনি শিব; তিনি পুরুষই। আর এক দেবতাও নাচেন, তিনি গণেশ, তিনিও পুরুষ। এসবের ছবিও আছে, ভাস্কর্যও আছে।

পুরুলিয়ার লোকনৃত্যের দল বা আখড়া আছে অনেক পল্লীতেই। কিন্তু সাইনবোর্ড কোথাও নেই; এখন কোনো কোনো স্থানে তা ঝোলানো হচ্ছে। পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি, অযোধ্যা, পর্বতপুর, ধানাড়া, আরসা, বাঁদোয়ান, কোনাপাড়া, বড়গ্রাম, গুরুর, ডাভা, কাঁড়িহেঁসা, ঝালদা, কলহাকাটা প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামে নাচ-গান-বাজনার প্রভূত চর্চা হয়। মাঝে, কিছুদিন কোনো কোনো গ্রামের দল উঠে যাচ্ছিল; এখন সরকারি উৎসাহে ও বেসরকারি প্রযোজনায় সেসব দল যেমন জাঁকিয়ে উঠছে তেমনি তৈরি হচ্ছে আরো অনেক নতুন নতুন দল। শুধু ছো-নাচের দলই কত স্থানে যে কতগুলি হয়েছে, এই মুহূর্তে তার হিসেব দেওয়া যাবে না। প্রায় সারাবছরই গ্রামে গ্রামে বাজনা বাজছেই। কোথাও-না কোথাও নাচ-গান হচ্ছেই। তবে ঢল নামছে ধান কাটার পরই—পৌষ মাসের মাঝামাঝি থেকেই। পৌষপার্বণে নাচে-নাচে ভরে যায় সমগ্র পুরুলিয়া জেলা—পরবে পরবে উত্তাল হয় গ্রামগুলি। পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ, এই ছ'মাসে যেন নাচ-গানের বিরাম নেই। তারপর যেদিন আসবে প্রচণ্ড বর্ষা, খেতে-খামারে মাঠে-ঘাটে কৃষিকাজে মেতে উঠবে সাধারণ শ্রমজীবীরা, তখনো কিন্তু কোনো কোনো চাঁদনী রাতে বাজনা বাজবে—'দিদির দাং দিদিরর দাং'। নাচের শব্দ উঠবে 'গোড়েৎ—গোড়েৎ'—।

১। ছো-/ছ-/ছৌ-নাচ

পুরুলিয়ার শ্রেষ্ঠ নাচ 'ছো-নাচ'। এ নিয়ে তো আলোচনার অন্ত নেই। তবে ছো-নাচ আছে বিহার ও ওড়িশার অনেক স্থানে, পশ্চিম মেদিনীপুরের কোন কোন গ্রামে। খোলা আকাশের নীচে এই নাচ। দরকার হয় না মঞ্চের। বৃত্তাকার দাঁড়ান জনতা। তারই মাঝে থেকে নাচিয়েদের ছুটে

ঢোকার মতো একটা চওড়া রাস্তা, জনতা, বৃত্তের মাঝেই থাকেন বাজনাদারেরা। একদিকে থাকেন গায়েনরা। সঙ্গত করেন পাঁচ-সাতজন। নাচিয়েরা মুখে পরেন মুখোশ। পালা অনুসারে সে মুখোশ তৈরি হয় আর তদনুসারে থাকে পোশাক। 'শিব-দুর্গা পালায় থাকে শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মুখোশ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক,—তাঁদের বাহনের মুখোশ। এছাড়া থাকে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে রাখার জিনিস—ত্রিশূল, সাপ, বীণা, পদ্মফুল, মালা—এসবই স্থানীয় মানুষেরই নির্মাণ। 'মহিষাসুরবধ' পালায় থাকে রণচণ্ডী দুর্গার দশ হাত, দশহাতের অস্ত্র, দুর্গা ও মহিষাসুরের মুখোশ। 'কালী' পালায় থাকে জিভ বের করা মুখোশ। পশু-পাখি চরিত্রেরও মুখোশ আছে। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা কোন পুরাণ-কাহিনিতে চরিত্র অনুযায়ী আছে চমৎকার মুখোশ।

ছো-নাচ আরম্ভ হয় রাত দশটার পরেই। এক-একদিন একাধিক পালাও দেখানো হয়। তাই কোনো কোনো স্থানে পালা দেখাতে দেখাতে ভোর হয়ে যায়। আরম্ভের অনেক আগে থেকেই বাজনা বাজতে থাকে। প্রচণ্ড জোরে একসময়ে বাজনা বেজে থেমে যায়। বন্দনা আরম্ভ হয়। বন্দনা শেষেই ছুটে আসে পালানুযায়ী চরিত্র, তবে প্রায় পালাতেই গণেশ থাকে। তার খড়ের দুহাত থাকে পিঠে, শুঁড় দুলিয়ে সে ঢোকে, ঢুকেই নাচতে থাকে, তারপর গানে গানে প্রকাশ পায় ঘটনা। সারা পুরুলিয়ায় এ নাচ চলে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত—টানা তিন মাস। গানের তালে তালে নাচ। শিব দুর্গা, মহিষাসুর, ভীম-অর্জুন, কৃষ্ণ বা সিংহ, বানর, পাখি, সবই মুখোশ পরে নাচতে থাকে। এ নাচ বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রধানত কুর্মি মহোতো ও ভূমিজরা। এর আদিরূপ আছে 'শিকার নৃত্যে', 'শবর নৃত্যে' ও 'মেছো' নাচে। গম্ভীর সিং মুণ্ডা, পিতাম্বর সিং, সুচাঁদ মাহাতো প্রমুখ এ নাচের জগৎ বিখ্যাত শিল্পী। আর এক শিল্পী মধুসূদন সিং। তিনি বলেন—"এই নাচটা সহজ কাজ নয়। সারা শরীর স্থির রেখে মাথা নাড়তে হয়, মুকুট নাড়াতে হয়। কখনো মাথাও স্থির থাকবে, শরীরের নিম্নাংশও স্থির থাকবে, শুধু কাঁধ দুটো কাঁপবে। সে বড় কঠিন কাজ। কখনো নাচতে নাচতে শিল্পী উঠবে লাফিয়ে, পা দুটো জোড়া করে সে পড়বে বসে। আর সেভাবেই সে লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে সামনে বা পিছনে। কখনো শিল্পী বুকটুকু কাঁপাবে। কখনো তা হবে দেবতার চালে, কখনো রাক্ষসের চালে, কখনো বা বীরের গতিতে।" কথায় কথায় মধুসূদন বললেন—"এখন সবই যুদ্ধের পালা, রামায়ণ মহাভারতের নানা যুদ্ধ। যুদ্ধ না হলে পালা জমে না।" মুখোশ তৈরির কথায় তিনি আমাদের বাগমুণ্ডি যেতে বলেছিলেন। বাগমুণ্ডিতে অন্তত ষাট ঘর শিল্পী মুখোশ তৈরি করেন। এছাড়াও শিল্পী আছেন জয়পুর, ডুমুরডি, জোড়দা ও বান্দোয়ানে। আমরা পুরুলিয়ার অসংখ্য গ্রামে ছো-নাচের দল দেখেছি। তবে দল আছে বাগমুণ্ডি বান্দোয়ানেই বেশি।

ছো-নাচে প্রচুর গান। সাধারণত দু'চরণে সীমাবদ্ধ। বিষয়—পুরাণকথা বা সংসারকথা। পুরাণকথার গানগুলি নিতান্তই পালাগান, সংসারকথার গানগুলি রক্তমাংসের মানুষের আনন্দ-বেদনায় পূর্ণ। এগুলিতেই কবিত্বের স্পর্শ আছে। তবে ছো-নাচে, নাচটাই প্রধান, গানটা গৌণ। নানা পালার নানা নাম—'মহিষমর্দিনী', 'রাবণবধ', 'কংসবধ', 'অভিমুন্যবধ', 'শিব-দুর্গা' প্রভৃতি। 'অভিমন্যু' পালার নাচের তালে তালে গান—প্রারম্ভে উত্তরা বলছে—

উত্তরা করে নতিস্তুতি। আজ পতি রাখহ মিনতি...
ওই যে হৃদয় বিদরে শ্যাম স্বপনে। দিব না যেতে রণে...

এরপর অভিমন্যুর উত্তর—

প্রিয়ে আমি বলিগে তোমায়।
তুমি, রণে বাধা দিয়ো না আমায়...

আমি রণে যাবো দাও গো বিদায়...

সংসার-জীবনের গানে জীবন-যন্ত্রণার কথা। বিবাহিত কন্যা শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিত হয়ে বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে আসে। এবং মনের দুঃখে বলে—

টাঁইড়ে টাঁইড়ে গ বরণ গঁওইধা কুড়া ভাল।
শ্বশুর ঘর যাবো না আমি ভাতার হইল কাল॥

২. নাটুয়া নাচ

পুরুলিয়ার আর এক শ্রেষ্ঠ লোকনৃত্য 'নাটুয়া নাচ'। প্রধানত আদিবাসী সমাজে এর চল্। অযোধ্যা, জয়চণ্ডী, সাতরি, বরাবাজার প্রভৃতি অসংখ্য অঞ্চলে এখনো নাটুয়া কম-বেশি দেখা যায়। আগে বিয়ের আসরে নাটুয়া নাচ হত। শিল্পীর পরণে ঘাগরার মতো করে পরিহিত ধুতি। খালি গা। তবে বুকের ওপর রঙিন শাড়ি গুণ চিহ্নের (x) মতো করে আঁটা। মাথায় ময়ূরের পাখা, বাঁহাতে বাঁশ বা বেতের কৃত্রিম ঢাল। ডান হাতে কৃত্রিম তলোয়ার বা টাঙ্গি। পায়ে ঘুঙ্গুরের তোড়া। বাদ্য বাজে ঢাক, ঢোল, নাগড়া, বাঁশি। আর বাজনার তালে তালে নাচ। নবীন নাটুয়া শিল্পী তরুণ দেশোয়ালি দেখালেন, এই নাচে আছে বারোটি তাল—ধুমুনা, ধুংড়ি, দারমদা, দেনাকি, উলফাবারি প্রভৃতি। বর এলে নাচ দেখিয়ে যে তাল উঠে, তা হল ধুমুনা। বাজনাটা বাজে—'ডেন ডেন ডেন ডেন'। নাচটা যুদ্ধের মতো। ঢাক-ঢোলের শব্দ বড়ো গুরুগম্ভীর। নাচিয়েদের দ্রুত পদসঞ্চালন প্রচণ্ড পৌরুষ প্রকাশক। কাঁধের ঝাঁকুনি ও বাহুর উত্তোলন বড় বীরত্বব্যঞ্জক। ঢাল চালনা আত্মরক্ষাত্মক। এবং তলোয়ার ঘোরানো ভীষণ আক্রমণাত্মক। সব মিলিয়ে লড়াই লড়াই ভাব ফুটে উঠে নাচে। নাচ বড়ো দৃষ্টিনন্দন এবং বাজনা বড়ো শ্রুতিবিদারক। ইতিহাস বলে, আগে ওড়িশার রাজাদের দুর্গা পুজোতে এ-নাচ হত। নাটুয়া নাচের শিল্পী কখনো একজন, কখনো দুজন, কখনো বা একগুচ্ছ। একদা ছোটনাগপুর মালভূমিতেও এ-নাচ হত, এই নাচে কোনো গান নেই। শুধু শারীরিক কসরৎ দেখানো—হাঁটা, চলা, ছোটা, লাফানো, ডিগবাজি খাওয়া ইত্যাদিই এ নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩. লাটা নাচ

পুরুলিয়ার নাটুয়া নাচেরই একটি রকমফের 'লাটানাচ'। ব্যবস্থা ও আঙ্গিক নাটুয়ারই মতো। তবে লাটা একক নৃত্য। পোশাক সম্পূর্ণ আলাদা। শিল্পীর খালি গা। তাতে রঙ মাখানো হয়। এবং সারা গায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় রঙবেরঙের ফালি কাপড়। ফালি ঝুলতে থাকে বাহুতে— কব্জিতে। গলায় মালা, কপালে টিপ, চোখে কাজল, ঝাঁকড়া চুল, ধুতি মালকোঁচা মারা, কোমরে লাল গামছা, পায়ে ঘুঙুরের তোড়া। বাজনার তালে তালে নাচ। সারা আসর জুড়ে ঘুরে ঘুরে নাচ। পুরুলিয়ার সাতুড়ি, হুড়া, কাশীপুর, জয়পুর, মুরাড়ি, আদ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে লোহার, বাগ্দী, ধীবর প্রভৃতি সমাজে এখনো কেউ কেউ এই নাচে মত্ত।

৪. বুলবুলি নাচ

পুরুলিয়ার আর এক অভিনব নাচ 'বুলিবুলি'। ছয়-আট জনের দল। ছজনের দলে তিনজন সাজে রাধা, তিনজন সাজে কৃষ্ণ। ছেলেরাই মেয়ে সাজে। একজন থাকে মূল গায়েন, একজন দুয়ারী। এছাড়া বাজনদার থাকে। তারা লাগড়া, ঢুলি, ঝুমকা, শাহিন বাজায়, পোশাক ঝলমলে।

সকলের মাথায় চুড়া, কৃষ্ণদের হাতে বাঁশি, রাধাদের কোমরে গইর‍্যা। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাচ,— দুর্গাপুজো থেকে শিব গাজন পর্যন্ত। ঝুমুরের গানই বুলবুলির গান, এ-নাচের বিখ্যাত গায়ক মিহিরবরণ লাল সিংদেও, কৃত্তিবাস কর্মকার প্রমুখ। বাজনা বাজে—

গিড়িন গেজা গিড়িন গেজা গিড়িন গেজা। ঝাঁ ঝাঁ গেজা গেজা গেড়ে ঝাঁ-ঞ ঝাঁ-ঞ গেজা। গেজা গেজা গেড়ে। একটি গানের নমুনা— ইকুল লদী উকুল লদী, মাঝ লদীতে পাথর বালি।

বঁধু, বল হে কেমনে পেরাব, ঝাঁপ দিলে ডুবিয়ে মরিব। বঁধু হে....

৫. মুক্তাটুকি নাচ

পুরুলিয়ার আর এক বিখ্যাত নাচ 'মুক্তাটুকি'। একসময়ে ধর্মঠাকুরের গাজনে এ-নাচ হত। ধর্মঠাকুরের পুকুর-গেড়্যা থেকে তাঁর থান পর্যন্ত এই নাচ দেখাতেন এক একজন নাচিয়ে। এখানেও নাচিয়ের মালকোঁচা ধুতি, কোমরে লাল গামছা। বাজনার তালে তালে ধীর গতিতে এ-নাচ। তবে কোনো গান নেই। নাচ দেখিয়ে ঠাকুরকে প্রসন্ন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এক সময় বারতিরা শিল্পীদের দিয়ে এ নাচ করাতেন।

৬. আঁঝিমুঁঝি নাচ

পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামান্তরে কিশোরদের একটি নাচের নাম 'আঁঝিমুঁঝি'। বাঁধনা পরবে কালীপুজোর দিন সন্ধ্যায় এই নাচ হয়। প্রত্যেকের হাতে থাকে জ্বলন্ত পাটকাঠির গুচ্ছ। তা মশালের মতো জ্বলে। কখনো হৈ-হুল্লোড় করতে করতে কিশোরেরা মশাল ঘুরায়। ঢোল বাজায়। বাজনার তালে তালে তারা নাচে। নাচতে নাচতে গান ধরে—

আঁঝিরে মুঁঝিরে　　　সগ্‌গে বাতি জ্বলে রে
খৈসাবুড়ি খোস লে　　　দাইদা বুড়ি দাদ রে
পুড়ে মরে যা রে　　　পুড়ে মর‍্যে যা রে।

আঁঝিঝুঁঝি কিশোর নাচ, তবে আচারভিত্তিক নাচ। প্রধানত খোস পাঁচড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাবার বাসনাই এর মূলে। পণ্ডিত বলবেন, আঁধার ঘুচিয়ে আলোতে আসার এই নাচ। পাটকাঠির মশাল তাই যখন জ্বলতে থাকে তখন কিশোরেরা আগুন নিয়ে লাফায় ঝাঁপায়, ছড়া বলে, নাচে।

৭. কাপ নাচ

পুরুলিয়ার একটি মজার লোকনৃত্য 'কাপ নাচ'। অন্যত্র যাকে বলে সঙ্‌—স্পোর্টসে যাকে বলে, 'যেমন খুশি সাজো'। পুরুলিয়াতে তাই এই সাজে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। পণপ্রথা, সতীন সমস্যা, ভোটরঙ্গ, কুঁড়েমি, মাছধরা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই নাচের গান আছে। তদনুসারেই সাজ। পুরুলিয়ার মানবাজার থানার কুড়মা শোল, বরাবাজার থানার লাগুডি প্রভৃতি স্থানে এর দল আছে। শিবের গাজন, ভান্‌সিংহের মেলা কিংবা পাহাড়পুজোর দিনে বাজনার তালে তালে এ নাচ হয়। এক এক দলে ৪-৬ জন করে নাচিয়ে থাকে। ২/৪ জন বাজনদার থাকে। একজন প্রধান গাইয়ে বা দুজনে যৌথ গাইয়ে গান ধরে। শিবগাজনে শিব কিংবা কালী কিংবা সন্ন্যাসীর কাপ সাজে। পণপ্রথায় কন্যা ও পিতার কাপ দেখা যায়। পিতা বসে বসে টাকা গোনে, মাঝে মাঝে চুরুট

টানে। হঠাৎই দুরন্ত বেগে কন্যা ছুটে আসে। সজোরে বাজনা বাজে, পিতার টাকাগুলিকে সে ছড়িয়ে দেয়, গান ধরে—

(ও বাপ) বিহা কইরব নাই, কইরব নাই
তরে দিলাম বলে।
ও বাপ গ তরে দিলাম বলে
পণ দিহে বিহা দিলে আমি মইরব জলে।
বাপ আমি মইরব জলে॥

৮. নাচনি নাচ

পুরুলিয়ার খুব জমাটি-নাচ নাচনি নাচ। লৌকিক নারী-নৃত্য এটি। সেকালে ধনী-বিলাসীরা ছিল এ নাচের ভক্ত। এখন তেমন বিলাসী হাতে গোনা যায়। তাই নাচনি নাচের এখন আসর বসছে কোনো লৌকিক দেব-দেবীর মাড়োয় কিংবা কোনো ক্লাবের বদান্যে। গ্রামাঞ্চলে এর বিশেষ চাহিদা। সারাদিন খেতে-খামারে কাজ করে শ্রমজীবীরা ঘরে ফেরে সন্ধ্যেয়। তারপর সামান্য একটু আনন্দের জন্যে চিতিয়ে থাকে ওরা। তখন আদিরসাত্মক গানের সঙ্গে এই নারী-নৃত্যটিকে তারা লুফে নেয়। একদা পুরুলিয়ার আনাচে কানাচে 'নাচনি'র দল ছিল। এখনো অসংখ্য গ্রামে 'নাচনি'র সন্ধান পাই। এক-একটি দলে প্রধানত একজন কখনো দুজন নাচনি থাকে। একজন থাকে মূল গায়েন। তাকে বলে রসিক। দুচারজন থাকে বাদক। বাদ্যযন্ত্র বলতে ঢোল, ধামসা, সানাই, কত্তাল ও চেরপটি। অনেক সময় নাচনি নিজে গায়, রসিক নিজে বাজায়। গান বলতে ঝুমুর, যা অতিমাত্রায় শৃঙ্গার রসের। বাবুরা বলে 'অশ্লীল'। তবে অধিকাংশই প্রেমের গান, বিরহের গান। —সুর দাঁড়শালিয়া, ভাদরিয়া। সাধারণত ত্রিপল খাটিয়ে আসর, চারদিকে ডে-লাইট। প্রচণ্ড বাজনায় যেন বাতাস কাঁপতে থাকে। হঠাৎ বাজনা থামলেই রসিকের আগমন/প্রস্তাবনা গান। অমনি চিলের মতো যেন উড়ে এসে তার গান ছিনিয়ে নিয়ে নাচনির নাচ। নাচ আর গান— গান আর নাচ— নাচ আর গান আর বাজনা। তালে তালে রুমাল উড়িয়ে, বুক কোমর নিতম্ব দুলিয়ে, নাচনীর চোখধাঁধানো নাচ, তার সঙ্গে দর্শকদের আনন্দ-উল্লাস। নাচনির লাল ঠোঁটে হাসির জোয়ার। কখনো কখনো অত্যুৎসাহী কোনো দর্শকের নিচের সীটে দাঁড়িয়ে অমনি কোমর দুলিয়ে নাচ। কারো কারো চিৎকার—'ঘুরে ঘুরে'। কেউ-বা ছুটে এসে নাচনির হাতে গুঁজে দিচ্ছে দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকার নোট, আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ছে জনতা। নাচনির গান উঠছে পঞ্চমে :

ফুলেতে বসনা ভমর ফুলের মধু দিব না।
ষোল বছ্‌র বয়স নাগর এ কলঙ্ক লিব না॥

পুরুলিয়ার বিখ্যাত নাচনিরা হলেন—

নাম	গ্রাম	রসিক
১. সিন্ধুবালা দেবী (জন্ম— ১৯১২),	মাতলা,	মহেশ্বর মাহাতো।
২. রসনা সর্দারিন (জন্ম— ১৯২১),	বগপটম,	কালিনাথ সিং সর্দার
৩. রাজবালা তন্তুবায় (১৯৪১),	যুগিডি,	কার্তিক তন্তুবায়
৪. মালাবতী দেবী	উদলখান,	বাউরিবন্ধু মাহাতো

৫. বিমলা দেবী	সটরা	গৌরচন্দ্র কুমার
৬. ভানুমতী দেবী	গুড়দা	অনিল মাহাতো
৭. অঞ্জনা দেবী	বলরামপুর	শঙ্কর মাহাতো
৮. শান্তি দেবী	গোপালপুর (বলরামপুর)	শ্যামাপদ মাহাতো
৯. জ্যোৎস্না দেবী	কেঁন্দরি	বিকাশ মাহাতো
১০. গোলাপী দেবী	ডুমারি	রাধাগোবিন্দ মাহাতো

নাচনি নাচের আমি সমীক্ষা করেছি দীর্ঘদিন ধরে। এঁদের দুঃখময় জীবনের কথা শুনেছি বারবার। কিন্তু এঁদের শরীর সঞ্চালন সেই কোমর বা বুক দোলানো, ঠোঁট বা চোখ কাঁপানো, ঘাড় বাঁকানো, মাথা বাঁকানো আর তার সঙ্গে গানে গানে আসর মুখর করা ভীষণ বড় অনুশীলনের কাজ। নাচনীর ভাষায়, 'সে হল গুরুর কৃপা।' গুরুর কথায়, 'সে হল ভগবানের দান।'

নাচনির গান মানেই ঝুমুর। পুরুলিয়ার ভবপ্রীতানন্দ, চাঁমু কর্মকার, দীনা তাঁতি, সুবল রাজোয়া, দুর্যোধন দাস, প্রমুখ স্বভাব-কবিরা সেই গানের লেখক।

৯. খেমটী নাচ

পুরুলিয়ায় একদা খুব চল্ ছিল 'খেমটী নাচে'র। এ নাচ এসেছে বিহার-হাজারিবাগ থেকে। এ গানও রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক প্রেমের গান। তবে 'সত্যিসত্যিই অশ্লীল'। নাচনি নাচের সঙ্গে এর তেমন পার্থক্য নেই। তবে এতে রসিক নেই, গায়ক আছে, বাজনদার আছে। অঙ্গভঙ্গি এ নাচেও প্রধান। অনেকটা ঝুমুরের মতো গান। গানের থেকে নাচটাই বেশি। গানের যে কোন একটি কলি যুবক-যুবতীদের সহজেই উত্তেজিত করে :

এই খাট পেতেছি বঁধু, শুবি যদি আয় হে; আয় হে, আয় হে...
ও বোতলে রয়েছে সুরা, পান করবি যদি আয় হে; আয় হে, আয় হে॥
এক চুমুকে ভরে না প্রাণ। তাই করি সকলি দান।
বঁধু, ধর ধর ঝঁট ধর নইলে ভেসে যাই হে॥
বুকের ভিতরে পকা লুটেপুটে খায় হে॥

১০. ধুমড়ি নাচ

পুরুলিয়ার অনেক স্থানে আর এক আয়োদি নাচের নাম 'ধুমড়ি নাচ'। অনেকটা বাইজি বা খেমটী নাচের মতোই। অশ্লীল গান ও অযথা অঙ্গভঙ্গি এ-নাচের মূল বৈশিষ্ট্য। নাচনি বা বাইজি নাচে থাকে ঝলমলে পোশাক। কিন্তু ধুমড়ি নাচে নাচিয়ে নারীর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনেকটাই অনাবৃত। সারা আসর ঘুরে-ঘুরে শ্রোতা দর্শকদের চিবুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে একদা এই নাচ হত। নাচনিতে থাকে সুন্দরী নারী, ধুমড়িতে নারী সুন্দরী না হলেও চলে। একদা মোটাসোটা, অনেকটা বিকৃতদর্শন নারীরাই ধুমড়ি সেজে নাচতো। দুটো ঢোলই এর প্রধান বাজনা। এখানেও একজন রসিক বা নাচের গুরু থাকে। প্রধানত স্বামী/পরিত্যক্তা নারী এই নাচে যোগ দেয়। কোনো কোনো গানে, রঙ্গব্যঙ্গও আছে। যেমন—

ও পরানের কানাই রে।
বামুন ঘরে পাঁঠী রাঁধে কেমন করে সামাই রে।
তোর যে এত রসের টান, কেমন করে যোগাই রে॥

১১. খাঁটি নাচ বা পাতা নাচ

সমগ্র পুরুলিয়ার একটি প্রধান লোকনৃত্যের নাম 'খাঁটি নাচ'। প্রধানত এগারো-তেরো-পনেরো জনকে নিয়ে এক একটি দল। নাচিয়েরা সকলেই পুরুষ, কিন্তু পোশাকে-আশাকে এরা নারী সাজে। এদের মাথায় রুমাল পরণে শাড়ি ব্লাউজ, সায়া। হাতে, কানে, নাকে, কপালে, গলায় নারীর অলঙ্কার। দু-হাতেও দুটি রুমাল। একজন মূল গায়েন গান ধরেন। আর গানের তালে-তালে বাজনা ও নাচ। সারিবদ্ধ নাচ, —এগিয়ে, পিছিয়ে, ঘুরে ঘুরে নাচ। নাচ বড় দ্রুত-গতির। সেজন্যে প্রায়ই বড় ধুলো ওড়ে। গানগুলিতে জীবন ও জীবিকার কথা। কখনো প্রেম ও বঞ্চনার কথা ধ্বনিত হয়। যেমন—

ও ঝিঙাফুল লিলেক জাতি কুল গো।
চাঁয়্যে চাঁয়্যে দেখি আমি মনের বড় ভুল গো॥

প্রধানত দুর্গাপুজোর দিন বা পৌষ পরবে দেব-দেবীর থানে এই নাচ হয়। অনেক সময় নাচিয়েদের পায়ে ঘুঙুর থাকে॥

১২. ঘোড়া নাচ

পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে একটি সুপ্রচলিত নাচ 'ঘোড়া নাচ'। বুট পরা ঘোড়ায় চড়া ধর্মঠাকুরের যেমন মূর্তি কল্পনা করা হয়, অনেকটা তেমনি ভঙ্গিতে এই নাচ করেন শিল্পীরা। এক-একটি দলে সামনে একজন, তার পিছনে দু-দুজনকে নিয়ে সারি, তাতে থাকে ১+(২x৪)= ৯ জন। তেমনি ১১, ১৫, ১৭ জনের নাচ। ঢোল, কাঁসি, ঢাক প্রভৃতি বাজে। গান হয়, প্রধানত ধর্মঠাকুর বা কোনো গ্রামদেবতার পুজোকে ঘিরে এই নাচের চল্। বাঁশ, কাপড়, রাংতা, কাগজ, শোলা ইত্যাদি দিয়ে বৃহৎ আকারের ঘোড়া তৈরি করা হয়। তার পিঠটা ফাঁকা থাকে। তাতে শিল্পী ঢুকে মাথা বের করে দাঁড়ান এবং ঠিক ঘোড়ার ভঙ্গিতে সেই কাগুজে ঘোড়াকে নাচাতে থাকেন। দূর থেকে মনে হয় যেন কোনো মানুষ ঘোড়ায় চেপে ছুটছে বা ঘোড়াগুলি নাচছে। 'ঘোড়া-নাচে' আগে গান ছিল না। এখন ঝুমুর গান গাওয়া হচ্ছে।

১৩. কাঠি নাচ

পুরুলিয়া জেলার আর একটি প্রাচীন নাচ 'কাঠি নাচ'। দেড়-দুহাতের কাঠি দুহাতে দুটি করে থাকে এক এক শিল্পীর। আট-দশজনের দল বৃত্তের আকারে নাচের ভঙ্গিতে অবস্থান করে। নাচতে নাচতে একজন অপরজনের কাঠিতে ফটাফট আঘাত করে সুনির্দিষ্ট নিয়মে। গান হয়, বাজনা বাজে। বাজনার তালে তালে কাঠিতে কাঠিতে আঘাত ও প্রত্যাঘাত হয়। প্রধানত ঘড়ির কাঁটার বিপরীত নিয়মে এ-নাচ হয়। মূল গায়েন গান ধরেন। নাচিয়েরা কেবল ধুয়াটি বলেন। কাঠি-নাচে প্রচুর গান। রাম ও কৃষ্ণ-কথায় বা নানা পৌরাণিক আখ্যানে এই গানগুলি সমৃদ্ধ। যেমন—

উপরে সুরজের তাপ নিচে তাতা বালি।

চলিতে না পারেন সীতা করিছেন বিকলি।।
হায় হায় রাম ভাঙেন তরু-ডাল, লক্ষ্মণ ধরেন শিরে।
তাহার ছায়াতে সীতা চলেন ধীরে ধীরে।।
(ধুয়া) হায় হায় চলেন ধীরে ধীরে।।

অমনি মাদলের শব্দ—তাক খেটে তাক ধেই—ধা-ধিনিতাং—ধা-ধিনি তাং তাক্—ধেই ধেই তাং।।

১৪. ঢাকি নাচ

পুরুলিয়ার আর একটি বিখ্যাত নাচ 'ঢাকি নাচ'। দুর্গা ও কালীপুজোর সময় তো কথাই নেই, অন্য যে কোনো পুজোর সন্ধান পেলেই নামমাত্র মজুরি পেয়ে ঢাকিরা উপস্থিত হন। বিশাল বিশাল ঢাক। ঢাক সাজানো হয় ময়ূর পালক, মোরগ পালক কিংবা রঙিন কাপড় দিয়ে। তার ওপর কেউ কেউ গন্ধ দ্রব্য দেন। ঢাকের এপিঠ-ওপিঠে কেউ কেউ লম্বা রঙিন ফালি কাপড় ঝুলিয়ে দেন। ঢাকের সঙ্গে থাকে দু-চারজন কাঁসি বাজনদার। ঢাকি নাচিয়েরা ধীরে ধীরে নাচের বোল তোলেন ও বোলের তালে তালে নাচতে থাকেন। শেষে ঢাকের এপিঠে-ওপিঠে প্রচণ্ড ঘা মেরে, নিজেদের লম্বা চুল দুলিয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে তাঁর নৈপুণ্য দেখান। এবং বিমুগ্ধ দর্শকদের কেউ কেউ তাঁদের তালে তালে নাচতে থাকেন।

১৫. টুসু নাচ—ভাদু নাচ

পুরুলিয়ার একটি প্রধান উৎসব টুসু পরব, আর একটি ভাদু পরব। পৌষ-সংক্রান্তিতে কোনো জলাশয়ে টুসু ভাসানো হয়। তখন টুসুর গান গাইতে গাইতে পুরুলিয়ার অনুন্নত সমাজের সব বয়সী নারীরাই নাচতে থাকেন। বাড়ি থেকে আরম্ভ করে জলাশয় পর্যন্ত এই নাচ চলতে থাকে। তারপর জলাশয়ের তীরে গিয়ে নাচ একেবারে উদ্দাম হয়ে যায়। ঠিক এমনি ভাদ্র সংক্রান্তি ভাদু ভাসানোর দিনে ভাদু গানের সঙ্গে ভাদু নাচ সমগ্র পুরুলিয়ার পথ-ঘাটকে মুখরিত করে।

১৬. রঁজা নাচ

পুরুলিয়ার শিবকে ঘিরে ভক্তদের একটি নাচের নাম 'রঁজা নাচ'। দশ-পনেরো জনের এক-একটি দল। প্রত্যেকের দুহাতের ওপরের পেশীতে ধারালো লৌহশলাকা চালিয়ে ফুটো করা হয়। তাতে সিঁদুর লাগিয়ে সুতো এমনকি বাবুই দড়ি পড়ানো হয়। আর সেই দড়ি দলের প্রত্যেকের হাতের ফুটোতে গলানো হয় এবং একটি দলের ৮, ১০, ১৪, ২০, ২৪ জন পর্যন্ত ভক্তকে মালার মতো গাঁথা হয়। প্রতি সারির প্রথম ব্যক্তির হাতে থাকে রঁজা দড়ির প্রথম অংশ। শেষাংশ থাকে শেষ ব্যক্তির হাতে। তারপর তাঁরা দু সুতোর মধ্যে আবদ্ধ থেকে সুতোকে ঢিলে রেখে শিবের থানে বা রাস্তায় রাস্তায় নাচতে থাকেন। দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। সারা গা ঘেমে উঠে। কিন্তু কারো ভ্রূক্ষেপ থাকে না। মাঝে মাঝে নিমডাল জলে ডুবিয়ে তাঁদের সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ঢাক বাজে। গান হয়। বিহ্বল জনতা কুলকুলি দেয়, হাততালি দেয়, নাচিয়েদের উৎসাহিত করে। আর ততই নাচিয়েরা আরো উত্তেজিত হয়ে নাচতে থাকেন। মাঝে মাঝে শিবের নামে ধ্বনি দেন।

১৭. ভক্ত্যা-নাচ (ভগ্‌তা লাচ)

পুরুলিয়ায় শিব বা ধর্মঠাকুরকে ঘিরে ভক্তদের বিচিত্র নাচকেই 'ভগ-তা নাচ' বলে। কেউ কেউ একে বলেন, 'গাজন নাচ'। শিব বা ধর্ম ঠাকুরের গাজনে যারা সন্ন্যাসী হন, তাঁদের একটি দল পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ঠাকুরের নামে ধ্বনি দিয়ে দিয়ে নাচতে থাকেন। সাধারণ মানুষও তাতে যোগ দেন। এ-নাচের নিয়ম-কানুন নেই। নাচ হলেই হল। তবে সমবেত নাচ এবং অনেকটা অনিয়মের মধ্যেও নিয়ম রক্ষা করে নাচ কোনো কোনো স্থানে মাড়ো বা মন্দির প্রদক্ষিণ কালেও এ-নাচ হয়। কোথাও কোথাও শিবপুকুর থেকে মাড়ো পর্যন্ত নাচ হয়। কোথাও বা এঁরা শিবের সামনে নাচ দেখান। কোথাও বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগনের উদ্দেশ্যে এ নাচ দেখা যায়। কোথাও কোথাও ধুনি হাতেও সন্ন্যাসীরা নাচ দেখান। তাকে সাধারণ লোকে 'ধুনিনাচ' বলে।

১৮. আদিবাসী-নাচ

পুরুলিয়া নাচের দেশ। অগুন্তি নাচের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের নাচও যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। মারাং বুরু, মড়েক, প্রমুখ দেব-দেবীদের পুজোয় কিম্বা বাহা, সহরায়, মাঃমড়ে প্রভৃতি উৎসবে এঁদের নাচের সীমা থাকে না। এঁদের নাচের নাম ডুনগার, ডাঁশায়ে, লবয়, মাতয়ে, গুজর, ব্যাঞ্জা প্রভৃতি। এছাড়া আছে পাতা নাচ, ভুয়াং নাচ, জ্যাঠা খারিয়া করম ইত্যাদি।

'ভুয়াং নাচ' খুব বিখ্যাত নাচ। ভুয়াং একটা যন্ত্র। লাউয়ের শুকনো খোলা দিয়ে তৈরি। বীণার মতো তাতে তার বাঁধা। টানলেই ভুয়াং ভুয়াং শব্দ হয়। পুরুষেরা গোল হয়ে বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান। তাঁদের মাথায় বাঁধা থাকে ময়ূরের পালক। কোমরেও ঝোলানো হয় ময়ূরের পালক। ভুয়াং বাজিয়ে বাজিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে কোমর বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে বিভিন্ন কায়দায় তাঁরা নাচেন। গান হয়। কখনো বা অন্য বাজনাও বাজে। সাধারণত কোনো পুজো-পার্বণে, উৎসবে বা গৃহকর্মে 'ভুয়াং'-এর চল, তবে কোনো কোনো চাঁদনী রাতে ভুয়াং-এর আসর বসে।

আদিবাসী নাচ সাধারণত নারী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ। বাহা, বাঁধনা, এরঃসিম মাঘসিম, কিম্বা মাঃমড়ে তাঁদের নাচ উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় মেয়েরাই নাচেন, ছেলেরা গান গান ও বাজনা বাজান। মেয়েদের পরণে লাল পাড় সাদা বা হলদে শাড়ি। গায়ে বিচিত্র গয়না, কানে ও খোঁপায় ফুল, গলায় মালা। মেয়েরা পরস্পরের কোমর ধরে অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে পিছিয়ে মাথা নীচু করে কখনো বা ঘাড় সোজা করে নাচেন।

কোনো কোনো নাচে কেবল বিবাহিতারাই নাচেন। আবার করম প্রভৃতি নাচে শুধু কুমারীরাই নাচেন। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বীজ পোঁতার কালে একনাগাড়ে চলে 'ডুনগার' নাচ, আশ্বিনে চলে 'লবয়' নাচ, কার্তিকে সহরায় উৎসবে চলে 'মাতোয়ার' নাচ। পৌষে বা মাঘের সাঁকরাত পরব ও ফাগুনে বাহা পরবে নাচের পর নাচ হয়। তখন এবং কার্তিকের বাধনা পরবে সাঁওতাল পল্লীতে দিবারাত্রি নাচগান হয়। বিয়ের সময় যে নাচ হয় তাকে বলে 'দং'। এই নাচ বড় ক্ষিপ্র। প্রচণ্ড দ্রুত লয়ে কোমর, বুক, মাথা দুলিয়ে এ নাচ। গানও তেমনি দ্রুত গাওয়া হয়। এ সময়ের একটি গান—

ছামড়া লাতাররে
তিদো আতং মেরেং মালাঞ এ মাম্
মালা মাদোলীদয় বড়াসেয় লাঁদায়া।
তিরে মেঁড়হেৎ সাকম জিড়য়ি লাড়েচ।

—এর মানে—'ছাতনা তলে হাত পাত। মালা দিব। কিন্তু মালা কথা বলে না, হাসে না। তুমি হাতে অক্ষয় লোহা পরিয়ে দাও। আমার হৃদয় তৃপ্ত হোক।'

'লাগড়ে' নাচে বৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করে নাচা। এগিয়ে পিছিয়ে বুক ও মাথা নাড়িয়ে নাচা। লাগড়ে মানে ক্লান্তি দূর করা। এইগানে রাখাল, রূপবতী কন্যা কিংবা হরি-জগন্নাথের কথা থাকে।

সাঁওতালদের শ্রেষ্ঠ পরব 'বাহা'। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই উৎসব। সপ্তাহ ধরে এ উৎসব চলে। দলে দলে ছেলেরা মেয়েরা নাচে নাচে জাহের থানকে ভরিয়ে দেয়। তখন সারা পুরুলিয়া জেলা যেন পাল্টে যায়।

পুরুলিয়া লোকনৃত্যের একটি মহা সাম্রাজ্য। এত নাচ, এত অভিনব নাচ, এত প্রাচীন নবীন লোকনাচের সমাবেশ এদেশের আর কোনো জেলায় আছে বলে জানি না। তাই খরাক্লিষ্ট, গ্রীষ্ম-ক্লান্ত, ধূলিধূসরিত, জলকষ্টের এই দেশে, অজস্র অভাব-অভিযোগ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের মধ্যেও কৌতূহলী মানুষ একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই দেখবেন, এই পুরুলিয়ার ভুবন নাচে ভরা, দেখবেন পুরুলিয়ার বিশ্বগানে ভরা, দেখবেন পুরুলিয়ার জগৎ বাজনায় উদ্দাম।



পাহাড় জঙ্গলের ছোনাচ এখন বিশ্বময়

সুবোধ বসুরায়

১৩.৩.৭৯ দোলপূর্ণিমা

এবারের আসা ছো-নাচের সন্ধানে। বাঘমুণ্ডি থানায়।

দুদিন আগেই পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের হলে ডঃ দুলাল চৌধুরী ছো-নাচের সেমিনার করে গেছেন। উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ চৌধুরী, পশুপতি মাহাতো, মানিক সরকার, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবতীমোহন সরকার, শঙ্করপ্রসাদ দে, হরেন ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুধীর করণ, সুবোধ বসু রায়, অরুণ রায়, ইন্দ্রজিৎ সামন্ত, পল্লব সেনগুপ্ত, অজিত মিত্র এবং গম্ভীর সিংমুড়া ও হীরালাল রায় প্রমুখ গবেষক ও শিল্পীগণ।

সেমিনার ও ওয়ার্কশপের শেষে Akademi of Folklore -এর তরফ থেকে ডঃ চৌধুরী তাঁদের আগামী প্রকল্প সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জানান ছো-নাচ প্রশিক্ষণের জন্য গুরু নিযুক্ত হয়েছে গম্ভীর সিংমুড়া, হীরালাল রায়, ধনঞ্জয় মাহাতো (সকলেই নাচ) আকলু মাছোয়াড় (সায়না), অনিল সূত্রধর (মুখোশ তৈরি)।

এই সেমিনারের আলোচনাগুলি প্রকাশিত হয় ছত্রাক পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮৬ সালে।

অব্যবহিত পরেই ছত্রাক সম্পাদক বেরিয়ে পড়েন বাঘমুণ্ডি শৈলীর সরেজমিন অনুসন্ধানে। সঙ্গে ছিলেন বাঘমুণ্ডি স্কুলের দুজন শিক্ষক, বিরিঞ্চি দে ও নরেন্দ্রনাথ খাঁ। ছত্রাকের ওই সংখ্যাতেই 'বাঘমুণ্ডীর সাক্ষ্য' নাম দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। চুম্বক হিসেবে তাকে অভিহিত করা হয়েছিল, যেহেতু আরও বহুতর সাক্ষ্য গ্রহণ না করা হলেও অনুভূত হয়েছিল মূল সত্য এর মধ্যেই নিহিত আছে।

তেইশ বছর আগেকার অভিযান দিয়েই শুরু করা যাক।

(১)

বলরামপুর ছাড়িয়ে রাঙ্গাডি পেরোলেই কেমন যেন ভূত-ভূত লাগে রাস্তাটা। পশ্চিমে পাহাড়ের যে কালোনীল রেখাটা পাঁচিলের মতো আড়াল করে রেখেছে ওপাশের পৃথিবীকে তা যেন ভয়ানকভাবে এগিয়ে আসে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঘাড়ের ওপর। রাস্তা থেকে পাহাড়ের গোড়া ভীষণ ফাঁকা; রুক্ষ্ম টাঁড়, কাঁকর, পাথরের টুকরো, আর হাল্‌কা হাওয়ায় বুনো বোদা গন্ধ। মাঝে মাঝে এক-আধজন রাহী লোক.... রড়ে-বাঁধা বোঁচকা সহ এক-আধটা সাইকেল ক্বচিৎ

কখনো সরকারি জীপ... পাব্লিক বাস... পেছনে-হেলান দেয়া আরোহীসমেত অ্যাম্বাসেডর মনে করিয়ে দেয় পাহাড়বনের অন্তরালেও জীবন্ত মানুষ আছে, যাদের অস্তিত্বই কেউ টের পায় না শহরবাজারে।

একটু আলগা দিলেই মনটা পেছোতে থাকে। শুধু ভূগোলেই নয়, ইতিহাসই যেন কেমন করে লেপটে আছে এদের সঙ্গে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই এসে পড়লো ভুচুংড়ির মোড়। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা হরিপদ, বিরিঞ্চি, নরেনের প্রায় ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো শ্রাবণী বাস।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টা।

একবার তাকিয়ে নিলাম:

সবুজ আর সবুজ। সামনে বিশালবক্ষ পাহাড়। কবে কোন্ ভয়ানক দুর্যোগে গোটা মাথাটাই ভেঙে পড়েছিল নীচে। সেই থেকে 'মুড়রাপাহাড়'। মাঠা রেঞ্জের সুরুও এখান থেকে।

নীচে বেড়াজঙ্গল। কচি কচি পাতা আর গুঁড়ো গুঁড়ো ধাধকীফুল। লাল থোকা থোকা।

তারই ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা— 'কাড়রাজড়া'। লুকিয়ে আছে বসতি— শ্রীরামপুর, সীমাটাঁড়, নদী পেরিয়ে খুদুডি।

এক মৌজার মালিক সুচাঁদ মাহাত। নিজেই হাল চালান। এবং নাচেন। নাচনি-নাচ। ছো-নাচও।

আলাপ ছিল আগেই : কাঁড়িহেসার নাচনিনাচের আসরে। তখন ওঁর বয়স ছিল ছিয়াত্তর। নাচতেন যেন ষোলো বছরের কেষ্টঠাকুরটি। আসর থেকে ফিরে এসেই কোদাল হাতে সব্জিবাড়িতে।

ওঁর নাতি পড়তো কলেজে। বলে পাঠিয়েছিলাম তারই মুখে। শালপলাশের জঙ্গল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি ওই নাচগানের তল্লাসেই।

বিরহড়রা থাক'ত, তাই আগের নাম বিরহড়ডেরা। এখন মাঝি মাহাতদের ছোট্ট বসতি, মাথাগুণতি কুল্লে দেড়শো জন। তাই বা কম কিসে? পুকুর, ক্ষেত, ধান, গম, আলু, কপি, পালং শাক, বেগুন বিলিতি, মুলো, মটর, কুট। ছাগল, মুরগী, গাইয়েরও অভাব নেই। এক হাল মহিষও আছে। রাজবাড়ির চত্বর পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে ঘেরা।

ঠাকুর্দাদা, বাপজ্যাঠা, নাতিপুতি সবাই এক বাখলে।

আকাল না পড়লে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব।

বুড়ো বুঝতে চায় না—'লেখাপড়িতে হবেকটা কি? এখনও নাচ খেলেই উয়ার মন'—সখেদে বলেন বড় ভাইপো হরিপদ।

যেমন মানুষ, তেমনি তার বিবৃতি—সহজ, সরল, মনখোলা:

"আগে ছিল একক নাচ। একৈড়া ছো। কেউ বলে ছো, কেউ বলে ছ।

আলাপ ছ'য়ে মুখোস থাকত না। আগে দু'লক, পরে চারজন। এখন আটজন, দশজনও নাচে।

না, পাইকনাচ বাঘমুণ্ডীতে ছিল না।

ছনাচ সৃষ্টি করে জীপা আর বাবুলাল মিস্ত্রি।

মুখোস ছিল, কিন্তু আড়ম্বর ছিল না। শুধু মুখটাই ঢাকত, এত বাহারী ছিল না।

বাঘমুণ্ডীতে ছনাচের উৎপত্তি। অনুমান, ষাট-সত্তর বছর আগে।

প্রথমে গণেশ বন্দনা হত। গণেশ আসনে বসলে সাজিতে ফুল বয়ে, ধূপধুনা শঙ্খ বাজিয়ে আরতি করে পূজা হত। তা শেষ হলে গণেশ চলে যেত। বাকিরাও চলে যেত। তখন পরশুরাম ঢুকত।

এখন এসব বাদ পড়ে গেছে। এখনকার নাচে বেদ নাই, শাস্ত্র নাই—প্রথমেই যুদ্ধ—গণেশবধ। কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শেষে কালী। এসব আজকালের তৈরি।

হ্যাঁ ত, নিজেও করেছি — গণেশ পরশুরামের যুদ্ধ, অভিমন্যুবধ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, কিরাতঅর্জুন, মহিষাসুরবধ, রক্তবীজবধ। কর্ণ বাদ রাখি নাই।

সেরাইকেলার নাচ, এখানের লকে নাই পছন্দ করে।

নাঃ, কনও গুরুর কাছে শিখি নাই। আমার বাবা সোনারাম মাহাতো মাদল আর ঢোল কিনে দিয়েছিল। তাই বাজাতাম। ছ-নাচ দেখেছি বহুৎ। দেখে দেখেই শিখা। ঐ করেই ত কাটালি, সংসারে কি হছে, নাই হছে, নাই জানি আজ্ঞা।

পালাগুলা বানাইছি পুরাণ, মাহাভারত, রামায়ণ থেকে একটা করে ঘটনা লিয়ে। রামলীলা কৃষ্ণলীলাই বেশি।

হাত পায়ের কাজ নিজেই তৈরি করেছি। কোনো শিক্ষাদীক্ষা নাই। সবটাই অনুভব। ভালো লাগেছে, আনন্দ পাঁয়েছি—ব্যস, ঐটাই সব। দেখুন না ঐ ফটোগ্রাফটা। কিছু বলে নাই, তবে ভাবটা লাগেই আছে। তেমনি মুখোসও।

বলতে বলতে এসে পড়ল মদনমোহন প্রসঙ্গ। উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন:

"স্বর্গে যেমন ইন্দ্ররাজ, বাঘমুণ্ডীতে রাজা মদনমোহন। সারা রাত আসর ছেড়ে নাই উঠতেন। হুকুমেই ছিল পূরা করা চাই। না করতে পারলেই; খেদ শালাকে; একদম ঢুকতে দিবি নাই আসরে।'

আরও হুকুম ছিল ছ'টা করে নাগড়া বাজবেক নাচের সময়। যদি কেউ না'ও আসতে পারে, শুনবেক ঘুমের ভিতরে।"

তখনকার এবং আজকালকার শিল্পীদের সম্বন্ধে: "ভিখার প্রায় সবই ছিল, তাগদ ছিল কম। যারা ঝুমুর করে তারা ত পাক-নাটের দিকে খাবেক নাই। উগ্‌লা নিরসা। ত বাজিমাৎ করত ভাবসৃষ্টিতে।

দেখুন ক্যানে, জুরু ত বিকট জুয়ান, গম্ভীর সিং—জীপার বেটা—এতটুকু। যত শক্ত আর পাতলা হবে, তত নাচবেক, ঘুরবেক, সুড়ং দিবেক।

ক্ষীরোদের বাজীগুলাও আলেদা, ঘুরাও আলেদা। উ'ও এখন শিখছে, দেখতে দেখতে বার করছে চাল। ই ছেল্যাগুলা উঠছে সেটা বলতেই হবেক।"

হঠাৎ ছেদ—অশীতিপর বৃদ্ধ নাচতে যাবেন! উস্‌খুস করছেন। পুরুলিয়া থেকে ছুটে এসেছি ওঁর সাক্ষাৎকার নিতে, আগেভাগে খবর দিয়ে। উনি চেনেন, ছেলেপিলে নাতিপুতি সবাই চেনে। মান্য অতিথি।

হরিপদ অপ্রস্তুতের একশেষ। ফিসফিস করে বলল: "অমনিই বঠে। নাচের নামে ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বরও নাই। ছেল্যার পারা। কোনওদিন ঘরসংসার ভালে দেখে নাই। নাচ পাল ত ডেগতে লাগল।"

না, অবাক হইনি। কাঁড়িহেস্যার নাচনিনাচ থেকেই জানি।

খুদুডিতে উপরি একটি লাভ হল। একপাশে বসে ছিলেন গোপেশ্বর মাহাতো। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশোনার দৌড়। ঝুমুর লেখেন। খাতা খুলে পড়ে শোনালেন। সাঙ্কেতিক ঝুমুর। লাজুক মুখে

বললেন: "ওই, সারাবলি পড়েই করেছি আর কি।"

আমার চক্ষুস্থির। চোদ্দপুরুষেও উদ্ধার করতে পারতাম না। 'আসি' বলে মধুপুরী চলে গেলেন বংশীধারী। কত কসরৎ ঐ 'আসি'তে (৮০) পৌঁছতে। গুচাঁদ মাহাত যে বেদ আর শাস্ত্র নিয়ে অহঙ্কার দেখিয়েছিলেন, তা মিথ্যে নয়।

ঋতুরবি গুণ করিয়া গণন যোগ করি তাহে গঙ্গারই নন্দন
এই বলে বংশীধারী
সে যে ছল করি গেল মধুপুরী কই এল না, এল না ফিরি।
গো, কই এল না, এল না ফিরি॥
বিনতানন্দন ভক্ষকবাহন তার সুত রথ হেরিয়ে যখন
মনে পড়ে শ্রীমুরারী
রতিপতি বানে মারে খনে খনে বাঁচিবে কেমন করি।
গো, বাঁচিবে কেমন করি॥
শচীপতি যেবা করিয়ে বন্ধন সহিতে না পারি তাহারি গর্জন
তিন অক্ষর সার করি
সেই বনমালি নয়নে না হেরি গলেতে নইও ছুরি।
গো, গলেতে নইও ছুরি॥
অদিতিনন্দন তার সুত যে হন বিকৃতি হইল যাহাতে বদন
তাহে তনু ত্যাগ করি
দীন গোপেশ্বর বলে রাধিকারে আসিবেন শ্রীহরি।
গো, আসিবেন শ্রীহরি॥

(২)

ওইদিনই: বেলা সাড়ে তিনটে থেকে

আবার সেই হাঁটাপথ। পলাশ কুসুম ধাবকীর লাল চোখ দেখতে দেখতে ভুচুংড়ি পর্যন্ত। বাস নেই, এরপর ট্রাক ধরতে হল। বাঘমুণ্ডীতে বিরিঞ্চিবাবুর বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে তিনটে।

সারা রাস্তাটা ভাবতে ভাবতে এসেছি। জাতিবিজ্ঞান এবং মহত্তর ঐতিহ্যের পাতালে তলিয়ে গিয়েও কি খোঁজ পাব—কবে, কি করে সব মেশামিশি হয়ে গেছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। কতখানি গুলে খেলে তবে তিন কেলাসে পড়া গোপেশ্বর মাহাত খাতার পর খাতা ভরিয়ে দিতে পারে সাঙ্কেতিক ঝুমুর! সুচাঁদ মাহাতোর খোঁজে এসে দেখলাম গোটা তল্লাটটাই মেতে আছে। মৌমাছির মতো ভনভন করছে পুরাণকাহিনি।

কানে ঝন্‌ঝন্ করে বাজছে হরিপদর খেদোক্তি: "বুড়হা লয়, অদাঁত বাছুর ব'ঠে। গলায় ঠুড়গা বাঁধে দেন, তা'ও নাচবেক। নাই পারবেন অটকিতে।"

হাতমুখ ধুয়ে সাফসুতরো হয়ে চা আর নিমকির প্লেটে হাত বুলোতে বুলোতে এইসব ভাবছি, এসে হাজির কলেবর কুমার—আশুবাবুর দলে দুর্গা নাচেন।

অনতিবিলম্বেই শুরু হল ছোনাচ কথা। সংক্ষেপে:

"ঠাকুর্দাদা পাঁড়ু কুমার বলতেন: শিবপূজায় কাপ-নাচ হত। তারপর আস্তে আস্তে এইরকম। কাকা বাণেশ্বর ছ-নাচ করতেন। ছ' আর ছো একেই। আশুবাবু নাম করেছেন ছৌ-নৃত্য। বরাবাজারের গোঁসাই'ডির ওস্তাদ বীরভদ্র দাসের কাছে কীর্তনের শিক্ষা করেছি। পুস্তিতোড়াং-

এর বিষ্ণু দাস রঙচটা সঙ্কীর্তন করতেন। ঝুমুর, কীর্তন বাঁধতেন। উনার কাছেও সহবৎ করেছি।

আগেকার গণেশ বন্দনার ঝুমুর বাঁধেছিলেন বৃন্দাবন সিংবাবু:

সিন্দুর ভূষিত অঙ্গ, মূষিকবাহন
সকল সিদ্ধিদাতা হরগৌরীর বাহন
কি সুন্দর চতুর্ভুজ গজেন্দ্রবদন, বিঘ্নবিনাশন।
জয় জয় হরগৌরীর নন্দন।।

আট মাত্রা। দুগুণ করলে ষোলো মাত্রা।
গোশিঙ্গাবধে ন' মাত্রা। দুগুণে আঠারো মাত্রা :

দুর্গার বরপুত্র অতি বলবান
চলিতে চরণে ক্ষিতি হয় বিদারণ।।

মুখোস তৈরি করতো ছুতাররা। সাজপোশাক আসত পুরুলিয়ার করালী নাগের দোকান থেকে। পোশাক সব পৌরাণিক যুগের।

ওস্তাদ ছিলেন বাঘমুণ্ডীর হরিবাবু, ভিখু সিং লায়া, চড়দার জীপা সিং মুড়া, বাবুলাল মিস্ত্রি, সিঁদরীর লাল মাহাতো, ভাড়া তোড়াং-এর মোহন তাঁতি।

তবে বাবু ছো'এর ব্যাপার কিছুটা আলাদা। ইটা নাচতেন উঁচু জাতের লোকেরা, বিশেষ করে রাজবাড়ির ছোট তরফের বংশধররা। একক নাচ। সাজপোশাকের জৌলুষ ছিল খুব।

এর ঝুমুর ছিল খুব ছোট। বলত 'ধুয়া'। সবই দেবতার বন্দনার। যেমন গণেশবন্দনার ঝুমুর:

শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল
সখীগণ মাঝে নাচে গৌরীদুলাল।
নাচ নাচ রে বিঘ্নবিনাশন গণপতিলাল।।

এর তাল—ধেন ধাঘে তেটে ধেন ধা।

এমনি শ্রীকৃষ্ণবন্দনা। এর ঝুমুর:

বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী
পূর্ণ মনস্কাম তোঁহারে প্রণাম দানব দর্পহারী।।

এর তাল:

তেরেঁখেটে তেরেখেটে তাগ্ (তিনবার)
ঝে ঝে ঝাঁ তেরেখেটে তাগ্
ঝা ঝা ঝাঁ
উর্র তেতাখেটে তাগ্ উরতেতাখেটে তাগ্
তা খেটে তাগ্ তা।।

ভাঙ্গান:

উর গেদাগেদা গেড়েন (দুবার)
গেড়েন জেগা গেনঝেন
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ গেদা গেন (তিনবার)
ঝাঁ জে ঝাঁ
তাগ তাগ তাগ তেরে খেটে (তিনবার)
তাকে র্তা।

খোলের বোল

ধ্যাৎ ধ্যাৎ ধ্যাৎ তা তেটে তেটে তেটে তা (তিনবার)

ধেরে কেটে ধেরে কেটে ধা ধা (তিনবার)

তা তা তা তা ধেরে কেটে ধা॥

এখন ভালো নাচছে জুরু কুমার। গম্ভীর সিং, বালগাড়ার ধুঁঙ্গা মাহাতো।

ছো-নাচটা হয় পায়ের মাধ্যমে। বাঘচাল, বিড়ালচাল, হাঁসচাল, জমিদারচাল, বীরচাল— এইরকম সব চাল।

একবার ওড়িশ্যার এক পার্টি চিংড়ির ডেগ দেখাল।

ছোনাচে আঠারো ডেগ। উড়ামালকে শরীরটা এক পাক খেয়ে বসে যায়। ছো-নাচ ভয়ঙ্কর নাচ। ঠিক ডেগ না দিতে পারলে হাত-পা ভাঙে।

ওড়িশ্যা পার্টির নাচ পল্টনী নাচ। পছন্দ হয় না এ অঞ্চলে।

নাচের মধ্যে নির্বাক শক্তির প্রকাশ। আমি দুর্গা নাচি : অত লাফঝাঁপ নাই।

স্যালভিনি আমাদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন। ফরেনে থিয়েটারের স্টেজে নাচ করতে হয়। একদিকে মুখ করতে হয়। বাজনা কম। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। অসুবিধা হয় নাই। একটা ঢোল, একটা নাগড়া।

জামা, ড্রেস, বাজনা, মুখোস সব বিক্রি হয়ে যায়। কোথায় রাখে কে জানে? হয়ত যাদুঘরে। ফিরে আলে সব নতুন করে হয়।"

এই তাহলে ফরেন যাওয়ার নট। গাঁয়ের গন্ধ একটুও যায়নি। ছেলের বিয়ে। দলবল নিয়ে চলেছেন বিয়েবাড়ি পাথরডিতে। সাতআট মাইল হেঁটে হেঁটে সেই ডাভাতোড়াং থেকে।

খবর পেয়েছিলেন বাঘমুণ্ডী হাটে। ছুটে এসেছেন ছেলের বিয়ে ফেলে।

তাঁর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম...

(৩)

ঐ রাত: ভবানীপুর দ্বিজেন্দ্র ব্রজেন্দ্র

দোলপূর্ণিমার চাঁদ। পাহাড়ের মাথায়।

আর ঘরে বসে থাকা যায়?

বিরিঞ্চি, নরেন আর আমি। বেরিয়ে পড়েছি। এই পৃথিবীটাই কেমন মায়াময় হয়ে উঠেছে। সাইকেলের স্পোকগুলোতেও যেন মুখ দেখছে চাঁদ। দৈত্যদানব, রাক্ষসখোক্কসরাও যেন একাকার হয়ে আছে ডিঙ্গ চাটান পাহাড়বুরুর সঙ্গে।

এই ত ছোনাচের দেশ। রাক্ষসের প্রাণভোমরা কোথায় লুকিয়ে আছে এখানেই। বসুন্ধরার পিঠটা সটান পড়ে আছে বাঘমুণ্ডি থেকে বাড়রিয়া, কিষ্টবাজার, লাহেরিয়া, রাণিবাঁধ, কুদলুং, তিতিরবনে। তার মধ্যে সেঁধিয়ে আছে ভবানীপুর। অরণ্যের অন্তঃপুরে।

আগে নাম ছিল ল্যাকড়াগাড়া : নেকড়ের গর্ত। এখন ভবানীপুর, ক্ষেত্রমোহনের ছেলের নামে।

কোথায় এলুম? ঘন জঙ্গল যেন হঠাৎ ঘিরে ধরল। চারদিকে গাছ আর গাছ। এত ফিনকি-দেওয়া জ্যোৎস্নারাতেও ছায়া ছায়া। বিরিঞ্চি নরেনও ঠাওর করতে পারছে না রাজবাড়ির বেড়টা কোথায়। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল সাদা চুনকামকরা টানা গাঁথনি। Listeners কবিতার সেই জঙ্গলের ভেতর পোড়ো বাড়িটার মতো দাঁত ছিরকুটে।

এতক্ষণে ঘড়ি দেখলাম—রাত দশটা।

এখানেই পাওয়া যাবে রাজবাড়ির বংশধরদের—দ্বিজেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ সিং দেওকে।

বুক দুরদুর করছে দরজা পেরোতে। এখানেই পোঁতা আছে সাত রাজার ধন ছোনাচের ইতিবৃত্ত। তাই চুরি করতে আমরা তিনজনে এসেছি চুপি চুপি, পাহাড় বনের অন্তরালে, রাজ্যহারা রাজার গড়ে।

সামনে বিরাট তক্তার ওপর চাদর পেতে খুড়ো ভাইপো সমাসীন। আভিজাত্য আছে; আর কিছু নেই।

দুটো হাতলভাঙা চেয়ার, একটা বেতের মোড়া—তাতে বসেই আমরা টুকে নিচ্ছি, পালাক্রমে।

আফশোশ হচ্ছে, টেপরেকর্ডার আনিনি বলে। যাক গে, সেই ত লিখতেই হবে।

"ভূতনাথ, হৃদয়নাথ, ব্রজগোপাল, মদনমোহন, ক্ষেত্রমোহন, যতীন্দ্রমোহন। আমাদের কাছে কুর্সিনামা নেই, এর বেশি বলতে পারব না।"

শুরু করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। উনি নিজে কাপ করতেন, ছ-নাচ করতেন, যাত্রাও করতেন। ব্রজেন্দ্র ক্ষেত্রমোহনের পুত্র। ছনাচ করতেন। খুড়োকে সম্মান করেই বলতে দিলেন। লক্ষ করলাম দুজনের ভাষাই মার্জিত, উচ্চারণে মানভূমী টান একেবারেই নেই।

তবে, যখন উৎসাহ এসে গেল তখন কে কখন ওপরপড়া হয়ে বলছেন তার হিসেব নেই।

"বৃন্দাবন সিং ছিলেন ব্রজগোপালের দূর সম্পর্কের ভাই। ভক্তিমার্গের লোক। ছোনাচ ছাড়াও অনেক ঝুমুর করে গেছেন।

তখন একক নাচই বেশি ছিল। ওস্তাদ থাকত। ব্রজগোপালের সময় ছিল দ্বারিক সুলুঙ্কি, নীলমাধব দে। মদনমোহনের সময় হরিপ্রসাদ সিংদেও।

চড়দার মিস্ত্রিরা হৃদয়নাথের সময় থেকেই ছিল। কাঠের মুখোশ শোনা কথা। প্রথমে মলাটের পীজবোর্ড, পরে কাগজের তৈরি। গোটা মুখটা ঢাকা থাকত। চূড়াটুড়া, সলমাকাঠি, কিরণগোখরি, জামিরপাতা ছিল। এখন অকে রঙচটকা হয়েছে। গঠন তখনকারই ভালো ছিল।

বাজনা বাজাত ডোমেরা। চড়দা, বাঘমুণ্ডির ডোমেরাই বেশি বাদ্যভাণ্ড করত। ঢোল, ধামসা, সায়না, শিঙ্গা, কেড়কেড়ি ছিল। মাদল বাজত না।

আগেকার পোশাক ছিল: কব্জি পর্যন্ত মখমলের জামা, কাঠির ফুল দিয়ে কাজ করা। ঘুঁটনা —সাদা-কালো-লাল রঙের টাইট সালোয়ার, গোড়ালির উপর ছ ইঞ্চি উপর পর্যন্ত টাইট করে সাঁটা। পায়ে মোজা আর ঘুঙুর। বুকে চাঁদমালা, গোলাপী কিংবা লাল পশম দিয়ে তৈরি। হেঁসলার পুরন্দর বানাত। কাজগুলো নিজেদের বসিয়ে নিতে হত।"

—মুখের কথার সঙ্গে তাল রাখতে হাত ভেঙে যাচ্ছে। তাহলেও থামা চলবে না।

"আগে সুর, পরে তাল, শেষে চাল। এখন সামঞ্জস্য থাকছে না। মদনমোহন কড়া নজরে রাখতেন। সায়নায় সুর দিল। ঢোল দিল তাল। —ভিখার মত কেউ ঢোল বাজাতে পারত নাই। বাজাতে বাজাতে চালও দেখিয়ে দিত। বোল বলে দিত। বেতাল হবার উপায় থাকত না। এরা ছিল গুরু।"

এবার বিরিঞ্চিবাবু কলম ধরলেন। আঙুল মটকাচ্ছি আমি। চা এল।

তকতকে, গোবরনিকোনো, পরিচ্ছন্ন মেজে। কালেভদ্রে কেউ এলে এইটাই বৈঠকখানা।

আবার ধরলেন—এবার ব্রজেন্দ্রনাথ:

"ডেগের আগে ছক করে নিতে হয়। মুখ ঢাকা আছে মুখোসে। ভাব সৃষ্টি করতে হয় মনে। দেহের প্রতিটি অঙ্গে ছন্দ লাগবে। এটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মুহা চালা', মানে মুখোস পরিচালনা;

মাথা নাড়িয়ে কিংবা স্থির রেখে। তারপর 'ডেগ'। তালে তালে পা ফেলাকে বলে ডেগ।

যতক্ষণ ডেগ নেই ততক্ষণ আসি, পা, গায়ে তাল রাখতে হয়।"

এতক্ষণে বুঝলাম এঁরা মার্জিত ভাষায় কথা বলছেন কেন। প্রথমত, আভিজাত্য রক্ষার জন্য। দ্বিতীয়ত, ওস্তাদ বলেই। পরিভাষাকে ব্যবহার না করেই এত সহজ করে বলছেন যা আমার মতো অর্বাচিনও বুঝবে।

ওই প্রসঙ্গও এসে পড়ল।

"অঙ্গভঙ্গি হরেক রকমের। তৈরিও হচ্ছে প্রতিদিন। সবগুলোর নাম নেই। না দেখলে ত বুঝতে পারবেন না। ভুঁই সঁটনর দ্রুত গিয়ে চমকে দিয়ে মাথা তোলা—এই হল শুঁড় দিয়া। গা-হিলা, বাহিমনকা, উড়ামালক, উলফা—এমনি আর কি। তৈরি হয়েই চলছে। তার মধ্যে কিছু বাঁধি চাল আছে।

তালের মধ্যে নাচনিনাচের তাল, বিয়ের গানের তালও ঢুকেছে।

না, পাইকনাচ আমরা দেখিনি।

তবে, আলাপ-ছো'এ একসঙ্গে, চারজন, ছজন, আটজনও নাচে একই চালে। এটা প্রথম দেখায় পুস্তিতোড়াং।

বাবু-ছোতে একজন নাচে। ভালো সাজপোশাক পরে। মুখোসের বাহার দেখে তাক্ লাগে। এতে যুদ্ধ নেই।"

ভালো লাগছে, আবার খারাপও লাগছে। বিরিঞ্চিবাবুর স্ত্রী এতক্ষণ খাবার সাজিয়ে বসে আছেন: আর এখানে চলছে আরব্য রজনী।

কত রাত কেটে যাবে কাহিনি শুনতে শুনতে!

সব নাচেই যুদ্ধ আছে—তবে সব সময় নয়।

চড়দার মিস্ত্রিরা ছুতোর ছিল। কুমোর নয়। তবে তারা বড় বড় মাটির মূর্তি গড়ত। মুখোস তো করতই। এখনো করে। সব পৌরাণিক কাহিনি থেকে নিয়ে। বড় বড় আসর হলে এগুলো সাজিয়ে রাখত। তাতেও একটা ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকত।

না, না, ছোনাচের শিল্পীরা—শুধু ডোমেদের বাদ দিয়ে—কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। শুধু ধামসা, ঢোল বাজানো ছিল ডোমেদের একচেটিয়া।"

জানতে চাইলাম বর্তমানের হাল। ছোনাচের বিদেশযাত্রার কথাও উঠল।

সংযত করে আনলেন ব্রজেন্দ্রনাথ তার কণ্ঠস্বর। ঘাড় নেড়ে তাঁকে সমর্থন করলেন কাকা দ্বিজেন্দ্রনাথ :

"দেখুন, ছোনাচের তো কোনো শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি এখনো। তবে মদনমোহন সবসময় চেয়েছিলেন একে গাম্ভীর্য দিতে। সস্তা চটকদারী দেখলেই চটে যেতেন বিষম।

এখনকার নাচ অনেক হালকা হয়ে যাচ্ছে। ধুলো উড়িয়ে দিচ্ছে, ভাব সৃষ্টি হচ্ছে না। সুর, তাল, চালের ঠিক নেই—যে কোনো সুর বাজাচ্ছে, যে কোনো তাল লাগাচ্ছে, যে কোনো চালে নাচছে। ভাব নেই, ছক করা নেই। গণেশ ঢুকতেনা ঢুকতেই মুণ্ডচ্ছেদ করছে পরশুরাম। যেন যাত্রা হতে চলেছে নাচটা। বাঁধি তালগুলো কেউ শিখছে না। বাঘমুণ্ডিতে যেসব তালে নাচা হয়, সেসব তাল দিয়ে আজকালকার ফরেন-ঘুরে-আসা নাচিয়েদের কেউই পা ফেলতে পারবে না। মুখোস রাখার কায়দাও জানে না।"

প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না: "মদনমোহন থাকলে সহ্য করতেন?"

"না, কক্ষনো না," বলে উঠলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, "নাচগান ছিল তাঁর প্রাণের জিনিস। প্রাণের জিনিস ছিল বাঘমুণ্ডি, ঝালদা, বরাবাজার; ওদিকে সেরাইকেলা, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জেও। গ্রামের মানুষেরও তো এইতেই আনন্দ। তাদের মাতব্বরি করে রাজাদের আনন্দ তো আরেক পাল্লা বেশি। তবে না বড় বড় ওস্তাদ উঠেছিল। মদনমোহনের সভা আলো করে ছিল ভিক্ষাম্বর সিং লায়া, মধু ভাট, জীপা সিং মুড়া।"

কৌতূহল থামাতে পারছি না, বলেই বসলুম : "সারা পৃথিবীতে হৈ হৈ পড়ে গেছে, এমন একটা নাচ জন্মাল কি করে? এত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল কি করে?"

দ্বিজেন্দ্র এবার হাতজোড় করলেন : "অত তো বলতে পারব না। তবে, পরিবেশটা দেখছেন তো। পাহাড়জঙ্গলে ডুবে আছে। সভ্য মানুষ ক'টাই বা দেখেছে? আর, লড়িয়ে জাত, মানতে চায়নি বাইরের শাসন। এই বরাবাজার এলাকাতেই তো চুয়াড় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে বারবার।

এ নাচটাও তো বেশিদিনের নয়। হৃদয়নাথের সময় থেকেই হয়েছে। মদনমোহনই ছিলেন এর সবচেয়ে বড় রূপকার। এক-একটি অঙ্গ ধরে ধরে সাজিয়েছিলেন। এখন যাঁরা বিদেশ যাচ্ছেন তাঁরা তো রাখতে পারছেন না। ওখানে তো এখানের মতো মুক্তমঞ্চ নয়। থিয়েটারের স্টেজ, থিয়েটারের হল। একদিকে মুখ করে নাচতে হয়। ঘুরে ঘুরে নাচটাই মরে যাচ্ছে। একটা ঢোল, একটা নাগড়া —নাহলে ছাদ ফেটে যাবে। সেই তুমুল আওয়াজ কই, যুদ্ধ বেধে গেল দর্শকদের সেই মাতুনি আর কুলকুলি কই? এটা আর গোটা সম্প্রদায়ের জিনিস থাকছে না।"

সাহস হচ্ছে না বাড়ির দিকে তাকাতে। থেমে থাকলেই ভালো। মরিয়া হয়ে বললাম: "বাঁধি তালটালের কথা বলছিলেন না? একটু নমুনা দেবেন।

হয়তো খটকা লেগে থাকবে, বিরিঞ্চি নরেনের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন খুড়ো ভাইপো। তারপর একটু কেসে দ্বিজেন্দ্রনাথ:

"ধরুন, তরণীসেনবধ পালা। প্রথমে ঝুমুর আর সুর:

পশ্চিম দ্বারেতে হনুমানাদি বানরগণ
বিভীষণ লক্ষ্মণ বসিয়া রাজীবলোচন॥

এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে হনুমান ছক করে ঢুকবে। বানররা ঢুকে দুদিকে ভাগ হয়ে দাঁড়াবে।

হনুমানের ইসারা পেলে প্রথমে রাম, পেছনে লক্ষ্মণ, শেষে বিভীষণ এসে মাঝখানে জায়গা নিয়ে দাঁড়াবে। তাল:

কের কের তাকে টেন কের কের তাকে টেন
কের কের তাকে টেন তাকে টেন তাকে টেন
কেতা কেন কেড়েন কেতা খিটি তা॥

এরপর তরণীসেনের প্রবেশ।

রামকে দেখে জোড়হাতে প্রণাম। রাম এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করতে যাবে। ছিটকে পেছিয়ে আসার তরণীসেন। যুদ্ধ চাই। যুদ্ধ না হলে তো তরণীসেন উদ্ধার হবে না। তখন সে ক্রোধিত হবে। তীরমুখেই আলিঙ্গন করবে। ঝুমুর:

তরণী ত্বরিতে যায় শ্রীরামে যুঝিতে

অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ধনুর্বাণ হাতেতে।।

তাল :

গেদাডেন গেড়েন তেতা খেটে তা তেতা খেটে তা
ঝাঁউর গেড়েনাক ঝাঁউর গেড়েনাক ঝাঁউর গেড়েনাক
গেড়েন।।

এরপর যুদ্ধ। তার বাজনা :

টেতা কেটে কেড়েন তাউর
ডেগ তা কেটে কেড়েন তাউর
ডেগ তা কেটে তেটে তাউর
তা কেন কেন তা কেন কেন তা কেন কেন
কেড়েন কেড়েন কেড়েন।।

পাখোয়াজ কিংবা খোলের বোলে নাচিয়ে যখন নাচবে তখন ধামসা কিংবা অন্য বাজনা থেমে থাকবে। ঢোলে খোলের বোল বাজবে।"

অনেক রাত। কখন ফিরবো কে জানে? বিশ্বাসই হচ্ছে না। যেন জ্যোৎস্না রাতের রূপকথা। অথচ, ঝোলায় ভরা নোটস রয়ে যাবে রাজ্যহারা রাজা ত ইতিহাস হয়ে।

বাঘমুণ্ডির এনসাইক্লোপিডিয়া গোলাম মহম্মদ

তিন তিনটে সাক্ষাৎকার এক সফরেই। আর ঘুম আসে? তার ওপর বিবেক-দংশন। রাত দুটোয় যখন পরিক্রমা শেষে ফিরেছি তখন ভাতের থালা সাজিয়ে বসে আছেন কোনো এক গাঁয়ের বধু।

আর জ্বালানো ঠিক নয়। মনঃস্থির করে ফেলেছি বিরিঞ্চিবাবু উঠলেই পালাবো।

তা, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে : এ যাত্রায় নিশ্চয় কোনো যোগ ছিল।

ছ'টার বাসে চেপে জানালায় মুখ বাড়িয়েছি, হৈ হৈ করে উঠলেন প্রশস্ত ললাটে পেল্লায় আবশোভিত পরিচিত এক মুখ : "হেই হেই, পুচকাছেন কথা? কাললে খুঁজছি, নামহুন, নামহুন! আরও বাস আছে, পরে যাবেন। এই বাবু (চায়ের দোকানের বাচ্চাকে) দে ন রে তিন কাপ গরমাগরম!"

তারপর বিরিঞ্চির দিকে ফিরে "এ বিরিঞ্চি, ইটা তুমার ধর্ম হল—স্যার আলেন, তুমি আমাকে খবরও দিলে নাই?"

মধ্যবয়েসী দশাসই যোয়ান গোলাম মহম্মদ খাঁ। প্রচুর জমি-জায়গার মালিক, মাতব্বর ব্যক্তি, নাচগানের পরম রসিক, রাজার ডানহাত, বাঘমুণ্ডির এনসাইক্লোপিডিয়া। সমঝদার পেলে কি আর ছাড়েন?

নামতেই হল। যা আছে ববাতে—চায়ের দোকানেই শুরু হল ইন্টারভিউ :

"চৈত-সংক্রান্তিতে শিবের গাজনের সময় কাপ হত—চৈত-কাপ। শিয়াল ছো, কাড়া ছো। তার সঙ্গে গণেশ ছো।

হৃদয়নাথের সময়েই চৈতকাপের ছো ভাঙে ছোনাচ তৈরি হয়ে গেছে। সব জাতের লোকই কাপ করত। কাপ করা মানে কোনো কিছু সেজে অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তামাসা করা, ব্যঙ্গ করা।

ছো ছ একই। অল্প ইধারউধার উচ্চারণের। ছৌ বলে সেরাইকেলায়। ছো মানে অনুকরণ। ছক

করাও বটে, মনে মনে প্ল্যান করা। নাচের সময় এটা করতেই হয়।

সেরাইকেলার নাচ সবটাই উলফাবাজি। আলেদা ঢঙ। তবে, উয়ারাও মুখোস পরে। আসা-যাওয়া আছে ইদগে।

হৃদয়নাথের সময় ছো-নাচের ওস্তাদ ছিল দ্বারিকা ভিতুরিয়া (রাজার অন্দরমহলে যাওয়ার অধিকার ছিল), হিকিমড়ির নীলমাধব দে, বৃন্দাবন সিংবাবু। ছো-নাচের অনেক ঝুমুর বৃন্দাবন সিংবাবুর বাঁধা।

সেসময় ছোট সাইজের মুখোস ছিল। মলাটের কাগজে। কিরাতের মুখোস ছিল না।

রাজা মদনমোহনের সময় সব নাচগানই প্রসার পায়। রাজা বলতেন—প্রত্যেক বছরই দুটো করে নতুন নাচ করতে হবে। সারাবলী, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, পুরাণ থেকে ঘটনা নেওয়া হত। যুগলকিশোর সিংবাবু তালবাজনা তৈরি করে দিতেন। চড়দার শ্রীনাথ মিস্ত্রি মুখোস তৈরি করে দিত। তালবাজনাও সৃষ্টি করত।

রাজা মদনমোহনের সময় বহু শিল্পী। সবাই এক-একটা সৃষ্টি করছেন। ধরুন না, পুস্তিতোড়াং-এর ধনুকধারী সিংবাবু। চার ভাই ছিলেন ইনারা। আলাপ-ছো সৃষ্টি কলেন চারভাই-এ। একদম প্যারেড নাচ। একেই সাজপোশাক, একেই চাল। দেখে লোকে তাজ্জব মারে গেল।

ছো-নাচে উলফা, চুড়পা, হাঁটুপটকা ইসব ঝালদা থানার সৃষ্টি। অনেক রকমের তাল আছে। চড়দার বাবুলাল মিস্ত্রি যখন মুখোস পরে কিরাত নাচ করতে আসে তখন মাচা ভাঙে গেল। লোকের উল্লাস এমন।

আগে একক গণেশ-ছো ছিল। মাদলার গোকুল মুখার্জি যুদ্ধের আকার দিয়ে গণেশ পরশুরামের যুদ্ধ করলেন। গণেশের 'রঙ' সম্পূর্ণ পালটে দিলেন। 'রঙ' বুঝলেন? ছো-নাচের ছোট ঝুমুর।

ভিখা লায়া ময়ূর নিয়ে কার্তিক ছো করত। 'তরণীসেন বধ' করতেন হরিবাবু, যুগলবাবু। গান ও তাল করলেন রাজা মদনমোহন নিজেই। 'মায়ামৃগ' করলেন চড়দার জীপা সিং মুড়া।

বালিয়াড়ির মোহন কুমার, বড়ামের শম্ভু ঠাকুর—সব বড় বড় নাচইয়া।

সব বছরেই নতুন নাচ। কোন বছর বাবুলালের 'মায়াসীতা-বধ'। ঘোড়াবাঁধা সিঁদরীর লাল মাহাতো'র রক্তবীজ-বধ', পাটাহেঁসালের বুকা সিং'এর 'অঘাসুর বকাসুর'—"

"হেঁ হে বিরিঞ্চি, বুকা সিংই বঠে ন?" এই প্রথম ইতঃস্তত করলেন গোলাম মহম্মদ, "ঠিক মনে আসছে নাই। যাতে দ্যান..."

তারপরই নতুন উৎসাহে : "ভিখা লায়া করল 'কামদেব ভস্ম' তো হরিবাবু 'শুম্ভনিশুম্ভ বধ'।

হচ্ছে ত হচ্ছেই, পালার শেষ নাই। 'অতিকায়-বধ', 'গোধনমোচন', অভিমন্যু বধ', 'জটায়ু বধ', 'জয়দ্রথ বধ', মাল্যবান-গরুড়ের যুদ্ধ'। আড়কালি-বামনীর দল করকেক 'কৃষ্ণকালি', সিরুমের মুরু মাঝি চাঁদসদাগর আর মনসা', মোহন তাঁতি 'ত্রিবিধ বানর'।"

ছো-নাচের ঝুমুর ছোট ছোট। নাচের শুরুতে আর তাল ভাঙার সময় থাকে। নাটকের জন্য ব্যবহার। আলাদা গুরুত্ব নাই। নাচনিনাচের ঝুমুর আলাদা, মূল্যও আলাদা।

অতিকায়-বধের রঙ দিয়েছেন মদনমোহন নিজেই। সুর দিয়েছেন, তালও দিয়েছেন :

শুন মিতা বিভীষণ রণে এল কোনজন
পর্বত সমান রথে চড়ি?
শ্রীরাম বচন শুনি বিভীষণ কহে বাণি

শুন প্রভু কহি বিবরণ:
অতিকায় নাম ধরে জন্ম মালিনী জঠরে
এই হয় রাবণ-নন্দন॥

মাল্যবান গরুড়ের যুদ্ধ:

মাল্যবান সনে রণে খগপতি হইল কাতর
শ্রীমধুসূদনে ডাকে এসো প্রভু অতীব সত্বর॥

তাল ভাঙার সময়:

ওরে ওরে নরাধম পাঠাব তোরে শমন-সদন
সুদর্শন চক্রে তোরে করিব নিধন॥

শেষ পর্যন্ত রাজা আর নাচের আসর ছেড়ে উঠতেন না। উঁয়ার আর কি কাজ? চেয়ার থাপড়াই তাল দিয়া ছাড়া? যেমন স্বয়ং ইন্দ্ররাজ।

ঘরে বসেও কানে আওয়াজ আলেই শুনতেন। বেতাক কানে গেল কি হাঁকাইতেন: কোন্ শালা রে? ধরে লিআয়।

শুধরে দিতেন। ততক্ষণ শান্তি নেই।

সেরাইকেলার বাজনা ছোট তালের। তার মধ্যেই নানা কসরৎ: প্যাঁচ দিয়ে উঠা বসা চলা। যুদ্ধবিগ্রহ তত নাই। ইখানের মানুষ ল্যায় নাই।

আজকালের ছোনাচে খ্যামটা, নাটুয়া, দাঁড়ধরা সব ঢুকে যাচ্ছে : সার্কাস করছে, কাঁধে চাপে ডিগবাজি দিচ্ছে। মূল ভাবটা নষ্ট হচ্ছে।

—যুদ্ধ জিতে রাম কি উলফা দিবেন? মিলবেক? ভাবের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, কসরৎ দেখালেই হল?

তীরটা কি সত্যই ছুঁড়তে হয়? না, ভাবটা করলে তবেই শিল্প হবেক। টানটাতেই ত বুঝাবেক।

খুব পুরানো লয়। ঢের করলে দেড়শো বছর। আলেদা কন জাতেরও লয়। সবাই নাচে। যেমন ধরুন ভিখা লায়া, মধু ভাট, লাল মাহাত, জুরু মাঝি, জীপা মুড়া, গোকুল মুখার্জি, হরিপ্রসাদ সিংদেও।

আঠারো ডেগ, উনিশ উলফা নাটুয়ানাচে আছে। ছোনাচ ডেগের নাচ লয়। ইয়ার ডেগ দুরকমের—বাঁওয়ালি আর ডাঁওয়ালি।

আক্রমণ যখন করবেক তখন বাঁ পা আগাবেক। প্রতিরোধ করতে করতে হলে ডান পা।

সেরাইকেলার দুবরাজ লন্ডন নিয়ে গেছলেন ছো-নাচকে ১৯৩০-৩২ সালে। আশুবাবুর আগেই।

তবে হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে ছো-নাচের প্রসার ঘটল আশুবাবুর জন্যই। স্যালভিনি মেমসাহেব চালগুলা পরিষ্কার করলেন। গম্ভীর, কলেবরের পেছনে অনেক পরিশ্রম করলেন। কিন্তু শাস্ত্রটা কোথায়?

ছোনাচের কাহিনি যা বলছে সে ত আজকের লয়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে নেওয়া। শুভ আর অশুভ শক্তির লড়াই, সে ত সৃষ্টির মূলে অশুভের জিত হল ত সৃষ্টিই থাকবে না। উয়াকে হারাতেই হবে। অভিমন্যু-বধে অন্যায় যুদ্ধে মারা গেলেন অভিমন্যু। কিন্তু মানুষের মন

ত সেটা মানে নাই। অভিমন্যুর বীরত্বকেই বড় করেছে। সমর্থনটা গেছে অভিমন্যুর দিকেই।

এইটাই না ভারতবর্ষের বাণি। লড়তে হবে, আত্মশক্তিকে জাগাতে হবে। তবেই ভগবানকে পাবে, দৈবশক্তি তুমার সহায়ক হবে। পৌরুষ জাগাতেই যুদ্ধের আয়োজন। মুখোশের ব্যবহারও এইজন্যই। বাইরের জগৎ, ঘটনা সব পাল্টায়, ভিতরের চরিত্র পাল্টায় না। লড়াইটা এইখানেই। দেখুন ক্যানে, ইন্দ্র আসছে কবচকুণ্ডল লিতে কথাটা জেনেও দাতাকর্ণ তার স্বভাব থেকে পেছালেন? সাবিত্রীর কোল থেকে সত্যবানকে ছিনতে পারলেন যমরাজ? মুখোসে তাই লিখছে। বিধিলিপিটা কাজ করছে ভিতরের স্বভাব থেকেই।

ছোনাচ সেইটাই দেখাচ্ছে। না হৈলে কোরীয়া, জাপান, ইংল্যাণ্ড, লস এঞ্জেলসের লোকে তা লিবেক ক্যান?

এইটাই নাচের গাম্ভীর্য। মদনমোহন এইটাই আনেছিলেন। সব ঘটনার মধ্যে এইটাই আসল, সব নাচের মধ্যে এইটাই আছে। ইটা বাদ দিয়ে আস্ফালন, ডেগচুড়পা, হাতপায়ের কেরামতির দিকে নজর টানলে কতদিন টিকবেক? আশুবাবুরা এই ভিতরের কথাটা ধরতে পারেন নাই। বাহারটা দেখাতেই ব্যস্ত আছেন।"

এই তাহলে ব্যথার স্থান। গোলাম মহম্মদ তেতে উঠেছেন। এই সময়ই তিনি সবচেয়ে তাৎপর্যময়। খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না: "বাঘমুণ্ডি এখন অভিভাবকহীন, কি বলুন? এসব কথা বলবার কেউ নেই?"

হেসে ফেললেন গোলাম সায়েব। সামলে নিয়ে বললেন, "উটা ত ইতিহাসই বলবেক। দেখতে থাকুন না, কতও রূপ। কন্‌টা কতদিন টিকে। বীজটা ত আছেই।"

গোলাম সায়েব গভীর জলের মাছ। অনেক দেখেছেন। এটাও দেখছেন। খুব যে মনঃপূত, তা নয়। কেবলই বলছেন : যে চালটা দিবেক তার অর্থটা ত পরিষ্কার হবে। পালা এগোবে ত সেইভাবেই। কাঁধের একটা ঝাঁকানি দেবে, সেও ত নিরর্থক নয়। সেটাও ত তালে পড়বে। ভাব সৃষ্টি করবে। তবে ত পরের ভাবে পৌঁছবে। এই ত শাস্ত্র। এটা না থাকলেই আপত্তি।

সেই শাস্ত্রের খোঁজেই ত আসা। গড়ে উঠেছিল; এখন যেন থমকে রয়েছে।

বাংলা ১৩৩৩ সন: বাঘমুণ্ডির রাসমেলা

চিরকাল এবং ইতিহাস। ভারতের বাণী—বীজ আর তার বিকাশ। গোলাম সায়েবের কথাগুলো এখনো ধাক্কা দিচ্ছে।

হারুণ অল রসিদ যদি হন রাজা মদনমোহন, তবে তাঁর মন্ত্রণাদাতা জাফর হলেন গোলাম মহম্মদ খাঁ। সব কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর কথাগুলো ফেলে দেবার মতো নয়।

বাংলা ১৩৩৩ সনে হয় বাঘমুণ্ডির রাসমেলা। নাচনিনাচ এবং ঝুমুরগানের এমন প্রদর্শনী আর কখনো হয়নি। কিংবদন্তী হয়ে গেছে সারা ছোটনাগপুরে। কত ঝুমুরিয়া ধরে রেখেছে তার স্মৃতি।

পাতকুমের পঞ্চরত্নের মধ্যমণি ছিলেন রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি:

যেমন জ্যৈষ্ঠ মাসে আম মিষ্ট
তেমনি ভাবে রসে রামকিষ্ট...

ঝুমুরটা লিখেছিলেন তারই এক রত্ন, দুলমির গঙ্গাধর ঘোষ। দলবলসহ রাসমেলায় আসছেন তিনি। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায়—

গগনে উড়ায়ে ধূলি আইলেন রামকিষ্ট গাঙ্গুলি
নাগড়ার বোলে মেদিনী পূরিল...

সভাস্থলের বর্ণনা করেছেন অন্য এক কবি নরোত্তম সিং:

বাঘমুণ্ডি রাজধানী আইলাম পত্র জানি
দেখিলাম অপূর্ব ঘটনা
গানবাদ্য অবিরত নৃত্যকার করে নৃত্য
হেন সভা হয়নি হবে না।।

বলে ফুরোতে পারছেন না গোলাম সায়েব : এত ভিড়, টিকটিকি পালাইতে পারে নাই।

দিনে রাতে ইন্দ্রপুরী। মুড়ায় মুড়ায় দ্বারবান : মস্ত সব মাটির মূর্তি—গণেশ, কার্তিক, অসুর, রাক্ষস, হনুমান। যেমন লেখেছে পুরাণে, তেমনি গড়েছে চড়দার মিস্ত্রিরা।

তার ওপর পঁচিশ নাগড়ার বাজন। খাপরি খসে পড়ছে খোলার চালে। কাড়্হামাথা হেডলাইটগুলা মহিষের পারা নাচছে কাঠের খুঁটায়।

মস্ত মস্ত কড়াইলে খিচুড়ি ঢালছে সারাখন। যে আসছে সেই পাত পাতে বসে পড়ছে।

কম্পানিকা মাল দরিয়ামে ঢাল।
ব্যস, লে! ইয়ার পরই পতন ও মূর্ছা—

পঁচাশি মৌজার বাঘমুণ্ডি এস্টেট এনকাম্বার্ড হয়ে গেল!

হ্যাঁ, এক রাসমেলাতেই সব গেল। নাচনিনাচের সঙ্গে সঙ্গে ছোনাচও : কাঁড়দার আজমত শেখের সঙ্গে জীপা, ভিখা, মধু লাল, সবাই।

অর্থনৈতিক কারণটাই এই নাচদুটির চর্চা আর অনুশীলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। পুনরুজ্জীবনের ভরসাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল।

এরপর বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক। অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে গেল ইতিহাসের চাকা।

কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে বাংলা বিভাগে খোলা হল লোকসংস্কৃতির শাখা।১৯৬৭ সালে বিভাগীয় প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সশিষ্য এলেন পুরুলিয়ায়। চৈত্রসংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখ তারই উদ্যোগে মাঠার বনবাংলোয় জমায়েৎ হল স্থানীয় ছোনাচের দলগুলি। তাদের মধ্যে থেকেই গড়া হল নতুন দল 'ফরেন' যাওয়ার জন্য। শ্রীমতি স্যালভিনি তাদের তালিম দিলেন পশ্চিমি রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে।

একটা বড় পরিবর্তনের সূচনা হল। চোট খেল মদনমোহনের পরিকল্পনা। একটার বেশি নাগড়া আর ঢোল বাজান বন্ধ হল—মুক্তাঙ্গন ত নয়, প্রেক্ষাগৃহের ছাদটাই ভেঙে যাবে (গোল হয়ে ঘোরাও বন্ধ হল, থিয়েটারের মঞ্চে মুখ ফেরাতে হল একদিকেই। যুদ্ধের সময় দর্শকদের মাতুনিও বন্ধ হল। ছোনাচ আর সকলের—গোটা সম্পদায়ের জিনিস রইল না। নিবিড় জীবনবোধও রইল না। ঝলমলে পোশাক, চিত্রবিচিত্র মুখোস, লম্ফঝম্পের আবেদনটুকুই সার হল।

প্রথম পাড়ি লণ্ডনে। তারপর শুধু সাফল্যের পর সাফল্য। প্যারিস, নিউইয়র্ক, শিকাগো, লস এঞ্জেলস। পরবর্তীকালে দূরপ্রাচ্য সিঙ্গাপুর, কুয়ালালুমপুর, চীন, জাপান, কোরিয়া।

বিশ্বের সর্বত্র পুরুলিয়ার ছোনাচের জয়জয়কার।

এর গুরুত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারও বুঝে গেছেন। চড়দার গম্ভীর সিংমুড়া 'পদ্মশ্রী' পেলেন ১৯৮১ সালে। ১৯৮৩ সালে পুনরায় পুরস্কৃত হলেন সঙ্গীতনাটক অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ডে।

রবীন্দ্র ভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী ১৯৭১ সালে ঐ ইউনিভার্সিটির স্নাতক বিভাগে ছো-নাচকে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কল্যাণী ইউনিভার্সিটিও কলকাতা ইউনিভার্সিটির পথানুসরণ করে।

ঝাড়খণ্ড হবার আগেই রাঁচি ইউনিভার্সিটিও সমান মর্যাদা দেয় ছৌনাচকে।

ছৌনাচের পালে এখন জোর হাওয়া। প্রতি গ্রামেই একাধিক দল। চোখে স্বপ্ন। এখন আলাদা ধরনের। গ্রামীণ জনতার সামনে রাজদরবারে সম্মানপ্রাপ্তি নয়। লক্ষ্যও হচ্ছে বিদেশের প্রেক্ষাগৃহে অর্থ ও সম্মান প্রাপ্তি দুইই। একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন এখনকার শিল্পীরা।

পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের পাশ দিয়ে চন্দনকিয়ারীর রাস্তা। ঘণ্টায় পৌঁছে বাঁদিকে নামলেই মেঠো পথ ভেঙে গ্রাম পুড়দা। 'নারায়ণী ছৌনৃত্য সংঘ'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক দুর্গাচরণ মাহাতো'র বাস ওখানেই। এটা সেটা প্রয়োজনে প্রায়ই আসেন। শুনিয়ে যান তাঁর বিদেশযাত্রার কাহিনি। ছোট্ট করে ইংরেজিতে লিখিয়ে নিয়ে যান ছৌনাচের সিনপ্‌সিস।

এবার করবেন চারটে পালা: 'তারকাসুর-বধ', 'মহিষাসুর-বধ', 'হিরণ্যকশিপু-বধ', 'কিরাতার্জুন'। কালো কুচকুচে গায়ের রং, লোমশ শরীর, গোলগোল লাল চোখ, মোষের মতন মাথা ডি.সি. মাহাত, সুড়ুং দিয়ে মাথা তুলবেন দেবী দুর্গার দিকে। লেগে যাবে সেই চিরকালীন দ্বন্দ্ব। শিকাগো কিংবা কুয়ালালুম্পুরের মাটিতে। শাস্ত্র জানি আর নাই জানি, গুরগুর করে উঠবে বুকের ভেতরটা। শিল্পী তো তত্ত্বকথা দিয়ে বোঝাবে না। সে নিজের খেয়ালেই সৃষ্টি করে। ডি. সি. মাহাত তো ঝুমুরিয়াও। আনন্দ পেয়েছে, তাই লিখেছে:

হরি হে,
টিকিট কাটে চলে যাবেন সিনেমাতে দেখতে পাবেন
রাবণ নাচেন পটল মাহাত;
ময়ূর নাচেন চেপা বাউরী কাঠের ঘোড়া করেন তৈরি
অভিমন্যু সতীশ মাহাত॥
ভাবে নাচেন ধনুকধারী মধুভাট গোয়ালা হরি
কুইলা মুচি নিরঞ্জন মাহাত:
গোবরা হাড়ি অবিরত বুকে তরোয়াল ঘুরাইত
কাঁচা হাঁড়ির উপরে ঝাঁপ দিত॥
গণেশ নাচে গোপাল শুঁড়ি ঝাঁপে তালে রাসু হাড়ি
বীর নাচে ধনঞ্জয় মাহাত;
মেলে তুলসী আদালত সাহানায় নলকুপী বল
শিব নাচে অনিল মাহাত বিখ্যাত॥
ডি. সি. মাহাত জানোয়ার যত হরিণ ঘোড়া বাঘ ভালুকের মত
হনুমান নাচিতেন লাল মাহাত;
নরসিংহ জুরু কুমার বলে কৃত্তিবাস কুমার
কার্তিক নাচ গম্ভীর সিং বিখ্যাত॥
নাচে যেমন বলিহারি সাজেও তেমন অলঙ্কারী
নাচিয়াছেন বিশ্বদরবারে;
শুন শুন হে পুরুলিয়ার ছোনৃত্য শ্রোতাগণ
না খুঁজিলে পাবে কোথায় ডি. সি. মাহাত'র মন॥

আজ দুহাজার দুই সালের পাঁচুই সেপ্টেম্বর—শিক্ষক দিবস, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। দেড়শো বছরের পুরুলিয়া ছৌনাচের পসরা সাজিয়ে এই সেপ্টেম্বরেই দশজনের দল নিয়ে ডি.

সি. মাহাত বেরিয়ে পড়বেন দুলাখ টাকার বাণিজ্যে। এবার Eastern Zone Culture Centre'এর ছত্রছায়ায়। এর আগে মার্চে গেছলেন Indian Council for Cultural Relation, Ministry of External Affairs, Govt. of India'র ব্যবস্থাপনায়।

শুধু D. C. Mahato-ই নয়, একাধিক দলই যাচ্ছে। অজান্তে একটা সামাজিক পরিবর্তনও ঘটছে। যাঁরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী ধীরে ধীরে তাঁরা এটিকে দ্বিতীয় বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করছেন।

ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে তা, ভবিষ্যতই বলবে।

পেছনের দিকে তাকালে এ কাণ্ড তো আগেও হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির চালান ত যুগে যুগেই হয়েছে :

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূদরের ভিত্তি
শ্যাম কাম্বোজে কণকাম্ভোজ মোদের প্রাচীন কীর্তি...
পুরুলিয়ার ছৌনাচ ত তারই আধুনিকতম অনুসৃতি।

সন্দেহ নেই শিল্প'গত বিচারে মদনমোহনের সময়টাই ছিল এর স্বর্ণযুগ। তিনিই ছিলেন এর শ্রেষ্ঠ রূপকার। আশুবাবু এসে তার বিদেশযাত্রার পথ খুলে দিলেন। গুরুত্ব বুঝে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তার আর্থিক সংস্থান করে দিলেন।

এ আলোচনা শেষ করার আগে জানাতে চাই অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল যার উত্তর দেওয়া যায়নি। অনেকটাই রয়ে গেছে ভবিষ্যতের গর্ভে। নাট্যরস রয়েছে কিন্তু নাটক হয়নি। কাহিনি বলতে খণ্ড ঘটনা। অভিনয়ের প্রধান মাধ্যম মুখ মুখোসে আবৃত। সংলাপ নেই। গ্রীক নাটকের মতোই মুক্তমঞ্চ। যবনিকা নেই।

নৃত্যকলার প্রদর্শনই প্রধান অভিপ্রায়। পুরুষরাই এর কুশীলব। নানা ভঙ্গির অঙ্গচালনা রয়েছে, কিন্তু মুদ্রায় পর্যবসিত হয়নি। খুবই পরিশ্রমসাধ্য। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি টানা যায় না। অথচ দর্শকরা আসে রাতভোর জেগে থাকার জন্য।

সমস্ত তোলা রইল আগামী দিনের জন্য।



নৃত্যে মুখোশ ও ছৌ মুখোশের শিল্পকলা

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য

মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনে সারা বিশ্বেই প্রস্তরযুগের পরবর্তী সমস্ত পর্ব থেকে মুখোশ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অবয়ব, আকৃতি-প্রকৃতি এবং প্রতীকী ব্যবহার সভ্যতার নানা পর্বে বৈচিত্রময় রূপান্তরে বিকাশলাভ করেছে। মুখোশ হল ব্যবহারকারী ব্যক্তির ছদ্মবেশ। মুখকে আবৃত করেই মুখোশ। মুখোশধারীর প্রকৃত পরিচয়, তার ব্যক্তিত্ব মুখোশের আড়ালে ঢাকা থেকে যায়।

সারা বিশ্বজুড়েই আদিম জনগোষ্ঠী নানা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এবং জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রকৃতিকে জয় করবার মানসে ও ভয়-ভীতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য নৃত্যগীতের আশ্রয় নেয়।

নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার সারা বিশ্বে আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সভ্যতার ঊষাকাল থেকে প্রচলিত। পৃথিবীর আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুখোশ, মুখোশ নির্মাণ ও তার ব্যবহার এখনও বহু অনুসন্ধানের বিষয়। দেশে দেশে যেখানেই প্রাচীন সভ্যতা আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিকশিত হয়েছে সেই অঞ্চলেই মুখোশ ও মুখোশ নৃত্য বিভিন্ন রূপে জনজীবনের সংস্কৃতির মধ্যে একাত্ম হয়ে আছে। আমাদের ভারতবর্ষের হিমালয়ের লাদাখ ও হিমাচল থেকে পূর্ব ভারতের দিকে কিরাত তথা মোঙ্গোলয়েড শাখার নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুখোশনৃত্য প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। নেপাল, ভুটান, চীন ও জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় দেশ ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বলীদ্বীপ, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে, আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সর্বত্র মুখোশ প্রচলিত ছিল। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন সুমের সভ্যতা, প্রাচীন ইওরোপের গ্রীক ও রোমান রাজত্বে, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে পেরু অঞ্চলে, ইন্‌কা সভ্যতা উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো ও অন্যান্য অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে ওই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অলৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার যা নানা উৎসবে-পার্বণে, জন্ম-মৃত্যুতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখোশ প্রতীক রূপে নৃত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মৃতের মমিকরণের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় সমাহিত করা হয় সেই মৃতের মুখাবয়ব-এর উপরে তার চরিত্রের রূপায়ণ করে মুখোশে ঢেকে রাখা হয়।

নৃত্যের সাহায্যে ভৌতিক শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেমন সম্ভব তেমনি এই অদৃশ্য শক্তিকে বশীভূত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ—এই বিশ্বাস আদিম লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। শুভ-অশুভ অলৌকিক শক্তির বিশ্বাস করবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রূপ-কল্পনাও গড়ে ওঠে। এই

ব্যাপারে আদিম মানুষ তার চারপাশে দৃশ্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাত। সুতরাং মানুষ পরিচিত অনেক পশু-পক্ষীর পৃথক অথবা এদের মিশ্ররূপের মধ্যে অলৌকিক দেবদেবী, ভূত-প্রেত প্রভৃতিকে ধরবার চেষ্টা করল এবং এইসকল কল্পিত মূর্তির চালচলন সম্পর্কে যে ধারণা করত তাই নৃত্যে অনুসৃত হত।

'পূর্ব পুরুষদের বিদেহী আত্মা অনেক সময় পশু-পক্ষী, মৎস্য, বৃক্ষ এমনকী ঝর্ণাধারা, পাহাড় প্রভৃতিকে আশ্রয় করে ওইসকল প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়বস্তু গোষ্ঠীর প্রতীক (Totem) রূপে গৃহীত হত। আবার লোকসমাজে এমন ধারণাও প্রচলিত ছিল যে বিশেষ কোনো জন্তু হতেই বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্ভব। মোঙ্গল জাতির বিশ্বাস ভালুক তাহার পূর্ব পুরুষ। কোনো এক সময়ে দুজন খান এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে একজন স্ত্রীলোক ছাড়া সমস্ত মানুষ নিহত হয়। জীবিত এই স্ত্রীলোকের সাথে একটি ভালুকের সাক্ষাৎ হয়। এরই ঔরসে দুটি সন্তান লাভ করে। এদের থেকেই মোঙ্গল জাতির উৎপত্তি। সুতরাং এই বিশ্বাস থেকে মোঙ্গলেরা ভালুককে টোটেমরূপে গ্রহণ করে (The Origin of Religion, R. Karston, London, 1935) আদিম লোকসমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এইভাবে নানা প্রকার টোটেম গৃহীত হত। বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীরা গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। নৃত্য ও উৎসবে টোটেম-এর প্রকাশ ঘটত। অতিলৌকিক শক্তির ব্যবহার, চাল-চলন ও অঙ্গ-ভঙ্গির নিখুঁত অনুকরণ করবার সুবিধার জন্য নৃত্যকারগণ অদৃশ্য শক্তির রূপ সজ্জা গ্রহণে মুখোশ ব্যবহারের রীতি প্রচলন করে। এই রীতি থেকেই মুখোশ নৃত্যের উদ্ভব। টোটেম উৎসবে টোটেমের সঙ্গে সাদৃশ্য রচনার জন্য সকলেই মুখোশ পরিধান করত। টোটেম চতুষ্পদ জন্তু হলে এর চর্মও পরিধান করা হত। এই নৃত্যের উদ্দেশ্য ছিল টোটেম অধ্যুষিত আত্মা বা ভৌতিক শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করা।'

(লোকনাট্য ও সমীক্ষা—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য)

"মুখোশ নৃত্য মুখাবরণ পরিহিত নৃত্য। আদিম সমাজের অনুকৃতিমূলক গোষ্ঠী নৃত্যে টোটেম বিশ্বাস ও যাদুক্রীড়ার সূত্রেই প্রধানত মুখোশের ব্যবহার শুরু বলিয়া বিবেচিত হয়।

লোকায়ত স্তরেই সাধারণত মুখোশ নৃত্যের অবস্থান। ইহাতে দেহাঙ্গগত উৎপ্লাবনে লোকনৃত্যের প্রাণময় উদ্দামতা সাধারণত স্বতস্ফূর্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুখাবয়ব ঢাকা থাকায় নৃত্যাভিব্যক্তি সীমাবদ্ধ।"

"বাংলায় সাধারণত কাঠ, কাগজ, কাপড়ের মণ্ড, মাটি, লাউ-কুমড়োর খোলা প্রভৃতিতে মুখোশ নির্মিত হয়। সাধারণত ঢাক, ঢোল, ধামসা, সানাই, কাসা প্রভৃতির বাদ্য হয়। কালী নাচ, রাভাং, রাবণকাটা, মুখাখেইল, সঙ, বহুরূপী, হরপার্বতী, বুড়ো-বুড়ী, নৃসিংহ, খোঁড়া, ডাইনি-পিশাচী, ছৌ নাচ প্রভৃতি মুখোশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

(— মণিবর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য।। ভারতকোষ)

হিমালায়ের পাদদেশের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বনাঞ্চল চা-বাগানসহ ডুয়ার্স এলাকা। চা-বাগিচা ক্ষেত্রগুলিতে অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চল, বিহার, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুর, বর্তমান পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী চা-বাগানে শ্রমিক হিসাবে যোগ দিয়েছিল এবং এর সাথে তাদের লোকসংস্কৃতির ধারাকে ওই অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে

মিশ্রণ ঘটিয়েছিল। পূর্বে আসামেও বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বৈচিত্রপূর্ণ লোকসংস্কৃতির ধারা প্রবহমান। মেচ, রাভা, টোটো, ওঁরাও, মুণ্ডা, খড়িয়া, মহালি কামার, গৌড়, সাঁওতাল আর নেপালিদের মধ্যে রাই, লিম্বু, মঙ্গর, গুরুংগ, কামী, দমাই, সারকী, তামাং, ভোটে ডুকপা, সেরপা ইত্যাদি রয়েছে। আনুমানিক ৪৮ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতি-উপজাতি। এঁদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব সমপ্রীতির বাতাবরণে অনেক সম্পন্ন হয়। ভাববিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে মিশ্র সংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত। এঁদের মধ্যে তামাং লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিতে ওই জনগোষ্ঠীর আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এঁদের একটি নাচ 'ডোম্ফু নাচ' নামে পরিচিত। এঁদের ধর্মীয় নৃত্য 'বাকপা', 'জুম্বা', 'চই'। নাচের বিষয় অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করা, কল্যাণ ও শান্তির কামনায়। বলিষ্ঠ আঙ্গিক। 'বাকপা' নৃত্যে এই নাচের কাঠ খোদাই করা মুখোশ ব্যবহৃত হয়। চমরী গরুর লেজ নিয়ে পরচুলা হয় তৈরি। মুখোশধারীরা সাধারণত নৃত্যাভিনয় করে 'ঢাকপো', 'মানিন', 'সিংদুং চেকিয়ার' এইসব নামের নৃত্যে। করতাল, বড় শঙ্খ, কাংলিং, গ্যালিং, ভিলবু, ধিংসা, চৈদর, খুনদর নামের বাদ্যযন্ত্র থাকে। 'বাকপা নাচ' হয় রাত্রে। দিনে হয় জুঙবা নৃত্য। এই নাচে মুখোশ না থাকলেও শিল্পী ভূতের মতো নানা বর্ণে সাজে। বাকপা নৃত্যের মতো পরচুলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে। রাভাদের মধ্যে নৃত্যের স্থান নিবিড়। নৃত্যকে 'বসিলি' বলে। শ্রম, আনন্দ ও বিরহের প্রকাশ এই নৃত্যে ফুটে ওঠে। এসব নৃত্য যৌথ শ্রমের ফসল। 'মাকপল নৃত্যে' ভালুক নাচে ভালুকের মুখোশ বা মুখা পরে। কলাপাতা বা পাটের আঁশ দিয়ে ভালুক নাচ দলবদ্ধভাবে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মাগুন তুলে বারোয়ারি কালীপূজা করে। একটিই মুখোশ থাকে। নাচের পর নদীর জলে মুখোশ ভাসিয়ে দেয়। আরেক মুখোশ নাচ আলিপুর দুয়ারের দক্ষিণে যা রো বসতির কোচাদ্রাও দল করে। নাম 'চোর খেলেয়ী'। এটিও ধর্মীয়, মাগুনের সঙ্গে যুক্ত। চোর খেলেয়ী নাচে দুটি মুখোশ। ভালুক মুখোশ যিনি পরেন তাঁর দেহ পাটের আঁশে তৈরি, হাতে বাঁকানো ছড়ি। আর একজনের মুখে চণ্ডীর মুখোশ, পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, গায়ে বুকখোলা শার্ট ডানহাতে তরবারি, পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। চোর খেলেয়ী মুখোশগুলি বিচিত্র। প্রসারিত ঠোঁট, লকলকে জিহ্বা, লম্বা নাক। রাজবংশী সমাজের মধ্যে চৈত্র মাসে চড়ক মাগুা বা গমীরা খেলার নৃত্য হয়। শিব ও পার্বতী, রাম-লক্ষ্মণ-হনুমান-সীতা, দশানন, মহিরাবণ, চণ্ডীর মুখোশ পরা দৃশ্যাবলী। মহিরাবণ বধ পালাতেও বিভিন্ন চরিত্রের মুখোশনৃত্য হয়। লোলজিহ্বাযুক্ত কালীর মুখোশ এবং ঘাগরা পরে একহাতে খড়্গ ও অন্যহাতে রুধিরপাত্র নিয়ে ঢাকের বাজনার তালে তালে উদ্দাম নাচ চলে।

জলপাইগুড়ির কালচিনিতে তামাংদের বাস। বৌদ্ধধর্মের মহাযানপন্থী এরা। 'বাক্‌পা ও জম্‌বা' মুখোশনৃত্য এদের বিস্ময়কর। অশুভ শক্তির মর্ত ও পাতাল জয় করে যখন স্বর্গে হানা দিল তখন ভীত দেবকুল পদ্মসম্ভব বা দেবাদিদেবের কাছে দুর্দশার কথা জানালেন। অশুভ শক্তি বিনাশ কামনায় এ নৃত্য। প্রতিটি চরিত্রে মুখোশ ব্যবহার করা হয়। দেব ও দানবভেদে মুখোশের চরিত্রও ভিন্ন। জুম্বানৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধপূর্ণিমার উৎসবে। নেপালিদের মধ্যে খ্যাতনামা কবি দেও কোটার 'প্রণয়' কাব্য অবলম্বনে রচিত ব্যালেধর্মী নৃত্যনাটক খুব জনপ্রিয়। এদের মহাকালী নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার রয়েছে।

চীন দেশে ক্লাসিক নাচ অপেরারই একটি অঙ্গ যাতে নৃত্য, বাহুভঙ্গিমা, অভিনয়, আবৃত্তি, কণ্ঠসঙ্গীত এবং উল্লম্ফন একত্র মিলিত হয়ে নৃত্যনাট্যের অবতারণা করে। বিশ্ববিখ্যাত চীনা নৃত্যশিল্পী ল্যাং ফ্যাং-এর সঙ্গে প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর আগে ভারতের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ইন্দ্রাণী রহমানের

এক অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। ভারতের কথাকলি নৃত্যের রূপসজ্জার মতো চীনা অপেরাতে একই ধরনের বীরত্বব্যঞ্জক দানবীয় এবং হাস্যভাব প্রকাশ করার জন্যে মুখে উজ্জ্বল বর্ণ প্রলেপ দেওয়া হয়। এই মুখাবয়বে এই ধরনের বর্ণ লেপনের কথাকলি নর্তকদের মুখোশের ন্যায় মুখাঙ্কনের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ইন্দ্রাণী রহমান সিংকিয়াং, মোঙ্গলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য চৌদ্দটি লোকনৃত্যের নৃত্যকলা দেখেছেন। চীনের নৃত্যশিল্পী ল্যাং ফ্যাং-এর মস্তকশোভিত মুকুট ছৌ নৃত্যের মুখোশের মাথার উপরের অংশের ছটার ন্যায়।

জাপানের বিশ্বখ্যাত কাবুকি নৃত্য নাট্যের মুখোশ বর্ণময়বৈচিত্রে আকর্ষণীয়।

১৯৭১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ইউনেস্কো-র সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক রামায়ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নেপাল, ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, খেমর, ভিয়েতনাম, লাওয়স, ফিলিপাইন্‌স ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ নৃত্যে ও আলোচনায় যোগদান করে। এখানে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং The Ramayana in Chhau, a traditional dance-drama of Purulia, West Bengal, India এই বিষয়ে একটি আলোচনা উপস্থিত করেন। এই ইন্দোনেশিয়াতেই এরই বহু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ জাভা, বলিদ্বীপ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সঙ্গী ছিলেন ভাষাচার্য পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তার মধ্যে নৃত্যনাট্য, ছায়ানৃত্য এই বর্ণময় নাচের রূপসজ্জা বিষয়ে অনেক কিছু আমরা জানতে পারি। ড. ভট্টাচার্য এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নৃত্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্য থেকে বাংলার নৃত্যকলা বিশেষ করে ছৌ নাচের বর্ণময় বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলার মর্যাদা ও গৌরব আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া' পুস্তকে ড. ভট্টাচার্য তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা চিত্রিত করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু ক্ষেত্রে নৃত্যে মুখোশ ব্যবহারের বিবরণ দিয়েছেন।

"পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। যদিও পুরুলিয়া ঐতিহাসিক ও তৎবাহিত ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস প্রায়ই একই পথে অগ্রসর হয়েছে। কারণ, গুপ্ত, পাল, সেন ইত্যাদি রাজবংশের শাসন সীমা থেকে এই অঞ্চল কোনোসময়ই বিচ্ছিন্ন ছিল না। ফলে জৈন-বৌদ্ধ -আর্য-মুসলমান-খ্রিস্টান সভ্যতা ও ধর্ম বিশ্বাসের তরঙ্গ নানাভাবে আছড়ে পড়েছে এই জেলায়। এই জেলার বর্ণ-হিন্দুরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বা বৃহত্তর ভারতের অন্য কোনও অংশ থেকে বহিরাগত। বাংলার খুব কম জেলাতেই আছে আড়াই হাজার বছর আগে তৈরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। অথচ পুরুলিয়া জেলা খুব বেশি দিনের নয়—দেশ বিভাগের পর। মিশরীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে প্রাচীন মন্দিরে। এই জেলার মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন জৈন ধর্মগুরুরা। চৈতন্যদেব গিয়েছিলেন নীলাচলে এই পথে। বাংলায় অভিযান করেছিলেন মানসিংহ। পুরুলিয়ার অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আজও আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সারি সারি ডুংরি পাহাড়ের দেশ পুরুলিয়া এক সময় ছিল বিস্তৃত জঙ্গলভরা—এখন আর তেমন নেই। জেলার পাহাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বেলে পাথর, অভ্র, শ্লেট, কয়লা, লোহা। কঠিন পাথরের বুক চিরে চলে গেছে কাঁসাই নদী—পশ্চিমে সুবর্ণরেখা আর দক্ষিণে কুমারী। এক বিচিত্র সৌন্দর্যে মোড়া জেলা এই পুরুলিয়া।

পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের মুখোশ (চোড়দা), গালার কাজ, কেটে বা তসরের কাপড়, রুপোর অলঙ্কার, আদিবাসীদের ধামসামাদল উল্লেখযোগ্য। কুলীন দেবদেবীর সঙ্গে আছে অসংখ্য লোকদেবতা।

জেলায় ভূমিজ-মাহাতো-ভূঞ্যা-বাগাল-সাঁওতাল-ওঁরাও-মুণ্ডাদের দেবতা কাম্রসের পূজা সুপ্রচলিত। জেলায় সামগ্রিক জনসংখ্যার মধ্যে বর্ণ হিন্দুর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি ;ভূমিজ, মুণ্ডা, মাহাতো প্রভৃতি কুর্মিজাতি, সাঁওতাল, ডোম এবং মল্ল প্রভৃতির বসবাস উল্লেখযোগ্য। এই জেলার অন্যতম আদিবাসী হোল মুণ্ডা। এরা আষ্ট্রিকভাষী।

মুখোশ বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে গণ্য। মুখোশের ব্যবহার হয় নাচে, সঙ সাজায়, বহুরূপীর কাজে। ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরি হয় পুরুলিয়ায় আর কাঠের মুখোশ তৈরি হয় দার্জিলিং-এ। .... যে সব বিষয়বস্তু নিয়ে মুখোশ তৈরি হয়, তাদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের চরিত্রগুলিই মুখ্য"।

(রামরঞ্জন দাস, পশ্চিমবঙ্গের রূপরেখা)

বর্তমানে ছৌ নৃত্যের চারটি ধারা দেখতে পাই। উড়িয্যার ময়ূরভঞ্জের ছৌ-নৃত্য, ঝাড়খণ্ডের সেরাইকেলার ছৌ-নৃত্য আর পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য ও ঝাড়গ্রামের চিলকিগড়ের একটি ধারা। চারটি ধারায় পার্থক্য আছে। সেরাইকেলার ছৌনৃত্য রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্টরূপ লাভ করে। ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম ইউরোপে এর পরিচিতি ঘটান এই রাজপরিবার। এতে মুখোশের ব্যবহার কিছু আছে। তবে বৈচিত্রহীন ও সঙ্কেতধর্মী। এতে ধারাবাহিক কোনো কাহিনি অবলম্বন করা হয় না। এর অধিকাংশ ভাবই রাজপরিবারের রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও সম্পদ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল।

ময়ূরভঞ্জের ছৌনৃত্যের অনুষ্ঠান এই পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চৈত্রসংক্রান্তির গাজনের কালে তিন দিন ধরে রাজপ্রসাদের মধ্যেই এর অনুষ্ঠান হ'ত। মুখোশের ব্যবহার নেই বললেই চলে, আঙ্গিকের দিক থেকে পুরুলিয়া ও ময়ূরভঞ্জের ছৌনাচের মধ্যে অনুষ্ঠানগত পার্থক্য নেই।

পুরুলিয়ার ছৌনৃত্যের বৈশিষ্ট্য তার অপরিহার্য মুখোশের ব্যবহার। মুখোশগুলো, বাস্তবধর্মী। পুরুলিয়ার নৃত্যে আনুপূর্বিকভাবে প্রকাশ পায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনি। পুরুলিয়ার মানুষের কাছে প্রদর্শিত, জনপ্রিয়। কোনো আঞ্চলিক ভূস্বামী তার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সামন্ত প্রভুদের নিছক ব্যক্তিগত রুচি কিংবা আদর্শবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। এর নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। তবে এই চারটি ধারার মূল উৎস অভিন্ন। পুরুলিয়ার পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, আবার রক্ষণশীল।

'যুদ্ধনৃত্য থেকেই ছৌনাচের উদ্ভব। ময়ূরভঞ্জের ছৌনৃত্যে খুব স্পষ্ট এই বিষয়টি। ছাউনিতে সৈনিকদের যুদ্ধের অভ্যাস থেকেই যে ছৌনৃত্যের উদ্ভব হয়েছে ময়ূরভঞ্জের ধারায় তা স্পষ্ট। এখানে মুখোশের ব্যবহার হয় না বলে যুদ্ধের রূপটি— আক্রমণ, প্রতিরোধের ভাবটি নাচে ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার নৃত্যে এইভাব কিছুটা আচ্ছন্ন থাকে রামায়ণের কাহিনি এবং মুখোশের আড়ালে। সেবাইকেলায়ও মুখোশ ছাড়া কাব্যময় সংকেত এবং ব্যঞ্জনার ভাব দিয়ে তা প্রায় মুছে দেওয়া হয়েছে। 'ছৌনাচ ময়ূরভঞ্জ, সড়াইকেলা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকনৃত্যের প্রকারভেদ। পৌরাণিক কাহিনি পুনর্কথনে দেবচরিত্র চিত্রণ এই নৃত্যের বিষয়বস্তু। জন্তু, জানোয়ার, দেবদেবী নাগরিক ও দৈত্যদানব চরিত্রের মুখোশই সাধারণত হয়।'[৫]

(মণিবর্ধন—বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য, ১৯৬১ ভারতকোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় খণ্ড)

ভারতবর্ষের ইংরেজ আমলের অন্তিম পর্ব থেকে আজ প্রায় ৬০/৭০ বছর ধরে ছৌ নৃত্যের অনেক বিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫৬ সালে বিহারের মানভূম জেলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হয় পুরুলিয়া জেলা। ১৯৬৬ সাল থেকে পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি থানার মাঠা পাহাড়ের নীচে বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও লোকশিল্পের গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই সময় থেকে নানা অনুসন্ধান কার্যের মধ্যে দিয়ে পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট ধারণা ও তথ্যসমূহের আলোকে বাংলায় ছৌনাচের বৈশিষ্ট্য, ছৌনাচে ব্যবহৃত মুখোশ, মুখোশ নির্মাতাদের বিষয়ে অনেক তথ্য পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের রাজধানী দিল্লীর মহলও একদিন যে শুধু সেরাইকেলা ও ময়ূরভঞ্জের ছৌনাচ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তারাই পুরুলিয়ার মুখোশসহ ছৌনাচে মুগ্ধ হলেন। দেশবিদেশে এর প্রদর্শন, প্রয়াত শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া সহ, অনেকের পদ্মশ্রী প্রাপ্তি, মুখোশ শিল্পের উৎকর্ষ সারা দেশবিদেশে খ্যাতি এনে আজ বিশ্বময় এই নৃত্য বাংলার ধ্রুপদী শিল্পের লোকায়ত জীবনে এর উত্তরণ ঘটিয়েছে।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় লোকসংস্কৃতি এখনও জনজীবনে জীবন্ত। এ যেন বহতা নদী। বাংলার বহুমুখী শিল্পধারার মধ্যে মুখোশনৃত্য এক উল্লেখযোগ্য। চিত্রশিল্পীদের কাছেও মুখোশ প্রেরণা দেয়।

'এখানে মালদহের গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য উল্লেখে বলা যায় 'গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য যার জন্ম প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, যার মধ্যে শুধু পৌরাণিক, তান্ত্রিক চরিত্রই নেই, আছে লোকায়ত জীবনানুগ ঐকান্তিকতা। গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যে সংগীতাপেক্ষা অনেক বেশী আদিমতার চিহ্ন বর্তমান। এই নৃত্য আচারভিত্তিক (Ritualistic) গম্ভীরার মুখোশ, (স্থানীয়ভাষায় মুখা বা মখা) বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে বর্তমান লেখকের ধারণা। পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে মুখোশ জন্মলাভ করলেও ধর্মের লোকায়ত বিষয়বস্তু গ্রহণ করে সেও অনেক স্থানেই ধর্মনিরপেক্ষ চৌহদ্দিতে দাঁড়িয়ে আছে। বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে গম্ভীরার মুখোশ নৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১। পৌরাণিক—কালী, বাশুলি, গৃধিনীবিশাল, চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণ, হিরণ্যকশিপু, তারকাসুর, শিব দুর্গা, সুধন্যবধ, ইত্যাদি।

২। গ্রামীণ বা লোকায়ত—বক, টাপা, গরুর দুধ দোহা, কলসি কাঁখে বধূ, সাঁওতাল চাষা-চাষি ইত্যাদি।

৩। প্রাণি সম্পর্কিত—সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি।

৪। সামাজিক—মাতাল, মেমসাহেব, বুড়া-বুড়ি ইত্যাদি।

৫। মিশ্র ও অন্যান্য—পইরী (পরী), বংশ (রণপায়ে আরোহণ করে নৃত্য) শব, চালি ইত্যাদি।
কাঠ, পোড়ামাটি ও কাগজের (পেপার ম্যাসে) মুখোশ তৈরি হলেও মালদহে পুরুলিয়ার মতো মুখোশ শিল্প গড়ে ওঠেনি, তবে বর্তমান নিবন্ধকারের ঐকান্তিকতায় আইহো গ্রামের দুই শিল্পী মন্টু পাল ও তুলসি পাল ইদানিংকালে মুখোশ নির্মাণে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মুখোশে মাটি রঙ (Earth colour) বা বার্ণিশ রঙ করা হয়। চিত্র-বিচিত্র জামাকাপড় বা বেশভূষা চরিত্রভেদে হয় তৈরী। এটি পরিপূর্ণ লোকনৃত্য হওয়ায় ধ্রুপদী নৃত্যের 'অঙ্গাহার' ও 'করণ' সুস্পষ্টভাবে এই নৃত্যের মধ্যে ধরা না পড়লেও মিশ্ররীতির ঢঙে নিজস্ব এক প্রাণবান লোকনীতিতে সে প্রতিষ্ঠিত। ... প্রাচীন গৌড়ের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ ও মুসলিম আক্রমণের ফল তন্ত্রের পীঠস্থানগুলি ধ্বংসের ফলে বিভিন্ন স্থানে যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বেঁচেছিল, তার একটি পথ তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছে

বলে বিশ্বাস্য সূত্র আছে এবং এই জন্যই তিব্বতের মুখোশের সঙ্গে গম্ভীরার মুখোশ ও তার নৃত্যের এক গভীর সম্বন্ধ; এ বিষয় গৌড় যে তিব্বতকে পথ দেখিয়েছে তাও প্রমাণ করা যায়।

('লোকসংস্কৃতি ও মালদহের গম্ভীরা'—প্রদ্যোত ঘোষ)

'নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার নফরচন্দ্রপুর গ্রামে মালপাহাড়ি আদিবাসীর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফুলশোলার তৈরি মুখোশ নাচ হয়। মালপাহাড়িদের মুখোশ নাচ লোকনাট্যে বিন্যস্ত। মুখোশ সাদা ও কালো রঙের। এদের লোকনাট্যে কালোমুখোশধারীদের দুই দলে যুদ্ধ হয় সব কাহিনিতেই। এদের মুখোশে যেমন পশু-পাখির মুখ থাকে, তেমনি থাকে পৌরাণিক চরিত্রের মুখ। দশানন রাবণের মুখ দর্শনীয়। এছাড়া শিব, কালী, মনসার মুখোশও যেমন আছে তেমনি হনুমানের মুখোশও আছে। নদীয়ার মালপাহাড়ির মুখোশ নৃত্যগীত সমৃদ্ধ।'

(মোহিত রায়—লোকনাট্য-লোকনৃত্য)

বর্তমানে শিল্পীদের ও পরিচালকবৃন্দের মধ্যে নানা যন্ত্র কৌশল ও বিজ্ঞানপ্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যেমন—

'পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডী অঞ্চলের ছৌনাচ শিল্পীদের রূপসজ্জায় ধীরে ধীরে আধুনিকতার স্পর্শে নানা রূপান্তর ঘটেছে। যেমন শিবের মুখোশের মধ্যে ব্যাটারির আলো জ্বালিয়ে তৃতীয় নয়ন বা কোমরে ব্লাডার বেঁধে শিবের জটায় গঙ্গার জলধারা সৃষ্টি করা হয়।'

(জি.এস আবুবকর)

গম্ভীর সিং একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন—ছৌনাচে যদি, মুখোশ না থাকত তবে তা এমন বর্ণময় হয়ে উঠত না। আগে (প্রায় ৩/৪ দশক আগের) মুখোশের এত চাকচিক্য হত না, ছিল ম্যাড়মেড়ে, রঙও এত উজ্জ্বল ছিল না। মুখোশ ছাড়া—অভিব্যক্তি ফুটে উঠত না। ধামসার গুরুগম্ভীর আওয়াজের মধ্যে মুখোশের নড়াচড়ায় তাকানোর ভঙ্গিতে শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। চড়িদার মুখোশ শিল্পীরা যে অসাধারণ কারিগরি দক্ষতায় নানা ব্যঞ্জনাময় মুখোশ তৈরি করেছেন তাতে ছৌনাচ অন্য মাত্রা পেয়েছে। গম্ভীর সিং নিজেই মুখোশ নির্মাতাদের মুখোশ তৈরির বিষয়ে পরামর্শ, অনুপ্রেরণা দিতেন।

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণভিত্তিক কাহিনির চরিত্র মুখোশে রূপায়িত করা ছাড়াও—সামাজিক ও জনজীবনের প্রয়োজনে আধুনিক কিছু পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনি অবলম্বনেও আলাদা মুখোশ নির্মিত হয়েছে। সিধু, কানু, ব্রিটিশ সেনানি, সাঁওতাল গণসংগ্রামের সদস্য, এদের মুখোশ নির্মিত হয়েছে। শুধু পৌরাণিক কাহিনির প্রথাগত পুরাণ নির্ভর নয়, আঙ্গিককে বজায় রেখে নতুন কাহিনি নিয়ে নতুন বিষয়ে নতুন চরিত্রের মুখোশ নির্মাণ ও তার প্রদর্শনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবীণ ছৌ-নাচ শিল্পীদের অনুমোদন ছিল। প্রথা ভেঙে দেবার মানসিকতায় ছৌনৃত্যগুরু গম্ভীর সিং মুড়ারও মানসিকতায় এই দৃঢ়তা অনুভব করা গেছে।

অযোধ্যা পাহাড় ছিল ঘন অরণ্যময়। জঙ্গল ছিল হিংস্র জন্তু জানোয়ারেপূর্ণ। পাহাড়মধ্যে হয় শিকার উৎসব। উৎসবে আসে নৃত্যদল। আজ থেকে দু-এক শতক বা তারও আগে ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতিনির্ভর আদিম জীবন। অথচ এই অঞ্চলেই প্রায় ৪, ৫ দশক পূর্ব থেকে এই নাচের সঙ্গে মুখোশ নির্মাণের চাহিদা থেকে বাগমুড়ীর চড়িদাগ্রাম আজ বিখ্যাত এবং মুখোশ নির্মাণের উৎকর্ষতায় অনন্য। এখানেই ঘরে ঘরে শুরু হয় মুখোশ তৈরির প্রথাগতভাবে ও বংশানুক্রমে মুখোশ শিল্পীদের

শিল্পকর্ম ও রূপসজ্জার উপাদানসমূহ। ক্রমশ এর উন্নত ও সংস্কৃত রূপশৈলী কয়েক দশক ধরে কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। মুখোশ তৈরি তার সঙ্গে পশু-পাখি সহ নানা ধরনের মুখোশে ও উপকরণে ঘরের সাজসজ্জা বৃদ্ধির শিল্পকর্মেরও বিস্তার লাভ করেছে।

থাইল্যাণ্ডে একশ্রেণীর রামায়ণ নৃত্যের নাম 'খন-রো-ন্নাই'। এর অর্থ মুখোশ নৃত্য। তবে তা 'দরবারী'। অভিজাত শ্রেণির নৃত্য। রামায়ণ নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার থাইল্যাণ্ডে খুব রক্ষণশীল। রামায়ণ সীতা বা উচ্চশ্রেণির চরিত্র এ যুগে মুখোশ পরে না। রাক্ষস-বানর-দৈত্য-দানবের মুখোশগুলো তৈরি হয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। চরিত্র অনুযায়ী রাক্ষসের মুখোশের রঙই সবুজ, প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের মাথার মুকুট পরিকল্পিত। বানরের মুখোশের রঙের বিভিন্নতা আছে, যেমন সুগ্রীবের মুখোশ লাল, হনুমানের রঙ সাদা, জাম্বুবানের মুখোশের রঙ নীল। মুখোশের রঙ দেখে অনেক সময় চরিত্রগুলোকে চিনতে পারা যায়। ভারতের কথাকলিনৃত্যে মুখোশের ব্যবহার না থাকলেও চরিত্রের মুখগুলো যে নানা রঙে চিত্রিত করা হয়, তা থাইল্যান্ডের অনুরূপ না হলেও তার উদ্দেশ্য অভিন্ন। বাংলার ছৌনৃত্যের মুখোশেরও চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী রঙ হয়ে থাকে। তবে ছৌ-তে দেবদেবী চরিত্রও মুখোশ পরে বলে মুখোশের রঙে যে বৈচিত্র দেখা যায়— অন্য কোনও স্থানে তা নেই। থাই নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে মঞ্চ-উপকরণ-ব্যবহৃত হয়। ছৌ-নৃত্যে তা নয়। ও দেশে নাচে মঞ্চে উচ্চ বেদী, যুদ্ধরথ, তীরধনু, লাঠি, ত্রিশূল, রাজছত্র এসব ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুক্তাঙ্গন অভিনয় সীমাবদ্ধ। আঙ্গিক এবং রীতির উপর বেশি জোর দেবার জন্য ছৌ-নৃত্য থেকে তা যেন প্রাণহীন।

অতীতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পর বাগমুণ্ডি অঞ্চল আদিবাসীদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন সম্পন্ন আদিবাসী ভূস্বামীদের মধ্যে হিন্দু চেতনা বাড়ল। ১৮৯১ খ্রি: প্রকাশিত রিজলি তাঁর—The Tribe and Castes of Bengal–গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এঁদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—

The leading men of aboriginal tribe, having somehow got on the world and become Independent landed Propritors, managed to enrol themselves in one of the leading castes. They usually set up as Rajputs, their first step being to start Brahmin priest......

বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁদের জন্য কুলপঞ্জি তৈরি করে তা'তে দেখিয়ে দিত যে এরা সূর্য কিংবা চন্দ্রবংশের সন্তান এবং মান্ধাতা কিংবা যুধিষ্ঠির থেকে তা'দের বংশধারায় এ পর্যন্ত কোথাও ছেদ নেই। এরপর থেকে হিন্দু আচার-পালন-এর আবশ্যকতা দেখা দেয়। পূজার প্রবর্তন, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ইত্যাদি শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে নিষ্কর ভূমি দান করা ব্রাহ্মণ পুরোহিত যেমন তাঁরা আমদানি করতে লাগলেন, তেমনি পূজার উপযোগী প্রতিমা নির্মাণ করবার জন্যও মৃৎশিল্পী এনে বসালেন। এ ভাবেই বাগমুণ্ডীর সামন্ত রাজারা চড়িদা গ্রামের মৃৎশিল্পীদের বর্ধমান জেলার কোনো স্থান থেকে এনে প্রতিমা নির্মাণ শিল্পীদের বসতি স্থাপন করান। এখানে ছৌ-নৃত্যের উপযোগী মুখোশ নির্মাণ শিল্পের প্রসার ঘটে। পশ্চিমবাংলার ছৌমুখোশ নৃত্যে ক্রমশ রামায়ণ-মহাভারতের বিষয় প্রবেশ করলেও পূর্বে মুখোশের বিষয় যে অন্য কিছু ছিল তা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কী ছিল অনুমান করা যায় না ঐতিহ্যের ধারার বিলুপ্তির ফলে। খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্যে বুদ্ধ-নাটক-এর উল্লেখ আছে। অভিনয় পদ্ধতি অজানা। ছৌ-নৃত্যনাট্যের তা' কোনো প্রাচীন রূপ কিনা, প্রশ্ন থাকে। ছৌ-নৃত্য প্রাধান্য লাভ করলেও তা অভিনয়, সংলাপ ছাড়া নাটকের আর সকল গুণ আছে।

পুরুলিয়ার বহু সংখ্যক প্রাচীন মন্দির-এর ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় একদিন জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম সমানভাবেই বিকাশলাভ করেছিল। দুর্গোৎসব ও দশহরা অনুষ্ঠান উপলক্ষেই রামায়ণ-মহাভারত পরে পুরাণ কাহিনি এ অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। ছৌ-নৃত্যের মধ্যেও এসব কাহিনি প্রবেশ করতে থাকে। যারা সামন্তরাজদিগের প্রতিমা নির্মাণের জন্য নিষ্কর জমি লাভ করে এসব অঞ্চলে বসতি গড়েছিল, তারাই চাহিদা অনুসারে ক্রমে ক্রমে দেবদেবীর চরিত্রের মুখোশ নির্মাণের এক বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে। ছৌনৃত্যের মুখোশ যার পরিণতি। সে যুগ ও আজ, এর উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে অনেক রূপান্তর ও রূপারোপে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে শিল্পীর হাতের দক্ষতায়।

পুরুলিয়া জেলার ৪টি থানাতেই প্রধানত ছৌ-নৃত্যের প্রচলন, বাগমুণ্ডী, আরশা, বান্দোয়ান এবং ঝালদা। চড়িদা থেকেই সরবরাহ হয় ছৌ-নাচের মুখোশের। এই নৃত্য আপাতদৃষ্টিতে লোকনৃত্যকলার মতো মনে হলেও শাস্ত্রীয় নৃত্যরূপে তা বিকাশ লাভ করেছিল। এখানকার রাজপরিবারই এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ছৌ-নৃত্যের বর্তমান পদ্ধতিটির প্রবর্তন যা বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে আরো বিকশিত হয়েছে, উন্নতরূপ লাভ করে জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছে, তার সন্ধান এখনও অসম্পূর্ণ।

"সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে মুখোশনৃত্য লাসায় কেবলমাত্র লামা সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয়—'ছাম'। এই ছাম শব্দটিও ক্রমে ছাঁউ, ছৌ বা ছো-তে পরিণত হওয়া আমাদের দেশে আশ্চর্য নয়। এই মুখোশ নৃত্যের একটি প্রধান বিষয়বস্তু হল তিব্বতীয় পুরাণের অন্তর্গত দেব-দৈত্যের বিরোধ। .... আমার বিশ্বাস এই 'ছো' বা 'ছাম' সম্পর্কীয় মুখোশ নৃত্যের আদিম প্রথা পূর্বভারতের বাংলা, উড়িষ্যা, তিব্বত অঞ্চল থেকেই এসে থাকবে। ... এটা অবশ্য একান্তভাবে আমারই অনুমান, ছৌ শব্দটি তিব্বতীয় এবং একে অবলম্বন করে, বহু প্রকার বীর রসাত্মক নৃত্য আছে—এটাও যথার্থ। অতএব 'ছো' বা 'ছাম' নৃত্যাদি থেকে বর্তমান ছৌ বা ছো আমাদের দেশে আসতে পারে এমন অনুমান নেহাৎ কল্পনা বলে মনে হয় না; বিশেষত আমাদের সাধক এবং তিব্বতের সাধকদের মধ্যে একদা যথেষ্ট যাওয়া-আসা বা এর আদান-প্রদান ছিল। এই নৃত্যগুলি তো আদতে এইসব সাধনারই অঙ্গ ছিল।

(পুরুলিয়ার 'ছত্রাক' পত্রিকা থেকে ঃ শ্রী রাজেশ্বর মিত্র)

পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের সাধারণ প্রকৃতি সর্বত্রই এক ও অভিন্ন, তথাপি তার বহির্মুখী রূপায়ণে সমগ্র অঞ্চলে চারিটি পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। ছৌ নৃত্যের প্রধান অবলম্বন, তা এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে চড়িদা গ্রামেই একটি অভিন্ন আদর্শে গঠিত হয়েছে। বাগমুণ্ডী, ঝালদা, আরসা ও বান্দোয়ান—এদের মধ্যে বান্দোয়ান অঞ্চলের রূপটি সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল এবং ঝালদা অঞ্চলের রূপটি সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। অন্য দুটি অঞ্চলের রূপ তার মধ্যবর্তী। ছৌ নাচের মুখোশ—নির্মাতারাই বাগমুণ্ডীর রাজার প্রদত্ত নিষ্কর জমিতে বাস করে এসেছে। এরাই ছৌ-মুখোশের উদ্ভাবক। প্রায় দুশো বছর ধরে একই পদ্ধতিতে মুখোশ তৈরি হচ্ছে। তবে রঙে উপকরণে উৎকর্ষতায় রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। প্রায় যাট বছর আগে চরিদায় হাতে গোনা দুই চারটি ছৌনৃত্য দল ছিল, বর্তমানে পুরুলিয়া জেলাব্যাপী প্রায় সাতশত ছৌনৃত্য দল আছে। অতীতের তুলনায় মুখোশের চাহিদাও বেড়েছে।

বাগমুণ্ডীর প্রধান বৈশিষ্ট্য—শারীরিক কসরতভিত্তিক acrobatic। শূন্যে দেহকে একবার চক্রাকারে আবর্তন করে মাটিতে, সেই অবস্থা থেকে শূন্যে লাফ দিয়ে, দেহটিকে আবর্তিত করে

আবার হাঁটুর উপর মাটিতে বসে পড়া। এভাবে ৮/১০ বার শূন্যে লাফ, আবর্তন, হাঁটুর উপর মাটিতে পতন—যাকে 'ঝাঁপ' দেওয়া বলে, খুবই কষ্টসাধ্য। এই পদ্ধতি সম্পর্কে সমালোচকদের মত তা রূপলাবণ্য থেকে দেহগত শক্তির প্রাধান্য পরিস্ফুট। এখানে মুখোশকে মুখের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নাচের সঙ্গে ব্যবহার—শ্বাস প্রশ্বাসে যেমন কষ্টকর, চোখের দুটি ফুটো দিয়ে নাচের ভূমি-ক্ষেত্রটিকে নজর রাখাও অনায়াসসাধ্য নয়, শ্রমসাধ্য।

ঝালদার পদ্ধতিটি প্রধানত 'মেল' বা গোষ্ঠী নৃত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রূপসজ্জা অত্যন্ত আধুনিক ও ব্যয়সাধ্য। প্রথাগত পোষাক নেই বললেই চলে। নাইলন, জর্জেট, টেরিলিন-এর প্রাধান্য। নানা যান্ত্রিক উপকরণ যুক্ত হয়। নৃত্যের কঠিন সাধনা এখানে কম-বেশি যান্ত্রিকতাপূর্ণ।

আরসার নৃত্যপদ্ধতি একান্ত আঙ্গিক-নির্ভর নয়। ঢোলক বাদ্যকর বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। অথচ তারা কেউ প্রথাগত বাদ্যকর নয়। এখানে প্রভাবশালী ভূস্বামী রাজা পূর্বে ছিল না। অধিবাসী সাধারণ কৃষক। কঠিন সংগ্রামী জীবন। এখানে সকল চরিত্রে মুখোশ ব্যবহার হয় না। নৃত্যগুণের বিশেষত্ব দর্শকদের কাছে প্রকাশ পায় বেশি। এখানে মুখোশের কৃত্রিমতা কিছু ক্ষেত্রে দূর হয়ে যাবার ফলে শিল্পীরা সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ পায়। চারিদিকে চোখ মেলে দেখবারও আনন্দ মেলে।

বান্দোয়ানে কেবলমাত্র নাচে রামায়ণের কাহিনিই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ-নৃত্যের মত এই অঞ্চলের নৃত্যই প্রকৃত রামায়ণ নৃত্য। বান্দোয়ানের পদ্ধতির একটি প্রধান গুণ এখানে শ্রমের চেয়ে লাবণ্য রূপটি বেশি ফুটে ওঠে।

বাগমুণ্ডী থেকে পরবর্তীকালে কিছু শিল্পী পরিবার জয়পুর থানার ডুমুরদিহি গ্রামে চলে যান—সেখানে একই পদ্ধতি ও গড়নে নানা চিত্র-বিচিত্র মুখোশ তৈরির কাজে অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করেন।

'২০০১ সালে পুরুলিয়া বইমেলায় দুটি জার্মান মেয়ে এসেছিলেন আনা ও রীতা। ওঁদের একজন মুখোশ শিল্প নিয়ে গবেষণা করছেন। ওঁরা চড়িদায় যেতে চান। আমি ও জগন্নাথ ওঁদের চড়িদা নিয়ে গেলাম। রীতা মুখোশ শিল্পীদের একজনকে চিনতে পারল। বলল 'জামনীর একটি বিখ্যাত ফিল্মে ওনাকে আমি দেখেছি।' ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাযা করায় জানা গেল একজন গবেষক জার্মান দেশ থেকে এসে একমাস চড়িদায় ছিলেন। মুখোশ শিল্পীদের নিয়ে উনি একটা ফিল্ম তৈরী করেছেন। রীতা বললেন, 'ওটা জামনীর একটা বিখ্যাত ফিল্ম।' ('অনুজ'—শ্রী দিলীপ গোস্বামী)

কাগজ, কাগজ মণ্ড, কাপড়ের মুখোশ ব্যবহার হলেও এক সময় মেদিনীপুর জেলার জামবনি থানার চিল্‌কিগড় ভূ-স্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ছৌনাচের উৎসব হত, তাতে বিভিন্ন চরিত্রের মুখোশগুলি হত কাঠের তৈরি, চিত্র-বিচিত্র। এ যুগেও সেখানকার রাজবাড়ির ছৌ-নাচে কাগজ ও কাপড়ের তৈরী মুখোশের সঙ্গে এইরূপ কাঠের মুখোশও চালু আছে। শিমূল কাঠের ব্যবহার হত।

'আগে ছৌ নাচে মুখোশের ব্যবহার ছিল না। সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ এবং ঝাড়গ্রামের ছো-নাচ উল্লেখযোগ্য। তথাপি, বাঘমুণ্ডি অঞ্চলের দলগুলির নাচই প্রতিনিধিত্বমূলক আর সেখানের নায়ক গম্ভীর সিং মুড়া। গম্ভীরের ঠাকুরদা, এবং পিতা বিনা মুখোশেই ছো-নৃত্য পরিবেশন করেছেন। মুখে কালি-ঝুলি মেখে (কাপ-ঝাপ) নাচা হত বা 'আলাদা-ছো' অথবা 'মেল-নাচ' করা হত। মুখোশের ব্যবহার এসেছে আরো পরে বাঘমুণ্ডির অবিনাশ সূত্রধর (১৩০৫-১৩৮২ বঙ্গাব্দ) মুখোশ শিল্পীর পথিকৃৎ।'

(আমাদের পুরুলিয়া ॥ অমিয় কুমার সেনগুপ্ত ॥ পৃঃ ১৭৩) (ছো সম্রাট গম্ভীব সিংমুড়া-অমিয়কুমার সেনগুপ্ত)

বাগমুণ্ডীর রাজবাড়ি থেকে দু'মাইলের মধ্যে চড়িদা গ্রামের সূত্রধর পরিবারগণই মুখোশ নির্মাণের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে যুক্ত। এই গ্রামটি পূর্বে ছিল ভৌগোলিক এবং সামাজিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এদের স্বজাতীয় কোনো লোকজন কাছাকাছি ছিল না। বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে এদের বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও দূরবর্তী জেলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পর পুরুলিয়া জেলা গঠনের পরবর্তী স্তরে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। চড়িদা গ্রাম, দুদিকে পাহাড় ও অরণ্য দিয়ে ঘেরা। কিছু চাষযোগ্য জমি, কৃষিখেত, আর নীরস পাথুরে ভূমি। এরমধ্যেই মুখোশ নির্মাতারা জীবিকা নির্বাহ করতে চেষ্টা করেছে। এখানে আদিবাসী সমাজের সর্দার ভূমিজ-মুণ্ডা পরিবার বাস করেন। এদেরই সংখ্যা বেশি। সংখ্যায় বেশি হলেও নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় এদের জীবন কাটত। বিগত দিনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ত্রিস্তরে প্রবর্তনের পর থেকে এই লোকজীবনের কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে। ছৌ-মুখোশ ত', সারাবছর ধরে বিক্রি হত না। যদিও তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের থেকে বর্তমান কালে ছৌ-নাচের খ্যাতিলাভ ও প্রচারের ফলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটলেও এদের অর্থনৈতিক সংকট এখনও বর্তমান। আমি চড়িদার অনেক মুখোশ শিল্পীর সঙ্গে কথা ব'লে জেনেছি—তখন সূত্রধর পরিবারগণ মন্দার কালে পালকি, কাঠের উপর কারুকাজ সহ আসবাবপত্র তৈরিতে হাত লাগান। জীবিকার তাড়নায় অনেকে প্রতিমার মরশুমে দূরে যান। রাঁচি, ডালটনগঞ্জ, পালামৌ, হাজারিবাগ পর্যন্ত যেতে হয়। মুখোশ তৈরিতে অতিসাধারণ জিনিস, উপকরণ দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যময় মুখোশ তৈরি করেন। পূর্বের তুলনায় ইদানিং এই মুখোশের, ওই সঙ্গে পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ারের, ময়ূরের ও পুতুলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে এবং তার সাথে চাহিদারও সৃষ্টি হচ্ছে।

মুখোশ তৈরির উপকরণ হল আঠাল মাটি, পুরোন খবরের কাগজ, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, ময়দা, আঠা, তেঁতুল বিচির আঠা, পালিশ করার জন্য গর্জন তেল, ধুনো, পাট, নকল চুল, পাখির পালক, পুঁতি, রাংতা, শালমা, চুমকি ও নানাবর্ণ রঙের সঙ্গে সাধারণ যন্ত্রপাতি। এইগুলি সহযাগে অসামান্য দক্ষতায় যে মুখোশ তৈরি হবে তার একটি নমুনা—মুখমণ্ডলের ছাঁচ তৈরি করেন। একে 'ছাঁচা' বলে। 'ছাঁচা' তৈরির পর মূর্তির কাঁচাভাব দূর হয়ে কিছুটা শুকনো হলে তার উপর ছাইয়ের গুঁড়ো ছড়ানো হয়। এরপর পাতলা আঠার মধ্যে মাপসই কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে ওই ছাঁচের উপর লেপটে দিতে হয়। এইভাবে ৭/৮ বা ১০ বার কাগজের আঠায় নরম করা পরদা সেঁটে দিতে দিতে মূর্তির গড়ন রূপ পেয়ে শক্তপোক্ত হয়ে নির্মিত হয়। রূপ পেতে থাকে অবয়ব। ছাঁচার উপর মাটি দিয়ে চোখ, ভ্রূ, নাক, ঠোঁট ও থুতনির, কানের অর্থাৎ মুখমণ্ডলের সামগ্রিক চিত্রটিকে রূপায়িত করা হয়। তারপর গোলা কাদামাটির মণ্ডে যথাযথ পাতলা মিহি কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে ওই মুখোশ ছাঁচের উপর টানটান হিসেব করে সাজিয়ে দেওয়া হয়।

কাদার এই প্রলেপ লাগানোকে বলে 'কাবিজ লেপা'। এরপরে দক্ষহাতে শিল্পীরা বিশেষ ধরনের কাঠের মসৃণ কর্ণিকের মত যন্ত্র ব্যবহার করে মূর্তিটিকে পালিশ করান হয়। একে থাপি বা থুপি বলে। পালিশের কাজ শেষ হলে রোদে শুকোবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিছুটা শুকিয়ে গেলে ওই মাটির ছাঁচ থেকে কাগজ ও কাপড়ের আস্তরণ খুলে ফেলা হয়। তৈরি হল মুখোশের অবয়ব। তাঁকে নিখুত করার জন্য বাড়তি অংশ ছাঁটকাট করা হল। এর পরবর্তী ধাপ—মুখোশের উপর চোখ ও নাকের স্থলে ফুটো তৈরি করা। নাচিয়ে শিল্পীরা যাতে চোখে দেখতে পায় নাকে নিঃশ্বাস

নিতে পারে। এ জন্যই এই ব্যবস্থা। মুখোশের কাঠামো এভাবে শেষ হলে রঙ-এর ব্যবহার শুরু হয়। মুখোশের উপর খড়িগোলা রঙ চড়িয়ে মুখোশের চরিত্র অনুযায়ী সেই রঙ গোটা মুখোশে লেপে দেয়া হয়। প্রতিমা গড়নের খুঁটিনাটি পদ্ধতির মতনই রঙ ও তুলির সাহায্যে চোখমুখ, গোঁফ এঁকে জীবন দান করা, যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হল। পরবর্তী ধাপ এ্যারারুটের লেই লেপে শুকানোর পর দেওয়া হয় গর্জন তেল। মুখোশ এবার ঝলমলিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখোশ তৈরি এখনও সম্পূর্ণ নয়—এরপরেই সাজসজ্জার কাজ শুরু। নকল চুল, শনের বা পাটের কালো রঙে মাখিয়ে লাগানো বা চুল তৈরিতে নাইলনের আঁশও ব্যবহৃত হয়। রঙিন পাখির পালক, ময়ূর পুচ্ছ, রাংতা, পুঁতি, কাকসা, চুমকি ও জামির পাতা প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে উন্নতরূপ দেয় হয়। 'পঞ্চখিলান' মুখোশ আছে—মুকুটের মাথার অংশ সজ্জিত করা—এজন্য শিল্পীর কলাকৌশল বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হয়। মুখোশ নির্মাতাদের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অবশ্যই প্রয়োজন। দেবদেবী, দৈত্য-দানব ইত্যাদি চরিত্রের গায়ের রঙ কার কেমন হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট জ্ঞাননির্ভর তথ্য নিয়ে রঙ নির্বাচিত হয়। পূর্বে পুরুলিয়ার এই অঞ্চলের শিল্পীদের হিন্দীভাষাভাষী প্রদেশের—বিহারের প্রভাব বেশি ছিল। সেই সূত্রে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসের' প্রভাব ছিল বেশি ছৌ-নৃত্যের কাহিনির মধ্যে। মুখোশও তেমন নির্মিত হত। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হবার অর্থাৎ পুরুলিয়া জেলা গঠনের পর থেকে কবিচন্দ্রের বিষ্ণুপুরী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত অবলম্বন করেই মুখোশ তৈরি হচ্ছে। কৃষ্ণনগরে বাস্তবধর্মী পুতুল নির্মাণকারী শিল্পীদের খ্যাতি সর্বত্র। সেই আদর্শেই পদ্ধতি প্রকরণ ভেদে সেই পথেই মুখোশ নির্মাণেরও শিল্পীদের শিল্পকর্মের বিস্তার লাভ করেছে। তবে 'চড়িদার মুখোশ নির্মাণের ক্রমবিবর্তন বিশেষ নজরে আসে না। পঞ্চাশ কি একশত বৎসর আগে যে ধরনের মুখোশ তৈরি হত তার নিদর্শন সংরক্ষণ করা বা সংগ্রহশালা না থাকায় এর ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ঐতিহ্যধারাই অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে মুখোশের সাথে গৃহসজ্জার জন্যও চাহিদা থাকায় আরও নতুন নতুন রূপারোপে সাঁওতাল দম্পতির মুখ, নানা পশু-পাখি, ময়ূর এই পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে। যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাজারে চাহিদাও আছে। প্রখ্যাত ছৌনৃত্য শিল্পী ও মুখোশ শিল্পী শ্রী নেপাল সূত্রধরের সাথে আমার এবিষয়ে আলোচনা হয়। আমার সম্পাদিত 'বাংলা'র ছৌনাচ ও গম্ভীর শিং মুড়া' সংকলন গ্রন্থে তার লেখাও ছাপা হয়েছে।

ছৌ নাচের প্রচার, প্রসার ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জেলার প্রশাসন ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দরদী ও গবেষকদের আগ্রহ বেশি সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেলা, উৎসবে দৃষ্টিনন্দন এই শিল্পকলার চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রথাগতভাবে পৌরাণিক কাহিনি রামায়ণ, মহাভাবত শুধু নয় ছৌনৃত্য শিল্পীরা, বর্তমান রাজনৈতিক সামাজিক, আর্থিক পরিস্থিতিতে দেশ ও বিশ্বের নানান ঘটনাবলিতে আলোড়িত হয়ে—স্বাদেশিকতা, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সিধু-কানহুর সংগ্রামী জীবন, ব্রিটিশরাজ, জমিদার, সামন্ততন্ত্রের অপশাসন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শিল্পরূপ দিয়ে অনেকে সচেতনভাবে এগিয়ে আসছেন। অশুভ শক্তির দমনের জন্য শুভ ও কল্যাণকর শক্তির পক্ষে, পৃথিবীর ও সমাজের মঙ্গল কামনায় হিতসাধনে, দেশকে, মানবসমাজকে শুভবোধে জাগ্রত করে তুলতে এই শিল্প মাধ্যম শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। অনেক ছৌ-শিল্পী নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করতে

জনমানসে চেতনা বৃদ্ধির জন্য মুখোশ সহ ছৌনৃত্যের প্রদর্শনে অনেকাংশে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কালানুক্রমিক মুখোশের সংগ্রহশালা একান্ত প্রয়োজন। যা বিদেশে দেখা যায়।

বিভিন্নধারার লোকনৃত্যকলা, মুখোশ ও মুখোশ নির্মাণ শিল্পীদের বিষয়ে বহু তথ্য এখনও সংগৃহীত হয়নি, আরো অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই নিবন্ধের স্বল্পপরিসরে অসম্পূর্ণতা থেকে গেল। নবীন গবেষক ও শিল্পী বন্ধুরা আরো গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান ও চর্চার মাধ্যমে পূর্ণতা দানে এগিয়ে আসবেন এই আশা।

পলাশ-কুসুম উল্লাসে রঞ্জিত এই অহল্যাভূমি পুরুলিয়াতেই ছৌ নৃত্যকলা শিল্পের ও শিল্পীর ঐতিহ্য রক্ষা ও তার সম্প্রসারণ অবশ্যই করতে হবে। এই সঙ্গে আশাকরি আরও রূপারোপে বৈচিত্রময় হয়ে উঠবে মুখোশ নির্মাণ শিল্পের আঙ্গিক ও কলাকৌশল। এখানে প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার স্মৃতিকে চিরজাগরুক রাখতে ছৌ-নৃত্যের আকাডেমি গড়ার উদ্যোগ পুরুলিয়া জেলার প্রশাসন ইতিমধ্যেই নিয়েছেন। আশার কথা, আজ প্রয়োজন অন্যান্য লোক-লোকশিল্পকলার উজ্জীবনে এবং বাংলার ধ্রুপদী ছৌ-নৃত্যকলার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিবর্তনের ইতিহাস রচনা, মুখোশ-এর সংরক্ষণ, উপযুক্তভাবে তথ্য সংকলন; আর চাই আদিবাসী জনজীবনের আরো উন্নয়ন। হারিয়ে যেন না যায় যুগযুগ সঞ্চিত লোকজীবনের ও সংস্কৃতির মূল্যবান ঐশ্বর্য ও তার সম্পদ।

এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে জনপ্রবাহের মধ্যে কৃষ্টির সমন্বয় যুগ যুগ ধরে ঘটেই চলেছে। মানভূম, সিংভূম, রাঁচী, পুরুলিয়া থেকে চব্বিশপরগণা জেলাতেও (এখন উত্তর) ছৌনৃত্য শিল্পীর কিছু পরিবার এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। সুন্দরবনের সন্দেশখালির ন্যাজাট অঞ্চলে কয়েকজন মুখোশব্যবহারকারী ছৌনৃত্যশিল্পী—তারাপদ মাহাতো, কুশধবজ মাহাতো, ছুটু মাহাতো, দেবদাস মাহাতোর নাম জানা গেছে। ১৯৬০-৬২ সালেও এদের ছৌ-নৃত্যের অনুষ্ঠান ঐ অঞ্চলের প্রবীণ ও শিক্ষক আদিবাসী নেতা বলরাম সর্দারের সাক্ষ্যে জানতে পেরেছি।

তথ্যসূত্র ঃ

আমার সম্পাদিত 'বাংলার ছৌনাচ ও গম্ভীর সিং' গ্রন্থের বিশিষ্ট লেখকগণ সহ আরো যাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ: ১। কাজিমান গোলে—পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ২। তারাপদ সাঁতরা ৩। দিব্যজ্যোতি মজুমদার। ৪। পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য।



পুরুলিয়ার মেলা ও পার্বণ

সিরাজুল হক

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলা—পুরুলিয়ার পরিচয় খরা-জরা-রুখু-শুখু-উচাঁলি-নাচালি-ডাঙা-ডহর-ডুংরী এবং চিরদরিদ্রতায় নয়। হয়তো রূপসি-বাংলা এখানে গেরুয়া-শাড়ি পরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে এক কঠোর তপস্যার সম্মুখীন। অনেকে পুরুলিয়াকে খরার রাজধানী বলেও মন্তব্য করেন। কিন্তু তবুও—তবুও এর অন্তরের সুড়ঙ্গপথে এক ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে অহরহ। এই ঝর্ণাধারার গতি-আবেগ-সুর এখানের সাদামাটা আটপৌরে খাটোয়া মানুষদের প্রেরণার উৎসভূমি।

'ফুটি-ফাটা' চৌচির মাঠের বুকে, বৈশাখের চিল-চিঁচি তাঁতবোনা দুপুরে, শাল-পলাশ-মহুয়ার রসে ডোবানো ডুরে শাড়ি-পরা কোনো সাঁওতাল-বউ মনে মনে গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে—

"………মাদল বাজে—

বাজে বুকের মাঝে লো—

মন লাগে না কাজে……….

কাজে মন লাগবার কথাও নয়। বছর ঘুরে নির্দিষ্ট দিনটি প্রায় এসে গেল যে! বৈশাখী-পূর্ণিমা! অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসব। ডিম-ডিম করে সাঁওতাল পল্লিতে মাদল বেজে ওঠে। বুকের ভেতর উথাল-পাথাল শুরু হয়। শিকার উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। মরচেপড়া অস্ত্র-শস্ত্রে টাঙ্গি-বল্লম-তির .ইত্যাদি শান দেওয়া হয়। মা-বোন-স্ত্রীরা তৈরি করে দেন ছাতু-মহুয়ার মোয়া (মহুললাঠা) ইত্যাদি। এইসব পথের খাবার।

—টা-টা-টা টাঙ্গিন টা...

প্রস্তুতি বাজনা বেজে ওঠে। সকলে সজ্জিত হয়ে শিকার করবার জন্য পা বাড়ায়।

গাড়দু-গাদুং—গাড়দু-গাদুং... সারা রাত চলে শিকার উৎসব। বিভিন্ন জেলা থেকেও হাজার হাজার সাঁওতালেরা এসে যোগদান করে।

এই জেলাকে 'দিশুম-সেন্দ্রা' বা যৌবন-মেলাও বলা হয়। এই মেলায় ছেলেরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কিছু আদিরসের চেতনা জাগাবার ব্যবস্থাও থাকে। অনেকের মতে এই দিনটি কিশোরদের যৌবন দীক্ষার দিন—জীবনের আদিমতম বর্ণপরিচয়। তাই এই মেলায় মেয়েদের যাওয়া নিষেধ।

এই বৈশাখী-পূর্ণিমা, বিশ্ববন্দিত অহিংস ধর্মের প্রচারক বুদ্ধদেবের জন্মদিন। তাই ওই দিন প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সাঁওতালি সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে আচার-বিচার, রীতিনীতি, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিচারও করা হয়।

বৈশাখের ১২ এবং ১৩ তারিখে "কেতন কি শিয়ারির মেলা"। আসলে এটি শিবের গাজন। তবে রাত্রের মেলা। অনেকে হয়ত 'মশাল' দেবার মানত করেন, তাই এই মেলায় প্রচুর মশাল দেখা যায়। আদ্রা-বাঁকুড়া রেলপথে "ইন্দ্রবিল" স্টেশন থেকে মাইল তিন-চার। ধামসা-লাগড়া-মাদল-বাঁশি সবে মিলে মেলা গমগম করে। ছো-নাচ, নাচনি-নাচের আসর বসে। এ্যাত্ত বাঁশি আর কোনো মেলায় দেখা যায় না। দেড় ফুটের আড়-বাঁশি মাৎ করে দেয়।

এই মেলা একপ্রকার চাষিদের মেলা। চাষের সবরকম সাজ-সরঞ্জাম (কাঠের এবং লোহার) এই মেলায় পাওয়া যায়। এখানে মুচিদের তৈরি দেশি চামড়ার জুতো পাওয়া যায় আর একটা বনফল পাওয়া যায়—কেঁদ পাকা। এ সময় হয়ত এই ফলের সময়। তাই প্রচুর 'কেঁদপাকা' আমদানি হয়।

"...কেতনকিরির, মেলা, দিদি— বড়রে, জমক' অথবা ".........কেতনকিরি গেলি দাদা কেঁদ পাকা কই?..." ইত্যাদি গানের কলি শোনা যায়।

এই বৈশাখেই পাড়া-থানার পাড়াতে ধর্মপুজো হয়। এই উপলক্ষে তিনদিনের মেলা হয়। এই ধরমপুজো সাধারণত কোনো ইচ্ছেপূরণ হলে গ্রামবাসী সকলে মিলে এই পুজোর আয়োজন করেন। বিভিন্ন আকৃতিতে জেলায় ধর্মরাজের মূর্তি দেখা যায়। ছড়ারায় ধর্ম ঠাকুরের স্থান আয়তাকার একটি ক্ষেত্র যাতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সাজানো। মানবাজারে পেতলের মর্তি আছে। শাঁখা গ্রামে ধর্মরাজ আছেন একটি বটবৃক্ষের নীচে— গাজন হয় বৈশাখে, তখন পাঁঠা বলিও হয়। বৈশাখে অন্যান্য পুজোগুলির মধ্যে ডোমদের কালুবীরের পুজোটিও উল্লেখযোগ্য। পুজো হয় জঙ্গলে।

বৈশাখে সারা মাস ধরেই মেলা এবং পরব লেগেই থাকে। বিশেষ করে গাজন উৎসব। বিশেষ করে গ্রামের শিব-মন্দির এলাকা। এবং এই উপলক্ষে মেলা এবং নাচ...ও হয়। এই জেলায় এইরকম গাজন মেলা বা উৎসব মোটামুটি প্রায় ১০৩টির খবর পাওয়া যায়। এরমধ্যে যেমন—১লা-২রা বৈশাখ—বড়গ্রাম, গোবিন্দপুর, কুড়মাশোল এবং বরো। ৩রা বৈশাখ—রঘুডি। ৪ঠা বৈশাখ—টুডুহলু। ৫ই বৈশাখ—চাটুমাদার, ভরতডি, নপাড়া। ৬ই বৈশাখ—পোঠাডি। ৭ই—মানিকডিহি, ম্যাটালা, রালিবেড়্যা। ৮ই ধবারডি, ডুমরাশোল। ৯ই সুরপা, বারি। ১০ই বগলুডি, গড়িং, শহরব্যেড়া, চাঁদাতরী এবং ক...ডি। ১১ই—বিষপুরিয়া, ডুমুরডি। ১২ই—বঙ্গাবাড়ী, নলডিহা, চিরুমাচা, পোঁচাড়া এবং জামবাদ। ১৩ই—কাঁটাডি, পলমা, বানসা। ১৪ই—লটপদা। ১৫ই—বালিগাড়া, টাটা...ি, গোপালনগর, কুড়ুকতোপা। ১৬ই—কদমপুর, ধানারাঙ্গি, ভেলাগড়া, ধারগাঁ, চিপিদা। ১৭-১৮ই—...ড়ুই, বুচা, ধাদকিডি, বেড়াদা। ১৯শে— কুদলুং, রায়বাঁধ, দামোদরপুর, ২০শে—ভাগাবাঁধ, কুমির, তুনাল, উজাড়া, বিজয়তি, জামগড়িয়া, বেলগাড়া, পানিপাথর এবং সানাড়া। ২১শে—মহেশপুর, ২২-২৩-২৪শে—বাঘাট্যাড়, হেবরলা, রনাইডি, হাতাকল এবং বাঁধবহাল। ২৫শে—কেশরগড়, টাঙ্গিদা, কমবেটোলা, কৈড়া, কেন্দা। ২৬-২৭-

২৮শে—দেলাং, জয়পুর, চাক্‌ড়া। ২৯শে—কোনাপাড়া, মাঠা। ৩০শে—আড়রা, খইপিড়াঁ, হরিহরপুর, রাঙ্গাট্যাড় এবং ধঠ-ডাঙ্গা। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন—গেঙ্গাড়া, কেতিকা, রাঙ্গামাটি এবং ভূতাম।

অতএব দেখা যাচ্ছে এই গাজন-মেলা প্রায় সারা মাস ধরে লেগেই আছে। তবে মেলা সব জায়গায় সমান হয় না। কোথাও লোকসমাগম বেশি কোথাও কম। মেলা বসে কোথাও দিনে আবার কোথাও রাত্রিতে।

দেউলিহারূপ (বাগমুণ্ডি)—এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে শিব পুজো হয় (এড়নাথ, নাংটি ঠাকুরানি)। একদিনের জন্য মেলা হয়। প্রচণ্ড ভিড় হয়। তা আনুমানিক হাজার চল্লিশ লোকসমাগম হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখে 'রহিন' উৎসব পালন করা হয়। এটি একটি কৃষিভিত্তিক পরব। এই অঞ্চলে ১লা মাঘ চাষিদের নববর্ষ। আখ্যান যাত্রা। ওই দিনে 'হালপূণ্যা' করা হয়। আর এই 'রহিন' দিনে 'বীজপূণ্যাহ' করা হয়—অর্থাৎ 'বীজপূজা'।

ভোরে ভোরেই গৃহস্থের মেয়েরা গোবরজল দিয়ে ঘর-দোর-উঠোন নিকিয়ে দিয়ে সুন্দর করে আলপনা আঁকেন। ঘরের বাইরের দেওয়ালে গোবরের বেড়ী (রেখা) আঁকা হয়। সেই রেখা ডিঙিয়ে কোন অশুভ শক্তি ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না—এটা বিশ্বাস। নতুন ঝুড়িতে ক্ষেত থেকে 'রহিনী-মাটি' আনার নিয়ম আছে। স্নান সেরে, ভিজে কাপড়ে, কারও সঙ্গে কথা না বলে এই মাটি এনে তুলসী মঞ্চে বা গোয়ালঘরে রাখা হয়। ধান ফেলবার সময় বীজের সঙ্গে ওই মাটি সামান্যভাবে মাখানো হয় এতে পোকা ধরে না। ওই দিন বীজ ফেলাও হয়—বীজপুণ্যাহ। এই 'ধুলো বতরে' বীজ ফেললে চারা পুষ্ট হয়, রোগ হয় না।

কিছু কিশোর ও শিশুরা ছেঁড়া-খুঁড়া কাপড় পরে, "কাপ" (সঙ) সাজে। নাচ-গান করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, পয়সা আদায় করে। যেমন—

কাপ নাচ নাচব না/না দিলে ত ছাড়ব না।।
একপুয়া চাল লিব/পেট না ভ্যরলে গ্যাল দিব।।

এই ছেলেমেয়েদের আনন্দে সবাই অংশগ্রহণ করে এবং গৃহস্থ ঘর থেকে কেউ কেউ চাল-পয়সা-গুড়-তরমুজ-খেজুরপাকা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। এইভাবে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। সেই সময় তারা তালপাতার বাঁশি (পেঁপটি) বাজায়। সকলেই 'রোহিন ফল' (আযাড়িফল) এক-এক টুকরো করে খায়। এই ফল বিযক্ষয়ী।

আষাঢ় মাসে পুজো-পার্বণ বা মেলা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে, বান্দোয়ানে রথ-যাত্রার মেলা হয় একদিন।

এরপর শ্রাবণে আছে মনসা পুজো, শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনে পুজো হয়। এখানে সাধারণত তিন রূপে পূজিত হন দেবী—প্রতিমা, বারিঘট্ ও সীজমনসার ডাল। শ্রাবণ সংক্রান্তির আগের রাত্রে 'জাগরণ'। সারারাত ধরেগো খাওয়া হয় 'জাত্‌গান' অর্থাৎ মনসা-মঙ্গল। মূল বিষয় হল বেহুলা-লখিন্দর এবং চাঁদ সওদাগর। যেমন—

"...চাই গুড়্ গুড়্ বাজনা বাজে

কন গাঁয়ের বর,

চাঁদ সওদাগরের বেটা

ভালাই লখিন্দর...”

পুজো অন্তে বলিদান—আখ, চালকুমড়ো, হাঁস এবং মানত থাকলে পাঁঠাও। কোথাও ১/২ দিনের জন্য ছোটোখাটো মেলাও বসে। যেমন—আড়ষা থানায় পলপল, বাগামুণ্ডি থানার বারডিয়া, বলরামপুর থানার রূপফাটা ও বেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় ‘ইঁদ’ পরব। বর্ষার দেবতা ইন্দ্র। ইঁদ পরব হল এই ইন্দ্রদেবতার আরাধনা। জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা হয়।

“...জয়পুরের রাসপূর্ণিমা বরাবাজারের ইঁদ রে

কাশীপুরের দুর্গাপূজা চাকোলতোড়ের ছাতারে...”

বরাবাজারে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এই ইঁদ পরব পালিত হয়। গ্রামের প্রান্তসীমায় মাঠের মধ্যে একটি শাল গাছ পোঁতা হয়। তার উপর ইন্দ্র দেবের উদ্দেশ্যে লাল কাপড় কিংবা লাল কাগজ দিয়ে একটি ছাতা বেঁধে দেওয়া হয়। ইঁদ পরব আসলে স্থানীয় রাজাদের আধিপত্য এবং প্রভুত্ব বিস্তারের একটি মাধ্যম।

ভাদ্র মাসের শেষ দিনটিতে অনুষ্ঠিত হয় ‘ছাতা’ পরব। পুরুলিয়ার, মফঃস্বল থানার চাকোলতোড়ের ছাতা মেলা বিখ্যাত। একরাত্রির মেলা। কিন্তু লোকে লোকারণ্য। বেশিরভাগই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ। পূর্বে এই সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের এই মেলায় প্রবেশ নিষেধ ছিল। আজকাল সেটা নেই। এই মেলায় বড় বড় ধামসা বিক্রি হয়।

এর সঙ্গে ‘ভাদু’ পরবের একটা সম্পর্ক আছে। জনশ্রুতি আছে যে, ভাদু বা ভদ্রাবতী ছিলেন পঞ্চকোটরাজ কাশিপুরের রাজবংশের মেয়ে। তিনি দেখতে অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। রাজার খুব আদরের মেয়ে ছিলেন। তিনি কুমারী অবস্থায় অকালে মারা যান। তাঁরই স্মরণে প্রতিমা তৈরি করে সারা মাস ধরে চলে ভাদু গান এবং সংক্রান্তির দিনে বিসর্জন দেওয়া হয়। ওই দিনই ছাতাহাট।

জনশ্রুতিটি কতদূর সত্য জানা নেই। তবে এই ‘ভাদু-পূজা’ বা ‘ছাতা মেলা’ পঞ্চকোটরাজের অধীন মৌজাতেই দেখা যায়। আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় বলে আমার জানা নেই।

আরও একটি কিংবদন্তি শোনা যায়। একসময় পঞ্চকোটরাজের সঙ্গে ছাত্‌নার রাজার কোনও কারণে যুদ্ধ বেধেছিল। সেই যুদ্ধে পঞ্চকোটরাজ জয়লাভ করেন। এই ‘ছাতা মেলা’ তারই বিজয়উৎসব।

সারা ভাদ্র মাস জুড়ে নানা পরব-উৎসব হয়ে থাকে। যেমন—জাওয়া, করম, ইঁদ, ভাদু, ছাতা পরব, কর্মকারদের বিশ্বকর্মা, সাঁওতালদের হাড়িয়ারসীম। মেয়েদের জিতা অষ্টমী মাথানিষষ্ঠীর ব্রত ইত্যাদি। এইসব পরবউৎসবের মধ্যে অধিকাংশই ‘কৃষিভিত্তিক’ বা ‘শস্যভিত্তিক’।

ভাদ্র মাসের একাদশী তিথিই হল করম তিথি। এখানে আদিবাসী সমাজের কৃষিসম্প্রদায় পালন করেন। কুমারী মেয়েরা ডালায় নদী থেকে বালি এনে, কুত্থি, ভুট্টা, মুগ্, ছোলা ইত্যাদি হলুদ মাখিয়ে, কুমারী মেয়েরা স্নান সেরে এই বীজ বপন করে। পুরোহিতের বাড়ির দরজায় করমডাল পোঁতা হয়। তার চারিদিকে ঘিরে, সব নাচ-গান করে।

"......উত্তরে বুনলম মাগো পশ্চিমে বুনলম গো—

পালম জাওয়া তৈরি হার......"।

করম ডালডি জলে ভাসিয়ে দেওয়ার সময়ও অতি দুঃখে গান করে—

"......কালরে করম গোঁসাই ঘরের দুয়ারে—

আজ রে করম গোঁসাই কাশ নদীর পারে।

কথায় বলে—ভাদ্র-আশ্বিন মাসে রাজার ভাঁড়ার খালি। অর্থাৎ এসময় খুব টানের সময়—স্বচ্ছলতা থাকে না। তখন ফসল উঠতে দেরি। ঘরে যা-কিছু ছিল চাষ-খরচা হয়ে গেছে। তবুও এদের প্রেরণা দেখে আশ্চর্য লাগে। তবে এ সময় কিছু বিকল্প খাবার হয়, তার মধ্যে 'জনার' (ভুট্টা) অন্যতম। তাই বলে—

"......ভাদর মাসে গাজর লাল টুপায় খাব

আর কি ছ্যালা জনম পাব?

এরপর আশ্বিনে দুর্গাপূজা—এতো সার্বজনীন। তবে জেলার মধ্যে কাশিপুরের দুর্গাপূজা বিখ্যাত। কারণ কাশিপুরের রাজার আমলে দারুণ আড়ম্বতে পালিত হত এবং সেই থেকেই কথাটা চলে আসছে।

কার্তিক মাসে অমাবস্যার রাত্রে হয় কালীপুজো। এই পুজো বিশেষভাবে অল্পবিস্তর সব জায়গাতেই দেখা যায়। তবে, আড়ষার উলুগড়িয়া, বান্দোয়ানে করালীক্ষেত্রে এবং ঘাঘরজুড়িতে বেশ জাঁকজমক হয়। জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ কালীপুজো হয় বাঁধামৌতড়ে। অজস্র পাঁঠাবলি হয় এমনকী মোষবলিও হয়।

এই কার্তিক মাসেই বেগুনকোদর (ঝালদা) এবং পুরুলিয়া শহরে রাসযাত্রা উপলক্ষে বেশ বড় আকারে রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌষ মাসে হয় টুসু উৎসব এবং সংক্রান্তি দিনে মকর। এই দিনটির জন্য সকলে সারা মাস ধরে প্রস্তুতি এবং অপেক্ষা করে থাকে।

"......আসছে মকর দুদিন সবুর কর

তুরা পিঠা-মুড়ির যোগাড় কর...... ।"

এই টুসু উৎসবকে এখানের "জাতীয় উৎসব"ও বলা চলে। খুবই জনপ্রিয় উৎসব। কেউ কেউ বলেন—পৌষালী বিজয়া।

ধানের তুষ দিয়ে টুসু পাতা হয়। একটি নতুন সরা নিয়ে গুঁড়িগোলা জলে গাবানো হয়। পাঁচটি বা সাতটি সিঁদুরের লম্বা দাগ টানা হয়। কাড়ুলী বাছুরের গোবরের গুলি রাখা হয়। আকন্দ ও গাঁদা ফুলের মালাও রাখা হয়। পরিষ্কার ঘরে বা চালায় পিঁড়ির উপর রেখে টুসু-বন্দনা চলে। প্রতিদিন সন্ধের পর প্রদীপ জ্বালিয়ে, ফুল দিয়ে পুজো করা হয় সরাটিকে। নারী-জীবনের গোপন অব্যক্ত কামনা-বাসনা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ, চলমান জীবনের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ সবই গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। নিজের আসন ছেড়ে টুসু তখন নেমে এসে যেন সব সখীদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। আর উপস্থিত সব মেয়েরাই যেন এক-একটি টুসু হয়ে উঠেন।

টুসু উৎসবের প্রাণশক্তি টুসু সঙ্গীতে। জনসাধারণের সুখ-দুঃখ-কল্পনা-অভিজ্ঞতা এবং

সৃজনশীল ক্ষমতা ওই গানগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয়। তখন যেন সমস্ত ভূখণ্ড টুসু গানে উঠছে আর বসছে। এ্যাত্ত গান, এ্যাত্ত আনন্দ, এ্যাত্ত প্রেরণা আর প্রাণের স্পন্দন—এরা পায় কোত্থেকে? ভাবতে অবাক লাগে। যত দুঃখকষ্ট হোক না কেন এই পরবে উৎসব হবেই—তা গানের মধ্যেও ধরা পড়েছে—

"......আকাল বছর আইল ঝড়
উড়াই দিল চালের খড়
খুদ-কুঁড়া ফুঁকে গেল ভঁড়রে
তাও পিঠা হবেক মকরে।......"

আবার দেশে আকাল-বছরে অন্তরের, বেদনা-মথিত নির্যাস যেন ফোঁটা ফোঁটা করে চুইয়ে পড়লো—

"......চল টুসু চল লঙ্গরখানা
খাইতে যাব খিঁচুড়ি......।"

সারা পৌষ মাস উঠতে বসতে টুসু গান। আঁধারে আলোর রেখার মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যখন ফুলন আনসারি, বুধু মাহাতো এবং রঘু বাউরিদের মত কিছু মানুষ দলবল সহ গান ধরে—

"......ই বছর গো ভালই ফলন
সুখের হবেক চলন-বলন
কাশ্মীর যুদ্ধ আমরা নাই চাই
দেশের রক্ষায় আমরা সবাই
একসাথে তাই টুসু গান গাই......।"

এই জেলা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির সময় একটি ঐতিহাসিক টুসু আন্দোলন হয়েছিল। সেই সময় কিছু রাজনৈতিক গানও শোনা গিয়েছিল—

"......তোরা রাখতে লারবি ডাং দেখাঁই
শুন বিহারী ভাই......"

জেলায় উল্লেখযোগ্য টুসু মেলা হয়—আড়ষা-দেউলঘাটা, বান্দোয়ান, বড়গ্রাম (ছড়া) তুলিন (ঝালদা) আনাই ইত্যাদি। তাছাড়া প্রতিটি নদী/জোড়/পুকুর ধারে ছোট ছোট মেলা বসে।

সংক্রান্তির আগের রাত্রে পিঠে-পরব। ঘরে ঘরে নানা প্রকারের পিঠে হয়। পরের দিন টুসু ভাষাণ। টুসুকে চৌডলে চাপিয়ে গান করতে করতে মেয়েদের মিছিল চলে নদী-জোড়-পুকুরের দিকে। কাঁদতে কাঁদতে সাধের টুসুধনকে জলে বিসর্জন দেয়। তখন চোখের জল সামলানো যায় না।

"......আমার পরাণ জ্বলে গো অন্তর জ্বলে—
সাধের টুসুধনকে কি কইরে দিব জলে......"

এই জ্বলন কে নেভাবে? কে নেভাবে তাদের বুকের আগুন আর মনের ব্যথা?

মকর সংক্রান্তির দিন থেকে 'ভানসিং' পরব শুরু হয়, চলে সারা মাস। জেলার মধ্যে

মানবাজার এবং পুঞ্চাতেই বেশি জনপ্রিয়তা দেখা যায়। কোনো মূর্তি থাকে না—খোলা মাঠেই পুজো হয়। ভানসিং একটি জাগ্রত দেবতা! তাঁকে তুষ্ট রাখলে গৃহপালিত প্রাণি নিরাপদে থাকবে বলে বিশ্বাস।

মাঘ মাসে জারগো (ঝালদা) শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ'র তিনদিন মেলা এবং উৎসব হয়। পাট-ঝালদায় তিনদিন 'সত্যমেলা' অনুষ্ঠিত হয়। হুটমুড়া পঞ্চায়েতের অধীন চাঁচড়া গ্রামে ৩/৪ দিনের চণ্ডিমেলা হয়। এছাড়া বান্দেয়ান থানার চিল্লা, সাঁতুড়ী থানার দণ্ডহিত। পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া এবং গোলামারাতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আরো-আসানসোল রেলপথে ছোট্ট স্টেশন—বেড়ো। জেলার সব থেকে বৃহৎ এবং প্রাচীন মেলা এখানেই হয়।

"......কাঁখে ছ্যালা কাঁধে ছ্যালা
আমরা যাব চণ্ডি মেলা......"

পথ-চলতি লোকের দৃশ্য। মাঠ-ঘাট-ডাঙা-ডহর যেন হাজার হাজার পথ—কেবল মানুষ আর মানুষ। এই কয়দিন এখানের স্থানীয় লোকের ভাবনা-চিন্তা কেবল মেলা আর মেলা। এ সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—

......চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর,
এখ্যান, ছেঁছান, ঘেঘান,
ছ্যালা কাচড়া, টুসি-ঝাড়া,
রাই রুঁই, সাঁই সুঁই
তার বিহানে আসবি তুঁই......"

এটি একটি খাতকের উক্তি। মহাজন ঘরে এসেছে পাওনাগণ্ডা আদায় করতে তাগাদায়। খাতক বলছে এই কয়দিন সে খুবই ব্যস্ত। অতএব সব শেষ হয়ে গেলে পরের দিন সকালে যেন সে আসে। প্রবাদটিতে দশ দিনের মত ব্যস্ততার কথা বলা হয়েছে। এখন সহজেই বুঝতে পারা যায়—স্থানীয় লোকেরা কীভাবে ব্যস্ত থাকে।

ফাল্গুন মাসে কাশিপুরের সোনাথলিতে একটি চারদিনের জন্য দোলযাত্রার মেলা হয়।

মূলত গ্রামের শিবমন্দির এলাকায় চৈত্র মাসে চড়ক পূজা এবং গাজন উৎসব হয়। সারা জেলায় এই গাজন উৎসব ১০৩টি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। আনাড়ার গাজন মেলা, উলুগড়িয়া (আড়ষা) বান্দোয়ান, তুলিন, জারগো (ঝালদা) ছড়রা, কোশজুড়ি, পঞ্চকোট (নেতুরিয়া) বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এ ছাড়াও কয়েকটি মেলা আছে। যেমন—পুরুলিয়ার গো-মেলা। পুরুলিয়ার গোশালা মোড়ে গোপা অষ্টমীতে দুইদিনের মেলা হয়। চাকদাতে একদিনের জন্য 'সতীমেলা' হয়। মাঘ মাসের পাঁচ তারিখে মোহনপুরে কেঁদুলী মেলা হয়। রাজনোয়াগড়ে সাতদিনের জন্য 'শবর মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা জনজীবনের মিলনক্ষেত্র।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উৎসবের মধ্যে সহরায়, বাহা, দাঁশা এবং কারাম এই চারিটি মঙ্গল উৎসব। 'বাহা' পার না হলে মেয়েরা কেউ শাল-ফুল খোঁপায় দেয় না। মহুয়া কেউ খায় না। এই

উৎসবে 'শাল' ফুলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। একে "শারহুল" উৎসবও বলা হয়। এই পরব তিনদিন পালন করা হয়।

এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে—সহরায় বা বাঁধনা। এটি ধন-জন-ফসল-গাই-গরু ইত্যাদির বৃদ্ধি কামনারই একটি লৌকিক উৎসব। এর কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখ নেই। বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন সময়ে হয়। এটি পাঁচদিন পাঁচ রাতের উৎসব। এই পরবে 'হাঁড়িয়া' অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। তারা যে কেবল নিজেরা খায় তা নয়—এই দিয়ে তাদের আরাধ্য দেবতাকেও হাঁড়িয়া দিয়ে পুজো করা হয়। এই পাঁচ দিন পাঁচ রাত সকলে যেন স্বাধীনভাবে আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেজন্য মোড়ল 'ছাড়' ঘোষণা করেন। তবে কোনো প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ থাকে না।

জামাই বাঁদনা, গরু বাঁদনা, কাড়াখুঁটা, গরুখুঁটা, ইত্যাদি কয়েকটি অনুষ্ঠান এই পরবেরই অঙ্গ।

এ ছাড়াও ভেজা-বিঁধা, মাঘ সীম, ইত্যাদি কয়েকটি আরও পরব আছে।

বর্তমানে রাজনৈতিক দলাদলি ও মতভেদের ফলে গ্রামের সহজ-সরল-অনাবিল ভ্রাতৃত্ববোধ বা সম্পর্ক যেন কিছুটা ভাটা পড়েছে। এ বিষয়ে বিকল্প কিছু পথের সন্ধান যদি চিন্তাবিদরা বার করতে পারেন নিঃসন্দেহে গ্রাম্য-জীবনের মঙ্গল হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। পুরুলিয়া - শ্রী তরুণদেব ভট্টাচার্য্য।

২। একনজরে পুরুলিয়া - শ্রী শ্রমিক সেন।

৩। আমাদের পুরুলিয়া - শ্রী অমিয়কুমার সেনগুপ্ত।

৪। জেলার নাম পুরুলিয়া - শ্রী লীলাময় মুখোপাধ্যায়।

৫। মানভূমের লোকনৃত্য - সম্পাদক শ্রী সুভাষ রায়

৬। পুরুলিয়ার মেলা - সিরাজুল হক।



‘অভাগিনি নাচনি : না শিল্পী না ঘরনি’

তৃপ্তি বিশ্বাস

পুরুলিয়া জেলা ও তার আশপাশের অঞ্চলের নাচ ও বাজনা সহযোগে ঝুমুরসংগীত পরিবেশন করেন এক শ্রেণির নর্তকী। স্থানীয় মানুষজন এঁদের বলেন নাচনি। গ্রামীণ বিনোদনের জন্য নাচনিনাচের আসর বসে এলাকার বিভিন্ন মেলায় ও পালাপার্বণে।

নাচগানে পটু এক ধরনের মেয়েদের নিয়ে শুরু হয়েছিল নাচনিপ্রথা। আগেকার দিনে বহু-বিবাহের চল ছিল সমাজে। পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেইসঙ্গে বেশ কিছু রক্ষিতা বা রাখ্‌নি থাকলে খাতির পাওয়া যেত সমাজে। দিনরাতের যে কোনো উৎসবে নাচগান চলত রাখ্‌নি মেয়েদের নিয়ে। এই অঞ্চলে ঝুমুর গানের বেশ কদর। ঝুমুর গানের সঙ্গে নাচ। আর নাচ হলে তো বাজনদার লাগবেই। খোলা জায়গায় খোলামেলা পরিবেশে রাখ্‌নি মেয়েদের নিয়ে টানাটানি শুরু হত পুরুষদের মধ্যে। আমন্ত্রিত অতিথিরাও শক্তি-সামর্থে কম কীসে! রাখ্‌নিরা তো তেমন নাচগান জানতেন না। হই-হুল্লোড় লেগেই থাকত। রাখ্‌নি মেয়েদের নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়ায় মাথা ফাটাফাটি ছিল জলভাত।

তখনই মনে হল নাচগান শেখা মেয়ে হলে এই জাতীয় বিনোদন জমবে ভালো।

অল্পবয়সি মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বা টাকা-পয়সার বিনিময়ে জোগাড় করা শুরু হয়ে গেল। ছোটো-খাটো জমিদার, সর্দার বা মান্‌কি রাজা, এককথায় সমাজের পয়সাওয়ালা পুরুষেরা আমোদ-প্রমোদের জন্য ওইসব মেয়েদের নাচগান শিখিয়ে নাচনি তৈরি করলেন। চালু হয়ে গেল নাচনিপ্রথা।

বহুবিবাহ বেআইনি হওয়ায় এখন একটিই স্ত্রী। ইনি হলেন কুলের বউ। নাচগানে উৎসাহী পুরুষটিকে বলা হয় রসিক। নাচনিরা বলেন মালিক। স্বামীও বলেন। শাঁখা সিঁদুরে নাচনিরা এয়োস্ত্রী। কিন্তু এর কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই।

সেকালে হত নাচনিলুঠ। শক্তিমান পুরুষেরা লাঠিয়াল লাগিয়ে লুঠ করতেন নাচনি! সে বড় পৌরুষের কাজ। এখন চলে নাচনিছাড়ানো। একজনের নাচনি ছাড়িয়ে নেয় আরেক রসিক। পুরুষের রক্তমাংসের সম্পত্তি হলেন নাচনি।

রসিকের কুলের বউ বংশরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। আখড়ায় নাচগান পরিবেশন করেন নাচনি। নাচনির শ্রমেই চলে রসিকের সামাজিক সংসার। হাতুড়ে ডাক্তার-বদ্যিকে দিয়ে নাচনিকে

বন্ধ্যা করে দেওয়াই নিয়ম। প্রাথমিক অসাবধানতায় নাচনির কোনো সন্তান হলে, সেই সন্তান রসিকের সংসারে নাচনির মতোই অচ্ছুৎ। নাচনির জন্য আলাদা ঘর। আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। রসিক ছাড়া কেউ তার ছায়া মাড়ায় না। কুলের বউয়ের হেঁশেল বা বাসনকোসন ছুঁতে পারেন না নাচনি। নাচনির বাপের বাড়ির লোকজন নাচনিকে দেখলে বলেন না-চিনি। যৌবনের সোনালি দিনগুলো কাটে রসিক বা মালিকের সেবায়। নাচগানে অক্ষম হলে ভিক্ষেই প্রধান সম্বল। নাচনির মৃতদেহ পোড়ানো হয় না। ফেলে দেওয়া হয় পাহাড়ের ফাটলে বা ভাগাড়ে।

নাচনিরা লেখাপড়া জানেন না। যদিও এঁদের কেউ কেউ স্কুলে পড়েছেন ছোটবেলায়। নাচনি পোস্তবালা এরকমই একজন। পোস্তবালার মাটির ঘর। চৌকাঠে মাটির সঙ্গে ভাঙা কাঁচের টুকরো মিশিয়ে দেওয়ায় সুন্দর। লেখাপড়ার কথা বলতে অনাবিল হাসি ফুটে ওঠে পোস্তর মুখে, ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে।

লেখাপড়া না জানলেও এঁদের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। কত গান যে মুখস্থ এঁদের। আখড়ায় সিংগ্‌ল রিডের হারমোনিয়াম নিয়ে গানের প্রথম কলিটি ধরিয়ে দেন গায়ক। সংগতে থাকেন অন্য বাজনদার।

বাজনদারদের বলা হয় 'সুরপার্টি'। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবলা মাদল বাঁশি ফ্লুট করতাল ম্যারাকাস, কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে সিনথেসাইজারও উঠে আসছে গ্রামীণ আখড়ায়।

আখড়াটি কেমন? একটা সমতল উচুঁ মাটির ঢিবি। আয়তন নির্দিষ্ট নয়। ওই ঢিবিটিই মঞ্চ বা আখড়া। মঞ্চের ওপর কোথাও ত্রিপল কোথাও বা কোনো পাতলা আচ্ছাদন। চারদিকে বসেন দর্শকশ্রোতা। জেনারেটর চালিয়ে আলো আর মাইকের ব্যবস্থা করা হয়।

নাচনিদের 'বাই' বলা হচ্ছে আজকাল। নাচনিনাচ হয়ে গেছে বাইনাচ। নাচনিনাচের ঝুমুরগান ছিল 'নাচনিশালিয়া'। এখন হয়েছে 'বাইশালিয়া'।

নাচনি থেকে বাই: একী উত্তরণ? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে এই শব্দবদলে!

ঝুমুর গান ও নাচনিনাচের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই অঞ্চলের রাজা ও জমিদার। রাজবাড়িতে শহর থেকে আসতেন বাইজি এবং গ্রামের হাট থেকে আসতেন নাচনি। রাজদরবারে নাচগানের আসরে বাইজিদের কেতাদুরস্ত নাচগানের পাশাপাশি গ্রামীণ নাচনিদের নাচগান চলত।

এই প্রসঙ্গে নাচনি সিন্ধুবালা দেবীর নাম বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার লালন পুরস্কার পেয়েছেন এই শিল্পী। লোকসংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত হয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির পক্ষ থেকে। ২০০৩-এর ১৬ এপ্রিল রবীন্দ্রভারতীর লোকশিল্প মেলায় ঝুমুর গাইতে এসেছিলেন এই শিল্পী। মহাশ্বেতা দেবী দেখা করেন শিল্পীর সঙ্গে।

সিন্ধুবালা দেবী কাশীপুর রাজার ডাকে দরবারি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন বাইজিদের সঙ্গে। সিন্ধুবালা দেবীর কেন্দরির বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখা করতে। পুরুলিয়া জেলার অনেকেই নাচনিশিল্পের পাঠ নিয়েছেন সিন্ধুবালার কাছে। এঁদের মধ্যে আছেন মাঝিহিড়ার প্রবীণ নাচনি গীতারানি এবং মাঝেরডি-শালবনির নবীন নাচনি তারা। সিন্ধুবালাও নিজেকে বাই বলেন। বাইজিদের চোখধাঁধানো চটক অবশ্যই ছাপ ফেলেছে তাঁর নাচনিজীবনে। বাইজি প্রভাবেই নাচনিনাচ এখন বাইনাচ।

সিন্ধুবালার শিল্পীজীবনকে সম্মান দিয়েছেন পুরুলিয়ার মানুষ এবং দেশের সরকার।

২০০৩-এর পুরুলিয়া বইমেলায় রেডক্রশ সোসাইটির তরফে তিন হাজার টাকা, একটি শাল, একটি শাড়ি, ফলমূল ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক শ্রীদেবপ্রসাদ জানা। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা।

নাচনি বা বাই যে নামেই ডাকা হোক এঁদের সামাজিক অবস্থানের বড় একটা হেরফের হয় নি।

সিন্ধুবালা দেবীর বয়স এখন নব্বই পেরিয়েছে। সাত বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বিধবা হন নয় বছরে। আড়কাঠিদের নজরে পড়ে বালিকা। দুজন মহিলা আড়কাঠি সিন্ধুবালাকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। সিন্ধুবালার দুই ভুরুর মাঝখানে উলকি আঁকা। খুঁত হয়ে গেল শরীরে। মেলার মাঝখানে বালিকাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল আড়কাঠি মহিলা দুটি। এক মাতব্বর সর্দারের বাড়িতে ঠাঁই হল বালিকার। এক মেলায় মহেশ্বর মাহাতোর চোখে পড়ল বালিকাটি। লোকজন দিয়ে মুখে কাপড় গুঁজে লুঠ করা হল সিন্ধুবালাকে। মহেশ্বর মাহাতোই সিন্ধুবালার রসিক মালিক ও স্বামী।

সিন্ধুবালার কাহিনি থেকে অন্য মেয়েদের নাচনি হওয়ার খানিকটা আন্দাজ পেয়ে যাই।

নাচনি প্রথার সঙ্গে দেবদাসীপ্রথার মিল নেই। দেবদাসীপ্রথার উৎসে আছে মন্দির ও দেবতা। নাচনিপ্রথার মূলে পুরুষের ভোগলালসা। মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত পুরুষদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন দেবদাসীরা। নাচনির দায় নাচগানের প্রতি। এই শিল্পে দক্ষতা অর্জন করতে হয় তাঁকে। সেইদিক থেকে নাচনি শিল্পদাসী। তবুও শিল্পীর মর্যাদা জোটে না তাঁর কপালে।

ঝাড়খণ্ডের রাজঘরসঁওয়াতে ঝুমুর নাচগানের স্কুল চালান আশি বছর পার করা বাউরিবন্ধু মাহাতো। সন্তান লাভের জন্য একের পর এক বিয়ে করতে হয়েছে তাঁকে। শেষে এক মেয়ে ও এক ছেলে উপহার পেয়েছেন তাঁর বর্তমান নাচনি মালাবতীর কাছ থেকে। বাউরিবন্ধু রসিকজীবন শুরু করেছিলেন আদরমণি নামে একটি মেয়েকে নাচনি করে। এখন মালাবতীই তাঁর একমাত্র নাচনি। মালাবতীকে তিনি স্ত্রীর অধিকার দিয়েছেন। নাচনি ও তাঁর সন্তানদের অস্পৃশ্য মনে করেন না তিনি। মালাবতী লেখাপড়া জানেন। আকাশবাণী কটকের শিল্পী। কুড়িটি ভাষায় গান গাইতে পারেন। শরীরে চটক নেই। বাউরিবন্ধু বলেন, শিল্প আছে।

প্রবীণ নাচনিদের মধ্যে রাজবালা ঘর করেন তাঁর রসিক কার্তিক তন্তুবায়ের সঙ্গে। বিমলা বেঁচে আছেন তাঁর প্রয়াত রসিক রঘুনন্দন কুমারের স্মৃতি নিয়ে। আবার জ্যোৎস্নার রসিক বিকাশের জন্য কুলের বউ খুঁজছেন সিন্ধুবালা দেবী আর মহেশ্বর মাহাতোর ভাইপো বিকাশের বাবা হৃষিকেশ মাহাতো। এই হৃষিকেশ মাহাতোর কাছেই থাকেন সিন্ধুবালা দেবী।

রাজবালা বিমলা বা এঁদের মতো কয়েকজন ব্যতিক্রম মাত্র।

আসলে নাচনিরা সামাজিক নজরে অশুচি। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না এঁরা। যদিও বড়লোকদের নানান অনুষ্ঠানে নাচনিনাচ হয়। কে কতজন নাচনি নাচাতে পারেন তাই দিয়ে সমাজে তাঁর মর্যাদা বিচার হয়। নাচনি রাখাও কম গৌরবের নয়। এখানে বলা হয় নাচনি পোষা।

বর্ষার নাচনিনাচ বন্ধ। রসিকের খেতখামারে কাজ করেন নাচনি। শরীর খারাপ হলে নাচনির চিকিৎসা করাতে ভুলে যান রসিক। আবার নাচনি পুষে সর্বস্বান্ত হবার ঘটনাও আছে।

চৈতন্যদেব মথুরা যাবার সময় এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ফলে ঝুমুর গানে রাধাকৃষ্ণ লীলা স্থান পেয়ে যায়। নাচনিরা আসর শুরু করেন এ ধরনের গান দিয়ে।

রাত দশটা নাগাদ আসর শুরু হয়। সারাদিনের খাটাখাটনির পর আসরে আসেন দর্শকশ্রোতা। এদের মজিয়ে রাখতে পারাটা বড় কঠিন। নাচনিনাচে কত্থকের আঙ্গিক দেখা যায়। এই আঙ্গিকের মধ্যেই নাচনিরা যৌনরসাত্মক ভঙ্গি দিয়ে দর্শক শ্রোতাকে জাগিয়ে রাখেন। সেই সঙ্গে তাদের গলায় উঠে আসে যৌন আবেদনে ভরা ঝুমুর গান।

নাচনিজীবন থেকে শিল্পের আড়ালে। মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো কিছু করার নেই। রসিকপুরুষ মনে করেন মারধর না করলে নাচনি বেচাল হয়ে পড়বে। অত্যাচার এড়াতে এক রসিক ছেড়ে অন্য রসিকদের কাছে পালিয়ে যেতে পারেন নাচনি। কিন্তু সেখানেও যে সুখ মিলবে তা কি কেউ বলতে পারবে!

কি শীত, কি গ্রীষ্ম, ঝলমলে পোশাকে চড়া মেক আপে শরীর নিংড়ে নাচগান করতে হয় নাচনিদের। আখড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁদের লক্ষ রাখতে হয় আসরের দিকে। দর্শকশ্রোতার মতিগতি বুঝে চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলতে হয় যৌন আহ্বান। যতক্ষণ আখড়ায় ততক্ষণ নাচনি শিল্পী। বলছি বটে, আখড়ায় থাকলেও দর্শকশ্রোতার চিমটি থেকে রেহাই পান না। যদিও পুরস্কার দেবার অছিলায় নাচনি শরীরের নরম অংশে সেফটিপিন ফুটিয়ে টাকা গুঁজে দেওয়ার কৌশল উঠে গেছে এখন।

নাচনিপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে। এই অঞ্চলের মানুষজনই পারেন এই প্রথার পরিবর্তন করতে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটা সবচেয়ে জরুরি। লেখাপড়া শিখলে নিজের জীবনের কিছুটা তো বুঝতে পারবে মেয়েরা। এখন যেমন নাচনিজীবন সম্পর্কে কোনো দুঃখপ্রকাশ করেন নি নাচনিদের কেউ। কিন্তু কোনো নাচনিই তাঁর মেয়ের নাচনিজীবন পছন্দ করেন না।

এই মুহূর্তে ঝুমুরশিল্পী হিসেবে নাচনিদের স্বীকৃতি দিতে আটকাচ্ছে কোথায়? সরকারি উদ্যোগে এঁদের অনুষ্ঠানে ডাকায় কোনো অসুবিধে নেই। হয়তো গ্রামীণ আখড়ায় নাচনিরা যতটা স্বচ্ছন্দ সাজানো মঞ্চে ততটা নয়। এই কারণে এঁদের বুঝতে গেলে নাগরিক দৃষ্টি ছাড়তে হবে। গ্রামীণ মন নিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।



পুরুলিয়া জেলার লোকগীত

বংশীধর কুমার

আমি তর গীতে কি আশ করি,
বাড়ির নামই গীতের চাষ করি।

গীত ও গান ছিল মানভূমের প্রাণ। মানভূম যেন গানভূম। এখানে চললেই নাচ, বললেই গান। সাঁওতালি ভাষায় গড়ে উঠেছে প্রবাদ—'রাঁড় আতে রড়গে সেরেঞ।' সুরে কথা বলাই গীত। সেই মানভূমেরই অঙ্গজাত জেলা পুরুলিয়া। তাই পুরুলিয়া জেলার লোকগানের আলোচনাকে শুধুমাত্র এই জেলার বর্তমান রাজনৈতিক সীমারেখা দিয়ে আবদ্ধ করা যায় না। এই জেলার লোকগীতের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে গেলে যে বিশাল পরিমণ্ডলে তার উদ্ভব, বিকাশ ও সঞ্চার সেই পরিমণ্ডলটাকে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। এ অঞ্চলের লোকগানের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায়। তাই এখানকার লোকগীতের ভাণ্ডারটি বিশাল, বৈচিত্রময় ও লোকায়ত জীবনের নানা দিকে পরিব্যাপ্ত। এ অঞ্চলের লোকগীতের অনন্যতা এখানেই যে এ অঞ্চলে প্রচলিত গানগুলিতে লোকগীতের আদিমতম রূপটিকে যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনই সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে কারণেই এ অঞ্চলের লোকগানগুলিতে লোকসাহিত্যের একজন গবেষক যেমন সাহিত্যের উপাদান খুঁজে পান, তেমনই নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরাও নানা উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন।

পুরুলিয়ার লোকগানের পরিমণ্ডল ঃ প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে এ জেলার লোকগানকে এ জেলার বর্তমান রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে সীমায়িত করা যায় না। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ধানবাদ, বোকারো, রাঁচি, পূর্ব সিংভূম এবং জামশেদপুর সহ সাবেক মানভূমের ৪,১৪৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই পরিমণ্ডলটির বিস্তার। তবে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা যেহেতু এ অঞ্চলের গোটা সাংস্কৃতিক মণ্ডলের মধ্যবিন্দু তাই এই জেলাতেই লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষতা বেশি। লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা বেশি ঘটেছে।

লোকগানের উদ্ভব, ঋতুবিভাজন ও উর্বরতা তত্ত্ব ঃ সৃষ্টির আদিমতম সন্তান মানুষ। সে যখন অসহায়, অনিশ্চিত তার অস্তিত্ব, ঝড়ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, প্লাবন, বজ্রপাত, আগ্নেয় উদগীরণ,

অগ্নিকাণ্ড ও ভূ-কম্পনের কার্যকারণ নির্ণয়ে অক্ষম, সেই যুগে প্রাকৃতিক ঘটনার অলৌকিকত্বে সে বিস্মিত হয়েছে, ভীত হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার উপায় খুঁজে বেড়িয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে শান্ত করতে চেয়েছে। মানবসমাজের সহায়ক করতে চেয়েছে। সমস্ত প্রাণী ও প্রকৃতিতে আত্মার সক্রিয় উপস্থিতি অনুভব করেছে। বুরু, পাহাড়, নদী, বৃক্ষলতা, সরীসৃপ ও বিভিন্ন জীবজন্তুর পূজাচার প্রচলন করেছে। শিকারের যুগে এঁকেছে শিকারের কল্পিত চিত্র। শিকারে যাবার প্রাক্কালে শিকার নিশ্চিত করতে শিকারের অনুকরণেই মাটিতে জন্তুর চিত্র অঙ্কন করে বল্লম বিদ্ধ করেছে। কৃষির যুগে বৃষ্টির জন্য ও অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে নৃত্যগীতে ফসলের জন্ম বৃদ্ধি, রোপণ ও কর্তনের অনুকরণে বিভিন্ন মুদ্রা ও অঙ্গভঙ্গির সূচনা করেছে। অনুকরণ করেছে মেঘের সঞ্চরণ ও ধারাপাতকে। সমস্ত প্রকৃতিকে। পাতার মর্মর, নদীর কল্লোল, পাখির কূজন, হরিণের চকিতচঞ্চল পদবিক্ষেপ, সিংহের রাজকীয় পদচারণা, গজ গমনের গম্ভীর ছন্দ, হাওয়ায় সবুজ শস্যের হিল্লোল সব কিছুকেই আত্মস্থ করেছে। এভাবেই উদ্ভূত হয়েছে আদিম গীত-গান, নৃত্য বাদ্য ও চিত্রাঙ্কন। লোকজীবনের আনন্দের খোরাক, প্রাণপ্রাচুর্য। তবু আদিম ভাবনায় প্রয়োজন কেন্দ্রিক। সভ্যতার আদিযুগে এগুলির সঙ্গে মানুষের আদিম বিশ্বাস, সংস্কার ও ধর্মাচার যুক্ত থাকলেও কালক্রমে এগুলি আচার মুক্ত হয়ে স্বতস্ফূর্ত লোকশিল্পের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পুরুলিয়া জেলার লোকগানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে লোকগানের উদ্ভব ও বিকাশের এই ধারাটিকে সুস্পষ্ট ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

পুরুলিয়া তথা সাবেক মানভূমে ঋতুভিত্তিক লোকগানের প্রচলন দেখা যায়। এই বিভাজনের পশ্চাতে ছিল তাদের আদিম কৃষি ভাবনা। বিভিন্ন ঋতুর ফসলের সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন প্রকার লোকগানের উদ্ভব ঘটেছিল। এক ঋতুর গান অন্য ঋতুতে গাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। সফল অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি, পুষ্টি, উৎপাদনের সফলতা ও মাটির উর্বরতা কামনা করে তারা বিভিন্ন প্রকার পর্ব বা কৃষি উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। প্রচলন করেছিলেন পর্বভিত্তিক নাচগানেরও। সুতরাং পুরুলিয়ার লোকগানগুলিকে ঋতুভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক এই দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। পুরুলিয়া তথা মানভূমের লোকগানকে ঘিরে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আদিম কৃষিজীবী মানুষ বছরকে দুটি ঋতুতে ভাগ করেছিল জানা যায়। একটি ফসলের ঋতু ও অন্যটি ফসল শূন্যতার ঋতু। ফসলের ঋতুটি ১৩ জ্যৈষ্ঠ মানভূমে অদ্যাবধি প্রচলিত বীজ বপনের প্রারম্ভিক দিন থেকে ফসল কাটার সময় পর্যন্ত ব্যাপ্ত। পৌষ সংক্রান্তি অর্থাৎ পুরুলিয়ার বিখ্যাত টুসু বিসর্জনের দিন এই ঋতুর পরিসমাপ্তি। পরদিন অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম তারিখ থেকে ফসল শূন্যতার ঋতুর আরম্ভ। ১২ জ্যৈষ্ঠ পুরুলিয়ার রহনি উৎসবের আগের দিন পর্যন্ত এই ঋতু চলে।

ঋতুভিত্তিক গীত-কবি ও উধআ ঃ ফসলের ঋতুর গীত কবি গীত। এই গীত যৌথসঙ্গীত। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ধানের চারা লাগাতে লাগাতে কৃষকবধূরা সমবেত কণ্ঠে কবি গীত গায়। এ গীত মাঠের গীত। ঘরে গাইতে নেই। অন্য ঋতুতে গাইতে নেই। এ গীত অশ্লীল, নিরাবরণ। অবাধ যৌনতা ফুটে ওঠে ভাবে ও ভাষায় :

কবিগীত : ১। ইস্টিশেনের লাল লৈটা হে,
ধর ছঁড়াকে কইরব লটপৈটা হে।
২। অ তুঁই আসবি ব'লে নাই আলি হে,
টিনের আগুড় জানলায় ভালি হে।

কবিগীত কর্ম সংগীত। ধান ভানার গীত বা ঢেঁকির গীত ও ছাদপিটার গীত কবিগীতেরই

পর্যায়ভুক্ত। একক কবিগীতকেই বলা হয় টাঁড়ঝুমুর। মাঠে মাঠে গরুমোষ চরানোর সময় বাগাল বা রাখালেরা টাঁড়ঝুমুর গেয়ে থাকে বলে একে রাখালিয়া গান বা বাগাল গীতও বলা হয়ে থাকে। এই গীতও যৌনগন্ধী, অশ্লীল ও নিরাবরণ। গানের বিষয়বস্তুতেও থাকে স্পষ্ট আহ্বান ঃ

টাঁড়ঝুমুর : ১। পীরিত করে লে রে খালভরা
পীরিত করে লে—
পাকা ডালিম রসেতে ভরা।

আদিম কৃষিজীবী মানুষের বিশ্বাসে যৌনতা ছিল উর্বরতার পরিপূরক। তাই সেকালে যৌনাচারকে কৃষি আচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কবিগীত বা টাঁড়ঝুমুরে কৃষিজীবী সমাজের সেই আদিম বিশ্বাসকেই খুঁজে পাওয়া যায়।

পুরুলিয়া জেলা কৃষি বৃষ্টিনির্ভর। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা না থাকা ও কর্কটক্রান্তীয় অবস্থানের দরুণ উত্তাপের তীব্রতা হেতু বর্ষার সময় ছাড়া বছরের বাকি সময়গুলিতে এ অঞ্চলে চাষ-আবাদের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে। পুকুর বাঁধ নদী জোড় ঝরা সহ জলের সমস্ত উৎসগুলি শুকিয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রকৃতিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা সূচিত হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে মাঝে মাঝে সমুদ্রে সাইক্লোন ওঠে। ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি নিয়ে আসে। তাপদগ্ধ পৃথিবী কিছুটা স্নিগ্ধ হয়। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর হাত ধরে বর্ষা নামে। অবিরল ধারায় মাটি নরম হয়। ফসল সম্ভাবনা জাগে। তাই ১৩ জ্যৈষ্ঠ মানভূমে বীজ বপনের প্রারম্ভিক কাল হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু তাড়িত বর্ষায় লালিতপালিত হৈমন্তিক ধান কাটা হয়ে গেলে আর কোনো ফসল সম্ভাবনা থাকে না। তাই পয়লা মাঘ থেকে ফসলশূন্যতার কাল আরম্ভ হয়। এ সময় মাঠে মাঠে শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে । কাটাধানের নাড়াগুলি বুকে নিয়ে নিঃসঙ্গ মাঠ যেন একা শুয়ে থাকে। প্রকৃতি যেন নিঃস্ব, রিক্ত। শীতের প্রকোপে বৃক্ষলতা পত্রপুষ্পহীন হতে থাকে। বসন্তের কয়েকটি দিন প্রকৃতি খানিকটা সবুজ থাকে। তারপরেই আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ। সবকিছুই যেন পুড়ে খাক হয়ে যেতে চায়। এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য হাহাকার ওঠে। তাই প্রাচীন কৃষিজীবী মানুষের ভাবনায় এই ঋতু ফসলহীনতার ঋতু, ফসল শূন্যতার ঋতু। এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেই সে যুগের মানুষ ঋতু বিভাজন করেছিল।

আদিম কৃষিজীবী মানুষেরা বিশ্বাস করত একবার ফসলের জন্ম দিয়ে মাটি তার উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলে। সেই বিশ্বাসেই মানভূমের কৃষিজীবীরাও ফসলশূন্যতার ঋতুর প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা মাঘ আড়াই পাক ভূমি কর্ষণ করে পরবর্তী বছরের চাষের সূচনা করে রাখত এবং আখ্যান, যাত্রা, ভাও ও ভানসিং পূজা, খেলাই চণ্ডীর পূজা, ধর্ম ও শিবের গাজন প্রভৃতি নানা রকম পূজাচার ও ধর্মাচার পালনের মধ্য দিয়ে মাটির উর্বরতা কামনা করত। মাটির উর্বরতা কামনা করে এই ঋতুতে তারা যে গান গাইত তার নাম উধয়া গান।

কবিগীত যেমন ফসলের ঋতুর গীত তেমনই উধয়া ফসলশূন্যতার ঋতুর গীত। উধয়া গীতের প্রারম্ভিক দিন পৌষ সংক্রান্তি। এদিন পুরুলিয়া তথা মানভূমের কৃষিজীবী নারীপুরুষেরা নদীতে টুসু বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরবার পথে উধয়া গাইতে গাইতে আসে। কবি বা টাঁড়ঝুমুরের মতো এ গীতও অশ্লীল এবং যৌনগন্ধী বলে ঘরে কিংবা গ্রামে গাওয়া যায় না। 'উধয়া' শব্দটি 'উদাম', ও 'উধাম' শব্দগুলির সমার্থক। অর্থ নগ্ন বা খোলা :

উঠহুঁ না দেলে ভৌজি গো
নিদহুঁ না দেলে গো
আ রে, অতি বেগেঁ হেল ভিনিসার।

ফসলহীনতার ঋতু বৃষ্টিহীনতারও ঋতু। তাই উধয়া গীতে বৃষ্টি ভাবনাও পরিলক্ষিত হয় :

বাঁধ ত দেলে রাজা হো
দেশেকেরা অড়ে—
আ রে, পিঁড়িআ ত দেলে অজগর,
ঝলকলে আওএ হো
শিরেকে গাগরিয়া
মলকলে আউএ পনিহর।

বৃষ্টিপাত একটা নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটিই গানটিতে কাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। আকাশের ঘন কালো মেঘ যেন সেই নারীর মতো যার মাথায় ঘনকৃষ্ণ কেশদাম। নারী যখন কলসি মাথায় পুকুর থেকে জল নিয়ে আসে তখন তার মাথার কেশরাশির উপর কলসিটি যেমন চমকাতে থাকে তেমনই কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর এই মেঘ ওই মেয়েটির মতোই এক বিশাল পুকুর থেকে জল নিয়ে আসছে, যে পুকুরটির পাড় বিশাল। গানটিতে পাড়ের বিশালতা বোঝাতে 'অজগর' শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশাল পাড়যুক্ত জলাধারটি আসলে বঙ্গোপসাগর তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর মেঘ ওই জলাধার থেকেই জল নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু তাড়িত হয়ে ছুটে আসছে, গানটিতে সেই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

পুরুলিয়ার লোকগীত ও প্রাচীন গ্রীসের উর্বরতা তত্ত্ব ঃ পুরুলিয়ার লোকগানের ঋতুবিভাজনের তত্ত্বটির সাদৃশ্য দেখা যায় প্রাচীন গ্রীসের উর্বরতার তত্ত্বটির সঙ্গে। গ্রীষ্মের উর্বরতার তত্ত্বটিকে ঘিরে উপকথা গড়ে উঠেছে। কিন্তু যে উর্বরতা তত্ত্বকে ঘিরে পুরুলিয়ার লোকগানের ঋতুবিভ'জন ঘটেছে সেটি আজও প্রাচীন ভাবনার মোড়কে আবদ্ধ। স্বভাবতই আজকের কৃষিজীবী মানুষের কাছে তা বিমূর্ত। তারা আবহমানকাল থেকে উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে কেবল অভ্যাসবশে প্রাচীন রীতিনীতি মেনে আসছেন। গ্রীসের উপকথাতেও ফসলের ঋতু ও ফসল শূন্যতার ঋতু—এই দুই ঋতু বিভাজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রীক উপকথায় আছে, উর্বরতার দেবী দেমেত্রা। তার কন্যা পের্সেফোনে ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। তিনি একদিন মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় ধরিত্রী দ্বিখণ্ডিত হল এবং পাতালের দেবতা আইদেস রথে চড়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সুন্দরী পের্সেফোনেকে অপহরণ করে পাতালে নিয়ে গেলেন। এই ঘটনায় মাতা দেমেত্রা কন্যার শোকে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তখন এই পৃথিবীতে ফুল শুকিয়ে গেল, গাছের পাতা ঝরে পড়ল, যব ও আঙুরের কুঞ্জে ফল ফলল না। পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন দেবরাজ জিউস আইদেসকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন কিছু দিনের জন্য পের্সেফোনকে পৃথিবীতে তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবছর পের্সেফোনে যখন পৃথিবীতে তার মায়ের কাছে ফিরে আসেন তখন উর্বরতার দেবী দেমেত্রা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তখন পৃথিবীতে বসন্তকাল দেখা দেয়। আবার যখন ভূগর্ভে ফিরে যান তখন দেমেত্রা শোকাভিভূতা হয়ে পড়েন। পৃথিবীতে তখন হেমন্ত কাল শুরু হয়। ফসল শূন্যতার ঋতু যেন বিরহের ঋতু। পুরুলিয়ার টুসু পর্বে এই তত্ত্বটির কিছুটা মূর্ত রূপ পাওয়া যায়। টুসুকে ঘিরে এ অঞ্চলের মেয়েরা-আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাদের কাছে টুসু কখনও কন্যা, কখনও বধূ, আবার কখনও বা সহচরী। এই টুসুকে

যেদিন তারা বিসর্জন দিয়ে আসে সেদিন তাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ভেসে ওঠে বিরহের সুর, উধয়ার সুর। রিক্ততার শূন্যতার সুর। এ সুরে থাকে উর্বরতাকে ফিরিয়ে আনার আকুলতা।

পুরুলিয়া জেলায় প্রচলিত লোকগানের শ্রেণিবিভাগ : ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া জেলায় প্রচলিত ঋতুভিত্তিক গীত কবি ও উধয়ার পবিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কবি ও উধয়া ছিল উর্বরতা এবং অধিক ফসলের কামনায় আদিম কৃষিজীবী মানুষের জাদুসঙ্গীত। কালক্রমে এই গানগুলি কর্মসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে নানা রকম পর্ব ও অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই জেলায় নানা রকম গানের প্রচলন আছে। বিভিন্ন লোকনৃত্যের সহযোগী গান যেমন আছে, তেমনই বিভিন্ন আচার ও ধর্মানুষ্ঠানকেন্দ্রিক নানা রকম গানের প্রচলন আছে :

টাঁড় ঝুমুর— ছুটুমুটু কানালি ঘাঁস কাটতে পাঠালি,
জিলপি দিব বলে তুঁই মটরভাজায় ভুলালি।

টাঁড় শব্দটির অর্থ মাঠ। সুতরাং টাঁড় ঝুমুর আক্ষরিক অর্থেই মাঠের গীত। রাখালেরা টাঁড় ঝুমুর গেয়ে মাঠে কর্মরতা যুবতীদের আকর্ষণ করে থাকে। ভাদ্র মাস টাঁড় ঝুমুরের প্রকৃষ্ট কাল বলে টাঁড় ঝুমুরের আর এক নাম ভাদরিয়া গীত। পরবর্তীকালে এই ভাদরিয়া গীতের ধারাতেই রাধাকৃষ্ণের প্রতীকে সাধারণ নরনারীর প্রেমলীলা ও লৌকিক জীবনের সুখ দুঃখকে অবলম্বন করে মানভূম পুরুলিয়ার ঝুমুর-কবিরা ভনিতাযুক্ত অনবদ্য ঝুমুর রচনা করেছেন। এই ঝুমুর বর্তমানে ঝুমুরের একটি বিশিষ্ট শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ঝুমুরের প্রায় সকল বিশিষ্ট কবিরাই ভাদরিয়া ঝুমুর লিখেছেন। এই ঝুমুরের বিশিষ্টতা এর ভাব, ভাষা ও সুরে :

শুনি শুনি বাঁশরিয়া ছটফট মন গো
নটখট মোকে করে জ্বালাতন গো
লম্পট শঠ না শুনে বারণ।
কেশীঘাট তটে বংশীবট ছায়া বন গো
ঝট পট চল পানীয়া ভরণ গো
বিপিন বিহারী শামে ডাক কি কারণ।

জাওআ গীত ঃ জাওল মাই জাওল কিআ কিআ জাওআ
জাওল মাই গো কুরথি বহুরা,
সেহ গো কুরথি এক পাঁতা সইর পাঁতা
বাগাইলাকে দেবেঁই মই রাঁড়া ভঁইসা।

জাওআ গীত কৃষি আচারমূলক পর্বভিত্তিক গীত। ভাদ্র মাসে জাওআ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জাওআ শব্দের অর্থ 'অঙ্কুরিত হওয়া বা জন্ম হওয়া।' জাওআ পর্ব শস্যের জন্মোৎসব। এই পর্বে বাঁশের ডালি বালিপূর্ণ করে শস্যের বীজ বুনে দেওয়া হয়। গ্রামের আখড়ায় মিলিত হয়ে মেয়েরা কয়েক দিন ধরে এই ডালিটিকে ঘিরে শস্যের সফল অঙ্কুরোদগম কামনা করে যৌথ নৃত্যগীত করে। এটিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কৃষিনৃত্য। প্রাচীন গুহাচিত্রে রূপায়িত নৃত্যের ছবিতে এই আঙ্গিকটিকে দেখতে পাওয়া যায়। আর এই নৃত্যের গীতগুলিই জাওআ গীত। মূলত শস্যের সফল অঙ্কুরোদগমের কামনায় রচিত জাদু সঙ্গীত হিসেবেই জাওআ গীতের উদ্ভব হয়েছে।

করম গীত ঃ করম কাটিকুটি আখড়া বন্দনা করি
গোপিন সব করে একাদশী—
আজ রে করম ভেল রাতি।

জাওআ পর্বের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করম গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে পুজো করা। এই ডালকে ঘিরেও চলে মেয়েদের যৌথ নৃত্যগীত। এই গীতগুলি করম গীত বলে পরিচিত। কয়েকটি বিশেষ গীত ছাড়া জাওআ ও করম গীতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

পাঁতা গীত ঃ ধান ফুলে রে মালা সাজল না সাজল না,
শবদে সখি রে বাঁশি বাজল না বাজল না।

'পাঁতা' শব্দটির অর্থ 'সারি'। জাওআ ও করম নৃত্য সারিবদ্ধ যৌথনৃত্যগীত। তাই এই নাচ পাঁতানাচ ও গীত পাঁতাগীত নামেও পরিচিত। তবে পাঁতানাচ ও গান সাধারণ সময়েও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। জাওআ করম ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ও সাধারণ অবকাশেও গ্রামের মেয়েদেরকে পাঁতা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। পাঁতা নৃত্য ও গীত আচারের বেড়াকে অতিক্রম করে লোকগীতের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে ও মানবিক আবেদনে, কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, আলঙ্কারিক উপস্থাপনায় এবং সুরের বৈচিত্রে উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

দাঁড় ঝুমুর ঃ তুমার পীরিতি জানা গলে এত দিনে
মিছাই দেখা মন রাখা নয়নে নয়নে।

দাঁড়ঝুমুর দাঁড়নৃত্যের সহযোগী যৌথসঙ্গীত। দাঁড় বা ডাঁড় শব্দটির অর্থও 'সারি'। দাঁড় নৃত্যও সারিবদ্ধ যৌথনৃত্য। জাওয়া বা করম নৃত্যের অনুকরণে এই নৃত্যের উদ্ভব। তবে জাওয়া করম গীতগুলির মতো দাঁড় ঝুমুরগুলির সঙ্গে কোনো ধর্মীয় আচারযুক্ত নয়। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ নিছক আনন্দের জন্যই দাঁড় ঝুমুর ও নৃত্যের আয়োজন করে। জাওয়া, করম বা পাঁতা নৃত্য ও গীতে মেয়েদের অংশগ্রহণই মুখ্য। পুরুষেরা বড় জোর বাদকের ভূমিকা নিয়ে থাকে। কিন্তু দাঁড় ঝুমুর নৃত্যে পুরুষেরাই নারীর পোশাক পরে সখি সেজে নৃত্যগীতে অংশ নিয়ে থাকে। বর্তমানে দাঁড় নৃত্য ও গীত গ্রামীণ সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

রোহিন গীত ঃ বড়বাঁধের আইড়ে যাতে মাইরি, লাগল প্রেমের হাওয়া
প্রেম পীরিতের বড় জ্বালা মাইরি, ছাইড়ে দে মায়া ছেলা।

পুরুলিয়া জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে বীজ বোনার দিন ১৩ জ্যৈষ্ঠ। এই দিনটি এখানে রহনি বা রোহিন নামে পরিচিত। এই দিন গ্রামের কৃষিজীবী সমাজের মেয়েরা মাঠে গিয়ে নৃত্যগীত করে ও কিছু আচার পালন করে। এই রহনি বা রোহিন পর্ব উপলক্ষে গাওয়া গীতগুলিকেই রোহিন গীত বলা হয়।

রোহিনের কাপগান ঃ বেহাইকে মাইরেছে কাড়াতে,
বেহাই পইড়ে আছে নালাতে।

রোহিন পর্ব উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে কাপগানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গ্রামের ছেলে-ছোকরারা গায়ে ধুলো, বালি, রঙ, কাদামাটি গায়ে মেখে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করতে করতে গ্রামের কুলিতে কুলিতে গান গেয়ে বেড়ায়। নানা জীবজন্তুর বেশে সেজে রঙ্গ তামাসায় মেতে ওঠে। চৈত্রের গাজন ও কার্তিকী অমাবস্যা বাঁদনা পরবেও বিভিন্ন জায়গায় কাপের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানটিও এক প্রাচীন কৃষি আচার বিশেষ। কাপ গানগুলিও অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ।

গাজনের কাপ গান ঃ চৈত পরবের কুঁড়া কুটা চালে শুখাছে,
সেই যে বঁধু মাইরেছিলে এখন দুখাছে।

শিবের গাজনে ঘাটফোঁড়ের দিন ঢোল ধামসা বাঁশি সানাই প্রভৃতি বাদ্য সহকারে ভগতারা পুকুরঘাটে

যায়। সেখানে ঘাট পুজো করে কিছু আচার পালন করে। তারপর তাদের শরীরে লোহার কাঁটা ফুটিয়ে আংটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই আংটায় দড়ি বেঁধে দড়ির সঙ্গে ভারি মই বা পাটা জুড়ে দেওয়া হয়। ভগতারা সেটাকে টানতে টানতে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন রকম রঙ্গতামাশাপূর্ণ গান গাইতে থাকে। এই গানগুলিই গাজনের কাপ গান।

ছৌনাচের রং ঃ একদন্ত গজানন মূষিক বাহন,

হর হর গৌরির নন্দন

বিঘ্ন বিনাশন।

শিব গাজনের জাগরণের রাত্রে পুরুলিয়া জেলার অসংখ্য স্থানে ছৌনাচের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ছৌনাচ মুখোশ নৃত্য। মুখোশ বিভিন্ন পৌরাণিক ও সামাজিক চরিত্রের নৃত্যাভিনয় ছৌনাচের উপজীব্য বিষয়। পুরুলিয়ার ছৌনাচ এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রতিটি পালাভিত্তিক নৃত্যের প্রারম্ভে একজন গায়ক ঝুমুরের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে নৃত্যের বিষয় বিবৃত করে। কিন্তু ঝুমুরের পুরো অংশই কখনই গাওয়া হয় না। রঙ অংশটুকু গাওয়ার পরেই ছৌনাচের সমস্ত বাদ্য যন্ত্র একযোগে বেজে ওঠে। ছৌনাচের রঙ বলে ঝুমুরের পৃথক কোনো ধারা নেই। প্রচলিত ঝুমুরের রঙগুলিকেই ছৌনাচের রঙ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে নাচের পালার উপযোগী ঝুমুর না থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী রঙ রচনা করে নেওয়া হয়।

জাঁত গান ঃ আমার গলে দোলে লো বেলফুলের মালা

পদ্মপাতে জন্ম আমার নামটি কমলা।

জাঁতগানের বিষয় দেবী মনসার মর্তে আগমন ও পূজা প্রচারের কাহিনি। জাঁতগানের চাঁদ সদাগর, বেহুলা-লখিন্দর ও মনসাদেবীর মাহাত্ম্য যেমন পরিবেশিত হয় তেমনই লোকজীবনের দৈনন্দিন প্রাপ্তি-বঞ্চনা ও সুখ-দুঃখের কথাও এর উপজীব্য বিষয়। জাঁতগানগুলিকে পৌরাণিক ও লৌকিক এই দুভাগে ভাগ করা যায় । লৌকিক জাঁতগানের একটা উদাহরণ :

বেহাই যাছ হে বাস্যাম খাঁয়ে যাও

. কেঁদকুঁড়া মরিচগুঁড়া গাঁইঠে বাঁধে লাও।

জন্মাষ্টমীর গীত ঃ আসামের সুর্মা, চিমটা কাঁটা, ধানবাদের ফিতা

টেসেলে বাঁধেছি মাথা, আমার তাও হৈল বাঁকা সিঁথা।

ভাদ্রের কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিটি পুরুলিয়ার গ্রামীণ লোকায়ত সমাজে ভিন্নতর মাত্রায় উদযাপিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব ও ঐশ্বরিক ভাবমূর্তির বদলে এখানে তার রাখালিয়া রূপকল্পটিই মানুষের প্রিয়। ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে ধূমপানের রীতি জন্মাষ্টমীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জন্মাষ্টমীর ধূমপানকে এই পর্বের আচারমূলক সংস্কারও বলা যেতে পারে। জন্মাষ্টমীর সারাদিন গ্রামের কিশোরী ও যুবতীরা গ্রামের উপান্তে কোনো শাল কিংবা আমের কুঞ্জে সমবেত হয়ে নৃত্যগীতে কাটিয়ে দেয়। তবে গীতের বিষয়বস্তুতে কোনো পৌরাণিক কাহিনি থাকে না, থাকে রাখালিয়া প্রেমের ছোঁওয়া ও সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবনাভূতিরই প্রকাশ।

ইঁদ ও ছাতার গান ঃ ইঁদ দেখালি দেওয়া ছাতা দেখালি রে

ঘুরাঞ আ'নে দেওরা মার খাওয়ালি রে।

ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয় ইঁদ ও ছাতা পর্ব। এই পর্ব উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। মেলায় যাওয়া আসার পথে বাতাসে ভাসতে থাকে ইঁদ ও ছাতার গান। ইঁদ ও ছাতার গানে পরকীয়া প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

দোলনার গীত ঃ চল ফুল চল গঁইঠা কুড়াতে,
নাই যাব ফুল নাই যাব ফুল
মাথা দুখাছে।
বাপ হামার গুণের ঠাকুর
গুনেতে বসেছে
মা হামার পদ্মরাণী
কাঁদতে বসেছে
ভাই হামার লেদাগাছ
খাঁচা সাজাছে।

আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মূলত বর্ষার মাস। গ্রামের নারীপুরুষ মাঠে ধানের চারা লাগানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদেরই ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে ঘর আগলানোর দায়িত্ব থাকে। এ সময় শিশুরা মোটা দড়ির দোলনায় দুলে দুলে সারাদিন গান গেয়ে কাটিয়ে দেয়। এই গানগুলিই দোলনার গান। স্থানীয় ভাষায় 'ঢেলুয়ার গীত'। দোলনার গানের রচয়িতা শিশুরাই। বর্ষার রিমঝিম শব্দে দোলনায় দুলতে দুলতে তাদের কবিসত্তা জেগে ওঠে। শিশুদের রচনা বলেই এই গানগুলি ছড়াধর্মী। এই শিশুসুলভ ছড়াগুলির অসংলগ্ন চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিশুকন্যাদের প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক বঞ্চনা, বৈষম্য ও আশা-আকাঙক্ষার বেদনাদায়ক অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

ছড়া গীতি ঃ এতটুকু জলে
মাছ কিলবিল করে
বাঁড়ির বেটা গোবিন্দ
মাছ ধরতে লারে

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রকার গ্রামীণ খেলাধুলাকে কেন্দ্র করেও ছড়াধর্মী গীতের প্রচলন আছে। এই গীতের প্রচলন শিশুজগতের মধ্যেই। শিশুরা এগুলিকে ছড়ার মত আবৃত্তি করলেও সেই আবৃত্তিতেও একধরনের আন্তস্রোতা সুর থাকে। শিশুদের আযত্নরচিত এই ছড়াগীতিগুলির আবেদন বড়দের কাছেও কম নয়। এগুলি অপরিণত ও বৈষয়িক বুদ্ধিমুক্ত শিশু মনোপযোগী হলেও শিশুরাও সমাজের অংশীদার বলেই তাদের অজান্তেই অনেকসময় এগুলিতে লোকজীবনের নানা অনুভূতি বায় হয়ে ওঠে। মায়েদের রচিত ছড়া ঘুমপাড়নি গান। মায়েরা গঠনগতদিক থেকে তাদের শিশুদের জন্য এগুলিকে ছড়ার মত করে রচনা করলেও সুর করেই গেয়ে থাকেন। নামকরণেও এগুলিকে গান বলেই স্বীকৃত।

ভাদু গীত ঃ খিরই নদীর কুল ভাইঙ্গেছে
ভাদু নাকি আসিছে,
হাতে আছে পানের বাটা
রুমালটি ভাঁইসে যাছে।

ভাদ্র মাসে পুরুলিয়ার ভাদু উৎসব। এটি শস্য উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে রচিত গীতগুলিই ভাদু গীত। ভাদু গীত কাব্যিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের নারী সমাজেও ভাদু পূজা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে অনেক উচ্চাঙ্গের ভাদু রচিত হয়েছে।

টুসু গীত ঃ তালতলে দাঁড়ালে টুসু
তালপাতে কি জল টেকে
ধর লক্ষণ মোমের ছাতা
টুসুর অঙ্গে জল পড়ে।

অগ্রহায়ণ মাস টুসু পর্বের মাস। সারা মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা টুসু পাতে। আকাশে বাতাসে অনুরণিত হতে থাকে টুসু গানের সুর। পৌষসংক্রান্তিতে টুসু বিসর্জনের মেলায় নারী পুরুষের আনন্দ উচ্ছ্বাস ও টুসু গীতের সুরে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। টুসু গীতগুলি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে। ফলে প্রাচীন টুসু গীতগুলি অবলুপ্ত হয়েছে। রচিত হয়েছে নূতন নূতন গীত। টুসু গীতের রঙ অংশগুলি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

কাঠিনাচের গান ঃ বাঁশি নাই বাঁশের ফাবল
তরল বাঁশের আগল গো,
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশি
বলে বলে রাধা রাধা গো।

রীতি অনুযায়ী দুর্গাপূজার সময় কাঠিনাচের আসর বসার কথা। কিন্তু বর্তমানে বছরের সবসময়েই এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কাঠিনাচ যুদ্ধনৃত্য। সারিবদ্ধভাবে মণ্ডলাকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধনৃত্যে সাধারণত গানের ব্যবহার থাকে না। কিন্তু কাঠিনাচে গানের প্রচলন দেখা যায়। তবে নর্তকেরা নিজেরা গান করে না। গায়নের কাজটা অন্যদের দ্বারা চলে। গান ও নাচের তালে তালে চলতে থাকে লাঠির ঠোকাঠুকি, বাজতে থাকে ধামসা, মাদল, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। কাঠি নৃত্যে দাঁড় নৃত্যের মতোই পুরুষেরা সখিবেশ ধারণ করে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। কাঠিনাচের গান মূলত রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক। তবে কাঠি নাচের আসরে দৈনন্দিন জীবাশ্রয়ী লৌকিক গানও শোনা যায়।

ঘেরাগীত ঃ হেঁঠে দেলঅ চারওআ
উপরে দেলঅ ফাঁদা
চারওআ কা লভেঁ
নাভঅবে গে পঙ্খি
বাঝঅবে মনহর ফাঁদে

ঘেরানাচ ও গান এখন অবলুপ্তির পথে। এই নাচে গিরিদা নামে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হত। নর্তক বাদ্যযন্ত্রটি বাজিয়ে বাজিয়ে নাচতেন এবং তাকে ঘিরে থাকত একদলা দোহার। ঘেরাগীত আদিম শিকারীজীবী ও কৃষিজীবী সমাজে প্রচলিত ছিল। ঘেরাগীতে শিকার ও বৃষ্টি ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ঘেরাগীতের সন্ধান এখন আর বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পদ্মলোচন মাহাত পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কয়েকটি অমূল্য ঘেরাগীত সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁর সংগৃহীত দুটি ঘেরা গীতের আলোচনা করা হল :

কনহ কাঠেকেরি গিরিদা ছুলাঅই রাম
কনঅ কাঠে গিরিদা ছারাঅই হো ললনা—
গুমঅরি গুমঅরি গিরিদা বাজৈ হো?

কঁড়রঅ কাঠেকেরি গিরিদা ছুলাঅই রাম

মিরগি চামে গিরিদা ছ্বরাঅই হো ললনা
গুমঅরি গুমঅরি গিরিদা বাজৈ হো।

কনেহি গাওলঅ কনে বাজাঅই রাম
কনঅ সখিঞ অরন্ত বুঝাওএই হো ললনা
গুমঅরি গুমঅরি গিরিদা বাজৈ হো?

রামেহি গাওলঅ রসিকাঞ বাজাঅই রাম
সিতা সখিঞ অরন্ত বুঝাওএই হো ললনা
গুমঅরি গুমঅরি গিরিদা বাজৈ হো।

রাম রসিক ও সিতা এই তিনটি শব্দের মধ্যেই গীতটির তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। নওলজির 'বিশাল নালান্দা শব্দ সাগর' অভিধানে ওই তিনটি শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। এইগুলির অর্থ যথাক্রমে জল (বৃষ্টি), মেঘ ও হলরেখা। বৃষ্টিপাতের শব্দকে গান ও মেঘে মেঘে ঘর্ষণের শব্দকে বাদ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৃষ্টি মাটিতে নেমে এসে হলরেখার উপর নৃত্য করছে। যেন আকাশ ও মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছে। এটি একটি বৃষ্টি ভাবনার গীত। গিরিদার গুরুগম্ভীর শব্দের মেঘের নির্ঘোষকে অনুকরণ করে ও বৃষ্টির নৃত্যকে অনুকরণ করে বৃষ্টি নামানোর আদিম জাদুক্রিয়া ঘেরানৃত্য ও গীতের মধ্যে দেখা যায়। যে সমাজের ঘেরা নৃত্যের উদ্ভব ঘটেছিল সেই সমাজে কৃষির পাশাপাশি শিকারেরও একটা মুখ্য স্থান ছিল। ঘেরাগীতে শিকারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

হেঁঠে দেলঅ চারওআ উপরে দেলঅ ফাঁদা
চারআ কা লভেঁ নাভঅবে গে পঙ্খি
বাঝঅবে মনহর ফাঁদে।
মুঠা ভরি ধরবঁঅ টেনা দুইঅ ভাঁগবঁঅ
আঁখি দুনঅ দেবঁঅ যে টিপি গে পঙ্খি
দিনঅ করবঅ রাতি।

নীচে চার অর্থাৎ পাখিকে খাবার দিলাম। উপরে দিলাম ফাঁদ। খাবারের লোভে পাখি নেমে আসবে এবং সুন্দর ফাঁদে আটকে পড়বে। পাখিকে মুঠো করে ধরবো, ডানা দুটি ভেঙে দেব এবং চোখ দুটি টিপে দিয়ে তার দিনকে রাত করে দেব। গানটির বিষয়বস্তুতে শিকারের নৃশংসতা ফুটে উঠেছে। শিকার প্রক্রিয়াকে অনুকরণ করে শিকার নিশ্চিত করার আদিম জাদুক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে এই ধরনের গীতের উদ্ভব।

বিয়ের গীত: একটা শিলের হলুদ বাঁটা, দুটা শিলে কেনে রাইখেছ,
যেদিন জনম সেদিন মিলন মাগো, আজ কেনে কাঁদিছ।

লোকায়ত সমাজের বিবাহ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকাচারসম্মত। বিবাহের সমগ্র প্রক্রিয়া জুড়ে বিভিন্ন লৌকিক ও স্ত্রী আচারের একটা মুখ্য ভূমিকা থাকে। এই আচারেরই অঙ্গ বিয়ের গীত। তাই পুরুলিয়ার বিয়ের গীতে আচারকেন্দ্রিক অসংখ্য গীতের সন্ধান পাওয়া যায়। বিয়ে আগাগোড়া একটা আনন্দানুষ্ঠান। তাই রঙ্গ-রসিকতাও বিয়ের গীতের একটা বড় অংশ

জুড়ে থাকে। কিন্তু বিয়ে মানে একটা চূড়ান্ত বিচ্ছেদও। বিয়ের পরেই মাতার স্নেহ, পিতার সোহাগ, ভ্রাতা-ভগ্নী ও সঙ্গী-সাথীদের ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে আবাল্যের ক্রীড়াভূমি থেকে কন্যাসন্তানকে বিদায় নিতে হয়। তাই বিয়ের গীতগুলিকে বিয়োগবিধুর করুণ রসেও জারিত হতে দেখা যায়।

মলহরিয়া : বড় বাঁধের আইড়ে যাতে শালুকের ফুল ফুটেছে
কৃষ্ণ ঠাকুর বাজায় বাঁশি রাধিকা জল ডুবাছে।

পুরুলিয়া লোকায়ত গ্রামীণ সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে নৃত্য ও গীত। এই নৃত্য-গীতকেই মলহরিয়া গীত বলা হয়। এই অঞ্চলের প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান মহুলবিহা অর্থাৎ কন্যাকে প্রথমে একটা মহুল গাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। মহুল বহু প্রসবিনী বৃক্ষ। বিশ্বাস কন্যাকে মহুল গাছের সঙ্গে বিয়ে দিলে সে বন্ধ্যা হবে না। এই মহুলবিহা অনুষ্ঠানেও নৃত্যগীত হয়ে থাকে। সম্ভবত মহুল থেকেই মলহরিয়া শব্দটি এসেছে।

অহিরা গীত: কনে ত কাঁদে ভালো জনম জনম রে
কনে ত কাঁদে ছয় মাস,
কনে ত কাঁদে ভালো জনম জনম রে
সিঁদুরে কাজলে টলমল?

বাঁদনা পরব উপলক্ষে কার্তিকী অমাবস্যার রাতে বাগাল মুনিস ও ধাঙড়েরা সম্পন্ন চাষিদের ঘরে ঘরে অহিরা গীত গেয়ে গরু জাগায়। অহিরা গীতের বিষয় কপিলার মর্তে আগমন ও কীর্তিকাহিনি। সেই সঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দারিদ্র সহ মানবিক অনুভূতিগুলিও অহিরা গীতের উপজীব্য বিষয়।

ঝুমুর : বৃথা কুঞ্জ সাজা বৃথা ফুলশয্যা বৃথা কবরী হায় গো
নিশি হল গত বৃশ্চিক শত শত দংশিছে কোমল হিয়ায় গো
রং- কি করি সজনি এ মধু রজনি বিফলে গেল পোহায় গো।

পুরুলিয়া লোক-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ঝুমুর। এই অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ঝুমুর বিকশিত হয়েছে। আদি পর্যায়ের ঝুমুরে মাত্রা ছন্দ তাল ও সুর নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ছিল না শিল্পকলার প্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস। মাঠে কর্মরত কৃষক রমণী ও গ্রাম্য যুবকদের মনের আনন্দ ও ভাবাবেগের স্বচ্ছন্দ উৎসার সুরের ছোঁওয়ায় গীত হয়ে উঠত। কবিগীত, উধয়া, টাঁড় ঝুমুর প্রথম পর্যায়ের ঝুমুরের বিশিষ্ট উদাহরণ। প্রথম যুগে ঝুমুর বলতে পুরুলিয়া জেলায় সমস্ত প্রকার প্রচলিত লোকগানকেই বোঝাত। এই ঝুমুরে কোনো ভণিতা থাকত না। পরিশীলিত বোধের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠত যৌনগন্ধী ও অশ্লীল। যদিও এগুলির মানবিক আবেদন কম ছিল না।

ঝুমুরের বিকাশ— এক সময় বাংলার জমিদারদের নাচমহলে রাতের পর রাত ছুটত মদের ফোয়ারা এবং বাইজিদের মুজরা ও ঘুঙুরের ঝংকারে জমে উঠত মেহফিল। তেমনি পুরুলিয়ার জঙ্গল সর্দাররাও নাচনি নাচে মাতিয়ে রাখতেন তাদের দরবার। এই নাচনি নাচকে ঘিরেই ঝুমুরের বিকাশ ঘটেছে। ঝুমুরের কিংবদন্তী ও প্রবাদপুরুষ ভবপ্রিতানন্দ ওঝা ছিলেন কাশীপুর রাজদরবারের

সভাকবি। তিনি নিজে নাচনিশালায় উপস্থিত থাকতেন না। তবু ঝুমুরে নাচনিদের অবদান স্বীকার করে গেছেন। ঝুমুরের বিকাশে বাঘমুণ্ডির জমিদারদেরও অবদান ছিল। ঝুমুর কবিরা সচেতনভাবে ঝুমুর রচনায় এগিয়ে এলে সম্ভবত ঝুমুরে ভণিতার প্রয়োগ আরম্ভ হয়।

ঝুমুরের একটি বিশিষ্ট শাখা ভাদরিয়া। ভাদরিয়া ঝুমুরে লৌকিক ঝুমুরের ঐতিহ্যটি বেঁচে আছে। অঞ্চল ভেদে ভাদরিয়া ঝুমুরের নানা বৈচিত্র রয়েছে। এগুলি হল— ঝিঙা ফুল্যা, ডহরিয়া, খেমটি, গোলয়ারী, তামাড়িয়া, শিখরিয়া প্রভৃতি। দরবারি ঝুমুরের সুর ও তাল জটিল এবং উচ্চাঙ্গের। প্রথম যুগের ভণিতাহীন ঝুমুরের সুর ও উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণীর মিশ্রণে দরবারী ঝুমুরের ধারা তৈরি হয়েছে।

ঝুমুরের বিষয়বস্তুতে রামায়ণ মহাভারত সহ বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনি, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। তবে নরনারীর লৌকিক প্রেমের বর্ণনা ঝুমুরে প্রধান উপজীব্য। ঝুমুর মূলত প্রেমসঙ্গীত।

পুরুলিয়ার লোকগানে সাহিত্যের উপকরণ : লোকগান সহজ সরল মুখের ভাষায় আবেদন সৃষ্টি করে লোকায়ত জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-বঞ্চনা, আশা-নিরাশা প্রভৃতি মানবিক অনুভূতিগুলিকে মানুষের কাছে দেয়। সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও কখনও কখনও কোনো কোনো লোকগানের সাহিত্যিক উৎকর্ষতা দেখে আমরা বিস্মিত হই ঃ

আম মজরি গেলা হো
মহুয়া মজরি গেলা
আ রে মজরল কেঁদ পিয়ার,
হামে কৈসে মজরব হো
ফুটল ধাদকি ফুলা
আ রে আপন বিহুয়াঞ লেলে যায়।

আম মুকুলিত হল, মহুয়া মুকুলিত হল। কেঁদ পিয়ালেও তো মুকুল ধরেছে। আমি কবে মুকুলিত হব? ধাদকি ফুল ফুটল। আমার বিবাহিত বর এসে কবে আমাকে নিয়ে যাবে?

গানটির সুললিত ভাষা, শব্দচয়ন ও কাব্যিক অভিব্যক্তি পদাবলি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। যদিও বিষয়বস্তুতে ভিন্ন। গানটি সচেতনভাবে সৃষ্ট যে কোনো শ্রেষ্ঠ কাব্য অপেক্ষা উৎকর্ষতায় কম নয়। স্বভাব-কবিত্ব থেকে সৃষ্ট মুখে মুখে রচিত লোকগানগুলির কাব্যিক উৎকর্ষতা বিস্ময় জাগায়। ছন্দ, মাত্রা ও অলঙ্কার কোনো রচনাকে কাব্যগুণে ভূষিত করে। পুরুলিয়ার লোকগানে এগুলির উপস্থিতির ছড়াছড়ি। উপমা একটা অলঙ্কার বিশেষ। মাত্র দু পংক্তির একটা দাঁড় ঝুমুরে উপমার প্রয়োগ আমাদেরকে চমৎকৃত করে ঃ

দিদির চালে লাউ ফউলটি ধব ফুটেছে
তরা দেখ গো—
কে কেমন মাথা বেঁধেছে।

মাথার সঙ্গে ঘরের চাল এবং মাথাগাঁথা সাদা ফিতার সঙ্গে লাউফুলের সাদা রঙের উপমা দিয়ে কেশবিন্যাসের সৌন্দর্যকে গানটিতে চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়েছে। ছন্দ ও মাত্রার সুচারু প্রয়োগে পুরুলিয়ার লোকগান অনবদ্য ঃ

১. ঝুরি ঝুমকার / ফুল / ফুটে হল / আলা,
আমার বঁধু / ঘরে নাই / কারে দিব / মালা। (চার মাত্রা)
২. কেমনে / যাব / জলকে,
হাত দুটা / লাড়ে / দিলে
যুগল / চুড়ি / ঝলকে। (তিন মাত্রা)
৩. শুন পিতা / বলি কথা
শ্বশুর ঘরের / সান্ত্বনা,
মাথার তেল / খুজতে গেলে
কত করে / গঞ্জনা। (দু মাত্রা)
৪. ছাছনি গাছের / ডগে
নিতাই যদি / আসে,
নিতাই যদি / আসে ত
মুচুক মুচুক / হাসে। (দু মাত্রা)

অনুপ্রাস : তাকে যদি দেখিতাম সরু সুতায় গাঁথিতাম
রাখিতাম হৃদয়েরই মাঝে, ভাই ললিতা—
অঙ্গ মাজিতে বেলা হৈল। (ত এবং ম-এর অনুপ্রাস)

পুরুলিয়ার লোকগানে ইতিহাসের উপাদান : ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে লোকগান রচিত হয় না। লোকগান মানবানুভূতির স্বতস্ফূর্ত উৎসার। তথাপি কোনো কিছুই তার সময়কে উপেক্ষা করতে পারে না। সময়ের কোনো ঘটনা সমাজে আলোড়ন তুললে লোকগানের পংক্তিতে তা উঠে আসে। তাই পুরুলিয়ার লোকগানে নানা সময়ের টুকরো টুকরো ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। কতকাল আগে বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ঘটেছিল। পুরুলিয়ার লোকগানে এখনও সেই ঘটনার উল্লেখ বিস্ময় জাগায় :

(১) কনে মরঅ জাওতঅ অনিজেঁ বনিজেঁ রে
কনে মরঅ জাওতঅ টুডুক রাজাক সঁগে?
ভইয়া মরঅ জাওতঅ অনিজেঁ বনিজেঁ রে
সইএগা মরঅ জাওতঅ টুডুক রাজাক সঁগে।

কে যাবে বাণিজ্যে? আর কেই বা যাবে তুর্কিরাজার সঙ্গে? আমার ভাই যাবে বাণিজ্যে। আর আমার স্বামী যাবে তুর্কিরাজার সঙ্গে (যুদ্ধ করতে)।

ভইয়া মরঅ আনি দেতা হাঁথেক শাঁখা
দিঅ হাঁথেক শাঁখা,
সঁইএগা মরঅ আনি দেতা লেঢ়ি সঙ্গিতিনী
রায়অ বাঘিনী রে।

ভাই আমাকে এনে দেবে দু হাতের শাঁখা। আর স্বামী আমাকে এনে দেবে দুরন্ত সতীন। এ রকম আরও একটি গানের উদাহরণ :

আখড়া সামাল, মুসলমান দেখ ভগবান
দাড়ি হইল ছাতির সমান দেখ ভগবান।

এই গানটিতে মুসলমান সৈন্যদের আক্রমণ থেকে নাচের আখড়া বাঁচানোর আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।

১৭৬৯ সাল। ইংরেজশাসনের একেবারে সূচনা কাল। মালভূমির জঙ্গল এলাকায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে চুয়াড় সর্দারেরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সংগ্রামের কথাও লোকগীতে ব্যক্ত হয়েছে :

হাঁসা রাজা কাঁসা সিং জুড়ল বিসন সিং
মানভূমে লাগল লড়াই,
মানভূমে মরি গেল রাজা হো বিসন সিং
পগড়ি আইল রে নিশান।

১৮৫৭ সালে কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিং সিপাহি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই অপরাধে ইংরেজ পুলিশবাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন। লোকগানে বিবৃত হয়েছে সেই কথাও:

হায় একি হইল, সিপাই পল্টন খেপিল
চারদিকে মার মার কাট কাট
যত সিপাই খেপেছে,
কাশীপুরের মহারাজা
মহল ছ্যাড়ে আইসেছে।

খাজনা বাকি থাকায় কাশীপুরের জমিদারি নিলামে উঠেছিল। এ অঞ্চলের লোকগানে এসেছে সে কথাও :

চাঁইবাসা গেছিলে টুসু মকদ্দমার কি হৈল
মকদ্দমায় ডিগ্রী হৈল নীলমনি বাঁধা গেল।

সারা বাংলা জুড়ে নীলকর সাহেবদের জোরজুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তখন সাবেক মানভূম তথা পুরুলিয়ার মানুষও পিছিয়ে ছিল না। এখানকার মানুষও সেদিন নীলচাষের ফরমানের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল :

লিল চাষেক জারি হেলা ভারি গো
রাজা হেই লেল জমিদাবি।
গকুল মাহাত বেড়ে রাগী
নাগাড়ায় পিটল খাড়ি—
মড়লে মড়লে গুনাদারী।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে তীব্র ইংরেজ বিরোধিতার ঢেউ যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, চারণকবি মুকুন্দ দাস স্বদেশি লোকসংগীতের সুরে আগুন ছড়াচ্ছেন, তখন মানভূমের লোককবিরাও পিছিয়ে ছিলেন না। তারা শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কাহিনিকে তাদের মতো করে মহিমান্বিত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন :

অশ্ব যদি থাকত ছাড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়ত ধরা
চাবুক মেরে চলে যেত গয়া গঙ্গা কাশী
বিদায় দে মা ফিরে আসি।

তৎকালীন মানভূমের উঁচুনিচু সকল বর্গের মানুষ সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সেই কথাও লোককবিরা তুলে ধরেছেন :

গাঁজা ছাড়লেক গণেশ মিছির
মদ ছাড়লেক বাউরীরা
দলে দলে পিকেটিং করে
পুলিশে যে দেয় তাড়া।

মানভূমের বাংলা ভুক্তি আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল লোকসেবক সংঘ। আন্দোলনকে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে রচিত হয়েছিল অসংখ্য টুসুগীতি। তাই এই আন্দোলন 'টুসু আন্দোলন' নামে পরিচিত।

পুরুলিয়ার লোকগানে নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক উপাদান : পুরুলিয়া জেলা বিন্ধ্য পার্বত্যাঞ্চলের প্রসারিত অঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমির আদিম অধিবাসী অধ্যুষিত অরণ্যময় ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সেই অধিবাসীদের কয়েকটি জনগোষ্ঠী সরকারিভাবে উপজাতি স্বীকৃতি পেলেও অবশিষ্ট বিশাল জনসংখ্যার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনজাতিগোষ্ঠী আত্মপরিচয়হীন মিশ্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চাপ স্বীকার করে ও উপজাতির পরিচয় হারিয়েও তারা বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি। আজও লৌকিক ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতিতে আপন বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছেন। এদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। আর্যানার্য মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে তারা সমাজের নিম্নবর্গে স্থানলাভ করেছেন। এই ইতিহাস নির্মম হলেও সত্য। এই জনগোষ্ঠীগুলির হারিয়ে যাওয়া পরিচয় অনুসন্ধানের মূল্যবান ক্ষেত্র এদের লোকগান। কেননা কোনো জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য গড়ে ওঠে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি তথা জীবনযাত্রার আধারে। লোকগানের পংক্তিতে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ, বাক্যবন্ধ ও টুকরো টুকরো সামাজিক চিত্রের মধ্যেই তাদের পরিচয় নিহিত আছে। লোকগানের সৃষ্টি ও সঞ্চার মানুষের মুখে মুখে। এর কোনো লিখিত রূপ না থাকায় ক্রমাগত সংযোজন, পরিবর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকায় গানের পংক্তিগুলি পালটে যেতে থাকে। মূল বিষয়বস্তুও অক্ষুণ্ণ থাকে না। এভাবেই কালের স্রোতে প্রাচীন সমাজতাত্ত্বিক উপাদানগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। তবু এখনও যেটুকু পাওয়া যায় তাকে একত্রিত করলে একটা গোটা ইতিহাস যেন চোখের সামনে উঁকি দেয়।

মাতৃতন্ত্র : বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, এমনকী ভারতেরও অন্যান্য স্থানে যখন পিতৃতন্ত্র পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত তখনও এ অঞ্চলে মাতৃতন্ত্রের অবশেষ টিকে ছিল। এ অঞ্চলের লোকগানে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েরা ছিল স্বাধীন। ব্যাস সংহিতা ও মনুর অনুশাসনে তারা বন্দিনী ছিল না। পতি নির্বাচন ও পতিকে ত্যাগ করার অধিকার তাদের ছিল। স্বামীর মৃত্যুতে, এমনকী স্বামী বর্তমানেও তারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারত। তাই লোকগানের পংক্তিতে তাদের সাহসী হয়ে উঠতে দেখা যায়—'জবাব দে রে নীলমণি ঘুরেই সাঁঘা করব।' পতির অত্যাচারে সে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠতে পারে—এক কিল সইলাম দু কিল সইলাম, তিন কিল বই আর সইব না / বলে দিবি ছট দেওর তর ভায়ের ঘর আর কইরব না।' এমনকী কোনো কারণ ছাড়াও অন্য পুরুষকে ভালোবেসে নিজের স্বামীকে ছেড়ে চলে যেত। বেচারা স্বামীর হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকত না। তাই পুরুলিয়া জেলার লোকগানে বোনকে দুঃখ করে বলতে শোনা যায় ঃ 'এমন ভায়ের ভাঙা কপাল, বউয়ে জবাব দিল রে'।

প্রাচীন বিবাহ রীতি ঃ প্রাচীন সমাজে রাক্ষস বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। পুরুলিয়া জেলার

বিয়ের গানগুলি আজও সেই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বরযাত্রী দলের সঙ্গে কনে পক্ষের নকল যুদ্ধের অভিনয় এ অঞ্চলের বিয়ের বৈশিষ্ট্য। একটি গানে বিবাহযাত্রাকে যুদ্ধযাত্রা মতো বর্ণনা করা হয়েছে :

অবশ করে বলেছি কামার ভাই
আইনে দিবি ষোল মুঠি কাঁড়,
বরের বাপ রণে যাবে।
রণে যদি জয় হয়
তবে দিব সোনার ঝারি। (উদ্ধৃত ঃ লোকায়ত ঝাড়খণ্ড)

কন্যাকে জোর করে বিবাহ করা রাক্ষস বিবাহরীতি। এই রাক্ষস বিবাহের উল্লেখ আরো গানে পাওয়া যায়। এরকম একটি গানে প্রাচীন অজাচারের ইঙ্গিত থাকায় রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। রূপকটি হল এইরকম : তিন বোন ডাঁড়ি থেকে জল আনতে নদীতে যায়। সেখানে এক ব্যাঙ তাদেরকে আটকে ছোট বোনটিকে বিয়ে করতে চায়। তাদের বাড়ির লোক খবর পেয়ে ছুটে আসে এবং ব্যাঙটিকে মেরে ফেলে। তারপর ব্যাঙের সৎকার ও অশৌচ পালন করে।

প্রাচীনকালে রক্তের সম্পর্কেও বিয়ের প্রচলন থাকায় অনেক সময় তা পারিবারিক সংঘর্ষের কারণ হত। এই রকম সংঘর্ষে কখনও কখনও মৃত্যুও ঘটে যেত। সেই কথায় গানটিতে বর্ণিত হয়েছে। অজাচারের কাহিনি প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজের রীতির বিবাহের দৃষ্টান্ত এ যুগের একটা লোকগানে কি করে এল তা একজন গবেষককে বিস্মিত করে।

কন্যাপণ: কন্যাপণ অসুর বিবাহের অন্তর্গত। প্রাগৈতিহাসিক কালের কন্যাপণ পুরুলিয়া নিম্নবর্গীয় সমাজে অল্প কিছুকাল আগেও প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক গ্রন্থে কন্যাপণ দিয়ে বিবাহের রীতির উল্লেখ আছে। পাণ্ডুর আর একটি বিবাহ দেবার ইচ্ছায় মদ্র দেশের রাজা বাহ্লীকবংশীয় শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর ভগিনীকে প্রার্থনা করলে শল্য তাঁর কাছ থেকে কন্যাপণ দাবি করেন। তিনি বলেন এটা তাদের কুলধর্ম। ভীষ্ম তখন তাঁকে স্বর্ণ রত্ন গজ অশ্ব প্রভৃতি বিবাহের যৌতুক রূপে দান করেন। অষ্টাদশ শতাব্দির বাংলাতে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যেও কন্যাপণের প্রচলন ছিল তা রামমোহনের লেখা থেকে জানা যায়। পুরুলিয়ার লোকগীতেও পাই কন্যাপণের উল্লেখ। কন্যাপণ কন্যা বিক্রির সামিল। তাই পিতার প্রতি কন্যার ক্ষোভ দুঃখ ও অভিমান লোকগানের সুরে যেন ঝরে পড়তে চায়:

(১) মাচিলায় বসিলে বাবাজন টাকা গুনালে রে,
টাকা করলে নিজ বাবাজন বিটি করলে পর গো।
(২) আজায় আমার ভালোবাসে চোখের কাজল বলে গো
আর কি আজায় বাসবেক ভালো পণ টাকা পালে গো।

উপসংহার: সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, অলঙ্কার, খাদ্যাভ্যাস ও এমনকী সামাজিক রীতিনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল হলেও আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হলেও এগুলির পরিবর্তন ঘটে। তাই পুরুলিয়া জেলার লোকগীতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের

বেশভূষা ও খাদ্যাভ্যাসের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রেও অনেক বিবর্তন ঘটে যায়। অতীতের কন্যাপণ এখন বরপণে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন বিবর্তনের সবকিছুরই ছাপ লোকগীতে পড়েছে। লোকগীত লোকসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গতিশীল অংশ। তাই লোকগীতে পরিবর্তন ও বিবর্তন বেশি। এই পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলে প্রাচীন গানগুলির অবলুপ্তি ঘটে এবং নতুন নতুন গান রচিত হয়। এ ভাবেই বহু মূল্যবান গান কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সমতল বাংলার লোকগানগুলিকে সংগ্রহ করে বিশেষ সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে পুরুলিয়ার লোকগানগুলিকে অবিলম্বে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না গেলে যেসব মূল্যবান গান এখনও টিকে আছে সেগুলিও অচিরেই কালের সমাধি লাভ করবে।



বেদিয়াদের বিয়ের গান—প্রসঙ্গ পুরুলিয়া

শ্রী অদ্বৈত

পুরুলিয়ার লঘিষ্ঠতম জনসংখ্যাবিশিষ্ট উপজাতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শাওরিয়া পাহাড়ি, বেদিয়া, শবর মাহালি, বীরহড় ইত্যাদি। উল্লিখিত উপজাতিদের মধ্যে বেদিয়াদের স্থান দ্বিতীয়, শবরদের পরেই। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পুরুলিয়াতেই এরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। পুরুলিয়ার বেদিয়ারা 'বা-দা', বেদা, বাদিয়া ইত্যাদি নামেও উল্লিখিত হয়। রিজলের মতে ছোটনাগপুরের বেদিয়ারা দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত কৃষিজীবী একটি ক্ষুদ্র উপজাতি (a small agricultural Dravidian tribe of Chotanagpur)। তিনি এদের সম্পর্কে আরও বলেছেন, 'The twelfth sept of the Santals which is supposed to have left behind in Champa and has long been seperated from the present tribe bears the name Bedia, and seems not improbable that the Bedias of Chotanagpur may be a branch of the Santals who did not follow the main in the wonderings East word. The tribe has nothing to do with the Bediyas of Eastern Bengal.

চম্পানগরীতে ফেলে-আসা সাঁওতালদের দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন শ্রেণিটিকে রিজলে বেদিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উক্ত সূত্রের ভিত্তিতে রিজলে বেদিয়াদের সাথে কুরমীদের একদা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে সেই সম্পর্ক সূত্র যে ছিন্ন হয়ে যায় সে কথাও তিনি বলেছেন, Bediyas are supposed to be Masiaut bhai or cousins through the maternal aunt of the Kurmis. Formerly it is said. Bedias and Kurmis intermarried but a split occurred. বর্তমানের ক্ষেত্র সমীক্ষায় কিন্তু উপরিউক্ত সূত্রের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। পুরুলিয়ার বেদিয়ারা আজও কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে প্রায় যোগসূত্রহীন উঞ্ছবৃত্তিজীবী একটি অর্ধযাযাবর উপজাতি। কুরমি বা সাঁওতালদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটা স্বীকার করে না। বরং বাগদিদের সাথে নিকট-সম্পর্কের কথা বলে।

সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকার্জনের সাবেকি পন্থাটিকে এরা আজও টিকিয়ে রেখেছে, কোনো বিকল্প পথ করে নিতে পারেনি। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে মানুষের সামনে সাপের খেলা দেখিয়ে ভিক্ষা করা এদের অন্যতম জীবিকা। গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশের সময় এরা জয় মা বিষহরি/মনসা ধ্বনি দিয়ে প্রবেশ করে। সাপের খেলা দেখানো ছাড়াও সরল হৃদয় গ্রামীণ মানুষের মনে বিষমোচনে সক্ষম, সর্পভীতিতে ত্রাণকারী, এই বিশ্বাস জন্মিয়ে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কিছু ভেষজ শিকড়-বাকড়, জড়িবুটি, তাবিজ, কবচ মাদুলি ইত্যাদিও তাদের কাছে থাকে। এ ব্যাপারে মানুষের স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত দেওয়ার মতো বাক্‌চাতুরিও এদের যথেষ্ট আছে। কেউ কেউ এদের ব্যাপারে প্রাচীন জাদুবিদ্যায় পারঙ্গমতার উল্লেখও করে থাকেন।

গাছতলায় আবাসমুক্ত হয়ে বর্তমানে এরা গ্রামের সম্পন্ন একদা জমিদারদের দাক্ষিণ্যলব্ধ একখণ্ড জমির উপর কুঁড়েঘর নির্মাণ করে বাস করে। চাষের জমি নেই বলে এদের মাটির টানও নেই। তাছাড়া কর্ষণজীবী হিসাবে নিজেদের এরা মূলস্রোতের সঙ্গেও মিশিয়ে নিতে পারেনি। দারিদ্রকে সম্বল করে একদা যাযাবর এই উপজাতিটি উঞ্ছবৃত্তি করেই জীবন কাটায়। প্রতিদিন সকাল হলেই কাঁধে তুলে নেয় একটি ছোট্ট বাঁক। বাঁকের দুদিকের শিকেয় ঝোলানো থাকে কয়েকটি ঝাঁপি। ঝাঁপির মধ্যে কয়েকটি সাপ, শিকড়-বাকড়, তাবিজ-কবচ মাদুলি, জড়ি-বুটি নিয়ে রোজগারের ধান্দায় এরা বেরিয়ে পড়ে। ফেরে সেই রাত্রে-মদ্য সেবনের নৈমিত্তিক কাজটি ফেরার পথেই সেরে আসে। নগ্নপদ কিংবা জীর্ণ চপ্পল অথবা দেশি মুচির তৈরি টায়ারের চটি পায়ে, পরনে হাওয়াই শার্ট, লুঙ্গি অথবা খাটো ধুতি অনুরূপ অবস্থায় কাঁধে বাঁক নিয়ে এদের হাটে-বাজারে গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরতলিতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। পাশাপাশি অবস্থান করা সত্ত্বেও সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে আজ অবধি এরা পুরোপুরি মিশে যেতে পারেনি। তাই আদিম জীবনাচারের রূপগত কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও আজও এরা অর্ধযাযাবর। পাখির নীড়ে ফেরার মতো বাসভূমির সাথে তাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র রাতটুকুর জন্য।

ভোর-সকাল আর সেই সন্ধেবেলা, দুবার ছাড়া রান্নার পাট নেই বলে মেয়েরা সারাদিন কর্মবিমুখ অলসজীবন কাটায়। বর্ষার মাসে ডাক পেলে চাষিদের বাড়িতে রোয়া-পোঁতার কাজ, গাছতলায় বসে মাঝে মাঝে খেজুর পাতার চাটাই বোনা একঘেয়ে জীবনচর্যায় তাদের কিছুটা বৈচিত্র আনে। শৌখিনতার যুগে, চাহিদার অভাবে বর্তমানে চাটাই শিল্পটিরও বেহাল অবস্থা। শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়েও পুরুলিয়ার বেদিয়ারা সমাজের নিম্নতম স্তরের বাসিন্দা। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে সচেতনতার প্রবল অভাব দেখা যায়। সকলকে সাক্ষর করার সরকারি নীতি তথা খাস জমি পুনর্বণ্টনের প্রক্রিয়াটি এদের মধ্যে কতটা কার্যকর হয়েছে তা যথেষ্ট মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। বর্তমানে জেলাপ্রশাসন ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। পুরুলিয়ায় পাড়া, মানবাজার, বলরামপুর, ঝালদা, পুরুলিয়া সদর ইত্যাদি থানা এলাকায় এদের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসের কথা জানা যায়।

উঞ্ছবৃত্তিজীবী বেদিয়াদের জীবনে দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট আছে। দুর্বিষহ দারিদ্র আছে, জীবন-যাপনের অনিশ্চয়তা আছে কিন্তু কোনো অভিযোগ নেই। সহজ, সরল-অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বেদিয়াদের জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধ আছে। জীবনকে উপভোগ করার উপাদান, উপকরণও আছে। প্রাত্যহিক সান্ধ্য আসরে তথা পাল-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠানে তাদের জীবনাচারের আনন্দঘন দিকটি স্ফূর্ত হতে দেখা যায়। আর্থিক দীনতা, জীবন-যাপনের রসদ সংগ্রহের অনিশ্চয়তা সেগুলির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। পারিবারিক তথা সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোকে তারা হৃদয়-উৎসারিত-রস উপাচারে ঋদ্ধ করে। এখানকার উপজাতিদের উৎসব-অনুষ্ঠানের অঙ্গ-সজ্জার উল্লেখযোগ্য আভরণ হল নাচ-গান। এখানে চলায় নাচ, বলায় গান, বাতাসে বাজে তার ছন্দ। এখানকার উপজাতিদের কোনো অনুষ্ঠান সাধারণত নাচ-গান ছাড়া হয় না। বিয়ের অনুষ্ঠান তার ব্যতিক্রম নয়। পুরোহিতবিহীন মন্ত্রোচ্চারণহীন বিবাহ-অনুষ্ঠানগুলিতে গানই মুখ্য ভূমিকা নেয়। লোক-লোকাচার ইত্যাদি বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানপর্ব সিদ্ধ হয় এই গীত দ্বারা। অধিবাস, জলসাইতে যাওয়া, গায়ে হলুদ, কন্যা-বিদায় প্রতি ক্ষেত্রে গীতগুলির অবিসংবাদী ভূমিকা রয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান—খুশির অনুষ্ঠান, আনন্দের অনুষ্ঠান। সেই আনন্দকে পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে লঘু রসের ঠাট্টা-তামাশার গানগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিবাহ অনুষ্ঠান

উপলক্ষে গীত পরিবেশনের একক ভূমিকা নারীর। বিয়েবাড়িতে মেয়েদের একাধিপত্য, 'বিহা ঘরে মা'য়া রাজা' প্রবাদটির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। বেদিয়াদের বিয়েতে সর্বাচারে গানের প্রচলন আছে। বিভিন্ন কৌমভুক্ত মানুষের পাশাপাশি অবস্থানজনিত কারণে সাঙ্গীকরণের ফলেও রীতিটি এসে থাকতে পারে। কারণ সামাজিক অবস্থান, সংস্কার-সংস্কৃতি, জীবনাচার ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়ে উপজাতিদের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিয়ের গানের মধ্যেও এই মিল প্রকৃতিগত ভাবে অত্যন্ত প্রকট। বিয়ের গানগুলি উপজাতিদের জনজীবনে নারীর গৌরবজনক ভূমিকার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। গানগুলো এদের মধ্যে শ্রুতির আকারে পরম্পরাক্রমে চলে আসছে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে।

বেদিয়াদের বিয়ের গানগুলো পর্যালোচনার পূর্বে তাদের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু আলোকপাত করার আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয়। সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে প্রথম বরপক্ষ থেকে কন্যাপক্ষের বাড়িতে যাওয়াই প্রচলিত নিয়ম। কোনো ঘটক নেই, আত্মীয়রাই কন্যা-সন্ধান দেয়। একই গোত্রে বিয়ে হয়। মেয়েদের বিয়ে দশ বছর বয়স থেকে শুরু, বেশি হলে ১৪-১৫ বছর। সম্বন্ধ পাকা করার সময় উভয় পক্ষের বাড়িতে বর ও কনের মামা, কাকা, পিসা-এঁরা যান। পাত্রী-নিরীক্ষণ আছে। পাত্রও কন্যা নিরীক্ষণে আসে। উভয় পক্ষের আশীর্বাদ আছে। কন্যাপণ আছে। সম্প্রতি বরপণও শুরু হয়েছে। প্রথমে কন্যাপণ দিতে হয় আড়াইশো টাকা। পরে বরপণের কথা। বরপণ বেশি হলে তিন হাজার টাকা, বাড়তি সাইকেল ইত্যাদি। বিয়ের অনুষ্ঠান তিনদিনের—গায়ে হলুদ বিবাহ এবং কন্যা বিদায়। বরযাত্রী ১৪-১৫ জন। মেয়েরা বরযাত্রী হয়ে আসে না। বাবা কন্যা সম্প্রদান করে। দ্বিরাগমন আছে তবে বাধ্যবাধকতা নেই। অষ্টমঙ্গলা হয়। এদের বিয়েতে কোনো পুরোহিত নেই। নাপিতরা অধিকাংশ কর্ম সমাধা করে। এ ব্যাপারে Risley-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল: In their marriage a barbar officiates as priest.

বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেলে পর উভয় পক্ষের বাড়িতে বসে যায় গানের আসর, চলতে থাকে বিয়ের দিন পর্যন্ত।

(১)

হুরহুরা হাওয়া দিছে কফিবাড়ির ভিতরে
কন্যার বাবা ঘুমায় আছে মুচি ঘরের দুয়ারে।

(২)

হুরহুরা হাওয়া দিছে কফিবাড়ির ভিতরে
বরের বাবা ঘুমায় আছে লেপ পালঙ্কের উপরে।

অধিবাসের গান, জল খাইতে যাওয়ার গান, বরকে হলুদ স্নান করানোর গান, কন্যা বিদায়ের গান, হাস্য-পরিহাসের গান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার গানে বিয়েবাড়ি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বর্তমান প্রবন্ধে বেদিয়াদের বিয়ের গানের মধ্যে হাস্য-পরিহাস, লঘু তামাশার গানগুলিই বিশেষভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। চার চরণে নিবদ্ধ গানগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিলযুক্ত অক্ষরবিন্যাস ও গ্রন্থনা, যমক, উপমা ইত্যাদি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ বিস্মিত করে। প্রচলিত ঝুমুর গানের সঙ্গে গানগুলোর গ্রন্থনাগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশের সরলতা গানগুলোকে অধিক সংবদেনশীল করে তোলে। প্রথাগত শিক্ষার আলোক থেকে দূরে থাকা নারীদের দ্বারা সৃষ্ট গানগুলোর মধ্যে উন্নত সাহিত্য রসচেতনার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। গানগুলো মানভূমি

ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দিশারী হতে পারে। বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় বলে বিয়ের গানগুলিকে শুদ্ধ বাংলায় ব্যবহারিক সঙ্গীত নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পুরুলিয়ায় লৌকিক গানমাত্রকেই গীত বলে। বিয়ের গানকে বলে 'বিহাগীত'।

হই-হুল্লোড়, আমোদ-প্রমোদ, হাসি-মশকরা নিয়েই বিয়েবাড়ি। আমোদ আহরণে বরযাত্রী, বর, বরের বাবা, কাকা, মামা ইত্যাদিকে কটাক্ষ, বক্রোক্তি, ঠাট্টা-তামাশায় বিদ্ধ করে সে আসরটি সাজানো হয়, তারাই তার কুশীলব। নির্মম-সরলতা দিয়ে সেগুলি হজম করে তারাও তার অংশীদার হয়ে যায়। লঘু তামাশার সাজানো আসরটি বিয়ে বাড়িতে প্রায় সকলের মধ্যেই দেখা যায়। তবে কেউ সাজায় গানে, কেউ বা বাক্যবানে, কুশীলব একই থাকে। অনেকে আবার অতি মাত্রায় রঙ ইত্যাদি মাখিয়েও এই রস আস্বাদন করে। এ ব্যাপারে বরযাত্রীদেরকে নিয়ে বেদিয়াদের গানে কোথাও তাদের মাতাল, কোথাও রাতকানা, কোথাও বা চোর আখ্যায় বিদ্ধ করা হয়েছে।

(১) মদ আছে ড্রামে গো
ভালপাহাড়ির গ্রামে,
সেও অত মদ খাঁয়ে গেল গো
জোড়হীড়ার মাতালে।

(২) ফুলকপি বাঁধাকপি
শাগের বড় দর গো
জোড়হীড়ার লোকগিলা
এক নম্বর চোর গো।

(৩) কনার মাই কনার মাই
চুনের হল কারখানা
জোড়হীড়ার লোকগিলা
দিনে হল রাতকানা।

পাড়া থানার একটি গ্রাম ভালপাহাড়ি। জোড়হীড়া বাঁকুড়া জেলায় শালতোড়ার পাশাপাশি। ভালপাহাড়ির বেদিয়াদের আত্মীয়তা সম্পর্ক সম্ভবত জোড়হীড়াতেই অধিক। জোড়হীড়ার বরযাত্রীদের জন্য আপ্যায়নের আতিশয্য যে কম নয় তা ভালপাহাড়ি গ্রামে ড্রামে মদ রাখার উল্লেখে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় অত মদ সাবাড় করা। যারা করল তাদের মাতাল বলে হেয় করার কটাক্ষটুকু যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রাপ্য।

মদ বেদিয়াদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যহ মদ না হলে তাদের চলে না। সারাদিনের ভিক্ষালব্ধ আয়ের অনেকটা অংশই নেশার পিছনে ব্যয় হয়ে যায়। মদ খেয়ে সন্ধেবেলায় আমোদ-প্রমোদ করা এদের নিত্যকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মদ সকলেই খায়। এব্যাপারে তাদের কোনো আড়াল-আবডাল বা সামাজিক বিধিনিষেধ নেই। তাই মদের কথা তাদের বিয়ের গানের মধ্যেও এসেছে। তবে অতিরিক্ত মদ্যপায়ীর যে কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই, ঘৃণা বা অবহেলার পাত্র তার ইঙ্গিত উপরিউক্ত গানের 'মাতাল' শব্দটিতেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

দ্বিতীয় গানটিতে জোড়হীড়ার বরযাত্রীদের এক নম্বর চোর বলা হয়েছে। ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্কিত ব্যক্তিদের তার সন্তান বা সন্তানতুল্য আপন জনের কাছে চোর বলে মজা নেওয়ার রীতিটি লঘু তামাশার একটি প্রাচীন গ্রামীণ কৌশল। গ্রাম্য সমাজে চোর যে অতিনিন্দিত তার যে কোনোরূপ

সামাজিক স্বীকৃতি নেই তার উজ্জ্বল উদাহরণ গানটি। শেষ গানটির ধাঁচে কথা বলার চল এখনও গ্রামেগঞ্জে কিছু কিছু শুনতে পাওয়া যায়। 'লোক রাতে কানা, তুঁই যে দিনেই কানা'। সাধারণত গালি, নির্বোধ বা বোকা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বিয়েবাড়ির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান বর এবং বরের বাবার। বরের বাবা তখন বরকর্তা। পোশাকে-আসাকে, চাল-চলনে তখন সে অন্য ভূমিকায়। তাই তূণের সুতীক্ষ্ণ শরগুলো তাকে লক্ষ করে বর্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাদেরকে কেন্দ্র করে গানের সংখ্যাধিক্য সে কথাই সূচিত করে।

(১) দুয়ারের আঁজির গাছটা
কালি কলমে সাজাব,
বরের বাবা মূর্খ বঠে গো
লেখাপড়া শিখাব।

(২) নুনীর শ্বশুর নুনীর শ্বশুর
চুঙ্গী খাপরার ঘর আছে,
দিব বলে সবার কাছে
ভিতর মনে খল আছে।

(৩) কনার বাবার পাগ-পাগড়ি
দেখায় যেমন জড়া-সিপাহি
বরের বাবার পাগ-পাগড়ি
দেখায় যেমন মহিষ ব্যাপারি।

উপরিউক্ত গানগুলোর উদ্দেশ্য বরকর্তাকে তাতিয়ে তোলা। কোথাও তাকে মূর্খ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোথাও তাকে সম্পন্ন তবে উদারমনা নয়, খলমন অর্থাৎ কৃপণ বলা হয়েছে। কোথাও আবার কনের বাবার সঙ্গে তুলনায় তাকে মহিষ ব্যাপারি বলে নিন্দিত করা হয়েছে। 'ম' স ব্যাপারি' 'কাড়াবাগাল' শব্দগুলি গ্রামাঞ্চলে পোশাকে-আশাকে শৌখিনতার অভাব, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ সম্বোধনে ঠাট্টা-তামাশা করা প্রচলিত গ্রামীণ রীতি, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিছক রাগানোর প্রয়োজনে। প্রথমোক্ত গানটিতে শিক্ষাবিমুখ বেদিয়া সমাজে শিক্ষা চেতনা জাগানোর ইঙ্গিত থাকতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতেও বেদিয়া সমাজে শিক্ষার হার অত্যন্ত নিম্নতম স্তরে অবস্থান করছে। শিক্ষার উপাদান উপকরণগুলি প্রত্যক্ষীভূত হলে যদি শিক্ষা চেতনা জাগানোর ইঙ্গিত থাকতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতেও বেদিয়া সমাজে শিক্ষার হার অত্যন্ত নিম্নতম স্তরে অবস্থান করছে। শিক্ষার উপাদান উপকরণগুলি প্রত্যক্ষীভূত হলে যদি শিক্ষা চেতনা বাড়ে এই আশায় সম্ভবত দুয়ারের আঁজির গাছে সেগুলি সাজাবার কথা বলা হয়েছে।

আঁধার ঘরের বিজলি বাতি
নুনীর হাতে টর্চ বাতি
টাকা দিয়ে জামাই পায়েছি
বরের বাপের মুরাদ কি?

বক্তব্যটি কনের মায়ের। গানটিকে পণপ্রথারূপ সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদীগীত হিসাবে উল্লেখ করা চলতে পারে। গানের ভাষা তাই বলে। আর সেই ভাষায় জোরালো প্রতিবাদ এসেছে এমন এক সমাজের মেয়েদের মুখ থেকে যাদের সমাজে কয়েক দশক আগেও বরপণ প্রচলিত

ছিল না, ছিল কন্যাপণ। বেদিয়া সমাজে আজও সর্বাধিক আড়াইশ টাকা দিয়ে প্রথমে কনেকে কিনে নিতে হয় তারপর বরপণের প্রসঙ্গ। মুরাদ শব্দটির বক্রোক্তি পুরুষকার ব্যক্তিত্বে তীব্র আঘাত করে। যে বরের বাপ ছেলে বিক্রি করে টাকা নেয় তাকে উপযুক্ত শব্দেই সম্বোধিত করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ সমাজেও অনেক ক্ষেত্রে কন্যাপণ প্রথার প্রচলন ছিল। তখন রাজগণ ও ধনবান ব্যক্তিরা দরিদ্র ব্রাহ্মণদের বিবাহ দিয়ে পুণ্যার্জন করতেন। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত কন্যাপণের বিষে জর্জরিত ছিল। ওইসব সমাজে কন্যাপণ সংগ্রহ করতেই অনেকে প্রৌঢ়ত্বে উপস্থিত হত। বর্তমানে বরপণ প্রচলিত হওয়ায় মেয়েদের ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা দেখা দিয়েছে।

ই বছরের খরা অঞ্চলে
কন্যার বাবা ভোটে দাঁড়ায়ছে,
দেশে দেশে খবর ছাপাব গো
বরের বাবা ভোটে হা'রেছে।

রুকনী ষ্টেশন্ ধারে
রুপু পাখী খঁদা করেছে
বরের বাবা এত লালহা
ডুমুর পাকায় মুড়ি শানেছে।

কনের বাবার প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে ভোটযুদ্ধে বরের বাবার পরাজয়ের খবরটি দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার মতোই বটে। প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষেত্রেও বরের বাবার যে জনসমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে কনের বাবার মতো জনহিতকর কর্মের কোনো সুযশ-সুখ্যাতি নেই, গানটিতে পরোক্ষে সে কথাই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় গানটিতে বরের বাবাকে প্রচণ্ড লোভী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মুড়িতে মাখার উপকরণ ডুমুর পাকা নয়—দুধ, দই, ঘোল, চপ, পকোড়ি ইত্যাদির অভাবে তেল লঙ্কা। কিন্তু বরের বাবা এত লোভী যে ডুমুর পাকা মেখে মুড়ি খাচ্ছে—ঘটনাটি প্রবল হাসির খোরাক জোগাবার মতোই বটে। বরকনে উভয় বাড়িতেই বিয়ের গানের আসর বসে। গানগুলির ভাষা এক—বরের বাড়িতে বিদ্রূপ বক্রোক্তির ক্ষেত্রটিতে কনের বাবার নাম, কনে বাড়িতে বরের বাবার উল্লেখ পরিবর্তন শুধু নামের ক্ষেত্রটিতেই।

বরের কাকাকে নিয়েও আক্রমণের ধার কম নয়। নীচের গানগুলোতে তার উল্লেখ সুস্পষ্ট করে।

বর আসুক বৈরাত আসুক
বরের কাকা যেমন আসে নাই,
বরের কাকা ধুতি ফরকা
আমার দেখে গো সহায় নাই।

আলু চাকা চাকা বাবা
আলু চাকা চাকা
তোর বাপের ভাই নাই খেরে ববা
কাকে বলবি কাকা বরা কাকে

বরের কাকার পোশাকে-আশাকে শৌখিনতা। ধুতি পরার বাহার তাকে বিয়েবাড়িতে অসহনীয় করে তুলেছে। তার এই আভিজাত্য দরিদ্র বেদিয়া সমাজে ভীষণ বেমানান লাগে। এ যেন সেই লোকপ্রবাদের 'লাপতে নাই ফাটা পাইটা' কিংবা 'ঘরে নাই ভাত দুয়ারে বাজছে ঢাক' এর মতো। তাই বিয়েবাড়িতে বরের কাকার আসা বারণ। দ্বিতীয় গানটিতে আক্রমণ বরকে হলেও প্রসঙ্গ কাকাকে নিয়ে। বরের কাকা নেই ফলে স্নেহ-আদর পাওয়ার ক্ষেত্রে বরের একটি বড় আকারের আধারহীন ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। সেই দুর্বল জায়গায় বরকে আক্রমণ করে আঘাতের তীব্রতা বাড়ানো হয়েছে।

বরকে কেন্দ্র করে বিদ্রুপাত্মক গানের সংখ্যা কম নয় বরং তুলনামূলকভাবে অধিকই বলতে

হয়। বর পৌঁছানোর পর থেকেই তার সূচনা।

ছুটু গাড়িটা উপরে ঝাঁঝরা
বাবা উপবে ঝাঁঝরা
বরবাবু বসে আছে গো
ফুলা ব্যাঙের পারা।

আকুচি বাকুচি জিলপী
ছা কব বাদাম তেলে
তোর মামরে গেলেরে বরা
কাঁদবি গলায় ধরে।

যে বর বিয়ে করতে আসছে একটা ছোট্ট গাড়িতে চেপে, যার ছাদটা ঝাঁঝরা। সেই গাড়ির ভিতরে উচ্ছলতাহীন ফুলা ব্যাঙের মতো গুম হয়ে বসে থাকা বরটি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র হওয়াই স্বাভাবিক। জীবিত মার মৃত্যুর কথা বলা এমনিতেই রেগে যাওয়ার ব্যাপার, তার উপর মা মারা গেলে কেমন করে কাঁদবে সে দৃশ্যের অবতারণা করে আরও অধিক উত্তেজিত করার প্রয়াসটি লক্ষণীয়, যা দ্বিতীয় গানটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। স্বামী নিবার্চনের ক্ষেত্রে মেয়েদেরও একটা অন্তর্মুখী পছন্দ-অপছন্দের ভাবনা থাকে যার প্রতিফলন নিম্নে উদ্ধৃত গানটির মধ্যে লক্ষ করা যায়।

হাট যাবি বাজার যাবি
বাবা আনবে মটর ভাজা
হীরো দেখে জামাই করবে বাবা
যতই লাগুক টাকা গো।

পণ যতই লাগুক পাত্রটি সুশ্রী, সুশোভন এবং চনমনে স্বভাবের হতে হবে। সেটি ফুলা ব্যাঙের পারা হওয়া চলবে না। বাবা এবং ওই সম্পর্কিত ব্যক্তিদের তুই-তোকারি করে কথা বলা পাড়া থানার একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। গানটিতে Hero Worship-এর ভাবনা লক্ষ করা যায়।

এত এত বরাত গেল বরা
পুয়াল কুঁড়ে ডেরা
তোর যদি ভাই থাকত রে বরা
ঘরে দিত ডেরা বরা ঘরে দিত ডেরা।

দাতন কুচি কুচি দাতন কুচি কুচি
ঘন মুখটায় গাল দিবি বরা।
সেই মুখটায় কুচি বরাসেই মুখটায় কুচি।

বরের ভাই না থাকাকে কেন্দ্র করেও গান তার সেই অভাববোধে আঘাত করা। গালমন্দ থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ কুচানির শাসানিও বরকে পেতে হয়। আর বেচারা বরকে সেগুলি নীরবে হজম করে যেতে হয়।

প্রেম-ভালোবাসার বিয়েতে যে সামাজিক স্বীকৃতি নেই, বাল্যবিবাহে বরের পক্ষ থেকে যে প্রতিক্রিয়া তার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় বিয়ের গানগুলোতে।

আকন ফুল তুলিতে যাঁয়ে
বরে ক'নায় দেখা গো।
ঘরে ঘরে ঘর জুড়েছি বাবা
না হয় যেন কথা গো।

নদীধারে ফুল কুমারী
ফুল তো ফুটে নাগো
ভ্রমর মালী কন্যা দেখে
বরের মন তো মানে নাগো

আকন্দ ফুলের মালা উপজাতিদের বিয়েতে একটি অপরিহার্য উপকরণ। সেই আকন্দ ফুল

তুলতে গিয়েই কিশোর-কিশোরী দুটি হৃদয়ের পাশাপাশি আসা। সেই সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়ার পালাটিও ঘটে যায়। কিন্তু এ ধরনের বিয়েতে পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে, সমাজ নিন্দা-মন্দ করবে। সেই ধরনের একটি সামাজিক রীতির উল্লেখ গানটিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গানটি বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধী। গানটির ভাব-ভাবনা শব্দচয়ন, রূপক ও যমক অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ চমৎকৃত করে। বর-কনের বয়সের অসমতা যে কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে গানটিতে তার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। জেলার প্রচলিত টাঁড়ঝুমুরেও অনুরূপ ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। 'এতটুকু মরিচ গাছটি কতই যতন করব, তুই ধনি ফুলমণি তোকেই সাঙ্গা করব।' এই যতনের মধ্য দিয়ে অতৃপ্ত মনের রত্ন-অভীপ্সাটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিয়ের নাটকের অন্তিম পর্বটি বিয়োগাত্মক, বিষাদময়। কন্যা বিদায়ের পালা, কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। শকুন্তলার কাল থেকে দৃশ্যগ্রাহ্য পর্বটি আজ অবধি সর্বস্তরে একই ধারায় প্রবহমান। আসন্ন বিচ্ছেদের কাতরতা বেদেদের বিয়ের গানগুলোতে এক করুণ মূর্ছনা এনে দিয়েছে। ভাবপ্রকাশের সরলতা বেদনাকে আরও অধিক মর্মস্পর্শী করে তোলে। কনের মা, বাবা, ভাই-বোন, বান্ধবী, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই হৃদয় এই বিশেষ মুহূর্তটিতে বেদনাতাড়িত, চোখে অশ্রুর নির্ঝর।

বাবায় বলে বিদায় বিদায়
মায়ের ছাতি গো ফা'টে যায়।
দাদায় বলে শিশু বহিন গো
পাছে রাস্তায় কাঁদে যায়।

ইখব ভালি উখব ভালি
নুনীর ফটোটা
কেমনে ভুলিব আমরা
নুনীর মুখের হাঁসিটা

বাবা বিদায়ের কথা বলতেই মায়ের বুক ব্যথায় বিদীর্ণ হচ্ছে। ছোট বোন যাবার সময় পাছে রাস্তায় কেঁদে যায় এই ভাবনা দাদাকে আকুল করে তুলেছে। দ্বিতীয় গানটিতে পতিগৃহে চলে যাওয়ার পরে মেয়ের স্মৃতি কন্যাশূন্য গৃহে মায়ের মনে যে মর্মপীড়া জাগায় তারই একটি বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত। ঘরের মধ্যে সদাহাস্যময়ী মেয়েটির ফটো অনুসন্ধান — কন্যা গৃহে না থাকার অভাববোধ মাতৃহৃদয়ের সান্ত্বনা, সদা জাগরূক কন্যার স্মৃতি ভুলে থাকার প্রয়াস।

গবর কুঁড়ায় ছাঁছা ধরে
কেন দাঁড়ালে
এমন দুশমন ছিলে নুনী
জোড়হীড়ায় কেন বিকালে।

সঙ্গী সাথী ছিলি আমরা
মানিক জোড়ের পারাগো,
এমনি আমাদের ভাঙ্গা কপাল
হেলা সঙ্গী ছাড়া গো।

প্রথম গানটিতে দূরে মেয়ের বিয়ে হওয়ার ব্যাপারে মায়ের আক্ষেপোক্তি। সামনা-সামনি বিয়ে হলে মাঝে মাঝেই মেয়েকে দেখার সুযোগ হত। দূরের ব্যাপার দশে-মাসে মেয়েকে হয়ত একবার দেখতে পাওয়া যাবে। মায়ের কাছে এ যেন মেয়েকে নির্বাসন দেওয়া। দ্বিতীয় গানটিতে কন্যা-বিদায়ের প্রাক্কালে একসাথে আবাল্য খেলাধুলা করা, ঘোরাফেরা করা, সর্বসময়ের সঙ্গী-সাথীদের মনেও আসন্ন বিচ্ছেদবেদনার কাতরতা কতখানি প্রভাব ফেলেছে তারই দৃষ্টান্ত উপরিউক্ত গানটি। কন্যা-বিদায়ের প্রাক্কালে বিদায়কে কেন্দ্র করে যে অশ্রুভেজা পরিমণ্ডলটি তৈরি হয় তার ভোক্তা শুধুমাত্র আপনজনেরাই নয়, গ্রামময় নারীহৃদয়ে তার স্পন্দন জাগে, মমত্ববোধে কয়েক ফোঁটা অশ্রু সেদিন তাদের চোখ দিয়েও আপনা হতে ঝরে পড়ে। একদা প্রচলিত গ্রামীণ সমাজ-চেতনার

এটা একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক যা সহমর্মিতা তথা ঐক্য-ভাবনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণ চালচিত্রের বর্তমান অবস্থাটি একান্তভাবে অনুসন্ধাননির্ভর।

বেদিয়াদের হৃদয়রসে সিক্ত প্রচলিত ব্যবহারিক গীতগুলো জীবনমুখী, কানুভাবনামুক্ত, এতদঞ্চলের জল, মাটি হাওয়ার পেলব স্পর্শ মাখানো। গীতগুলো শুদ্ধ বাংলা থেকে স্বতন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সমৃদ্ধ পরিচয়ে উজ্জ্বল। সরলতায় মোড়া গানের কথায় মানবিক মূল্যবোধ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক চিত্রপট সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। গানের নির্মিতিও কম অবাক করার মতো নয়। বেদিয়াদের ব্যবহারিক গানের সঙ্গে এতদঞ্চলের ঘাসী, শবর ইত্যাদি বনবাসী এবং অন্যান্য উপজাতিদের গানের বিষয়বস্তু ও রূপগত সাদৃশ্য বহুলাংশে প্রকট। পাশাপাশি দীর্ঘ অবস্থানের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে বলে অনায়াসে অনুমান করা যায়। বিষয়টি এতদঞ্চলে বেদিয়াদের বসবাসের প্রাচীনতার ভাবনাকে প্রকট করে।

জঙ্গল মহলের পুরুলিয়া বনাঞ্চলে বেদিয়াদের অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়ার কারণ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। এই খণ্ড জাতিটির অতীত ইতিহাস খুব একটা স্পষ্ট নয়। তাদের অতীত ইতিহাস কি কোনো বিশেষ জাতিসত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে? এরা কি পথ হারানো তাদের কোনো বিচ্ছিন্ন শাখা। বেদিয়াদের নিয়ে গবেষণাধর্মী কোনো আলোচনা আজ অবধি তেমন নজরে পড়েনি। ফলে সুনির্দিষ্ট পথের অভাবে শিকড়ে পৌঁছানোর জটিলতা সব সময়েই থেকে যায়। বেদিয়ারা নিজেদের সর্পবৈদ্য বলে। সর্পবৈদ্য থেকেই বেদিয়া কথাটি এসেছে বলে তাদের অভিমত। অস্ট্রিক ভাষায় লাঢ় অর্থে সাপ। বেদিয়াদের জীবনবৃত্তটি সাপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই অধিক সরীসৃপ অধ্যুষিত এই নাগলোককে তাদের জীবন-জীবিকার স্বার্থে বসবাসের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচিত করেছিল বলে মনে হয়।

সর্প প্রসঙ্গে বেদিয়ারা আদিতে বজ্রযানী বৌদ্ধদেবী জাগুলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিনা ভেবে দেখার বিষয়। জাগুলী বিষমোচয়িত্রী সর্পদেবী, বীণা বাদনরতা। চর্যাগীতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। জাগুলীর সাথে অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণে উল্লিখিত বিষনাশিনী সরস্বতীর অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিষমোচয়িত্রী দেবীর উপাসনা বেদিয়ারা যে প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে সে কথা তারা নিজেরাই বলে। তাদের কথায় জালু-মালু যে মনসার স্বর্ণবারি জোড়াঘট পেয়েছিল সেটা তাদেরই ভাসানো ঘট। চর্যাগীতে উল্লিখিত শবর, ডোম ইত্যাদি অনুন্নত সম্প্রদায়ের ন্যায় অনিকেত গাছতলাবাসী বেদিয়ারাও জঙ্গলের দেবী জাগুলীর সেবক হিসাবে বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসে থাকতে পারে। তাবিজ, কবচ, তুকতাক, মন্ত্র, জড়িবুটি, ইন্দ্রজালবিদ্যা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর মধ্যে বেদিয়াদের তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট। জীবনাচারের উপরিউক্ত দিকগুলো পর্যালোচনা করলে তাদের বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসার ভাবনা কষ্টকল্পিত হবে বলে মনে হয় না।

বেদিয়ারা দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত বলে পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত। এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত সর্প বা সর্পদেবী মনসার পূজা দ্রাবিড় থেকে আগত বলে অনেকের অনুমান। জাতিসত্তা সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে বাহকদের মধ্যে বেদিয়াদেরও রাখতে হয়। দ্রাবিড়ের স্বপক্ষে আরও বলা যায় জাঙ্গুলী বোধিসত্ত্বকে বিষমোচনের যে মন্ত্রটি শিখিয়েছিলেন সেটিও দ্রাবিড় ভাষাসম্ভূত

হ'ল্লা চিল্লা চক্কো বক্কো কোডা কোডেতিচ মোডা মোডেতি
কুরুডা কুরুডেতি।
নিকুরুডা নিকুরুডেতি পুরুডা পুরুডেতি নিপুরুডা নিপুরুডেতি
ফুট্টে ফুট্টে রূহে ফুট্ট টুটুণ্ডরূহে নাগে নাগ রূহে নাগ টুটুণ্ডরূহে

সর্পে সর্পরূহে সর্ব টুটুগুরূহে অচ্ছে অচ্ছলে ইলবিকল বিষে
শীতে শীতে বত্তালে।
হলে হলনে তুণ্ডে ভুতুণ্ডে তণ্ডিতে তণ্ডিতট্টে
তট্ট স্ফুট স্ফুটতু বিষং স্বাহা।

বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ সাধনমালায় উল্লিখিত মন্ত্রটিও দ্রাবিড় ভাষাসম্ভূত—
ওঁ ইলিমিত্তে তিলিমিত্তে ইলিতিলিমিত্তে দুম্বে দম্বালিয়ে
তর্কে তর্করণে মর্মে মর্মরণে কাশ্মীর কাশ্মিরমুক্তে অখে অখনে
অপ্যাই এ শ্বেতে শ্বেততুণ্ডে অননুরক্তে স্বাহা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাপকে কেন্দ্র করে ঝাঁপান অনুষ্ঠানটি দ্রাবিড়ভাষীদেরই প্রাচীন সংস্কার।

অতি সম্প্রতি পাড়া পঞ্চয়েত সমিতির উদোগে ভালপাহাড়ির চোদ্দটি দুস্থবেদিয়া পরিবারকে আধ শতক জায়গার উপর পাকা বাস্তুবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি পরিবারকে একবিঘা করে চাষের জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছে। উদ্যোগটি অতীব প্রশংসনীয়। বেদিয়াদের সুস্থিত জীবনযাপনে প্রেরণা জোগাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাংলার লোকসঙ্গীতে নারীভাবনা—ড. জয়ন্তী ভট্টাচার্য
২। দামুন্দা কপিশা শিলাবতী—শক্তি সেনগুপ্ত
৩। সুভদ্রা, মেনকা, সনি, ধনিয়া বেদিয়া—ভালপাহাড়ি (পাড়া)
৪। সুধীর বেদিয়া, অপিন্দ সর্পধর—ভালপাহাড়ি (পাড়া)
৫। সতীশচন্দ্র মাহাত—ভালপাহাড়ি (পাড়া)
৬। মিলন বেদিয়া—লুহারশোল (পুরুলিয়া)
৭। সাধন মাজী—সাঁওতালডি।



সৃজক পরিচিতি

ধ্রুব দাস—পুরুলিয়ার রুক্ষ্ম মাটিতে জন্ম ১৯৪৪। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পীর অসংখ্য ভাস্কর্য সৃষ্টি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। শিল্পীর নিজস্ব প্রচেষ্টায় "কলা-নিকেতন শীর্ষক' ভ্রাম্যমান শিল্প প্রদর্শনীর একমাত্র প্রবর্তক। ভারতবর্ষে যার প্রদর্শনীর সংখ্যা প্রায় ৩০০শ এর উপর। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য চারুকলা পর্যদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়— পুঞ্চা থানার বাগদা গ্রামে। ৮.৯.১৯৩৮ সালে জন্ম। প্রথম শ্রেণী পেয়ে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পি.এইচ.ডি ও ডি.লিট ডিগ্রি পান। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার ইতিহাস রচনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন।

নকুল মাহাতো—১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মানবাজার থানার বামনী গ্রামে জন্ম। লৌলাড়া আর.সি. একাডেমি থেকে মেট্রিক ও পুরুলিয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর ১৯৪৩-৪৪ সালে নপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। বরাবাজার থানার সিঁদরী এম.ই. বিদ্যালয়ে ১২ বৎসর শিক্ষকতা করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভূতাম এম.ই. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অবিভক্ত ভারতের কমুনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত হন এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। পার্টি বিভাজন হওয়ার পর ১৯৬৪ স্যালে বলরামপুরের সম্মেলনে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির (মা) জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। এখনও সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। জেলার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জগতের অবিসংবাদী বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা। আজীবন আপামর জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলেছেন। অসংখ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধের রচয়িতা বিশ্লেষণের দক্ষতায় ও তথ্য, তত্ত্বের সংযোজনায় প্রবন্ধগুলি বিশিষ্টতালাভ করে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বসু— মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে ১৯৩৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ও রিসার্চ স্কলার। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি.। বিষয়—মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থার কিছু দিক। খড়্গপুর কলেজ ও পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজের প্রাক্তন রীডার। বাংলার ইতিহাস বিষয়ক বহু প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা

অনিলকুমার চৌধুরী—১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্ত্তিক (১৯২৩ খৃ) জন্ম পুরুলিয়া শহরে। পুরুলিয়া জেলার প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিশিষ্ট অনুসন্ধিৎসু, গবেষক ও লেখক। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সংগ্রহশালার (জেলা সংগ্রহশালা) প্রধান সংগ্রাহক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

জলধর কর্মকার—১/১/১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বলরামপুর থানার নন্দুড়ি পো: নামশোল, জেলা পুরুলিয়া জন্ম। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে বলরামপুর ফুলচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের সাঁওতালী অনুবাদ ও "স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী" এই দুটি গ্রন্থরচনায় নিয়োজিত আছেন।

সুদীপ্তা মুখার্জী—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়ে বাঁকুড়া জেলার অমর কাননের গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা হিসাবে কর্মরতা আছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

অশোক চৌধুরী—জন্ম পুরুলিয়া শহর। মৃত্যু ৮।৮।১৯৮৪। সাংবাদিক ও সমবায় আন্দোলনের নেতা। 'সমবায়ের কথা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অকৃতদার। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক ছিলেন। অবিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। পিতা ঁসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মাতা ঁইন্দুপ্রভা চৌধুরী।

ডঃ সুধন্বা দরিপা—জন্ম পুরুলিয়া শহর। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি। গবেষণার বিষয়— পুরুলিয়ার জনজাতি। 'চোদ্দশ সাল' পত্রিকার সম্পাদক।

দিলীপকুমার গোস্বামী—পুরুলিয়া জেলা কাশীপুর থানার সুতাবই গ্রামে ১৯৫৩ সালে ৩১শে ডিসেম্বর জন্ম। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গড়জয়পুর আর বি.বি. উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। ১৯৯৭ সাল থেকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের 'জেল সংগ্রহশালা'র দায়িত্ব পালন করছেন। 'পুরুলিয়ার মন্দির' ১৯৯৯ পুরুলিয়া বইমেলা গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদিত গ্রন্থ রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'পঞ্চকোট ইতিহাস' ২০০৩ পুরুলিয়া বইমেলা।

ডঃ শান্তি সিংহ —জন্ম ১৯৪৫ সালে, (১৩৫২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা আষাঢ়) বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে ভূতেশ্বর গ্রামে। বিশিষ্ট কবি ও গবেষক। বর্তমানে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। সর্বপ্রথম গবেষণা গ্রন্থ 'লোকসঙ্গীত সংগ্রহ : ঝুমুর'। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এবং বিদ্যাসাগর নিয়েও অভিনব গবেষণা করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থও আছে এ বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত বসন্তরঞ্জন রায়ের জীবনী গ্রন্থের লেখক।

ড: দীপকরঞ্জন দাস— ১৯৩৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বীরভূম জেলার রামপুরহাটে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পি.এইচ.ডি। ১৯৬৭ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিষয় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি মন্দির ও স্থাপত্যশিল্প বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধের রচয়িতা। পুরুলিয়ার মন্দির বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ—বর্তমান প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ।

সুভাষ রায়—জন্ম ১৯৬৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার চেলিয়ামায় জন্ম। দীর্ঘ ১৮ বৎসর 'অনৃজু' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। বাংলা ও ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়ে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত আছেন। সম্পাদিত গ্রন্থ—(১) মানভূমের লোকনৃত্য ও (২) ঝুমুর ও তার নানা দিক'—এই দুটি গ্রন্থ প্রশংসিত হয়েছে।

উৎপল মাহাতো—হুড়া থানার থানার নডিহা গ্রামে ১৯৬৩সালে জন্ম। বর্তমানে সোনাথলী কালাপাথর উচ্চতর বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখেন—কিন্তু কম লেখেন। নিজের রচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে—'সেই তো চলেছি একই দিকে' (১৯৯৭)।

শ্যামলকুমার মণ্ডল—হুড়া থানার কলাবনী গ্রামে ১.৩.১৯৭২ সালে জন্ম। ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত আছেন। পুরুলিয়ার ইতিহাসে গভীর আগ্রহবশতঃ গ্রামে-গঞ্জে ভ্রমণ করে বহু অনালোচিত বিষয় আলোকে আনছেন।

ড. সুধীর করণ—ঝাড়খণ্ড রাজ্যের (পূর্বতন বিহার) সিংভূম জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে ৩১.১২.১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। পুরুলিয়া জে. কে. কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক (১৯৫৭-৬৪)। ১৯৬১ সালে P.hd. ডিগ্রি পান। ১৯৮৪-১৯৮৯ পর্যন্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার ও এশিয়াটিক সোসাইটির (১৯৯০-১৯৯৪) সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করেছেন। বিখ্যাত গ্রন্থ—'সীমান্ত বাংলার লোকযান।' 'সীমান্ত রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাংলার গ্রামীণ শব্দকোষ।' লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের গবেষক হিসাবে সারা রাজ্যে সম্মানিত।

মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি—।ষাটের দশকের উজ্জ্বল কবি-ব্যক্তিত্ব মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ ৩৪ বৎসর কবিতার কাগজ 'কেতকী' সম্পাদনা করে আসছেন। পুরুলিয়া জেলার কবিতা আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকার সফল অংশীদার কবি-সৈনিক। কবিতা, প্রবন্ধ, কাব্যনাটক, ছড়া লেখেন। দেশি-বিদেশি ভাষার বহু কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। দু'বাংলার বহু নামি-দামি পত্রপত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। ১৮টির বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্বর্ধিত ও সম্মানিত হয়েছেন।।

জগবন্ধু ভট্টাচার্য— জন্ম মানভূম জেলার চায থানার সতনপুর গ্রামে ১৯.৪.১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ৮.৬.১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে । মানভূম জেলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। বহুবার কারাবরণ করেছেন। জেলার লোকসংস্কৃতি, লোকগীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বহুবার কারাবরণ করেছেন। জেলার লোকসংস্কৃতি, লোকগীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময় রঘুনাথপুরে পুলিশের লাঠি খেয়ে পঙ্গু হয়ে যান—বাকি জীবন সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন নি। বিহারের শাষকবর্গ তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁকে 'বোকারো রত্ন' উপাধি দেওয়া হয়। শেষ জীবনে গ্রামের বর্হিদেশে 'গীতা ভবন' নামক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন।

সুদিন চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও প্রবন্ধকার।

শ্রী বিজয় পান্ডে—জন্ম ১৯৪০ সালের ৬ই জুলাই বাঁকুড়া জেলা খাতড়া থানার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রান্তিক গ্রাম গুণিয়াড়ায়। দুবড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩৮ বৎসর শিক্ষকতা করে অবসর নিয়েছেন। পুরুলিয়া ও কলকাতার অসংখ্য পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। কিছুদিন ছত্রাক পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। 'মানভূম লোক সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ (১ খণ্ড) নামক পুস্তকের রচয়িতা।

ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা—বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার ফুলকুসমা গ্রামে ২৪/২/১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও পি.এইচ. ডি. (১৯৭৭) ও ডি.লিট (২০০০) পান। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। বর্ত্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ৫টি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। 'মানভূম' লোকসংস্কৃতি পুরস্কার' ও 'ছাতনা' চণ্ডীদাস পুরস্কার পেয়েছেন।

সুবোধ বসুরায়—১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া শহরে জন্ম। শিক্ষালাভ কলকাতার স্কটিশচার্চ, সেন্টপলস্, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৮-এ। পুরুলিয়ার নবপ্রতিষ্ঠিত জে.কে. কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। কর্মজীবন কাটে প্রিয় কলেজটিতে অধ্যাপনা করে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মানভূম লোকসংস্কৃতি মুখপত্র 'ছত্রাকের' সম্পাদনা। ছত্রাকের সম্পাদক সুবোধ বসুরায় নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির গভীর গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য—১৯৩০, ৭ই জানুয়ারী, কলকাতায়। লেখাপড়া—কলকাতা, বরিশাল ও কলকাতায়, বিদ্যালয়ে, আশুতোষ কলেজ ও আর্টকলেজ। চল্লিশ দশকের শেষ থেকে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত। কবি ও চিত্রশিল্পী। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। 'পলিমাটি', পত্রিকার সম্পাদক। প্রায় কুড়ি বছর পঞ্চায়েত প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। সাক্ষরতা, গ্রন্থাগার, লেখকশিল্পী ও আদিবাসী লোকসংস্কৃতি সংগঠনের সাথে যুক্ত। সমাজসেবা, গবেষণা ও সৃজনশীল কর্মে নিয়োজিত মার্কসবাদে প্রত্যয়ী মানুষ।

সিরাজুল হক—রঘুনাথপুর থানার বেড়ো গ্রামে ১৯৩৪ সালের ২০ অক্টোবর জন্ম।অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী 'ডহর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—(১) জলডুবির মাঠ (২) নামালিয়া (৩) পুরুলিয়ার মেলা (৪) বনবাদাড়ের পদাবলী (গল্প সংকলন)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ—পুরুলিয়ার অহঙ্কার। সম্বর্ধনা ও পুরস্কার পেয়েছেন অসংখ্য মূলত গল্পলেখক ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবে পরিচিত।

তৃপ্তি বিশ্বাস—জন্ম ১৩ জানুয়ারি ১৯৫২।একজন সাধারণ গৃহবধূ। তাঁর দৃষ্টিতে নাচনি সমাজের যন্ত্রণার দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা 'সিন্ধুবালা ঝুমুর ও নাচনি' প্রকাশিত হয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

বংশীধর কুমার—জন্ম-২৩ নভেম্বর, ১৯৫৯, জন্মস্থান-ভাড্ডি গ্রাম, থানা জয়পুর, জেলা পুরুলিয়া, বর্তমান ঠিকানা-অলঙ্গীডাঙা, পুরুলিয়া, পেশা-শিক্ষক। কলেজ জীবন থেকে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে 'মালভূমি বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সম্পাদনা করেন। জেলা ও জেলান্তরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে কবিতা, গল্প ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখা লিখে থাকেন। 'সহমরণের চিতা' নামে একটি মাত্র কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য লেখা অবস্থিত।